BanglaBook.org
দশটি উপন্যাস
বুদ্ধদেব গুহ
BanglaBook.org
BanglaBook.org
BanglaBook.org
BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশটি উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

BanglaBook.org

আনন্দ

www.BanglaBook.org

সূচিপত্র

হলুদ বসন্ত	৯
খেলা যখন	৭৭
বিন্যাস	১৪৩
ওয়াইকিকি	২২১
অন্বেষ	২৯৩
ভোরের আগে	৩৬৯
সন্ধের পরে	৪৬৯
পুজোর সময়ে	৫৫৩
নগ্ননির্জন	৬৪৩
বাতিঘর	৭০১
গ্রন্থ-পরিচয়	৭৫৩

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলুদ বসন্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১

ফোনটা বাজছিল।

অন্য প্রান্তে ফোনটা কুরর্—কুর্ কুরর্—কুর্ করে কোনও মেঘলা দুপুরের কামাতুরা কবুতরের কথার মতো বাজছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। টেলিফোনটা ওদের বাড়ির সিঁড়ির কাছে আছে। এখন বাড়িতে কে কে থাকতে পারে? সুজয় নিশ্চয়ই আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। ক'দিন বাদে দোল। পাড়ায় দোল-পূর্ণিমার কাংশান হবে। তাই নিয়ে পাড়ার রুস্তমরা ব্যস্ত। কাংশান না কচু। ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে রেলিশ করে কিছু মেয়ে দেখা। রুস্তমদের বঙ ফিকে হয় না। বুকের লোম পেকে গেলেও না। বেশ আছে ওরা। টেরিলিন-টেরিকটে মোড়া বৃদ্ধ বলখিল্যের দল। নয়নার মা নিশ্চয়ই ঠাকুর ঘরে চুপ করে বসে আছেন। এমন ভাব, যেন পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘটনা সব ওই ঠাকুরঘরের কন্ট্রোলরুম থেকেই রেডিও কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

ফোনটা বাজছেই—বাজছেই—বাজছেই।

নয়না এখন কী করছে? বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। সারাদিন পরিশ্রম তো কম নয়। নয়নার কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ওর সমবয়সী মেয়েদের পটভূমিতে ও বর্ষার জল-পাওয়া মৌরলা মাছের মতো লাফায়, অথচ ও আমার কাছে এলে শীতের সংকোচ নদীর ঘরেয়া মাছের মতো ধীরা হয়ে থাকে। আস্তে মাথা দোলায়, আলতো করে চোখ তুলে চায়, মুখে যত না বলে, চোখ দিয়ে তার চেয়ে বেশি কথা বলে। ওকে বুঝতে পারি না—ওকে একটুও বুঝতে পারি না। অথচ ওকে কী করে বোঝাই যে ওর এক চিলতে হাসি, ওর এক ঝিলিক চোখ চাওয়া—এইসব সামান্য সামান্য দান আমার সমস্ত সকাল, আমার সমস্ত দিন-কে অসামান্য মহিমায় মহিমামণ্ডিত করে তোলে। গত পাঁচ বছর ধরে কখনও এ কথাটা ওকে বোঝাতে পারিনি—কিংবা ও বুঝলেও, না বোঝার ভান করে থেকেছে।

'হ্যালো।'—ওপার থেকে নয়নার মা'র গলা শোনা গেল। গম্ভীর, ঠাণ্ডা, নিরুৎসাহব্যঞ্জক গলা। অথচ ভদ্রমহিলা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। বন্ধুর মা তো বটেই। আমি ফোন করলেই শুধোন, ওঁদের বাড়ি কেন যাই না—কাকিমার আর্থরাইটিস্ কেমন আছে—? মিনুর বাচ্চাটা (২ নং) ভাল আছে কি না ইত্যাদি, ইত্যাদি। অথচ তবু, আমার ইচ্ছে করে না ওঁর সঙ্গে কথা বলতে। বোধ হয় মনে পাপ আছে বলে! আচ্ছা, ভালবাসা কি পাপ? জানি না। বোধ হয় অন্যায়ভাবে, জোর করে ভালবাসাটা পাপ। নইলে এমন ভীরুতা, চোর চোর ভাব, অন্যায় বোধ আসে কেন?

আবার শুনলাম, 'হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!'

কোনও উত্তর দিলাম না। কেন দেব? আমি তো ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইনি! অফিস থেকে ফিরে, পায়জামা-পাঞ্জাবি চাপিয়ে আরাম করে শোফাটায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পাখাটাকে আস্তে খুলে দিয়ে আমি নয়নার সঙ্গে কথা বলব বলেই ফোন ডায়াল করেছিলাম। আমি তো অন্য কাউকে চাইনি। আমি তো অন্য কাউকে চাই না।

ভাবলাম, রিসিভার নামিয়ে রেখে দিই। কিন্তু হঠাৎ দেহাভ্যন্তরীণ কোনও যান্ত্রিক গোলযোগে

www.BanglaBook.org

অনিচ্ছায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, হ্যালো। আমি ঋজু।

কী ব্যাপার ?

লজ্জায় মরে গেলাম। ঈস্। তবে কি ওঁর কাছেও ধরা পড়ে গেলাম ? বললাম, কোনও ব্যাপার নেই। মানে, নয়না আছে ? গতকাল আপনাদের ওখানে গিয়েছিলাম—বসবার ঘরে আমার দেরাজের চাবিটা বোধ হয় ফেলে এসেছি। পাচ্ছি না।

মাসীমা আবার শুধোলেন, তোমার গাড়ির চাবি ফেলে গেছ ?

আমি বললাম, না। দেরাজের চাবি। (গাড়ির চাবি ফেলে এলে আর গাড়ি চালিয়ে বাড়ি এলাম কী করে ? যাচ্ছেতাই। কানে আজকাল কম শুনছেন।)

কোথায় ফেলেছ মনে আছে বাবা ?

আমি বললাম, নয়নাকে একবার জিজ্ঞেস করুন না ? কাল ও কাছে ছিল, গল্প করছিল।

দাঁড়াও। ফোনটা ধরো একটু।

শুনতে পেলাম, সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে মাসীমা নয়নাকে ডাকলেন। গম্‌গম্ করে উঠল। যেমন গম্‌গমে গলায় আমার মাথার মধ্যে নয়নার নাম শুনি আমি—কোনও অসহ্য একলা গরম দুপুরে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম। রিসিভারের জালে ডাবল হর্নটা ঝমঝমিয়ে বেজে উঠল। একটু পরে নয়না এসে ফোন ধরল।

কী হল ? হলটা কী ?

আমার চাবি।

আপনার চাবি ?

হ্যাঁ। আমার চাবিটা, দেরাজের চাবিটা ; তোমাদের বাড়ি কাল ফেলে এসেছি।

পাচ্ছেন না ?

না।

জ্বালালেন। দাঁড়ান দেখি।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, সব তো দেখলাম, সোফার কোণা, মেঝে ; এমনকী রাস্তায় যেখানে আপনার গাড়ি ছিল সেখানে অবধি। যদি গাড়িতে উঠবার সময় পড়ে গিয়ে থাকে, তাই ভেবে। কিন্তু নেই। পেলাম না।

নেই ?

না। বললাম তো পেলাম না।

পাবে না।

মানে ?

মানে, আমার চাবি আমার সামনেই আছে। হারায়নি। বলেই টুং টুং করে চাবিটা রিসিভারের সঙ্গে বাজালাম।

ঈস্। কী খারাপ আপনি—ভারী অসভ্য। কেন অমন করলেন ?

তোমার মা কেন ফোন ধরলেন ?

মা কী যম ?

আমার যম। আমার ভীষণ ভয় করে তোমার মাকে।

আমার মা'র মত লোকই হয় না।

তারপর একটু খুশি খুশি গলায় বলল, তারপর ? আপনার কী খবর বলুন ?

আমি বললাম, আমার আবার কী খবর ? তোমার সঙ্গে একলা কথা বলতে, একলা দেখা করতে ইচ্ছে করে। ভাল লাগে। তাই অফিস থেকে ফিরে তোমাকে ফোন করলাম। তুমি বিরক্ত হলে ?

না, আপনার ফোন এলে আমার ভাল লাগে।

আমার চিঠি পেয়েছ ? পরশু পোস্ট করেছিলাম।

উঁ।

কেমন লাগল ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাল।

শুধু ভাল ?

ভীষণ ভাল।

একটারও জবাব দাও না কেন ?

মানে, সময় হয়ে ওঠে না, তাছাড়া আপনার মতো ভাল চিঠি লিখতে পারি না। 'কেমন আছেন ? ভাল আছি। কলেজের প্রিন্সিপাল আজ এই বললেন' এই রকম চিঠি লেখার তো কোনও মানে হয় না। যেদিন আপনার মতো করে লিখতে পারব, সেদিন লিখব।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

কী হল ? কিছু বলুন।

তুমি আমাকে ভালবাসো না কেন ?

বাসি না ?

না।

খুব বাসি। (বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।)

আমি অনুক্ষণ, অনুক্ষণ তোমার কথা ভাবি, তোমার কথা ভাবি, আর তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না।

তারপর আবার চুপ। কোনও কথা নেই। হঠাৎ নয়না বলল, ভালবাসলে কী করতে হয় ?

কী জবাব দেব জানি না। ইচ্ছে হল বলি, চুমু খেতে হয়, আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির মতো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়—অনিমেষে, আশ্লেষে অন্যের মধ্যে আপ্লুত হতে হয়। কিন্তু ওসব কথা বলা যায় না। একবার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না। বন্যা একবার উঠলে নদীতে কত বড় বড় ঢেউ উঠবে তা আমি জানি না—সে ঢেউয়ে হাল ধরতে পারব কিনা তাও জানি না। তবু খুব ইচ্ছে করল, বলি—যে-কথা সব-সময় বলতে চাই—ঘুমুনার সময় বলতে চাই, ঘুম ভেঙে বলতে চাই—কাজের ফাঁকে ফাঁকে বলতে চাই—সেই কথা বলবার জন্যে আমায় আমন্ত্রণ জানাল নয়না ; অথচ আমি কিছুই বলতে পারলাম না। ভালবাসলে কী করতে হয় এই সরল সোজা প্রশ্নের উত্তরে বললাম, জানি না।

নয়না সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমিও জানি না।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

আমি বললাম, তুমি কী শাড়ি পরে আছ ?

বাজে ; বাড়ির শাড়ি।

তবু, বলো না !

হলুদের মধ্যে কালো কাজের একটি কটকী শাড়ি।

আর জামা ?

উঃ, জ্বালালেন আপনি। হলুদ জামা।

দাঁড়াও, মনে মনে আমার চোখের আয়নায় দাঁড় করিয়ে তোমায় দেখে নিই। বাঃ, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তো। হুবহু একটি হলুদবসন্ত পাখি।

নামটা পছন্দ, কিন্তু আমি তো সুন্দর না।

তুমি সুন্দর না ?

সবাই বলে।

সবাইর তো চোখ নেই। তোমার সৌন্দর্য সকলের জন্যে নয়।

থাক, বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে না। বাজে কথা রাখুন। টেনিস খেলতে গিয়ে পায়ে যে চোট লেগেছিল, এখন কেমন আছে ?

কাল থেকে ভাল।

তবু, পুরোপুরি সারেনি তো ?

না। এখনও একটু ব্যথা আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কয়েকদিন না খেললে কী হয় ? খেলোয়াড় যা, সে তো আমি জানি। যান তো অনেক সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে দেখতে। তাই না ?

সব মেয়েকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে ঘোড়ফরাস দেখতে আমি বেশি ভালবাসি।

উপমাটাও ভদ্রজনোচিত দিতে পারেন না ? আপনি সত্যিই একটি জংলি হয়ে যাচ্ছেন।

আমি তো জংলিই।

বাঃ। খুব বাহাদুরীর কথা, না ?

বাহাদুরী নয়। আমি যা, আমি তাই। তোমাদের সংজ্ঞায় সভ্য হতে চাই, সবসময় চেষ্টা করি ; পারি না, সত্যি সত্যি পারি না।

চেষ্টা করুন, চেষ্টা করতে থাকুন। কঠিন কাজ কী কেউ একবারে পারে ? ওঃ শুনুন, মনে পড়েছে। আপনার সেই লেখাটা আমার বান্ধবী সুমিতার খুব ভাল লেগেছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে।

জানোই তো আমি যার-তার সঙ্গে আলাপ করি না। কিন্তু লেখাটা তোমার কেমন লেগেছে বলোনি তো একবারও ?

আমার ? আমার মত দিয়ে কী হবে ?

তুমি জানো না কী হবে ?

না। জানি না।

তুমি নিজে একটি জংলি। পৃথিবীসুদ্ধ লোক হাই-ফাই এম্‌প্লিফায়ারে চিৎকার করে আমাকে ভাল বললেও আমার যতটুকু না আনন্দ হবে, তুমি একা যদি আমায় ভাল বলো—আন্তরিকভাবে—তাতে আমার অনেক বেশি আনন্দ হবে।

তাই হবে বুঝি ?

জানো নয়না, ছোটবেলা থেকে জনারণ্যের মধ্যে মিশে বড় হইনি—আজও মাত্র একজন দুজনের দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছি—যা কিছু করার করছি—তাই তাদের মধ্যে কেউ যদি ফাঁকি দেয়, তখন অন্ধের মতো দিশেহারা হয়ে পড়ি—পথ দেখতে পাই না। কী করব বুঝতে পারি না। বুঝলে ?

বুঝলাম, কিন্তু আমি কোনও অন্ধের যষ্টি হতে রাজি নই।

তা আমার মতো করে আর কে জানে ?

কিছুক্ষণ চুপ।

কী করছিলে ? ঘুমুচ্ছিলে ?

না স্যার। আপনার মতো সবসময় ঘুমুই না। সোমবার পরীক্ষা। পড়ছিলাম।

কী পরীক্ষা ?

উইক্‌লি পরীক্ষা।

তা হলে তো এতক্ষণ কথা বলে অনেক সময় নষ্ট করলাম।

না। এতটুকুতে আর কী ক্ষতি হবে ?

বললাম, তবু যাও পড়ো গিয়ে লক্ষ্মী, সোনা মেয়ে।

নয়না বলল, আচ্ছা। ও এমনভাবে ফোন ছাড়ার আগে 'আচ্ছা' বলে, মনে হয় সুন্দর সুগন্ধি কোনও ভালবাসার চিঠিতে শীলমোহর দিল। চুমু খাওয়ার মতো মিষ্টি করে বলল, আ—চ্ছা।

তুমি ছাড়ো ফোন।

না। আপনি আগে ছাড়ুন।

ফোন ছেড়ে দিলাম।

এই মুহূর্তে আমার এত ভাল লাগছে যে কী বলব ! আমার কী যে ভাল লাগে ; কী যে ভাল লাগে। নয়নার সঙ্গে এই যে একটু কথা বললাম, এর দাম জানি না। কেন এমন হয় তাও জানি না। কীই বা জানি ? কতটুকু বা জানি ? শুধু জানি যে শোবার সময় যখন ফুরফুর করে বসন্তের বাতাস মাধবীলতাটায় দোল দিয়ে আমার নেটের মশারিতে ঢেউ তুলে উত্তরের জানালা দিয়ে পথে

www.BanglaBook.org

বেরোবে—তখন আমি রাজার মতো, মহারাজার মতো, বিড়লার সমান বড়লোকের মতো আরামে, আবেশে, নয়নার উজ্জ্বল চোখ দুটি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ব। সেই আনন্দের বদলে আমি আর কিছুই চাই না। কিছুতেই তো বিনিময় করতে পারি না।

২

এই একটা দিন। রবিবার। সারা সপ্তাহ এর মুখ চেয়ে থাকা। সপ্তাহে ছদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৭টা করি। ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে গা জ্বালা করে। কিন্তু ওই যে পুরুষালী জেদ। কজন লোক আর শুধু পয়সার জন্যে খাটে? খাটে লোকে জেদের জন্যে। আমি পারি, ভাল করে পারি, এইটে প্রমাণ করার জন্যে। বিজিতেনবাবু একদিন বলেছিলেন; তখন আমি ছেলেমানুষ; সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কারখানায় ঢুকেছি। বলেছিলেন, প্রফেশনাল ফার্মে গুডউইল নিজের নিজের তৈরি করে নিতে হয়—বাপ-কাকার নামে চলে না। মামা বড় এঞ্জিনিয়ার বলে লোকে আপসে ভাগ্নেকে বড় এঞ্জিনিয়ার বলবে না। মানে, কটাক্ষ করে এমনভাবে কথাটা বলেছিলেন যে, মনে লেগেছিল। ভেবেছিলাম মামা-বেচে খাব এই বা কেমন কথা? যে নিজের পরিচয়ে পরিচিত নয়, নিজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়, সে আবার পুরুষ কীসের? ব্যস। ওই জেদেই গেল। মাথার চুল পাতলা হল, চোখের কোণায় কালি জমল, চেয়ারে বসে বসে তলপেটে চর্বির আস্তরণ পড়তে লাগল। বিনিময়ে, বুকের কোণায় হয়তো কিছু আত্মবিশ্বাস জন্মাল।

সত্যি বলতে কী, এরকম সাফল্যে আত্মপ্রসাদ হয়তো আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। বর্তমানটাকে পদদলিত করে নিজেকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করলাম বটে—কিন্তু কখনও কখনও—কাজের ফাঁকে ফাঁকে—টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে—কোনও কলোয়ারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ দূর দিগন্তে মনে মনে ছুটির ছবি দেখি—কানে নিচু-গ্রামে ছুটির বাজনা বাজতে শুনি, তখনি মনটা কেঁদে ওঠে। ইচ্ছে করে গ্যাডগিল এন্ড ঘোষ কোম্পানির মুখে লাথি মেরে, কাচের জানালা ভেঙে কোনও পাখি হয়ে উড়ে চলে যাই। কোনও সমুদ্র কিনারে। অনেকদিন আগে-যাওয়া গোপালপুরে। যেখানে আসন্ন সন্ধ্যার করুণ সুগন্ধি ম্লানিমায়, সুনীল আকাশের পটভূমিতে শ্বেতা ফেনার বুদ্বুদ মেখে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই নিজে উড়ে বেড়াই। যেখানে আমার কোনও কর্তব্য নেই, আমার উপর কারও দাবি নেই। ইচ্ছে করে, নিজের মনের ইজেল বালুবেলায় সাজিয়ে অবসরের প্যাস্টেল কালারে, খুশির তুলিতে ছবির পর ছবি আঁকি।

রবিবারের Gun-club-এ একটা মেলা মেলা আবহাওয়া আছে। সারি দিয়ে সকলে বন্দুক দেখে নিচ্ছে। প্রথমে স্কিট-শুটিং, পরে ট্র্যাপ-শুটিং হবে। শুটিং-পজিসানে দাঁড়িয়ে উড়ন্ত ডিস্ককে গুঁড়িয়ে দেবার একটা আনন্দ আছে। মনে মনে অবচেতনে আমি যা পছন্দ করি না, আমি যা ঘেন্না করি, আমি যা সইতে পারি না—সেই সবকিছুকে আকাশ থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলোর সঙ্গে পড়তে দেখি। ভারী আনন্দ লাগে।

সুগত হাই-হাউসের নীচে দাঁড়িয়ে ওর পাখিকে ডাকল। শট-গানটা ডান থাইয়ের উপরে বসিয়ে শক্ত করে ধরে ডাকল—পুল্। অমনি হাই-হাউস থেকে মাটির ডিস্ক বেরিয়ে গেল মেশিনে—সাঁই করে। যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে—মুহূর্তের মধ্যে দূরে চলে যাচ্ছে—দুম্। আকাশে গুঁড়ো হয়ে গেল। নীল আকাশের পটভূমিতে একমুঠো কালো ধুলোর মেঘ ফুটে উঠে বৃষ্টি হয়ে নীচে পড়ল।

এবার লো-হাউসের পাখি আসবে। সুগত রেডি হয়ে বলল, পুল্—নিচু দিয়ে এবার সামনে থেকে উড়ে এল, কাদার ডিস্ক—এল, এল; এল—একেবারে সামনে—দুম্। আবার গুঁড়িয়ে গেল।

এবার ডাব্‌ল। এক সঙ্গে হাই এবং লো—দুদিক থেকে দুটি পাখি উড়ে এল—দূরে-যাওয়া পাখিকে আগে মেরে, কাছে-আসা পাখিকে পরে মারতে হবে, তাই নিয়ম। দুম, দুম—আবার দুটি। পাখিরা গুঁড়ো হয়ে পড়ল।

বন্দুকের ইজেক্টরটা মাঝে মাঝে জ্যাম হয়ে যাচ্ছিল—ব্রীচটা খুলে দেখছি—এমন সময় যতি এসে ফিসফিস করে কানের কাছে বলল, ঋজুদা, গাড়িটা দেখেছ? প্যাভিলিয়নের পাশে চেয়ে দেখো।

www.BanglaBook.org

চেয়ে দেখলাম—একখানা গাড়ির মতো গাড়ি বটে—একটা চাঁপা-রঙা জাগুয়ার স্পোর্টস-কার প্যাভিলিয়নের পাশে দাঁড় করান। ভাল করে দেখার আগেই, সুগত ডাকল, এই ঋজু কী হল ? এসো।

আমি বললাম, আমার বন্দুকের ইজেক্টর খারাপ হয়ে গেছে।

ও ধমকে বলল, ঝামেলা কোরো না—এসো।

সুগতর অভিযোগ আছে যে কোনওদিনই আমি সীরিয়াসলি অনুশীলন করলাম না। কেন জানি না—প্রতিযোগিতায় আমি নামতে চাই না কারও সঙ্গে—কোনও ব্যাপারেই। যে প্রতিযোগিতা পেটের জন্যে করতে হয়—তার কথা স্বতন্ত্র। সে প্রতিযোগিতায় না নেমে উপায় নেই। কিন্তু তা ছাড়া অন্য প্রতিযোগিতায় নামার শখ আমার নেই। এক প্রতিযোগিতাতেই আমি হাঁপিয়ে গেছি ; ফুরিয়ে গেছি। বরং জীবনের অনেকানেক ক্ষেত্রে অনবধানে ঢুকে পড়ে রংরুটের মতো যেটুকু মজা লুটে নিতে পারি, সেটাই দৈনন্দিন প্রতিযোগিতার গ্লানি ঢেকে রাখার জন্যে প্রয়োজন আমার। আমি পারি না। প্রতিযোগিতাতে হেরে যাবার জন্যেই আমি জন্মেছিলাম।

তবু সুগত আমায় ভালবাসে ; তাই বলে। ক'জনই বা ভালবাসে ? এত বড় পৃথিবীতে ক'জনই বা কাকে কাছ থেকে চেনে, জানে, বোঝে ? সেই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে সুগত অন্যতম ; আমার জঙ্গলের বন্ধু।

কোনওরকমে একটা 'ডিটেল' ছুঁড়ে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম গাড়িটার পাশে। যতি আগেই গেছে। রঞ্জনও গুটি গুটি এল। গাড়ি একখানা।

এয়ার কন্ডিশানড তো বটেই—যেমন চেহারা তেমন গড়ন। টায়ারগুলো ইয়া মোটা মোটা এক জোড়া সাইলেন্সার চক্‌চক্ করছে—দরজাটা খুলে যেখানে খুশি ছেড়ে দিলে সেখানেই আটকে থাকে। ধরে থাকতে হয় না। রঞ্জন গাড়িটার গায়ে ঠোঁট লাগিয়ে চুঃ শব্দ করে একটা চুমু খেল। যতির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। গাড়িটার পেছনের কাচের এক কোণে এমব্যাস করে নাম লেখা রয়েছে "লাভ ইন দ্য আফটারনুন"।

গাড়ির মালিককে আমরা চিনি। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। মিস্টার সিধু। অনেক ব্যবসা-ট্যাবসা আছে। যতি ডাকত সিধুমুখী। ভদ্রলোকের এরকম আরও গোটা পাঁচ-সাত গাড়ি আছে। এক একদিন এক একটা নিয়ে আসেন। আমরা আমাদের ঝরঝরে অ্যাম্‌বাসাডারে, এবং যতি, যতির আড়াই-পাক-ফলস্-স্টিয়ারিংওয়ালা জীপে বসে, আড় চোখে গাড়িগুলোকে রোজ দেখি—আর ক্ষোভে হিংসায় পাটকাঠির মতো দাউ দাউ করে জ্বলি। এক একটি গাড়ির দাম সোয়ালাখ ; দেড় লাখ। স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন থেকে কেনেন ভদ্রলোক।

হঠাৎ রঞ্জন বলল, যতি, তুই চীনে খেতে খুব ভালবাসিস, না ?

এই প্রশ্নে যতি চমকে বলল, কেন ? এর মানে কী হল ?

রঞ্জন একটু ভেবে বলল, তোর জীপ যদি তুই ওই গাড়ির ঘাড়ে তুলে দিতে পারিস কখনও, তো তোকে তিন দিন চীনে খাওয়াব !

যতির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। চীনে খাবার লোভে নয়, এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝেছে ও—আমিও বুঝেছি।

বললাম, আমিও তিন দিন চীনে খাওয়াব।

যতির চোখ দুটো আবার উজ্জ্বল হল। দপদপ করতে লাগল। বলল, গাড়িটার বাম্পার দেখেছ—কেমন নিচু—জীপকে একবার ঘাড়ে চড়াতে পারলে পেছনের কাচ এবং এয়ার-কন্ডিশানার-টানার ভেঙে একেবারে সীটের উপর পৌঁছে যাব।

এই অবধি বলেই হঠাৎ মুষড়ে পড়ে বলল, কিন্তু তা হবার নয়—। এ গাড়ির যা স্পীড, এ তো ক্যাঙ্গারুর মতো দৌড়বে—এ গাড়িকে পেছন দিয়ে গিয়ে ধরা, জীপ গাড়ির কর্ম নয়—তবে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে সামনাসামনি যদি কোনওদিন পাই তো "জয়, বজরঙ্গবলীকা জয়" বলে একেবারে মুখোমুখি লড়িয়ে দেব। তারপর যো হোগা, সো হোগা।

আমি বললাম, সামনাসামনি মারলে তো সামনের সীটের লোকও মরে যেতে পারে।

www.BanglaBook.org

যতি বলল, তা তো পারেই। তুমি বেশ কথা বলছ বটে। ছ'দিন চীনে খাব—আর তার বদলে এক-দুজন লোক মরবে না ? আমাদের জীবনের দাম কি এতই বেশি না কী ?

রঞ্জন ওকে নিরস্ত করার জন্যে বলল, দ্যাখ যতি, বেশি বাড়াবাড়ি করতে যাস না—সবটাতে তোর জ্ঞান দেওয়া স্বভাব হয়ে গেছে।

৩

কবে নয়নাকে প্রথম দেখেছিলাম ভাল করে মনে পড়ে না।

যা মনে পড়ে তা হচ্ছে একদিন গ্রীষ্ম গোধূলিতে সুজয়দের বাড়ি-যাওয়া। সুজয়ের সঙ্গে তখন প্রথম আলাপ। কলেজে মাখামাখি হয়েছে, কিন্তু কখনও আমি ওদের বাড়ি যাইনি। সেই সময় আমাদের বাড়ি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কাছে হত বলে কলেজ-ফেরতা ও আমার সঙ্গে প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসত। মানে, তখন কলেজে মাখামাখি হয়েছে, সাহিত্যালোচনা হয়েছে, জীবনে প্রথমে একসঙ্গে সিগারেট খেয়ে নিজেদের প্রাজ্ঞ মনে করা হয়েছে। এমনি সময় একদিন সুজয় ফোন করে বলল, আয় না ঋজু, বাড়িতে আছি। আমাদের বাড়ি একদিনও তো এলি না।

বিকেলের মেহগিনি আলোয় একদিন ওদের বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। বাড়ির ভিতরে, লনের কোণায় গোয়ালা দুধ দোয়াচ্ছিল, তার পাশে একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছিপছিপে সপ্রতিভ মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুঁউক-চাঁক—চুঁউক-চাঁক আওয়াজ করে গোয়ালা কী করে দুধলি গরুর গোলাপি বোঁটা থেকে দুধ নিঙড়ে বের করছিল তাই দেখছিল।

শুধোলাম, সুজয় আছে ?

মেয়েটি প্রথমে অবাক হল। গেটের পাশের দরোয়ানের শূন্য টুলের দিকে একবার তাকাল। তারপর সপ্রতিভ গলায় বলল, আপনি ঋজুদা ?

হ্যাঁ। তুমি কে ?

আমি নয়না। আপনার বন্ধু সুজয় আমার দাদা। এই অবধি বলেই, বক্‌না বাছুরের মতো মাথা দুলিয়ে, দুই বিনুনী ছুঁড়ে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে ও বসবার ঘরে বসাল।

পর্দা ঠেলে বসবার ঘরে ঢুকলাম। সোফায় বসলাম। সেদিন বুঝতে পারিনি, পরে এই ঘরটি, এই আদর, এই অতিথিপরায়ণ সহজ বন্ধুত্বহীন আত্মসম্মানজ্ঞানী মেয়েটির আকর্ষণ আমার কাছে এমনি দুর্বার হয়ে উঠবে।

সেই প্রথমদিনে, নয়নাদের বন্ধুর ছোট বোন হিসেবে, চটপটে কমনীয় একটি মেয়ে বলেই ভাল লেগেছিল। তার চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়নি। অন্য কিছু ভাবিওনি। সেই নয়না আর আজকের নয়নায় কোনও মিল নেই। সব মেয়েরাই বোধ হয় দ্বিজ। যৌবনে ওরা প্রত্যেকে নতুন করে জন্মায়।

তারপর একটি একটি করে বুড়ি বছরগুলি হাওয়ার সওয়ার হয়ে নিমগাছের প্যাতার মতো ঝরে গেছে। দুপুরের ক্লান্ত কাকের মতো কা-খ্বা—কা-খ্বা করে প্রথম যৌবনের অস্বস্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। বেগুনি প্যাশান-ফ্লাওয়ারের মতো সুগন্ধি স্বপ্ন দেখেছি এবং একদিন এক জিয়াভরলি ভোরে আবিষ্কার করেছি যে, নয়না আর আমার কাছে শুধু সুজয়ের বোন মাত্র নয়। সে আমার অজানিতে আমার নয়ন-মণি হয়ে উঠেছে। ঠিক কোন সময় থেকে যে সে আমার মনে, অনবধানে, একটি কৃষ্ণসার হরিণীর মতো সুন্দরী, কাকাতুয়ার মতো নরম এবং মৌটুসী পাখির মতো সোহাগী হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারিনি। সেই ভোরে, হঠাৎ দরজা খুলেই মনের উঠোনে পত্রপল্লব বিস্তার করা রঙিন কৃষ্ণচূড়ার মতো তার মঞ্জরিত ব্যক্তিত্বকে অনুভব করে আমার সমস্ত সত্তায় সিরসিরানি লেগেছে।

সুগতকে মাঝে মাঝে বলতাম নয়নার কথা। ও আমার চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে শুনত। ও নয়না কি সুজয় কাউকেই চিনত না। ওকে বেশি কিছু বলতে গেলেই ও আমার মুখ চেপে ধরত। বলত, পাগলা ছেলে, এসব কথা বলতে নেই—এসব যে একান্ত কথা। সোডার বোতলের ছিপি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুলে ফেললে সে যেমন সমস্ত ঝাঁজ, গন্ধ, আবেগ হারায়, সে যেমন নিঃশেষে বিড়বিড় করে ফুরিয়ে যায়—তুমিও তেমনি ফুরিয়ে যাবে। এসব কথা কাউকে বলতে নেই। কেবল নিজের মধ্যে দামি আতরের গন্ধের মতো, জঙ্গলে চাঁদনি-রাতে হঠাৎ-শোনা কোনও পাখির ডাকের ভাল-লাগার মতো নিজের একান্ত করে রাখতে হয়।

তারপর সুগত শুধোত, তুমি যে ভালবেসে ফেলেছ তা জানলে কী করে? ভালবাসা আর ভাল-লাগায় তফাত জানো?

আমি অবোধের মতো মাথা নাড়তাম।

ও নিজেই উত্তর দিত। বলত, ভালবাসায় বড় দায়, বড় ঝুঁকি; বড় ব্যথা। ভালবাসার সমুদ্রে ভীষণ ঝড় ওঠে—সে ঝড়ে হারিয়ে যায় কত লোক। কূল খুঁজে পায় না। নৌকো ডুবে যায়। কিন্তু তবু, সোজা, সমস্ত জোরের সঙ্গে দাঁড় বেয়ে তাকে চলতে হয়; যে ভালবাসে সে কখনও ভয় পায় না—ভালবাসার জন্যে সে নিজের সাধ্যাতীত অনেক কিছু করে ফেলতে পারে।

শুধোতাম, আর ভাল-লাগা?

ভাল-লাগা কী জানো? দোতলার বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে দেখলে পথ দিয়ে একটি ফুটফুটে মেয়ে শরত-সকালের শিউলির মতো হেঁটে যাচ্ছে। তুমি মনে মনে বললে, বাঃ, বেশ তো।

ব্যস্। ওই পর্যন্ত। সে যেই মোড় ঘুরল—ভিড়ে হারিয়ে গেল—তোমার ভাল-লাগাও ফুরিয়ে গেল। ভাল লাগলে মানুষ ভাল-লাগাকে তার ইচ্ছাধীন করে রাখতে পারে, কিন্তু ভালবাসলে মানুষ নিজেই ভালবাসার ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে। তার নিজের কোনও নিজস্ব সত্তা থাকে না। ভালবাসা তাকে যা করতে বলে, পোষা পুষির মতো সে তাই করে।

সত্যি। সুগত যে কত কী জানে, কত কী ভাবে! কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে। অথচ আমি কেবল পাগলামি করে বেড়াই। বুদ্ধি বলে কিছুই হল না এ পর্যন্ত! মস্তিষ্ক অসাড় করে সব কিছু জমেছে গিয়ে হৃদয়ে। নড়লে-চড়লে হৃদয়টাই শুধু ঝমঝমিয়ে বাজে।

শিশুর মতো বায়না ধরি, অথচ বৃদ্ধের মতো অপরাহ্ণ হয়ে বসে থাকি। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। নিজেকে শিকারের যোধপুরী বুট পরে লাথি মারতে ইচ্ছা করে।

ঠিক কোন সময় থেকে নয়নাও আমার প্রতি কৌতূহলী চোখে চাইতে আরম্ভ করছিল তাও মনে নেই। তবে মনে হয়, প্রথম আমার চিঠি পেয়ে। চিঠি লিখতে কখনও আলস্য বোধ করিনি। এবং সে কারণে, যখনি যেখানে গেছি সেখান থেকে চিঠি লিখেছি চেনা পরিচিত অনেককে, তার মধ্যে নয়না ছিল অন্যতমা। মনে হয় আমার চিঠির আয়নায় সে তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখটিকে প্রথম আবিষ্কার করে। তারপর প্রতিটি চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ও নিজেকে চিনতে পারে, নিজের প্রতি ওর মমত্ববোধ জাগে—এত বড় কলকাতা শহরের অগণ্য মেয়েদের মধ্যে ও যে বিশিষ্টা—ও যে নিজের পরিচয়ে পরিচিতা, ও হাসলে ওকে যে সুন্দর দেখায়, ওর চোখে যে অন্ধকারে বুদ্ধির জোনাকি জ্বলে, ওর কাছে এলেই যে কেউ ভাল-লাগায় মরে যেতে পারে, এত সব অনাবিষ্কৃত তথ্য ও বোধহয় আমার চিঠি পাবার আগে জানত না। এবং দিনে দিনে ও ঠিক যে অনুপাতে গর্বিতা, মহতী ও খুশি হয়ে উঠতে থাকে, আমি ঠিক সেই অনুপাতে হীনমন্য ক্ষুদ্র ও অখুশি হয়ে উঠতে থাকি। এও এক ধরনের আত্মাবলুপ্তি। স্লিপিং পিল খেলে এক মুহূর্তে হত। এমনি ভাবে তিলে তিলে হচ্ছে।

কিন্তু শুধু যে আত্মাবলুপ্তিই ঘটছে তাই বা বলি কী করে? নয়নাকে ভালবেসে আমি নিজের অযোগ্য অনেক মহৎ কর্মই করে ফেলেছি এ পর্যন্ত, যা ওকে ভাল না বাসলে করতে পারতাম কিনা আমার সন্দেহ আছে।

স্যার উইনস্টন চার্চিল বিরোধী পক্ষের একজন পার্লামেন্টারিয়ানকে একদিন বলেছিলেন, The honourable member should not have more indignation than he can contain. তেমনি আমারও নিজেকে বলতে ইচ্ছে করত, I should not have more greatness than I contain.

একদিন সকালে বাড়িতে বসে আছি—শাল জড়িয়ে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। রোদে, আরামে বসে চা খাচ্ছি—এমন সময় নাপিতটি এল। ইদানীং ও সপ্তাহে দুবার করে আসছে।

www.BanglaBook.org

হাত-পায়ের নখ ইত্যাদি কাটে। ও একটি পাতলা সুতির জামা গায়ে দিয়েছিল। শীতে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছিল।

ঘুম ভেঙে উঠে আমি বসে ছিলাম। বাগানে এক ফালি রোদ লুটিয়ে পড়েছে। একটি বহুরূপী লনের শিশির-ভেজা ঘাসের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। একটি শালিক হলুদ হলুদ পা ফেলে ফেলে একা একা মুখ গোমড়া করে হাঁটছিল, এমন সময় অন্য একটি উড়ে এসে ওর গায়ে ঢলে পড়ল। One for sorrow; Two for joy.

ভীষণ খুশি খুশি লাগতে লাগল। নয়নার কথা মনে হল। এখন নয়না কী করছে? ঘুম থেকে নিশ্চয়ই ওঠেনি। বড় দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে ও। এত দেরি করে উঠলে তো চলবে না। রোজ সকালে আমার ঘুম ভাঙার আগে উঠে, চান করে নেবে ও—তারপর সুগন্ধি খোলা চুল নিয়ে, জানালা খুলে দিয়ে হাতছানি দিয়ে ভোরের রোদকে ঘরে ডেকে, আমাকে বলবে—এই! আর কত ঘুমোনো হবে? ক'টা বেজেছে জানো?

আমি বলব, উঁউম-ম্-ম্-ম্...। তারপর বলব, জানি। বারোটা।

ও বলবে, সবসময় ইয়ার্কি, না?

এই আবেশে, অনিমেষে, এ সব ভাবছি, এমন সময় নাপিতটি এল। এমন সময় ও আমার অমন স্বপ্নভরা চোখের সামনে শীতে কাঁপতে লাগল। কী হয়ে গেল জানি না! শালটি গা থেকে খুলে ফেললাম। বোধহয় আমি নিজে খুললাম না। নয়নার অদৃশ্য লতানো হাত দুখানি আমার গা থেকে শালটি আল্‌তো করে খুলে নিল! তারপর নাপিতটিকে বললাম—নাও, নাও, গায়ে জড়িয়ে নাও; করেছ কী? নিউমোনিয়া হবে যে।

আমার কিন্তু একটিমাত্রই শাল ছিল। এরপর বিয়েবাড়ি যেতে হলে ধার করতে হবে। দিদি জানতে পেরে খুব বকবেন। বলবেন, ভাই আমার জমিদার হয়েছেন!

আমি জবাবে কিছুই বলব না। মাথা নিচু করে থাকব। দিদিকে আমি কী করে বোঝাব যে, যে মুহূর্তে আমি শালটি দান করেছিলাম, সে মুহূর্তে কোনও সামান্য জমিদার তো দূরের কথা, আমি হায়দরাবাদের নিজাম হয়ে গিয়েছিলাম! আমার মতো বড় লোক আর কে ছিল?

কিন্তু ওসব কিছুই আমি বলতে পারব না। দিদি লোককে বলবে, ঋজুর আমার মনটা ভীষণ বড়। দিদি জানবেন না যে, তাঁর ঋজুর মনটা বড় নয়। খোঁড়া ভিখিরিকেও সে পয়সা না দিয়ে বিদায় দেয় ধমক দিয়ে, কিন্তু নয়না যখন পাশে থাকে, মানে, নয়না যখন মনে মনে তার খুব কাছ-ঘেঁষে দাঁড়ায়—তখন সে মহান্ত হয়ে যায়। বিরাট, বিরাট,—সি. আর. দাশের চেয়েও বড় দাতা হয়ে যায়। তখন সে নিজের যা কিছু আছে সব দিতে পারে।

৪

সুজয় নেমন্তন্ন করতে এসেছিল সেদিন। বলল, আমার দিদির বিয়ে। ময়নাদির বিয়ে, তোর সকাল থেকে যেতে হবে কিন্তু—কাজকর্ম করতে হবে।

বললাম, দ্যাখ, নিজের দিদির বিয়েতেই কাজকর্ম করিনি। আমি একেবারে অকর্মা। তবে, যখন অতিথি-অভ্যাগতরা আসবেন তখন তাদের আসুন-বসুন করতে পারি। তার বেশি আমার দ্বারা হবে না। ভার দিলেও সব গোলমাল করে দেব।

সুজয় বলল, আরে সেটাই কি কম কাজ? আমার মা কী বলেন জানিস? বলেন, নেওতা-নেমন্তন্নে কেউ কারও বাড়ি খেতে আসে না। ভালমন্দ সকলেই বাড়িতে খায়। তাই এসব সামাজিক ব্যাপারে আদর-আপ্যায়নটাই বড় কথা। তার জন্যেই লোকের দরকার।

বললাম, তা হলে তো ভালই!

বিয়ের দিন সকাল সকাল গিয়ে পৌঁছলাম। সুজয়দের লনে, পাশের প্যাসেজে এবং রাস্তায় সামিয়ানা ঘেরা হয়েছে। ব্যাঙের মতো হলুদ-রঙা ভাড়া-করা চেয়ার পাতা হয়েছে সারি দিয়ে। অনেক লোকজন। ব্যস্ত-সমস্ত। সানাইওয়ালা আনেনি ওরা। অ্যামপ্লিগ্রামে লং প্লেয়িং রেকর্ড

www.BanglaBook.org

বাজছে।

সামনে দিয়ে অনেক লোক আসছে যাচ্ছে। সুজয়ের মা একবার বাইরে এলেন দেখতে, মেয়ের বিয়ের প্যাণ্ডেল কেমন হয়েছে। আমায় দেখে বললেন, কি বাবা, এসেছ ? নিজের মতো করে আদর আপ্যায়ন কোরো লোকজনকে। এটা তো তোমার নিজেরই বাড়ি।

মাসীমাকে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু এ বাড়ি আমার নিজের বাড়ি ভাবতে খুব ভাল লাগে।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। শীতটাও জাঁকিয়ে পড়েছে। যতির কাছ থেকে ধার-করা শালটা এত ছোট হয়েছে যে, ভাল করে শীত মানছে না।

এবার লোকজন আসতে আরম্ভ করল। একটার পর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে—কেউ কেউ ট্যাক্সিতে, কি হেঁটেও আসছেন। ফ্লুরোসেন্ট ডে-লাইটে ফর্সা লোকেদের ঠাকুমার কোলবালিশের মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। আর কালো লোকেদের বেগুনি-রঙা সিমের মতো মনে হচ্ছে। আলোয় মেয়েদের গয়না ঝিক্‌মিক্ করছে। কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে টাইট-ফিটিং টেরিলিন-টেরিকটের স্যুট পরে এসেছে। আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে আসছে। ইচ্ছে করছে হঠাৎ পা বাড়িয়ে দিই ; মুখ থুবড়ে পড়ুক। বুঝতাম, অফিস-কাছারি থেকে সোজা আসছে, তাও নয়। সারাদিন ঘুমিয়ে কি আড্ডা মেরে, এখন সৌখীন স্যুট পরে আত্মীয়-বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে এসেছে। কোনদিন মাড়োয়ারী ছেলেদের মতো স্যুট পরে, পাঞ্জাবী ছেলেদের মতো হাতে বালা পরে, মেক্সিকান ছেলেদের মতো চোখা জুতো পরে এবং বীটলসদের মতো এক মাথা কাকের-বাসা চুল নিয়ে বাঙালির ছেলে হয়তো বিয়েও করতে যাবে। জানি না, একদিন হয়তো চোখে সবই সয়ে যাবে।

এদিকে 'আসুন' 'আসুন' করে তো হাঁপিয়ে উঠলাম। যে আসছে, তাকেই গাড়ির দরজা খুলে নামাচ্ছি। মধুর হাসি হেসে পথ দেখিয়ে যাচ্ছি। তারপর মহিলাদের বাড়ির মহিলামহলে ; এবং পুরুষদের হলুদ কাঠের চেয়ারে সমর্পণ করছি।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। একটা সাদা হেরাল্ড। বাঁ দিকের দরজা খুলতেই এক মোটা ভদ্রমহিলা (অল্পবয়সী) নামবার চেষ্টা করতে লাগলেন। চেষ্টা করলেই তো হল না। ওই চেহারা নিয়ে হেরাল্ড গাড়ির গর্ভ থেকে বেরুনো মোটেই কম নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, আজ আমার করণীয় কর্তব্যের মধ্যে কোনও স্থূলকায়া 'মমতা-ঠাসা-নাদুস' মহিলাকে গাড়ি থেকে হাতে ধরে টেনে নামানোও পড়ে কি না, এমন সময় যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি কটাং শব্দ করে হেরাল্ডের দরজা খুলে স্ত্রীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

কী সর্বনাশ। এ যে অনিমেষ। আমাদের কলেজেই পড়ত। আমাদের চেয়ে দু' বছরের সিনিয়র ছিল। আমরা বলতাম অনিমেষ গুণ্ডা। একবার ইন্টার-ক্লাস ক্রিকেট ম্যাচে আমার ইনস্যুয়িং বলে আউট হয়ে রেগে গিয়ে আমাকে খুব মেরেছিল। ওকে দেখে রাগে গা চিড়বিড় করতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিমুখে বললাম, 'আসুন' 'আসুন'।

ও আমাকে চিনতে পেরে অবাক হল। মুখের বিগলিত অবস্থা দেখে বুঝলাম, সুজয়রা নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়। স্ত্রীকে উদ্ধার করে আমার হাতে দিতেই আমি মহিলামহলে পৌঁছে দিলাম। গাড়ি পার্ক করিয়ে ও যখন আবার গেটে এল, আবার বললাম, 'আসুন' 'আসুন'—ও খুব কাছে এল—একদম মুখের কাছে মুখ নিয়ে 'হুঁকোমুখো'র মতো হিমেল হাসি হেসে বলল, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ?

বাক্যব্যয় না করে চলে এলাম। যতির শালটায় নাক ফেটে রক্ত-টক্ত পড়লে কেলেঙ্কারি হবে। বললাম, আচ্ছা বসুন, বসুন। বলেই সরে এলাম।

এবারে নয়নার উপর আমার সত্যিই রাগ হচ্ছিল। সেই বিকেল তিনটে, সাড়ে-তিনটেতে এসেছি—রাত নটা বাজতে চলল। এখনও কি একবার সময় করে নীচে আসতে পারল না ? কতগুলো বাজে বন্ধু জুটেছে। খালি হি-হি আর হা-হা। বন্ধুগুলোই ওর মাথা খাবে। এবং আমারও সর্বনাশ করবে।

আলোর নীচে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছি, এমন সময় রাজেন্দ্রাণী এলেন। ওকে সাজলে-গুজলে

www.BanglaBook.org

রাজেন্দ্রাণী ছাড়া আর কিছু বলতে ইচ্ছে করে না আমার। আর কিছু মনে আসে না।

একটি নীল-রঙা বেনারসী পরেছে। রুপোর ফুল তোলা। চুড়ো করে খোঁপা বেঁধেছে। ওর গ্রীবাটি এত সুন্দর যে ও আমার কাছে এলেই ওর গ্রীবায় আল্‌তো করে ঠোঁট ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে। হাতে হালকা গয়না পরেছে, পায়ে পায়-জোড়। পা ফেললেই ঝুনুর ঝুনুর করে বাজছে—আর আমার বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে উঠছে।

নাজিমসাহেব টুটিলাওয়াতে উর্দু কবিতা শুনিয়েছিলেন—নয়না সাজগোজ করলেই আমার সেই শায়রীর কথা মনে পড়ে :

উল্‌ঝি সুল্‌ঝি রহনে দেও,
কিঁউ শরপর্ আফৎ লাতি হো ?
দিল্‌কা ধড়কান বাড়তি হ্যায়
যব, বাঁলোকো সুল্‌ঝাতি হো।

মানে, তুমি উস্কোখুস্কোই থেকো—। সেজেগুজে, চুল পরিপাটি করে আমার শিরে নতুন করে বিপদ ডেকে এনো না। তুমি কি জানো না, তুমি সুন্দর করে সাজলে আমার বুকের মধ্যেটা কেমন করে ?

এলেন। এতক্ষণে এলেন। যেন রাধারাণী এলেন। গর্বিতা, সুস্মিতা, আত্মবিশ্বাসে উত্তিষ্ঠিতা, কিন্তু আত্মসচেতন নয়। ও যদি ওর কী আছে জানত তবে ওকে আমার ভাল লাগত না। চলতে ফিরতে ওর অজানিতে আমার জন্যে অচেতনে ও যা উপচে ফেলে যায়, কোনও সুখী সাঁওতাল ছেলের মতো, বৈশাখী সকালের ঝরে-পড়া মিষ্টি মহুয়া ফলের মতো তা আমি কুড়িয়ে বেড়াই। ও জানে না—কী সুবাস, কী স্বাদ, কী ভাল-লাগা ও আমার জন্যে রেখে যায়—যখনি ও কাছে আসে।

নয়না এক ভদ্রমহিলাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল গাড়ি অবধি। ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। এবার ও আমার দিকে ফিরল। ফ্লুরোসেন্ট আলোতে ওকে স্বপ্নময় দেখাচ্ছে। সন্ধে থেকে, সব-বয়সী কত সুন্দরীই তো এই আলোর নীচে এসে আমার সামনে দাঁড়াল,—কই, এমন তো আর কাউকে লাগল না ?

ও কাছে এল, একটু হাসল, কপাল থেকে এলোমেলো অলকগুলি সরাতে সরাতে বলল, খুব কাজ করছেন ?

ভী-ষণ। তুমি তো ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছ।

তা তো বলবেনই। পা'টা যে কী ব্যথা করছে না। কতবা-র যে উপর-নীচ করলাম। সোজা উঠলে বোধ হয় কেদার-বদরী পৌঁছে যেতাম।

বললাম, চেষ্টা করলেও পারতে না। দুষ্টু লোকেরা সেখানে যেতে পারে না।

ও বলল, আপনাকে বলেছে ! পাপীরাই তো পাপমুক্তি ঘটাতে যায় সেখানে।

কে যেন ওকে ডাকল। ও গিয়ে দুটি কথা বলেই আবার ফিরে এল, বলল, খুব খিদে পেয়েছে, না ?

বললাম, খু-ব।

ঈস্। বেচ্চা-রা। আর একটু কষ্ট করুন। একসঙ্গে আমরা বসে খাব।

তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার বিয়েতেও আমি খুব কাজ করে দেব ; দেখবেন।

বলছ ?

ও উত্তর না দিয়ে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি হঠাৎ বললাম, যাও। গল্প কোরো না। কাজ করো গিয়ে।

ও চলে গেল।

নিজের গালে নিজে চড় মারতে ইচ্ছে করল। আমি যেন মাতব্বর জ্যাঠামশাই হয়ে গেছি। ওর যেন আমিই গার্জেন, যেন আমার উপদেশেই ও চলে। এতক্ষণ ওকে একটু দেখতে পাবার জন্যে ছটফট করেছি—যখন ও কাছে এল, ভাল লাগায় মরে গেলাম ; অথচ ওর উপস্থিতিটা পুরোপুরি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপভোগ করার আগেই নিজের প্যায়ে নিজে কুড়ুল মেরে বললাম, যাও, কাজ করো গিয়ে।

এখন কেমন লাগছে ? তখন তো বিশ্বামিত্র মুনির মতো ভাব দেখালাম, এখন ও যে পথে চলে গেল সে পথে চেয়ে আছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটা ঢাউস গাড়ি এসে গেল।

আর নয়নার কথা ভাবা গেল না।

ওল্ডস্‌মোবাইল—। কালো কুচকুচে। একি ? পাধামশায় যে। আমাদের কোম্পানির কাস্টোমার। হাওড়ার শ্রীরাম ঢ্যাং লেনে মস্ত কারখানা।

আমাকে দেখে তিনিও অবাক।

আরে, বোস সাহেব ? এখানে ?

এই আমার বন্ধুর দিদির বিয়ে।

বাঃ বাঃ, বেশ বেশ।

আপ্যায়ন করে বললাম, চলুন চলুন, বসবেন চলুন।

উনি একটি চেয়ারে বসলেন। চেয়ারটা 'কে-রে কে-রে ?' করে উঠল। মনে হল বলল, যত ভাড়া দেওয়া হয়েছে তাতে এত মোটা লোকের বসার কড়ার ছিল না। রাজার-বেটার মতো বুক-চিতিয়ে বসে, পাধামশায় রুপোর সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন এবং আমায় অফার করলেন।

বললাম, এ গুরুজন-অধ্যুষিত জায়গা। এখানে চলবে না।

ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। পাতা-কাটা চুল, হাতির দাঁত-বাঁধানো লাঠি, গিলে-করা ধুতি, ফিনফিনে আদ্দির গাড়োয়ানী-গা-দেখানো পাঞ্জাবি। এ সব স্পেসিমেন আজকাল ভারতীয় গণ্ডারের মতো দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে।

পাধামশায় ফিসফিসে গলায় বললেন, আমার ছেলে বলছিল আপনি নাকি কাগজপত্রে আজকাল গপ্প-টপ্প নেকেন ? আসলে, কাকে দিয়ে নেকান ? আমার গাঁয়ের মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা ধরেছে একটি সাহিত্যসভার বক্তৃতা দিতে হবে। ভদ্রলোককে একবার আমার কাছে পাটিয়ে দেবেন ? পয়সা করি ভালই দোব।

বিনীতভাবেই বললাম, আজ্ঞে কাউকে দিয়ে লেখাই না, আমি নিজেই লিখি।

সে কী মশায় ? ক' পয়সা পান লিখে ?

বললাম, আমি একেবারে নতুন। সামান্যই পাই, এই চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা এক একটি লেখায়—বড় লেখা হলে আরও বেশিও পাই।

সে কী ? আধঘণ্টা আপনার ডেস্কে বসে একটা ড্রইং করলেই তো দুশো টাকা পেতে পারেন। তাহলে কী দরকার এ সবের ?

একটা যুৎসই উত্তর ঠোঁটের গোড়ায় এল, কিন্তু হেসে বললাম, এই আর কী !

উনি খুব হাসলেন, যেন উত্তরটা যে বুঝলেন শুধু তাই নয়, যেন মনোমতও হয়েছে। হো-হো করে হেসে বললেন, তাই বলুন। সেই আর কী !

এখন আর ভাল লাগছে না। আগামী কাল শেষ রাতে উঠে পলাশী যেতে হবে। লালগোলা প্যাসেঞ্জারে। পলাশীতে একটি কনসট্রাকসনের কাজ হচ্ছে। শীতটাও রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। ঘড়িতে প্রায় দশটা বাজে।

সুজয়ের সঙ্গে দেখা করে ওকে বললাম, যাচ্ছি। স্বাভাবিক কারণে ও বলল, যাঃ তা কী করে হয় ? এত খাটাখাটনি করলি, না খেয়ে যাবি ?

বললাম, তোদের বাড়ি খাইনি কখনও এমন তো হয়নি। না-গেলেই চলবে না-রে এখন। ভোর সাড়ে-চারটেয় ট্রেন।

ও বলল, তাহলে আর কারও সঙ্গে দেখা করিস না। দেখা করলেই আটকে যাবি। তুই চলে যা, আমি ম্যানেজ করে নেব, মা আর নয়নাকে।

www.BanglaBook.org

বাড়ি আসতে আসতে ভাবলাম—সাড়ে চারটেয় ট্রেন তো কী ? ইচ্ছে করলে কি আর রাত বারোটা অবধি থাকতে পারতাম না ? আগে কি আর কখনও এমন করিনি ? আসলে চলে এলাম অনেক কথা ভেবে। ভাবলাম, সব অতিথি-অভ্যাগতদের বিদায় জানিয়ে নয়না যখন গেটে এসে দাঁড়াবে—দেখবে একটি ভিখিরির ছেলে ছেঁড়া-কাপড়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে—কিছু খেতে চাইছে—নীল আলোয় বেচারিকে আরও নীল দেখাবে।

নয়না ভাববে, আরে ? এখানেই তো ঋজুদা দাঁড়িয়েছিল—কোথায় গেল ? যখন জানবে আমি নেই—তখন ওই ছেলেটির প্রতি নয়নার আরও বেশি সমবেদনা হবে। ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাতপেড়ে বসিয়ে পেট ভরে খাওয়াবে। আমারও ইচ্ছে করে, কোনওদিন নয়না ওর মনের দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর শরীরের সামিয়ানার তলায় বসিয়ে ওই ভিখিরি ছেলেটির মতো করে আমাকেও সাধ মিটিয়ে খাওয়াবে।

ইচ্ছে তো কত কিছুই করে।

রসা রোডের মোড়ের লাল আলোতে দাঁড়ালাম।

বুঝলাম, সুজয়টা খুব বকুনি খাবে।

এক-ছাদ লোকের সামনে ক্লান্ত, অবসন্ন নয়না সুজয়কে খুব বকবে। বলবে, ঈস তুমি কী দাদা ? আমাকে ঋজুদা বলল পর্যন্ত যে ভীষণ খিদে পেয়েছে, আর তুমি চলে যেতে দিলে ? খেয়ে যেতে কতক্ষণ লাগত ? ও যখন সুজয়কে বকবে, আমি হয়তো তখন ঘুমিয়ে থাকব—বালিশে মুখ গুঁজে আমি ঘুমিয়ে থাকব—তা হলেও ঘুমের মধ্যেই আমার খুব ভাল লাগবে। মনটা ভরে উঠবে। ফ্র্যায়েড রাইস—রোস্ট চিকেন ইত্যাদি খেলে পেটটা হয়তো ভরত, কিন্তু এমন করে মনটা তো ভরত না।

শোবার ঘরে ঢুকে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে খুব ভাল লাগতে লাগল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমালটা বের করতে গিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কী যেন লাগল হাতে। দেখি, রাংতা-মোড়া একটি লাল গোলাপ। নয়না দিয়েছিল, আমার সঙ্গে কথা বলে চলে যাবার সময়। গোলাপটাকে চুমু খেলাম। একদম নয়নার মতো গন্ধ গোলাপটার। হঠাৎ আয়নায় নিজেকে বেশ সুন্দর দেখতে লাগল। বেশ হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম। যদি সবসময় আমাকে এরকমই দেখাত তাহলে নিশ্চয়ই নয়না আমাকে ভালবাসত। ভগবান, তুমি আমার চোখেরা নয়না যেমনটি পছন্দ করে তেমনটি করে করলে না কেন ?

বড় খিদে পেয়েছে। অথচ বাড়িতে বলাও যাবে না যে খেয়ে আসিনি। মিনুরা তো সব খেয়ে-দেয়ে এসে শুয়ে পড়েছে। জেগে থাকলেও বলা যাবে না। ঠোঁট উল্টে মিনু বলবে, তোর এমন ন্যাকামি না ! কেন খেয়ে এলি না ?

মিনুর মেয়ে মিঠুয়াকে দেবার জন্যে একটি ক্যাডবেরী কিনেছিলাম। ড্রয়ার খুলে বের করে অগত্যা সেটিকেই খেলাম কুর্‌কুর্‌ করে। তারপর ঢকাস ঢকাস করে দু' গেলাস জল খেয়ে কম্বলের নীচে বডি-থ্রো দিলাম।

৫

গাড়িভরা ঘুম, কামরা নিঝুম।

শীতকালের রাত চারটে অনেক রাত। কোনওক্রমে, পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একটি বাণ্ডিলের মতো এসে হোল্ডল্ বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এখনও অনেকক্ষণ ঘুমুনো যাবে। কূপেতে আমি একা। ভিতর থেকে লক করে দিয়ে কম্বল মুড়ে ঘুম লাগিয়েছিলাম।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার চলেছে। শীতের আধো-ফোটা ভোরে—রিকঝিক ; রিকঝিক ; রিকিঝিকি রিকিঝিকি—রিকঝিক রিকঝিক।

শুয়ে থাকতে থাকতে বুঝলাম, একসময় ভোর হল। চোখ মেললাম। বাইরে সোনালি রোদ—আকাশময় সাঁতরে বেড়াচ্ছে। মনে হল, যেন এই সকালে কারওরই কোনও দুঃখে ডুবে মরার

www.BanglaBook.org

ভয় নেই।

পায়ের কাছের জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে ধূসর কম্বলে লুটিয়ে পড়েছে।

শিকারে-টিকারে গিয়ে আমার যখন ভীষণ শীত করে, পাতার ঘরে কি কোনও ডাকবাংলোর চৌপায়ায়, যখন একটি কি দুটি কম্বলেও শীত মানে না—ঠোঁট যখন ঠাণ্ডায় নীল হয়ে যায়, পায়ের পাতাদুটি হিমেল হাওয়ায় হিম হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে আসে, তখন আমি নয়নার কথা ভাবি। নয়নাসোনার ভাবনা তখন কোনও চিকন পাটির পলকের লেপের মতো আমার কম্বলের তলায় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায়। আমার সমস্ত সত্তা উষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে, ধীরে ধীরে। তারপর আমার সমস্ত আমিত্বে একটি মসৃণ চিতাবাঘের চেকনাই লাগে। শীত কাকে বলে আমি ভুলে যাই।

কিন্তু এই রেলগাড়ির কামরার সামান্য শীতে অতসব দরকার হয় না। এমনিই শুয়ে শুয়ে রোদ দেখলেই গা গরম হয়ে ওঠে। ভাল লাগে।

রানাঘাট বোধ হয় এসে গেল। চা খেতে হবে। বার্থ ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। পলাশী আসতে এখনও অনেক দেরি। চা খাবার পর আরও কিছুক্ষণ আরাম করা যাবে।

রানাঘাট স্টেশানে চা নিলাম। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেই চা খেলাম। বেয়ারা এসে পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে গেল।

এবার লম্বা দৌড় দেবে গাড়ি।

গায়ের পাশের জানালাটি এবার খুলে দিলাম। উঠে বসলাম। বাইরে ভাল করে তাকালাম।

ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও শীতের আনাজ লেগেছে। শিশির-ভেজা সবুজ ঝোপে-ঝাড়ে প্রজাপতি ফুরফুর করছে। শুকনো ক্ষেতে পাখির ঝাঁক একরাশ চঞ্চল ভাবনার মতো ছড়িয়ে পড়ছে; উড়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে আম-কাঁঠাল ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম। কাছাকাছি ভেরাণ্ডার বেড়া দেওয়া কাদা-লেপা বাড়ি। পুকুরপাড়ে হাঁস প্যাক্‌প্যাঁকাচ্ছে। কোথাও খোঁটায়-বাঁধা একলা ছাগল দার্শনিকের মতো একদিকে চেয়ে কত কী ভাবছে। বাঁশবনের ছায়ায় ছাতার পাখিরা পঞ্চায়েত বসিয়েছে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে পরনিন্দা পরচর্চা হচ্ছে।

সেই নদীটি এল।

কী নীল জল! যতবার নদীটি পেরুই ততবারই নতুন করে ভাল লাগে। ছিপছিপে, নীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্না নদী। গুম গুম গুম গুম—গুম গুম গুম গুম করে লোহার কড়ি-বড়গা পেরিয়ে রেলগাড়ি নদী পার হল। পার হয়েই ছুটল—রিকিঝিকি-রিকিঝিকি-রিকিঝিকি-রিকিঝিকি।

বাইরে আদিগন্ত আকাশ আর সোনালি রোদ্দুরে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল যেন দূরে, রেলগাড়ির পাশে পাশে, গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাল রাতের নীল বেনারসী পরে নয়নাসোনা শুঁটিক্ষেতে, শর্ষেক্ষেতে শাড়িতে ঢেউ তুলে তুলে ছুটে চলেছে। ওকে দৌড়লে যা সুন্দর লাগে! চিকি-চুঙ-চিকি-চুঙ-টাকা-টাকা-টিকি-টঙ গাড়ির তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একবার ত্রিতালে, একবার কাহারবায়, একবার দাদরার ছন্দে নয়না আমার পাশে নীল বেনারসী পরে ছুটে চলেছে। যেন উড়ে উড়ে চলেছে। ওর পায়ের পায়-জোড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ওর কোমরের রুপোর চাবির রিং-এর ঝুনঝুনি শুনতে পাচ্ছি। নয়না আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। হাওয়ায় ওর শাড়ি ফুলে উঠছে—আঁচল দুলে দুলে উঠছে—চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। দুলে দুলে, হাওয়ায় ফুলে ফুলে, ফুলের মতো ও কী যেন বলছে—হাওয়া আর চাকার শব্দ কথাগুলিকে নিয়ে কাপাস-তুলোর মতো উড়িয়ে দিচ্ছে—শুনতে পাচ্ছি না কিছু—কেবল বুকের কাছে নয়নার অস্তিত্ব অনুভব করছি। আমার সবটুকু ভাললাগা এই ভোরের রোদ্দুর হয়ে আকাশময়, মাঠময়, বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে।

মনে হল, ট্রেনটার গতি কমে এল। চাকাগুলো কুমীরের শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ করতে লাগল। হঠাৎ দেখলাম নয়না নেই। নয়না আমার সঙ্গে আর দৌড়চ্ছে না।

বীরনগরে পৌঁছে গেছে গাড়ি। বড় বড় সেগুন গাছ। সেগুন গাছের বন হয়ে আছে। স্টেশনের দুপাশে। মনে হয় না, নদীয়া জেলায় আছি। গোদাপিয়াশাল বা শালবনী বলে মনে হয়।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল। সেগুনবনের আড়াল থেকে প্যাঁকু প্যাঁকু করে সাইকেল রিকশার হর্ন

www.BanglaBook.org

শোনা যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে একটি বিতিকিচ্ছিরি বিনতা বউ একটি নীল-রঙা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেবেছে, বুঝি নীল-রঙা শাড়ি পরলেই নয়নার মতো দেখাবে। সঙ্গে, হলুদ শার্ট পরে নতুন বর। টোপর মাথায়।

বীরনগরে ক্রশিং হবে। এখানে সিঙ্গল লাইন। কৃষ্ণনগর থেকে ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার আসবে, তবে এ গাড়ি ছাড়বে। প্রতিবারই এমনি অপেক্ষা করতে হয়। কোনও এক গাড়ির। যে গাড়ি আগে আসে।

নয়না আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। একটু আগেও দেখেছিলাম। জানি না ও এখনও দৌড়ে আসছে কিনা। কী বলছিল ও, শোনা হল না। বলছিল হয়তো—ঋজুদা, কাল আপনি না খেয়ে চলে এলেন বলে আমারও খাওয়া হল না। অসভ্য। না খেয়ে চলে এলেন কেন?

জানি না কী বলছিল।

জানি না, বীরনগরে আমাকে ও অপেক্ষা করতে বলেছিল কিনা। দরকার হলে, মানে, ও এখানে আসবে জানলে, আমি আজীবন অপেক্ষা করতে পারি। শুধুই এই জীবনই বা কেন? অনেক জীবন। জানি না আমি আর ও, একই সিঙ্গল লাইনে এই লালগোলা প্যাসেঞ্জার দুটির মতো বিপরীত মুখে ছুটে আসছি কিনা। নয়না কিন্তু আমার সঙ্গে একই দিকে ছুটছিল—আমার পাশে পাশে। সে জন্যেই ভয়। বিপরীত মুখে ছুটলে কোনও-না-কোনও শান্ত স্টেশানে আমাদের দেখা হয়ে যেতই যে, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতাম। কিন্তু একই দিকে ছুটছি বলে, আমি হয়তো যখন ঘুমিয়ে থাকব কামরাতে, ও হয়তো আমাকে পিছনে ফেলে কোনও অজানা স্টেশানের দিকে চলে যাবে—যার টিকিট আমার কাছে নেই। অথবা, এই কানীন রেলগাড়ির কামরার মতো, কোনও কামরা, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমার অজানিতে, হয়তো আমার নয়নার কাছ থেকে আমায় দূরে, বহু দূরে নিয়ে চলে যাবে। কোনও স্টেশানেই হয়তো আমাদের আর দেখা হবে না।

বড় ভয় করে। আমার বড় ভয় করে।

ঘণ্টা পড়ল। ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার আসছে। নীল বেনারসী পরা কুৎসিত বউটি একটু হাসল। বরটি যেন কী বলল। তারপর বিড়িটায় একটি শেষ সুখটান দিল।

ওদের দুজনের জীবনের আপ ট্রেন আর ডাউন ট্রেন বীরনগরের মতো কোনও পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে ক্রশিং করেছে। ওদের দেখে খুব ভাল লাগল। ওরা হারিয়ে যায়নি। দুজনে দুজনকে হারিয়ে ফেলেনি।

এমন সময় গুম গুম করতে করতে অন্যদিক থেকে ট্রেনটি এসে ওদের মুখ দুটি আমার চোখ থেকে মুছে দিল। একটি খয়েরি চলমান রেখা ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে থেমে গেল লাইনের উপর। আমার দাঁড়ানো কামরার তলা থেকে একটি ধবধবে বেড়াল লাফ দিয়ে নিচু প্ল্যাটফর্মে উঠল। দুষ্টুমি করে আমাকে একবার চোখ টিপল—তারপর শীতের রোদে আড়মোড়া ভেঙে আর এক লাফে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে সেগুন বনে লাফিয়ে নামল।

দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে পেছনের মাঠভরা সোনালি রোদ্দুরে তাকালাম। এখনও আমার নয়না দৌড়ে আসছে কি না তা দেখার জন্যে। দেখলাম, একটি সোহাগী নীলকণ্ঠ পাখি টেলিগ্রাফের তারে বসে আনন্দে গদগদ গলায় আপনমনে কী যেন স্বগতোক্তি করছে। এবং খুশি খুশি রোদ-ঠিকরানো-ঠোঁটে মসৃণ পালক পরিষ্কার করছে। ওর গর্বিত মুখ দেখে মনে হল, এই নীল বেনারসীপরা নিরিবিলি পাখিকেও বোধ হয় আমার মতো করে অন্য কোনও নীলকণ্ঠ পাখি এই রোদ্দুর-মাখা সকালে ভালবেসেছে। নইলে, ওর মুখ নয়নার মতো অমন নিরালা নরম দেখাত না।

৬

ভোরবেলা সামনের বাড়ির রেডিও থেকে মুহূর্তবাহী "খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল"-এর ঘুম ভাঙানো সুর কানে এসে লাগল। ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল আজ দোল; আজ ছুটি।

ভোরবেলার প্রথম কাপ চা খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিপুণভাবে দাড়ি কামালাম। খবরের কাগজটা

www.BanglaBook.org

উল্টে-পাল্টে দেখলাম। কাল অফিস-ফেরতা একটি আনন্দবাজার দোলসংখ্যা কিনেছিলাম—সেইটে নিয়ে আরাম করে বারান্দায় ইজিচেয়ারে, মোড়ার উপর পা তুলে, মৌজ করে বসব। তার আগে অত্যাচারী আগন্তুকদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আলমারী খুলে একটা ছেঁড়া পায়জামা ও পাঞ্জাবি বের করলাম।

এমন সময় সুজয় ফোন করল, কী রে ? কী করছিস ? এদিকে আসবি না ?

অতদূর হেঁটে কী করে যাব ?

গাড়ি নিয়েই আয়।

সাদা গাড়ি। রঙ দেবে ভীষণ।

তুই কে রে একটা মস্তান যে, বেছে বেছে তোর গাড়িতেই রঙ দেবে ?

কেউ নয় বলেই তো দেবে !

যাঃ যাঃ ইয়ার্কি মারিস না। দ্যাখ, বিদেশে ঠাণ্ডায় গিয়ে পচে মরব—কত বছর দোল খেলতে পারব না কে জানে ? এই আমার আপাতত শেষ দোল খেলা—আয় না বাবা। মা ইয়া-ইয়া পান্তুয়া বানিয়েছে। নয়না কুঁচো নিমকি বানিয়েছে। একটু পর পাড়ার সব ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আসবে। রমরমে কাণ্ড হবে। জানিস তো কলের 'ফেরুল' বাড়ানো হয়েছে। এবার আমাদের ওয়াটার-ফেস্টিভ্যালও খুব জমবে।

আমার সর্দি সর্দি হয়েছে। জল দিলে যাব না।

ও বলল, আমাকে অত ইনকনসিডারেট ভাবিস কেন ? আমার ড্রয়ার ভর্তি সেলিন ট্যাবলেট আছে—'ভিটামিন সি'। আগে গোটা দুই খাইয়ে তারপর জল দেব। এমন সময় শুনলাম সুজয়ের পাশ থেকে কে যেন বলল, কে রে দাদা ?

ও বলল, ঋজু।

আসতে চাইছে না ?

না।

তারপরই নয়নার গলা শুনলাম।

কী হে মশাই—আসতে পারছেন না ?

কেন যাব ?

বন্ধুদের সঙ্গে রঙ খেলবেন—পান্তুয়া খাবেন—নিম্‌কি খাবেন—মজা হবে—আর কেন ?

আমার ওরকম চেঁচামেচি, বেশি হইহট্টগোল ভাল লাগে না।

তো কীসে লাগে ?

একা একা তোমার সঙ্গে গল্প করতে।

কোনও উত্তর দিল না ও।

কী ? বুঝলে ?

হুঁ !

হুঁ মানে ? কী বুঝলে ?

যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি।

হঠাৎ টোকা-খাওয়া টাকা-কেন্নোর মতো কুঁকড়ে গেলাম। আসলে আমার এই পাগলামি দেখে ও নিশ্চয়ই হাসে।

বোধ হয় বন্ধুদের কাছে আমার গল্প করে, অফ-পিরিয়াডে বোধ হয় আমায় নিয়ে হাসিহাসি করে। সব বুঝি, মনে মনে লজ্জায়, অপমানে, প্রত্যাখ্যানে মরে থাকি—তবু বারে বারে ফিরে ফিরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই। কোনও পুঁজিপতির মতো "নেহি হোগা ; নেহি হোগা। চলো, হাঠো হিঁয়াসে" বলে ও আমাকে তাড়িয়ে দেয়। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু ওর নিস্পৃহতা দেখে বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, আর মরমে মরে যাই। কিন্তু, পরক্ষণেই আবার লজ্জাহীনের মতো ভিক্ষা চাই।

এই ঋজুদা !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী ?

আসুন না বাবা।

আমি গেলে তোমার ভাল লাগবে ?

বেশ কিছুক্ষণ কথার উত্তর নেই।

তারপর বলল, আপনি জানেন না ?

না।

তবে জানেন না।

বলো। বলো না ? ভাল লাগবে কিনা ?

হুঁ।

আবার হুঁ। নাঃ। তোমাকে বলতেই হবে।

আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো আপনি। লাগবে। হল তো ? আপনি যেন কী ? কোনওদিন কি বড় হবেন না ?

বড় হয়েছি বলেই তো এত যন্ত্রণা।

অত আমি বুঝি না। তাড়াতাড়ি আসুন। আপনার জন্যে আমি বাঁদুরে রঙ গুলছি।

সুজয়দের বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় দশটা। দেখলাম কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধেছে। পাড়ার যত ছেলেমেয়ে সব ওদের বাড়িতে। নয়না একটা কালোর উপর লাল ফুল-তোলা বাঁধনী শাড়ি পরেছে। দৌড়াদৌড়িতে শাড়ির প্রান্তে কালো মোটা সিল্কের সায়ার আভাস দেখা যাচ্ছে। মাথা—কপাল—শাড়ি—ব্লাউজ সব নানা রঙে রঙিন হয়ে গেছে। ওকে দেখে, কোনও ইম্প্রেসনিস্ট আর্টিস্টের চলমান ছবি বলে মনে হচ্ছে। ও কাছে আসছে, দূরে যাচ্ছে, অন্য মেয়েদের সঙ্গে দলবদ্ধ হচ্ছে, আবার পরক্ষণেই দলছুট হচ্ছে। ওর পায়ের পাতা দুটি শ্রীরাধার পায়ের মতো সুন্দর। পাতলা সরু দুটি পাতা। ইচ্ছে করে ধরে থাকি—মুখের সঙ্গে ঘষি।

সুজয়ের বন্ধুরা মিলে আমাকে অতর্কিতে ও অন্যায়ভাবে জবরদস্তির সঙ্গে রঙে রঙে ভূত করল, তারপর এ ওকে বালতি বালতি জল ঢালল। সকলে মিলে ভিজে ঝোড়ো-কাক। ওদের ছোট্ট লনটিতে আমরা বসলাম সবাই। মাসীমা পাঠিয়ে পাঠালেন, সঙ্গে নিমকি। তারপর কফি। নয়নার বান্ধবীরা মিলে কোরাস গাইল, "ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে"।

দোলের দিনে প্রতিটি লোকই হেরে যাবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত থাকে। বলবান লোক, কিশোরী মেয়ে, রূপসী বৌদি সেদিন যে কোনও ছোট ছেলে অথবা যে কোনও অবাধ্য দেওরের কাছে হেরে যাবার জন্যে মনেপ্রাণে হন্যে হয়ে থাকে। আমি যেমন অনুক্ষণ ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে বসে থাকি—এই একটি দিনে, সবাইকে তেমনি পরনির্ভর দেখি।

আমারও ইচ্ছে ছিল, নয়নার কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হব। ভেবেছিলাম, নয়না আমার খুব কাছে এসে যখন ওর সুন্দর সুরেলা আঙুল বুলিয়ে আমার সমস্ত সত্তাকে চাবি টিপে-একটি উদ্বেল পিয়ানোর মতো বাজাবে, তখন আমি আমার স্বপ্নের খুব কাছাকাছি আসব। মুহূর্তিক যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাব। কিন্তু নয়না কিছুই করল না। কাছে এল। যথেষ্ট ব্যবধান রেখে আমার কপালে আবীর দিল—পায়ে আবীর ছুঁইয়ে প্রণাম করল। আবীর-মাখা মুখে, সুন্দর সুগন্ধি দাঁতে একফালি আশাবাদী রোদের মতো হাসল। তাতেই আনন্দে মরে গেলাম। ইচ্ছে করলে আশীর্বাদ করার ছুতোয় আমি ওকে কাছে টেনে আনতে পারতাম—ওর মুখকে আমার বুকে, ঝড়ের রাতের ভয়ার্ত পাখিকে ঝাঁকড়া ঝাউগাছ যেমন করে আশ্রয় দেয়, তেমনি করে আশ্রয় দিতে পারতাম। জড়িয়ে থাকতাম থরথরানো শরীরলতাকে। কিন্তু কিছুই পারলাম না। যে আমি অনুক্ষণ ওকে কল্পনা করে কাঁদি—ওর সুরেলা শরীরকে স্বচ্ছন্দে কোমল 'নি'তে বাজাই, ওর নূপুরের মতো নিবিড় নাভিতে কল্পনায় অনিঃশেষ মৃগনাভির গন্ধ পাই, সেই আমি ওরই আঁচল থেকে একমুঠো বেগুনি আবীর নিয়ে ওর মাথার উপরে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, দিস ইজ দ্য সোবার ওয়ে।

অন্য অনেক ছেলে নির্দ্বিধায় হয়তো যা করতে পারে—আমি তার কিছুই করতে পারি না।

www.BanglaBook.org

এমনকী, আমি যতখানি ভাল নই, নয়নার কাছে এলে আমি তাই হয়ে উঠি। আমার 'সত্যি আমি'র চেয়ে অনেক সংযত। যে কামনার ছুরি অনুক্ষণ হ্যাকস্ ব্লেডের মতো আমাকে চিরে চিরে চলে, ওর কাছে গেলে, কোনও অদৃশ্য মন্ত্রবলে আমার সেই সমস্ত কামনা শীতল শামুকের তুলতুলে শরীরের মতো বাইরের সংযমী আবরণের ভিতর মুখ লুকোয়। আমি অনেকদিন নিজেকে শুধিয়েছি—একি নিছক ভণ্ডামি ? নিজেকে মহান করে লোকের সামনে তুলে ধরার কোনও নীচ প্রচেষ্টা ? ধার করে অন্য লোকের মার্সিডিস গাড়ি চড়ার মতো এও কি কোনও শস্তা বড়লোকী ? কিন্তু না। নিস্তব্ধ নির্জন বিকেলে অথবা কোনও হঠাৎ ঘুমভাঙা-রাতে নিজেকে বার বার শুধিয়ে এই জবাবই পেয়েছি। জুতো পায়ে যত ময়লাই মাড়াই না কেন—মন্দিরে যাবার আগে যেমন জুতো ছেড়ে রাখি বাইরে—নয়নাসোনার কাছে এলেও জুতো পায়ে আসার কথা আমি ভাবতে পারি না। ওর কাছ থেকে চলে এলেই আবার জুতো পরে ফেলি। লোক ঠকাই—ময়লা মাড়াই, কামনার অক্টোপাসের সঙ্গে কর্কশ কুস্তি করি। নয়নাসোনা আমার মন্দির।

পাশের বাড়ির দেবদারু গাছে একটি কোকিল ডাকছিল। ফুরফুর করে বসন্তের হাওয়া দিচ্ছিল। ভিজে পাঞ্জাবিতে গা'টা শিরশির করে উঠে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

এমন সময় সেই ছেলেটি এল। প্রথম দিন থেকেই আমি দু'চোখে একে দেখতে পারি না। নয়না যেন ওকে কী এক বিশেষ চোখে দেখে—কোনও বিশেষ কোণ থেকে। ছেলেটি ফর্সা, লম্বা, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, পেটের কাছে একটি মাঝারি সাইজের নাদু। পান খেয়েছে। পায়জামা ও আদ্দির পাঞ্জাবি পরেছে। গায়ের রঙ যে ফরসা তা দেখানোর জন্যে ইচ্ছে করেই বোধ হয়, পিঠের কাছে অনেকখানি ছিঁড়ে রেখেছে। নীতীশ। মনে পড়েছে। এর নাম নীতীশ সেন। সেদিন সুজয় আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

কেন জানি না, এতক্ষণ ধরে মনে মনে যে খুশির আলাপ করছিলাম, যে মহত্ত্বের জোড়কে গড়িয়ে গড়িয়ে ঔদার্যের মেরজাপ্ পরে একেবারে ঝন্‌ঝনে ঝালায় পৌঁছে দিয়েছিলাম—এক লহমায় তার সব শেষ হয়ে গেল। ঝনাৎ করে তার ছিঁড়ে গেল, থেবড়ে বাঁয়ার মধ্যে হাত ঢুকে গেল। আমার সকালটাই মাটি হল।

নয়না এগিয়ে এসে আপ্যায়ন করে বলল, আসুন আসুন। ছেলেটি মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ে নয়নাকে আবীর দিল। বেশ ভদ্রভাবেই দিল। কিন্তু আমি নয়নার মুখে চেয়ে বুঝতে পারলাম যে নিছক শটী-বাটা আবীর, কপাল ছেড়ে আরও গভীরে প্রবেশ করল। আমার কানটা গরমে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। মাথার মধ্যে ঝুনুক ঝুনুক করতে লাগল রক্ত। এত খারাপ লাগতে লাগল যে কী বলব। মনে হল ডেঙ্গু ধরেছে। গায়ে পায়ে ব্যথা। সারা গায়ে অবসাদ, বিরক্তি ; মুখ বিস্বাদ। নয়না কি ছেলেটিকে ভালবাসে নাকি ? ছেলেটিও বোধ হয় ভালবাসে।

মনে হচ্ছে। এ সব ব্যাপারে আমার মনে-হওয়া মারাত্মক। এ রকম মনে-হওয়ার ক্ষমতা কোনও রেসুড়ের থাকলে সে কোটিপতি হয়ে যেত। আমার বার বার মনে হল, যা মনে হচ্ছে তা ঠিক।

ছোটবেলা থেকে নয়না ছেলেটিকে চেনে। সুজয়দের মতে, ওরকম ছেলে নাকি হয় না। ও নাকি আদর্শ ছেলে। তার মানে বুঝতেই পাচ্ছি। গুডি গুডি টাইপ। মানে ন্যাকা। খেঁকি কুকুরের লেজে তারাবাতি বেঁধে এইসব ছেলের দিকে লেলিয়ে দিতে হয়। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বাড়ির অবস্থা ভাল। শিলঙ-এ কোন সাহেবী কোম্পানির চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ওখানেই থাকে। দোলে-দুর্গোৎসবে কলকাতা চলে আসে প্লেনে। দিনকয় অন্তঃসলিলা চালিয়াতি করে চলে যায়।

ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিপক্ষকে দেখতে লাগলাম ; ষাঁড় যেমন বুল-ফাইটারকে দেখে। কীই-বা এমন ছেলে ? হতে পারে আমার চেহারাটা ভাল না। কিন্তু পৃথিবীতে চেহারাই কি সব ? হতে পারে ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট—কিন্তু তা বলে আমিও কি এঞ্জিনিয়ার নই ? ও লিখতে পারে ? ছবি আঁকতে পারে ? পারে না। ও খালি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ও খালি টাকা রোজগার করতে পারে আর পাঙাস মাছের মতো চোখ করে অন্য লোকের টাকার হিসাব রাখে। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। ও আমার মতো করে ভালবাসতে পারে নয়নাকে ? আমার মতো করে রাত্রি দিন, নীরবে ও সোচ্চারে নয়নাকে মনে করে ? কিছুই করে না। অথচ, অথচ নয়না ভালবাসে ওকে। আমাকে নয়।

www.BanglaBook.org

পায়ের কাছের একমুঠো কচি দুর্বা ফস্ করে হ্যাঁচকা টানে টেনে তুললাম। নয়নাদের অ্যালশেসিয়ানটা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আমার কাছে এল। মনে মনে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললাম—গন্ধগোকুল কুত্তা—আমার কাছে কেন ? অনেক সুগন্ধ ওদিকে আছে, যাও না শালা।

কেন এমন হয়, কেন এমন হল, জানি না। আমার সমস্ত খুশি, সমস্ত ভাল-লাগা এক লহমায় বিষাদে ভরে গেল। পৃথিবীতে বিষাদ ছাড়া আর কিছু যে আছে, তা চেষ্টা করেও মনে আনতে পারলাম না।

কেউ কেউ দ্বিতীয় কাপ কফি খাচ্ছিল। নয়না নিজে হাতে এক কাপ কফি এনে আমাকে বলল, নিন। ও জানত, কফি আমি ভালবাসি এবং ভিজে জামাকাপড়ে আর এক কাপ কফি না খাবার কোনও কারণ ছিল না। তবু ও কাছে এসে, যে মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রীতিঝরানো হাসি হেসে বলল, নিন, ধরুন ; সেই মুহূর্তে সব রাগ গিয়ে পড়ল ওর উপর। বললাম, খাব না।

ও বুঝতে পারল, কোনও কারণে আমি অখুশি আছি। আরও কাছে এসে বলল, রাগ করেছেন আমার উপর ?

ওর মুখের দিকে না চেয়েই অন্যদিকে চেয়ে বললাম, রাগ করার কোনও কারণ তো ঘটেনি। তবু, আমার মুখে চেয়ে ও ব্যথিত হল। একটু চুপ করে থেকে বলল, খাবেন না ? সত্যি ?

আমি কোনও জবাবই দিলাম না।

অন্য অনেকে সেখানে ছিল। আর কিছুই না বলে ও কফিটা নিয়ে ফিরে গেল।

একটুক্ষণ বসে থাকার পরই আমার মনে হল যে, আমার এখানে আর থাকবার কোনও মানে নেই। আর একটুও থাকা না-থাকা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমার কাছে, তা বটেই—নয়নার কাছেও। এবং অন্য কারও মতামত নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

হঠাৎ উঠে পড়লাম। উঠে সুজয় ও মাসিমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। নয়না গেটের কাছে অবধি পৌঁছে দিতে পর্যন্ত এল। আমার উচিত ছিল যে একটা ভদ্রতাসূচক "চলি" অন্তত বলি। কিন্তু আমার রক্তের মধ্যে যে ভাবপ্রবণ জানোয়ারটা বাস করে সে নীরব রইল। দড়াম আওয়াজ করে অসভ্যর মতো দরজাটা বন্ধ করলাম। তারপর গাঁ-গাঁ করে গাড়িময় কুৎসিত আর্তনাদ তুলে সোজা বাড়ি এসে পৌঁছলাম। ঘরে বসে—চুপচাপ—একেবারে একা একা অনেকক্ষণ পাইপ খেলাম। তারপর চান-ঘরে ঢুকে শাওয়ার খুললাম। সমস্ত শরীরের রঙ—লাল, নীল, বেগুনি, সবুজ, রূপালি, সোনালি, সব রঙ অন্ধকারের মতো, আমার অন্ধ আবেগের মতো গলে গলে পড়তে লাগল। চান-ঘরের আয়নায় সেই সিক্ত, পরিবর্তনশীল, বহু-রঙে-রঙিন ছবি দেখে, হঠাৎ নিজেকে মনে হল এ কোনও অনাদিকালের বহুরূপী। একে আমি নিজেও কোনওদিন চিনিনি। সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে রঙ তুলতে তুলতে হঠাৎ নিজের উপর খুব রাগ হল, ঘৃণা হল, নিজেকে মারতে ইচ্ছা করল।

এত খারাপ লাগতে লাগল যে, কী বলব ! মেয়েটিকে অমনভাবে বিনা কারণে ব্যথা দিয়ে এলাম—একটি কুৎসিত, নোংরা, এক-রোখা শুয়োরের মতো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। নয়নাকে আমি অন্যায়ভাবে ব্যথা দিয়ে এলাম। ভারী খারাপ আমি ; ভীষণ খারাপ।

৭

দমদম এয়ারপোর্টের রিসেপশন কাউন্টারের পাশের টেলিফোন-বুথ থেকে ফোন করছিলাম। ভায়াল টোন শুনতে পেলাম—ঘটাং করে পয়সা ফেললাম।

একবার পিছন ফিরে তাকালাম। ইনস্যুরেন্স কাউন্টারের ভদ্রলোক তখনও আমার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন। হাতটা যদি ইচ্ছে মতো লম্বা হত তো ওইখানে দাঁড়িয়েই হাত বাড়িয়ে চটাস্ করে চড় মারতাম। মজা না কি ? পয়সা খরচ করে প্রিমিয়াম দেব আর উনি বলছেন ইনস্যুরেন্স করবেন না। বলে কি না, ইনসিওরেবল্ ইন্টারেস্ট নেই। যদি নয়নার জীবনে আমার ইন্টারেস্ট না থাকে—তো কার জীবনে আছে ? তাছাড়া পলিসি তো করছি আমি। প্লেন ক্র্যাশে

www.BanglaBook.org

মরলে নয়না দু'লাখ টাকা পাবে। ওকে তো নমিনী করলাম মাত্র।

ভদ্রলোক চশমার ফাঁক দিয়ে শুধোলেন, রিলেশন ?

প্রথমে গম্ভীর হলাম।

তারপর ভাবলাম, গম্ভীর হয়ে থাকলে খারাপ কিছু ভাবতে পারে—কত রকম বদখত লোক আছে কলকাতা শহরে—তাদের কত শত মেয়ের সঙ্গে কত রকম সম্পর্ক আছে। পাছে, এই রামগড়ুরের ছানা, নয়না সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবে—তাই হেসে ফেললাম। একেবারে এক গাল।

বললাম, ভালবাসি।

ভদ্রলোক চশমার তলা দিয়ে আমায় দরদরিয়ে দেখলেন, বললেন, তাহলে কী লিখব ? লাভার ?

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না না।

তারপর অসহায়ভাবে বললাম, কিছুই না লিখলে হয় না ?

ভদ্রলোক পেনসিলটাকে দু'বার প্ল্যানচেটের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, ফিঁয়াসে ?

খুশি হলাম।

ভয়ে ভয়ে বললাম, আচ্ছা এইসব টেকনিকাল অসুবিধার জন্যে আমি মরে গেলে টাকাটা পেতে কোনও ঝামেলা হবে না তো ?

উনি কন্‌ফিডেন্টলি বললেন, দেখবেনই তখন স্যার।

ফোন করতে করতে ভাবলাম, বেশ বলল বটে, দেখবেনই তখন স্যার। মরে গেলে কোথায় থাকব তা আমি কী করে জানব ? দেখতে পাব কি না তাই বা কে জানে ? আর দেখতে পেলেও অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারবই যে এমন কি কোনও গ্যারান্টি আছে ?

তবে মরে যাবার পর যাই হোক, মরবার আগের মুহূর্তটিতে তো অন্তত আরামে মরতে পারব। এই ভেবেই আশ্বস্ত হলাম। পাশের সিটের ব্যবসায়ী প্যাসেঞ্জার যখন কোমরে বাঁধা টাকার থলি নিয়ে হাঁউমাঁউ করে কাঁদবে—গর্বিতা এয়ার হোস্টেসের যখন নাক দিয়ে খুকুমণির মতো জল গড়াবে, কন্ট্রোলে-বসা পাইলট আর কো-পাইলটের তলপেট যখন গুড়গুড়িয়ে উঠবে আষাঢ়ে মেঘের মতো—তখন একা আমি আরাম করে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখব। দু'লাখ টাকায় নয়না অনেক কিছু করতে পারবে। একটি ছোট্ট লনওয়ালা বাড়ি। একটি আকাশী-নীল রঙা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড। তারপর ও যাকে ভালবাসবে, তার জন্যে কিছু করতে পারবে। সেই ছেলে যদি পড়াশুনা করতে ভালবাসে, তাকে একটি মনোমত স্টাডি করে দিতে পারবে। সে যদি শিকার করতে ভালবাসে, তাকে দামি দামি ডাবল-ব্যারেল রাইফেল কিনে দিতে পারবে—আরও অনেক কিছু করতে পারবে—যা নয়না করতে চায় এবং যা ও আমায় কোনওদিনও জানতে দেয়নি।

অত সামান্য প্রিমিয়ামের বদলে এমন একটি তৃপ্তি যে পাওয়া যাবে তা ভেবেই ভাল লাগছে।

ফোনটা বাজছে। প্রায় দু মিনিট হল। এত সকালে বোধ হয় কেউ ওঠেনি।

বেয়ারা ধরল। বলল, নয়না উঠেছে। চা খাচ্ছে।

নয়না এসে ফোন ধরল।

কী ব্যাপার ? এত সকালে ?

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করছি।

কোথায় গেছিলেন ?

কোথাও যাইনি। এখন যাচ্ছি। গৌহাটি। সেখান থেকে শিলঙ।

বেড়াতে ?

না না। অফিসের কাজে।

আগেই যখন বলেননি, তখন তো পৌঁছেই খবরটা দিতে পারতেন।

রাগ কোরো না। বিশ্বাস করো। গতকাল দিনে ও রাতে তোমায় তিনবার ফোন করেছিলাম।

আমি তো সবসময়ই বাড়ি ছিলাম।

হয়তো ছিলে। কিন্তু তুমি একবারও ফোন ধরোনি।

কে ধরেছিল ?

www.BanglaBook.org

প্রথম দু'বার তোমার জামাইবাবু, মানে দিলীপদা ধরেছিলেন, তার পরের বার ময়নাদি। আমি যখন কথা বললাম না তখন দিদি বললেন Ghost call।

নয়না রেগে গেল। বলল, কেন ? আপনি কী করেছিলেন ?

আমি কিছুই করিনি বা বলিনি। মানে বলতে পারিনি। আসলে আমার লজ্জা করছিল ভীষণ।

লজ্জা করছিল ? কেন ?

মানে ভেবেছিলাম, কিছু মনে করতে পারেন ওঁরা। কী কারণে আমি তোমাকে রোজ রোজ ফোন করি—একথা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

কেন ফোন করেন আপনি জানেন না ?

আমি জানি। আমি তো জানিই। আমার জন্যে ভয় নয়। ভয় তোমার জন্যে। তোমাকে পাছে ওঁরা কিছু ভাবেন। অথচ ভাবার কিছুই নেই।

আমি কাউকে কেয়ার করি না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা, আপনি না বাঘ মারেন ?

বললাম, সে সাহস অন্য সাহস। সে অনেক সহজ সাহস। তুমি বুঝবে না। কীসের ভয়, তা তুমি বুঝবে না।

ও চুপ করে রইল।

বললাম, শোনো। এক্ষুনি একটি দু'লাখ টাকার পলিসি করেছি। রসিদটা খামে করে তোমাকে পাঠালাম। আমার যদি কিছু হয় টাকাটা তোমার খুশিমতো খরচ কোরো। তোমাকে তো কিছুই দিতে পারিনি।

ব্যাপারটার অভিনবত্বে ও বোধহয় রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ কিছু বলল না।

তারপর বলল, প্লেনে চড়লেই সকলে মরছে কিনা !

বললাম, একদিন না একদিন তো মরতে পারে। অ্যাকসিডেন্ট ইজ্ অ্যাকসিডেন্ট। তারপর, ওর কাছে প্রতি বার বাইরে যাবার আগে যেমন করে ভিক্ষা চাই, তেমন করে ভিক্ষা চাইলাম।

আমাকে চিঠি লিখবে ? অন্তত একটি চিঠি।

চিঠি ? আচ্ছা। একটা তো ? আচ্ছা। একটা লিখব। উঠবেন কোথায় ?

পাইনউড হোটেলে উঠব। খুব চমৎকার হোটেল। তুমি গেছ শিলঙ ?

অনেকদিন আগে। ছোটবেলায়। আমরা পিক্ হোটেলে ছিলাম।

বললাম, ঈস্, যদি আমরা দুজনে একসঙ্গে যেতে পারতাম ? খুব মজা হত, না ?

হয়তো মজা হত। কিন্তু এমন কিছু মজা থাকে যা বাস্তবে হয় না। যা কল্পনায় করতে হয়।

বললাম, জানি তা।

কিছুক্ষণ পরে ও বলল, ঋজুদা আপনি একটা পাগল। সত্যি সত্যিই ইনস্যুরেন্স করেছেন ? কেন করেছেন ? আমি আপনার কে ?

বললাম, তুমি আমার কেউ নও। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর হয়তো কেউ হবে।

ও অস্বস্তিভরা গলায় বলল, আপনাকে নিয়ে মহা মুশকিলেই পড়লাম আমি। শুনুন। খুব ভাল হয়ে থাকবেন কিন্তু। দুষ্টুমি করবেন না। রোজ আমাকে একটা করে চিঠি দেবেন।

নয়নার গলাটা একটু ভারী ভারী লাগল।

আমি নিশ্চয়ই দেব। তুমি দেবে তো ? তোমার চিঠির জন্যে বসে থাকব কিন্তু। তোমার যা খুশি লিখো ; কিন্তু লিখো।

একটা চিঠি তো ? বেশ ! এবারে ঠিক দেব। দেখবেন। তারপর বলল, ভাল লাগে না। কী যে চলে যান-না, না বলে-কয়ে এমনি হুট্ করে। ভেবেছিলাম, এই রবিবারে আপনাকে খেতে বলব। মা অনেকদিন হল আমায় বলছেন।

কী করব বলো ? অফিসের কাজ। না গিয়ে উপায় নেই।

শিলঙে তো এখন বেশ ঠাণ্ডা হবে। ভাল করে গরম কাপড় জামা নিয়েছেন তো ? ঠাণ্ডা লাগাবেন না কিন্তু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন সময় প্লেন ছাড়ার অ্যানাউন্সমেন্ট শুনলাম মাইক্রোফোনে।

বললাম, নয়না, ছাড়ছি এখন। প্লেনে উঠতে হবে। চলি।

ওপাশ থেকে নয়না তাড়াতাড়ি বলল, ঋজুদা, ভাল হয়ে থাকবেন। চিঠি দেবেন।

আচ্ছা!

ফোন ছেড়ে দিয়ে প্লেনটি যেখানে টেক্-অফের জন্যে রাণী মৌমাছির মতো উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে দৌড়লাম।

দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে একজন মোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। ভদ্রলোক মারেন আর কী। যেন আমারই দোষ।

কিন্তু আমার এখন কারও সঙ্গেই ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই।

হাত জোড় করে থিয়েটারি ভঙ্গিতে বললাম, অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ করুন। আবার দৌড়লাম। আমার পায়ে এখন খুরাল হরিণের বেগ। আমি এখন প্লেনের চেয়েও জোরে ছুটতে পারি। আমি নাচতে নাচতে দৌড়লাম। আমি ভাল হয়ে থাকব, আমি ভাল হয়ে থাকব; আমি ভাল হয়ে থাকব...।

প্লেনে উঠে গেলাম। সিঁড়ির মুখে, পাকা এয়ার-হোস্টেস বিজ্ঞের মতো বলল, গুড মর্নিং। আমি হাসলাম, বললাম, 'ভেরি গুড মর্নিং ইনডিড্'। মেয়েটি একটু ঘাবড়ে গেল। জায়গায় গিয়ে বসলাম। পাশে, এক ছোকরা মিলিটারি অফিসার। আমাদের বয়েসীই হবে। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। তাকে পাশ কাটিয়ে জানালার পাশে আমার সিটে বসলাম।

ফকার-ফ্রেন্ডশিপ বা অন্য কোনও প্রেশারাইজড্ প্লেনে চড়ার মনে হয় না কোনও। বাইরের শব্দ-টব্দ কিছুই কানে আসে না। সাইলেন্ট পিক্‌চারের মতো শুধু দেখা যায়। এর চেয়ে পুরনো ভাঙা ড্যাকোটা ভাল। পয়সা দিয়ে যে প্লেনে চড়েছি, তা প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারা যায়। ধড়ফড়-গড়গড় করে। ক্ষণে ক্ষণে এয়ার-পকেটে পড়ে বাড়ি-থ্রো দেয়। ডিগবাজি খেতে চায়। মানে, প্রাণ এবং কান নিয়ে প্রতিমুহূর্তে লোফালুফি করে। বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস এক্সপিরিয়েনস। তা নয়, এ যেন এয়ার-কন্ডিশনড ঘরে বসে থাকা।

প্লেনটা ট্যাক্সিয়িং করছে—উড়ল—উড়ল—ব্যস। এবার সোঁ সোঁ করে মেঘ ফুঁড়ে উপরে উঠল—মেঘকে নীচে ফেলে আরও উঠে গেল। তারপর মুখ সোজা করে গন্তব্যের দিকে চলল।

পাকিস্তান আমাদের সঙ্গে নাক ঘষাঘষি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হয়তো, কিন্তু আমাদের মতো প্লেন যাত্রীর লাভ হয়েছে বিস্তর। আগে প্লেন গৌহাটি যেত পাকিস্তানের উপর দিয়ে। এয়ার হোস্টেস ক্যানক্যানে গলায় বলত, উই উইল শর্টলি ফ্লাই ওভার দি রিভার পদ্মা।

জানালা দিয়ে পদ্মার ছবি দেখতাম—চর, জল; অববাহিকা। গল্পে-শোনা ভাটিয়ালি গানের পদ্মা, কল্পনার রাজকন্যা পদ্মা।

কিন্তু এ বছর পাকিস্তানের উপর দিয়ে যাওয়া চলবে না।

গেলেই হয়তো কড়াক-পিঙ্ করে দেবে।

এখন প্রায় হিমালয়ের কোল ঘেঁষে যেতে হয়। ভারতের মধ্যে মধ্যে। আর ভাগ্যিস যেতে হয়। তুষারমৌলি হিমালয়ের সে কী রূপ। বরফাবৃত চূড়ায় সকালের রোদ এসে পড়েছে—আজ যেন নগাধিরাজের অভিষেক হচ্ছে। দার্জিলিং—আলমোড়া থেকেও হিমালয় দেখা, আর এ একেবারে নগাধিরাজের মুখের কাছে গিয়ে দেখা। এ দেখার তুলনা হয় না। কী সোনালি সুখ। কী সুন্দর। আমার নয়নাসোনার চেয়েও সুন্দর। এ দৃশ্য না দেখলে জীবনে সত্যিই একটা দেখার মতো কিছু অদেখাই রয়ে যেত।

এয়ার-হোস্টেস ব্রেকফাস্টের ট্রেটা নামিয়ে দিয়ে গেল। কানের কাছে ফিস্‌ফিসিয়ে শুধোল, চা না কফি? বললাম, কফি। সামনে বসা গুজরাটি ভদ্রলোককে মেয়েটি শুধোল, ভেজেটারিয়ান অর নন-ভেজেটারিয়ান?

ভদ্রলোক সাবধানে এদিকে-ওদিকে তাকালেন, তারপর প্রাইভেট্‌লি শুধোলেন, হুইচ উইল বি বেটার?

www.BanglaBook.org

তার মানে, বুঝলাম ডিম মাংস খাবার ইচ্ছে হয়েছে।

বেচারি মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ওর এয়ার-হোস্টেসের জীবনে এমন তাজ্জব প্রশ্ন ও শোনেনি।

আমার চোখে চোখ পড়তেই ইশারায় বললাম, নন-ভেজ্। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি পেশাদারি হাসি হেসে বলল, নন-ভেজেটারিয়ান।

ভদ্রলোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, দেন, নন-ভেজেটারিয়ান প্লিজ।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে জমিয়ে পাইপটা ধরালাম। এখন খুব ভাল লাগছে। প্লেনে উঠেই প্রথম মিনিট পনেরো কুড়ি কেন যেন অস্বস্তি লাগে। মাটি ছেড়ে, সাধের পৃথিবী ছেড়ে মনটা দুখায়।

এখন বেশ ভাল লাগছে। প্রপেলার দুটো নীল আকাশে হাওয়া কাটছে। পুজোর আর বেশি দেরি নেই। ধবধবে সাদা মেঘে সোনালি রোদ লেগেছে। পায়ের তলায় সুন্দরী পৃথিবী লুটিয়ে রয়েছে। ধুলো নেই, বালি নেই, স্টেটবাসের ধোঁয়া নেই, ধ্বংস করো ধ্বংস করো, চলবে না চলবে না, চীৎকার নেই। এখানে সবকিছু চলবে। গান গাওয়া চলবে, কাউকে ভীষণভাবে ভালবাসা চলবে, মানে, এখানে জীবন ছাড়িয়ে এসেও বেঁচে থাকা চলবে।

প্রপেলার দুটো ঘুরছে। নিশ্চয়ই গুন্‌গুন্ করছে। ভিতরে বসে শোনা যাচ্ছে না। প্লেনের স্টার-বোর্ড উইং-এর একটা পাশে ছায়া পড়েছে। সাদা বরফের মতো কুঁচি কুঁচি জল জমেছে ধূসর পাখাটার গায়ে। যেন কোন করুণ জাঙ্গীল—উড়ে চলেছে—উড়ে চলেছে—উড়ে চলেছে। ভারী ভাল লাগছে। বেঁচে আছি বলে আনন্দ হচ্ছে। মরার কথা ভাবতেও ইচ্ছে করছে না। পৃথিবীটা এত সুন্দর জায়গা। এত কিছু কান ভরে শোনার আছে, চোখ ভরে দেখার আছে, আর এই একটি পাগল মন নিয়ে ভাবার আছে যে, আমার মরতে ইচ্ছে করে না।

আমি খুব ভাল আছি ; ভাল হয়ে থাকব।

এসবে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই উদ্দেশ্যহীনতা, এই ব্যথা পাওয়া, এই নিজেকে ছোট করার সীমালঙ্ঘন—এই সবকিছুতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি একটুও ভাল নেই।

আমার মনে পড়ে না, নয়না কোন ব্যাপারে আমার অনুরোধ রেখেছে। আমাকে কোন অবকাশে অপমান না করেছে! আমার কোন আশাকে সে সফল করেছে?

শিলঙ্ থেকে রোজ রাতে নয়নাকে আমি একটি করে চিঠি দিয়েছি। সকাল থেকে রাতে কী করলাম লিখেছি—। রোজ শোবার সময় পার্স থেকে ওর ছোট্ট ফোটোটি বের করে শুয়ে শুয়ে দেখেছি। ওর ছবির দিকে চাইলে মনে হয় না ও এরকম নিষ্ঠুর হতে পারে, এমন বিবেকহীন হতে পারে। রোজ শোবার সময়, আমি ওর জন্যে শুভকামনা করে ঘুমিয়েছি। কাজের অবকাশে, পাখি-ডাকা দুপুরে, ঝাউবনে-দোলা-দেওয়া হাওয়ায় যখন রোদের বাঁকা ফালি এসে পড়েছে—পাইনউড হোটেলের কাঠের ফ্লোরের বিরাট ডাইনিংরুমের পর্দা-দেওয়া জানালার পাশে বসে, আমি একা একা লাঞ্চ খেয়েছি—আর নয়নার কথা ভেবেছি।

আমার সজ্ঞানে, আমার চোখ খুলে, নয়না যা পছন্দ করে না তেমন কোনও কিছুই যে আমি করতে পারি এমন ভাবনাগুলিকে পর্যন্ত আমি ট্রাউজারের চোরকাঁটার মতো একটি একটি করে উপড়ে ফেলেছি।

প্রতিদিন দুপুরে ও রাতে ম্যানেজারের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে খোঁজ করেছি আমার চিঠি এসেছে কি না। তার সঙ্গে বসে ডাকবিভাগের নিরীহ কর্মচারীদের গাফিলতির তীব্র নিন্দা করেছি। ভেবেছি, চিঠি না-পাওয়ার জন্য তারাই দায়ী।

হয়তো কিছুই লিখত না নয়না চিঠিতে। হয়তো লিখত, 'সু'দার, টেবল টেনিস টুর্নামেন্ট আরম্ভ হয়েছে—ওদের অ্যালশেসিয়ান কুকুরটার (জিম) শরীর ভাল যাচ্ছে না। ওর পড়াশুনার চাপ চলেছে। ইত্যাদি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও যে কোনওদিন চিঠিতে আমাকে এমন কিছু লিখবে যা পরে ওর বিপদ ডেকে আনতে পারে, তা আমি মনে করি না। তাছাড়া কোনও ব্যাপারে, বিশেষ করে ওর লেখা চিঠি দেখিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেল করে ঠকানোর কথা, আমি অন্তত মনেও আনতে পারি না। তাছাড়া ব্ল্যাকমেল যদি কেউ কোনওদিন আমাকে করতে চায়, তা ও-ই করতে পারবে। কারণ, আমি ওকে কিছু বাকি রেখে চিঠি লিখিনি। একজন সদ্বংশজাত ছেলে একজন সদ্বংশজাতা মেয়েকে কিছুই-বাকি-না-রেখে ভালবাসলে যেমন করে চিঠি লিখতে পারে তেমন করেই লিখেছি। এ চিঠিগুলির জন্যে হয়তো ভবিষ্যতে অনেক নিগৃহীত হতে হবে আমাকে। অনেকে এবং হয়তো নয়নাও গায়ে থুথু দেবে। আমার কী হবে তা নিয়ে কখনও আমি ভাবিনি। কারণ আমার ভালবাসায় কোনও মেকি ছিল না—আজও নেই। ও যদি আমার উজাড়-করা ভালবাসার প্রতিদানে আমায় আরও শাস্তি দিতে চায় তো দেবে। আমার অধিকার বোধহয় শাস্তিতেই—পুরস্কারের ভাগ্য করে তো এ জন্মে জন্মাইনি।

কিন্তু আমি তো ওর কাছে প্রেমপত্র প্রত্যাশা করিনি। শুধু ও কথা দিয়েছিল যে, একটা চিঠি দেবে। পাঁচটা নয়, দশটা নয়; মাত্র একটা চিঠি। সেই প্রতিশ্রুত একটি মাত্র চিঠিও ও আমাকে দেয়নি। আসলে আমিও যে একটা মানুষ, একটা রক্ত-মাংস—শরীর-হৃদয়ের মানুষ তা বোধহয় নয়না কোনওদিন ভেবে দেখেনি।

আমি কি ব্যর্থ প্রেমিক? হয়তো ব্যর্থ আমি। ব্যর্থ; কারণ আমি নিজেকে সার্থক করতে পারিনি। কিন্তু তা বলে প্রেম কখনও ব্যর্থ হয় না। কারও প্রেমই কোনওদিন ব্যর্থ হয়নি। আমি সব সময় বুঝি, ভাবি, মনে রাখি যে, আমি একটি সামান্য ছেলে—একটি সামান্য এঞ্জিনীয়র ঋজু বোস। আমার গর্ব করার মতো জীবনে কীই বা ছিল। না চেহারা, না গুণ, না অন্য কিছু। আমার মতো অনেক অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে কলকাতার পথেঘাটে আকছার ঘুরে বেড়ায়। আসলে আমার সর্বস্ব দিয়েই নয়নাকে ভালবাসার আগে আমার কোনও পরিচয়ই ছিল না। আমি একটি Negative entity ছিলাম। কিন্তু এখন একজন মহৎ মানুষ। প্রেম আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে যা আমার কোনওদিন ছিল না; যা কোনওদিন আমি অন্যত্র পেতাম না।

নয়না আমাকে কিছুই দেয়নি এতবড় মিথ্যা কথা বললে আমার পাপ হবে। নয়না আমাকে যা দিয়েছে তার ঋণ শোধ করতেই আমার আবার এ পৃথিবীতে আসতে হবে। কিংবা হয়তো গত জন্মেও কিছু ঋণ ছিল। সে বোঝাই এখন হালকা করছি। কিন্তু এও তো সত্যি, নিজের কিছুমাত্রই না হারিয়ে নয়না আমাকে যা দিতে পারত তার কিছুই ও দেয়নি। নয়না সে কথা আমার চেয়েও ভাল করে জানে। তবু, ওর যদি বুদ্ধি বলে কিছু থেকে থাকে, যদি মন বলে কোনও পরিশীলিত বস্তু থেকে থাকে, তবে একদিন ও বুঝবে যে, যার বুকেই শুয়ে থাকুক না কেন, ঋজু বোসের মতো করে আর কেউ এ জন্মে ওকে ভালবাসতে পারবে না; পারেনি। একদিন না একদিন, এ সত্য তার কাছে প্রতিভাত হবেই।

ভুলে থাকার চেষ্টা করি। সবসময় চেষ্টা করি। কিন্তু ভারী দেখতে ইচ্ছে করে ওকে, বড় কথা বলতে ইচ্ছে করে। মনটা পাগল-পাগল করে। মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব শাসন করি। বলি, কলকাতা শহরে নয়নাপেঁচী ছাড়া আর কি মেয়ে নেই? তোমাকে কি আর কেউ ভালবাসতে চায় না? চায়নি কোনওদিন? তক্ষুনি যে-আমি মনকে শাসন করে, সে-আমিকে ভীষণ ধমকে দিয়ে অন্য-আমি বলে, ইডিয়টের মতো কথা বোলো না। নয়না নয়নাই। নয়নার অভাব অন্য কাউকে দিয়ে পূরণ হয় না।

আসলে এই ছুটির দিনগুলোই জ্বালায়। যেই নিমগাছটায় ঝুরু ঝুরু হাওয়া দেয়, স্থলপদ্ম গাছের সারিতে রোদের আঁচ লাগে—রঙ্গনেদের ডালে মৌটুসি পাখি এসে কিস্‌কিস্‌ করে কথা বলে, অমনি ভিতরের পাগলটা গরাদ ভেঙে বাইরে আসতে চায়।

আমাকে চিঠি না লিখে ও যা অন্যায় করেছে তার কোনও ক্ষমা হয় না। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওকে ভুলে যাব। অন্তত একমাস ওর সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখব না। মানে, ভেবেছিলাম ওকে একটু টাইট্‌ দিতে হবে।

কিন্তু শিলঙ থেকে ফিরেছি মাত্র পাঁচ দিন। ফিরে আসার পর এই প্রথম ছুটির দিন। কিন্তু আর

www.BanglaBook.org

প্রতিজ্ঞা রাখা হয়ে উঠল না। ভাবলাম একটা টেলিফোন করিই না নয়নাকে। এবারের মতো ক্ষমা করে দিই। যেতেও পারতাম ওদের ওখানে। কিন্তু একা একা কথা বলতে পাই না। সুজয়টা খেলার আলোচনা করবে। কোন প্লেয়ার কোন টিমে গেল---এই সীজনে কে কটা গোল দিল—। এখনও সেই কলেজের ছেলেই রয়ে গেছে---মাসিমা তাঁর ন' দেওরের সেজ ছেলে দুর্গাপুরে কীভাবে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল তার গল্প করবেন। নয়নার মুখের দিকে ভাল করে একবার তাকাতে পর্যন্ত পারব না। ওঁদের মুখের দিকে চেয়ে কথা শুনতে হবে, মাথা নাড়তে হবে—তারপর চা কি কফি খেয়ে রাগে গর্‌গর্ করতে করতে চলে আসতে হবে। তার চেয়ে ফোন করা ভাল।

ফোনটা নয়না ধরল। ইস্ কী বরাত আজ।

কে ?

আমি নয়না বলছি। কে ? ঋজুদা ?

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

বা রে। তাহলে ফোন করা কেন ? ছেড়ে দি ? (বলে হাসল)।

রাগে গা জ্বালা করতে লাগল।

ও আবার বলল, কেন ? কথা বলবেন না কেন ?

কেন, তুমি জানো না ?

না। কী হয়েছে ? কবে এলেন আপনি ?

তা দিয়ে কী হবে !

আপনার সব ক'টি চিঠি পেয়েছি। প্রতিটি চিঠি দারুণ হয়েছে, ভীষণ—ভীষণ ভাল লেগেছে। মানে, এত ভাল লেগেছে যে দাদা এবং মাকেও দেখিয়েছি।

কী করেছ ?

চিঠিগুলি দাদা এবং মাকে দেখিয়েছি।

তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমার চিঠি কাউকে দেখাবে না ?

করেছিলাম। কিন্তু এই চিঠিগুলো দারুণ ভাল হয়েছিল। এদের বেলা ওসব প্রতিজ্ঞা-টতিজ্ঞা খাটে না। সুমিতাকেও দেখিয়েছি।

কিছু বলার নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

কী হল ? কথা বলুন।

তুমি আমাকে চিঠি দাওনি কেন ?

ও খুব ক্যাজুয়ালি বলল, আর বলবেন না। জানেন, একদিন মনেও পড়ল। কিন্তু খাম-টাম ছিল না—। লিখব লিখব করে আর হয়ে উঠল না। আর কীই বা লিখতাম ? লিখিনি ভালই হয়েছে। পড়ে, আপনি হয়তো হাসতেন।

কী আর বলব ? সত্যিই বলার কিছুই নেই। চুপ করে রইলাম।

নয়না বলল, তারপর ? খুব তো বেড়িয়ে এলেন।

হ্যাঁ, বেড়াতেই তো গেছিলাম কিনা ? শিলঙে উঠতে যা বমি হয়। ভদ্রলোক শিলঙে যায় ?

বমি হয় ? সে কী ? আপনি কি মেয়ে নাকি ?

ভীষণ রাগ হল। বললাম, মানে ? মেয়ে নাকি মানে কী ? ট্রাক-ট্রাক ষণ্ডা গুণ্ডা মিলিটারির জোয়ানগুলি গলগল করে সারা রাস্তা বমি করতে করতে যায় যে—তারাও বুঝি মেয়ে ?

নয়না হাসতে হাসতে বলল, তা জানি না, কিন্তু খুব হাসি পাচ্ছে। আপনি দোলনা দুলতে পারেন ?

দোলনায় আবার ছেলেরা চড়ে নাকি ?

পারেন ?

না। আমার গা গোলায়।

ছিঃ। লোককে বলবেন না। সকলে হাসবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু থেমেই বলল, থাক, বাজে কথা থাক। এই একটু আগেই আপনার কথা ভাবছিলাম।

আমার কী সৌভাগ্য!

সত্যি। আপনার বন্দুকটা নিয়ে একবার আমাদের বাড়ি আসবেন?

কেন? পাগল কুকুর বেরিয়েছে নাকি?

না। পাগল কুকুর নয়। টিক্‌টিকি—মানে মোটা মোটা বিচ্ছিরি কুমীরের মতো গা'টা—কালো দেখতে।

কোথায়?

আমার বাথরুমে। দেওয়ালে। এমন ভয় দেখিয়েছে না আজ সকালে! সকালে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে যেই মুখ তুলেছি, দেখি আয়নার নীচে থেকে একেবারে আমার নাকের সামনে উঁকি মারছে। চমকে উঠে এমন চিৎকার করেছি যে মা দৌড়ে এসেছেন। পার্টিকুলারলি এই একটা টিক্‌টিকিই খারাপ। যেমন দেখতে, তেমন স্বভাব।

বললাম, আমার মতো?

ও সিরিয়াসলি বলল, না না, ঠাট্টা নয়। এমন গোল্লা গোল্লা চোখে তাকায় না! চান করার সময়ও ভয় দেখায়। অন্য সাদা টিকটিকিগুলো কিছু করে না; ভাল। বেশ মেয়েলি স্বভাবের। এইটা একটা জংলি। পুরুষ-পুরুষ।

তারপর একটু থেমে বলল, আসবেন বন্দুকটা নিয়ে?

টিকটিকি মারতে বন্দুক লাগে না। এয়ার রাইফেলেই কাজ হবে। কিংবা, গিয়ে, হাতে ধরে পকেটে পুরেও নিয়ে আসতে পারি।

ঈস্, ঘেন্না করবে না?

ঘেন্না করবে কেন? এমন একজন ভাগ্যবান ভদ্রলোক।

কেন? কেন? ভাগ্যবান কেন?

তা জানি না। তবে আমার খুব ইচ্ছে করে, আমি তোমার চান-ঘরের টিকটিকি হই।

কেন?

পরক্ষণেই মানে বুঝতে পেরে বলল, ইস্, কী খারাপ আপনি। ভারী, ভারী খারাপ হয়েছেন। সত্যি সত্যিই আপনি টিকটিকিটার মতোই জংলি। ছিঃ।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

ও সামনে থাকলে, সর্বাঙ্গীণ লজ্জায় লাল হলে ওকে কেমন দেখায় দেখতে পেতাম।

তুমি কেমন আছ?

ভাল। খুব ভাল। আপনি কেমন আছেন?

ভাল।

শিলঙে ভাল হয়ে ছিলেন তো?

কেন? তুমি বললেই কি ভাল হয়ে থাকতে হবে?

বা রে! আমি তো তা বলিনি।

তোমার কথা আমি কেন শুনব? তুমি আমার কোনও কথা শোনো?

এবারের মতো ক্ষমা করুন। দেখবেন। আমি আপনার সব কথা শুনব।

৯

পাড়াটা থমথম করছে। ভয়ে নয়, নিস্তরঙ্গতায়। মিষ্টি মিষ্টি রোদে পাশের বাড়ির বউ চান করে, খড়কে-ডুরে শাড়ি পরে, দোতলার বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন দেখছে। কর্তা অফিস থেকে ফিরবেন, সে অপেক্ষায় নিশ্চয়ই অপেক্ষমাণ। আজ শনিবার। নিশ্চয়ই দুপুরে বাড়ি ফিরে লাঞ্চ করবেন। ভাল ভাল পদ রান্না হয়েছে। আজকে কর্তা রেলিশ করে কিছু খাবেন। তারপর হয়তো কর্তা গিন্নি সিনেমায় যাবেন। বড় সাহেব হলে টার্ফ ক্লাবে, কি গল্‌ফ ক্লাবেও যেতে পারেন।

www.BanglaBook.org

নইলে অনেক কিছু করবেন, ভাবনীয় বা অভাবনীয়।

এমন সময় নয়না ঘরে ঢুকে বলল, আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছেন ?

হাতে-ধরা ম্যাগাজিনটা ফেলে বললাম, শুধু আকাশে নয়।

নয়না কাছে এসে আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল, ওর নাম রানী। আমাদের রানীবৌদি।

দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার স্বামী খুব সৌখিন ?

সৌখিন ? থার্ডক্লাশ। সখ বলে কোনও জিনিস নেই। রানীবৌদির রুচি কিন্তু খুব ভাল। তার মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি—যেমন আপনার লেখা খুব ভালবাসেন।

কী ব্যাপার ? আজ সকালে আমার কল্যাণে লেগেছ কেন ?

কখনও কি অকল্যাণে লেগেছি ?

না। তা লাগোনি। তুমি যে কল্যাণী।

ঠাট্টা নয়। একদিন বুঝতে পাবেন। কল্যাণী কি না।

নয়না চেয়ার টেনে বসে কী যেন ভাবতে লাগল।

রানীবৌদি কিন্তু অনেকদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন। দাদাকেও অনেকদিন বলেছেন। আমার কাছে আপনার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন। আপনি কখন লেখেন ? কে আপনার কপি ফেয়ার করে দেয় ? আপনার মেজাজ কেমন ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

তুমি কী বলো ?

আমি আবার কী বলব ? আমি কি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি যে এসব কথার খবর রাখব ? তবু, আমি বলি যা খুশি বানিয়ে বানিয়ে।

বললাম, বানিয়ে বানিয়ে মানে ?

মানে, আমার যা বানাতে ইচ্ছে করে।

বললাম, তোমার তো বুদ্ধি রাখার জায়গা নেই—কিন্তু এও বলে দাওনি তো যে আমার লেখার অনুপ্রেরণা তুমিই।

ভারী তো লেখেন, তার আবার অনুপ্রেরণা।

আচ্ছা। তোমাকে নিয়েই যদি একটি গল্প লিখি।

আমাকে নিয়ে মানে ?

তোমাকে নিয়ে মানে, তোমাকে নায়িকা করে।

আমি আবার নায়িকা হব কী করে ? নায়িকা হবার যোগ্যতা কোথায় ?

সে তো নায়ক এবং যে লিখবে সে বুঝবে।

তাহলে লিখুন। মনে হল, খুব নিস্পৃহ গলায় বলল কথাটা।

বললাম, তোমার গর্ব হবে না নয়না ?

নয়না আমার চোখের দিকে চাইল—অনেকদিন পরে ও এরকমভাবে চাইল। তারপর মুখ নিচু করে নিয়ে বলল, হয়তো হবে। জানি না। কিন্তু নায়িকার গর্ব হলে লেখকের কী লাভ ? লেখক কী পাবে ?

বললাম, লেখকরা তো কিছু পাবার জন্যে লেখেন না। নিজেদের নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলার জন্যে লেখেন। লেখকরা কোনওদিনও লাভবান হন না। নায়ক-নায়িকারা খুশি হলেই তাঁরা খুশি হন।

নয়না বলল, আমি অত জানি না। তবে আমার ভাবতেই মজা লাগে। নায়িকাকে কিন্তু আমার চেয়ে সুন্দর করে আঁকবেন। আর যিনি ছবি আঁকবেন, তাঁকেও বলে দেবেন—নায়িকা যেন দারুণ দেখতে হয়।

বললাম, তোমার চেয়ে ভালয় আমার দরকার নেই। হুবহু তোমার মতো আঁকতে বলব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

নয়না বলল, সত্যি, সত্যি, সত্যি ? আমাকে নিয়ে গল্প লিখবেন ?

বললাম, সত্যি। সত্যি। সত্যি।

অনেকক্ষণ নয়না মুখ নিচু করে বসে কী যেন ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে ও চান করেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটি খাটাউ ভয়েল পরেছে। চোখের নীচটা লালচে লাগছে। ভুরুতে একটু হালকা আইব্রো পেনসিল ছুঁইয়েছে। ঠোঁটে পাতলা করে ভেস্‌লিন। চোখে সামান্য কাজল বুলিয়েছে। বারান্দার হাওয়ায়, ওর শিকাকাই-ঘষা চুল এলোমেলো হচ্ছে।

ভালবাসা কাকে বলে জানি না। কোনওদিন জানতেও চাইনি। হয়তো কোনওদিন জানতে চাইও না। এই মুখটি, এই সুগন্ধি শরীরটিকে কাছে পেলে আমি আর কিছু চাইনি—কোনওদিন চাই না। বেঁচে থাকবার জন্যে আমি আর কিছুই চাই না।

বললাম, নেমন্তন্ন করেছ বলে কি মনে করেছ বাইরের রেস্তোরাঁগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে নাকি ? খিদেয় যে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেল। খেতে দেবে না ?

নয়না হাসল।

ক্ষমা-চাওয়া হাসি। বলল, বেচ্চা—রা। খুব খিদে পেয়েছে, না ?

মায়ের মেয়ে তো এতক্ষণ নিজের কায়দা দেখিয়ে এল। এখন মা নিজে ছেলের বন্ধুর জন্যে বিশেষ পদ রান্না করছেন। আর একটু ধৈর্য ধরুন। বুড়ো মানুষ তো। মনে কষ্ট দিতে নেই ! সখ করে রাঁধছেন।

বললাম, মেয়েকে শিক্ষা তো খুব চমৎকার দিয়েছেন মাসীমা। দেবদ্বিজে ভক্তি করিবে, বৃদ্ধের মনে ব্যথা দিবে না। কিন্তু সে সঙ্গে এও তো শেখাতে পারতেন যে জীব মাত্রেরই প্রাণ আছে। এবং প্রাণ থাকিলেই আঘাত লাগিতে পারে। অতএব যুবার প্রাণে কষ্ট দিবে না।

নয়না এক ঝিলিক হেসে উঠল। বলল, আমি কোনও যুবার মনে সজ্ঞানে কষ্ট দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। এখন যদি কেউ কষ্ট পায়, মন-গড়া কষ্টে নিজেকে ভাগায়, তাহলে তাকে ভগবানও বাঁচাতে পারেন না।

মানুষ তো দূরের কথা, কী বলো ?

ও চোখ দিয়ে সায় দিল।

মাসীমা বারান্দায় এলেন। বললেন, দেখেছ তোমার বন্ধুর কাণ্ড ! এক্ষুনি ফোন করল যে ও আসতে পারবে না, ঋজুকে বলে দিতে, যেন কিছু মনে না করে।

ও গেছে কোথায় ?

ওর এক বন্ধু রমেশ, তুমি চেনো না বোধহয়, আজ বিলেত চলে যাচ্ছে। বম্বে থেকে জাহাজ ধরবে। আজ বম্বে যাচ্ছে। তাই বাড়িতে গেছে।

না মাসীমা। আমি চিনি না।

সুজয়টার রকমই অমনি। বন্ধু এল বাড়িতে, তিনি গেলেন অন্য বন্ধুর বাড়ি।

নয়না বলল, তাতে কী হয়েছে মা, ঋজুদা তো কিছু মনে করেনি।

মাসীমা বললেন, ঋজু মনে করুক আর না করুক ও আসবেই বা না কেন ?

চলুন চলুন মাসীমা। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

চলো বাবা।

নয়নাদের খাবার ঘরটি আমার ভারী ভাল লাগে। এমনকী, বসবার ঘরের চেয়েও ভাল লাগে। সত্যি কথা বলতে কী, যে খাবার ঘরে ঢুকেই কেবল খিদে খিদে না পায়, বেশ শান্তির সঙ্গে নিরিবিলিতে খাওয়া না যায়, সেখানে খাওয়া না খাওয়া সমান !

ঘরটি ছোট। দুটি জানালা। জানালা দিয়ে ওদের লনটি চোখে পড়ে। চেরিগাছের পাতায় চারটি চড়াই চিড়বিড় করছে। হা-হা হাওয়া বোগেনভিলিয়ার পাতায় হই হই করছে। ঘরের দেওয়ালে একটি স্টিল-লাইফ। তেলরঙা কাজ। এক কোণে ছোট্ট একটি রেফ্রিজারেটার ফিস্ ফিস্ করে কী যেন কী বলে চলেছে। এক পাশে একটি মানানসই কাবার্ড। তাতে চীনে ক্রকারি। এক দেওয়ালে নয়নার একটি ফ্রক-পরা বেণী-ঝোলানো ফোটো। ছোটবেলায় নয়নার চেহারাটা এখনকার মতো ছিল না। কেমন যেন অন্য রকম ছিল। সাপের খোলস ছাড়ার মতো ও যেন ওর পুরনো শরীর ছেড়ে হঠাৎ এই নূতন সুগন্ধি শরীরে প্রবেশ করেছে।

টেবিলে সুন্দর করে ফুল সাজিয়েছে নয়না। চমৎকার ম্যাটস পেতেছে। এ রকম টেবিলে, এ

www.BanglaBook.org

রকম ঘরে বসে, নুন-ভাত খেতেও ভাল লাগে। তাতেই পেট ভরে যায়। অনেক সময় কী খাচ্ছি সেটাই বড় হয় না ; কেমন করে খাচ্ছি সেইটে বড় হয়। নয়নাদের খাবার ঘরে ঢুকলে কেবল আমার তাই মনে হয়।

সুজয়টার রুচি দিন দিন বিড়িওয়ালার মতো হচ্ছে। কলেজে ও অন্য রকম ছিল। অথচ নয়নার রুচি দিনে দিনে আরও সুন্দর হচ্ছে। ঠিক মনে মনে আমি যেমনটি চাই, যেমনটি কল্পনা করি। নয়না যেন আমার সব রকম চাওয়াকে সফল করবে বলেই এ জন্মে জন্মেছিল।

মাসীমা চেয়ারটি টেনে দিয়ে বললেন, বোসো।

তারপর বললেন, নয়না ফ্রায়েড রাইস্ আর মুরগিটা নিজে রেঁধেছে। অন্য রান্না ঠাকুরের। আমি কেবল তোমার জন্যে নারকোল দিয়ে বুটের ডাল রেঁধেছি। নয়না বলছিল, তুমি ভালবাসো।

অবাক হলাম। আমি ভালবাসি ? কই ? আমি নিজেই জানি না। বললাম, নিজে জানি না আর নয়না জানল কী করে ?

নয়নার মুখ লাল হয়ে গেল।

বলল, আপনি কী ? সেই পিকনিকে কতখানি ভাত খেয়েছিলেন খালি ওই ডাল দিয়ে ? মনে নেই ? নিজে ভুলে যাবেন নিজের লোভের কথা, আর অন্যকে অপদস্থ করবেন।

মনে পড়ল, মনে পড়ল। ঠিক তো। আমি তো ভালবাসি। আমি যে ভালবাসি নিজেই কোনওদিন জানিনি। আমার লোভের কথা আমি ভুলে গেছি। এমনি করে আমার সমস্ত দুরন্ত লোভগুলির কথা যদি আমি ভুলে যেতে পারতাম !

মাসীমা বললেন, তোমরা দু'জনে খাও, আমি পুজোটা সেরে আসি ততক্ষণে। লজ্জা কোরো না ঋজু। তুমি আর সুজয় তো আমার কাছে আলাদা নও।

নয়না বলে উঠল, লজ্জা করার পাত্র কিনা উনি। দাদার দু'গুণ খান।

মাসীমা বকলেন, বললেন, এই ! তুমি ভারী অসভ্য তো। বেশ করে। খায়। স্বাস্থ্যবান ছেলে, খাবে না তো কী ? তোদের মতো ফিগার ফিগার বাতিক তো নেই ?

নয়না বলল, বাতিক থেকেই বা কী লাভ হত ? না খেলেই যেন রক্-হাডসন্ হয়ে যেত।

নয়না আজ খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে রয়েছে সকাল থেকেই। কেন জানি না। এত কথা ওকে খুব কম বলতে শুনেছি।

মাসীমা চলে গেলেন।

আমি বললাম, চেহারাটা নিয়ে ঠাট্টা করো কেন ? তুমি কি মনে করো তুমি খুব সুন্দরী ? নিজে তো কাঁড়িয়া-পীরেতের মতো দেখতে !

তা তো আমি জানিই, তবু তো...।

কথা বললাম না। ফ্রায়েড রাইসটা জব্বর রেঁধেছে নয়না। একেবারে পীপিং কি ওয়ালডর্ফ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

বললাম, রেস্তোরাঁ থেকে খাবার কিনে এনে নিজের বানানো বলে চালানো কি মহৎ কাজ ? আমি সবই জানি।

জানেন তো সবই। তবে জেনেশুনে অন্য লোকের লেখা বেমালুম টুকে নিজের বলে চালিয়ে কয়েকটি সরলবুদ্ধি মেয়ের কাছে নাম কেনার আকাঙ্ক্ষাই বুঝি খুব মহৎ ?

বললাম, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। এই লেখা-টেখা নিয়ে কোনও কথা বোলো না। যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলো কেন ?

বেশ বলব না। কিন্তু আপনি কি রান্না বোঝেন ? বলুন তো ফ্রায়েড রাইস্ কীসে রাঁধে ? ঘি, সরষের তেল, না ডালডা ?

খুব বোকা ভেবেছ ? জানি না বুঝি ? স্যালাড অয়েলে।

ও মাঃ ! তাহলে জানেন ? সরি। সরি। আই উইথড্র। সত্যি। আপনি ক—ত্ত জানেন। বলেই হাসতে লাগল।

হেসো না বলছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও বলল, বেশ হাসব না—খান খান— please ঝগড়া করবেন না। ভারী ঝগড়া করেন আপনি।

দুজনে অনেকক্ষণ বসে আস্তে আস্তে খেলাম। খাওয়ার সময়ে যে-কোনও মেয়েকে দেখে বলা যায় সে সদ্বংশজাত কি না। কেউ কেউ রাক্ষসীর মতো গেলে। কেউ কেউ বাঘিনীর মতো ভাতের থালায় থাবড়া মারে, আর কেউ বা পদ্মিনীর মতো স্বপ্নভরা আঙুলে আলতো করে খাবার তুলে মুখে দেয়। তাকে তখন দেখলে, সে যে আহারের মতো অমন একটি প্রাচীন, আদি ও পশুভিনরাণাং প্রক্রিয়া করছে, তা দেখে বোঝার উপায় থাকে না। যেমন করে আলপনা দেয় তেমনি করেই নয়না খায়। ও আমার চোখে আর্টের সংজ্ঞা। ওকে কখনও কোনও অবস্থায়, হঠাৎ ঘুম-ভেঙে, অথবা ভীষণ ক্লান্ত অবস্থাতেও কুৎসিত দেখায় না। ওর সৌন্দর্য আমার ভালবাসার মতো ওকে সবসময় জড়িয়ে থাকে।

খাওয়া শেষ হল।

মশলা-টশলা কিছু খাবেন ?

না। পাইপ খাব।

চলুন। আমার ঘরে চলুন! দুপুরে মা'র কাছে মহিলা-সম্মিলনীর বন্ধুরা আসবেন। ও ঘরে থাকলে আপনার বিপদ আছে।

কেন ? বিপদ কীসের ?

বাঃ বাঃ। কী বলেন ? এমন একজন এলিজিবল্ ব্যাচেলার। মায়ের প্রত্যেক বন্ধুর গোটা তিনেক করে উজ্জ্বল কন্যারত্ন আছে। কাজেই বিপদ অনিবার্য।

আর তোমার মায়ের বুঝি কোনও কন্যা নেই ?

আমার মায়ের মেয়ের ভার মাকে নিতে হবে না। সে নিজেই নিজের ভার বইতে পারে।

পারে বুঝি ?

পারে না ?

নয়নার ঘরটি দক্ষিণ-খোলা। একটি বীর্ড-আই ওয়ার্ড্রোব, একটি চওড়া ডিভান। কোণায় একটি পড়ার টেবল্। একটি মোড়া। একফালি জাফরাণীরঙা মীর্জাপুরী গালচে। তার উপরে একটি অ্যামপ্লিগ্রাম। দেওয়ালে, গোপাল ঘোষের একটি প্যাস্টেলে আঁকা স্কেচ্।

ডিভানে বসে পাইপটা ধরালাম।

নয়না বলল, আপনি একটু বসুন। আমি মায়ের খোঁজখবর নিয়ে আসি। বেচারি মা। মা'র জন্যে আমার ভারী কষ্ট হয়। একা একা মানুষ থাকতে পারে ? আমার বন্ধুর মা'দের কত মজা। বাবাদের সঙ্গে সিনেমায় যান, চওড়া-চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ি পরেন। দোল-দুর্গোৎসবে কত আনন্দ করেন। আর মা আমার কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে থাকেন। বাবার উপর রাগ হয়। কোনও মানে হয়, এমন করে মাকে ফেলে যাবার ?

বললাম, কী করবে বলো ? আমার তোমার তো কোনও হাত নেই।

নয়না বলল, আমি এক্ষুনি আসছি, হ্যাঁ ?

নয়না চলে গেল।

আমি বসে বসে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, ওইটুকু মেয়ের সকলের প্রতি কী সমবেদনা। ওর ওই ক্ষীণ শরীরের ভিতর যে এতবড় একটি বুদ্ধিমতী মহতী প্রাণ লুকিয়ে আছে তা ওকে যে কাছ থেকে না জানে, সে কখনও জানবে না।

ও ওর কাছের লোকেদের এমন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে যে সে বলার নয়। আমি জানি ও আমাকে ভালবাসে না। হয়তো কোনওদিন ভালবাসবেও না। অথচ ও কোনওদিন আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি যে, আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। একে ফ্লার্ট করা বলে না। একে কী বলে তা জানি না। তবে এটুকু জানি, খুব কম মেয়ে জানে যে, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের চাওয়াকে অবিকৃত রেখেও নিজেকে অনিঃশেষে কোনও ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিতে হয়।

হাই-ভোল্টেজ তামার তারের মতো, নয়না অনেক বিদ্যুৎভার সইতে পারে, বইতে পারে ; কিন্তু ও

www.BanglaBook.org

নিজে জ্বলে যায় না। ও সেই বিদ্যুৎ বয়ে নিয়ে গিয়ে মনে মনে ঘরে ঘরে আলো জ্বালায়। ও আমার মন-দেয়ালি।

নোংরা ভিক্ষুকের নোংরা হাতে ওর শালীনতা কলুষিত হতে পারে যে, সে সম্ভাবনার কথা ও জানে। অথচ, তবু যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো, ও আমার কামনাহত মনকে পবিত্রতার প্রদীপ জ্বেলে শুশ্রূষা করে, নিজের শরীরের গেরিলা বাহিনীকে ও অবহেলায় অগ্রাহ্য করে। কী করে ও পারে জানি না। শুধু জানি যে, ও পারে। একমাত্র ও-ই পারে।

একটু পরে নয়না ফিরে এল।

মোড়াটার উপর বসে বলল, Sound of Music দেখেছেন ? গ্লোব-এ হচ্ছে।

বললাম, যখন কলেজে পড়তাম তখন আমাদের কলেজ হলে একবার হয়েছিল। তখন দেখেছিলাম। অবশ্য অনেক দিন হয়ে গেল।

সে তো পুরনো ছবি। নতুন ছবি দেখেননি ? সেভেন্টি মিলিমিটারের ছবি। আর কী গান ; কী গান !

ব্যাপারটা কী বলো তো ? ভাল করে মনে নেই।

ব্যাপারটা গান।

তারপর মোড়া ছেড়ে উঠে বলল, শুনুন তবে। আমার কাছে রেকর্ড আছে। শোনাচ্ছি।

লং-প্লেয়িং রেকর্ড— অনেক গান। তার মধ্যে একটি গান আমাকে ও বিশেষ করে শুনতে বলল। বিশেষ করে কানে লাগল—

Nothing comes from nothing,
Nothing ever could,
In my youth,
Or in my childhood ;
I must have done
Something good...

গান শেষ হল।

শুধোলাম, আচ্ছা এই ছবিতে অনেকগুলো বাচ্চা-টাচ্চা ছিল না ? জুলি এন্ড্রুজ আছে ?

হ্যাঁ। আগে নান্ ছিল। পরে সাত-সাতটি ছেলেমেয়ের বাবা এক বদমেজাজী ক্যাপ্টেনের বাড়িতে গভর্নেস্ অ্যাপয়েন্টেড হল। পরে সেই ক্যাপ্টেনকে সে বিয়ে করল। মানে, "হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো ; গান দিয়ে দ্বার খোলাব"।

বললাম, বলো কী ? সাত-সাতটি ছেলেমেয়ের বাবাকে সুশ্রী কুমারী মেয়ে বিয়ে করল ?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

পুলকিত গলায় বললাম, তাহলে নিশ্চয় আমার মতো ব্যাচেলারদের আরও ভাল।

নয়না এক চিলতে হাসল। বলল, বলা যায় না। হয়তো ভালও হতে পারে— তবে only if they have done something good in their youth or in their childhood.

১০

পুজো পুজো পুজো। এসে গেল পুজো।

জানি, লাউড-স্পীকারের শব্দে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, লোকের ভিড়ে মাথা ধরবে। তবু, কেন জানি পুজো এলে ভাল লাগে।

বাঙালি বলে বোধহয়।

মনে-প্রাণে পুরোপুরি বাঙালি বলে বোধহয়।

শম্পু সরকার কি রুশি বিয়ান্দকারের তো এমন মনে হয় না। ওরা সাহেব। পুজোর ছুটিকেও ওরা অন্য যে কোনও ছুটি বলে মনে করে।

www.BanglaBook.org

সকালে উঠে ওরা যথারীতি চান করবে, ব্রেকফাস্ট করবে, তারপর ড্রেইনপাইপ গলিয়ে কারও বাড়ি গিয়ে তাসের আড্ডায় বসবে, নয়তো ক্লাবে গিয়ে বীয়ার খাবে। চঞ্চল চন্দ হয়তো বারান্দায় পাজামা পরে বসে, নিউ স্টেটসম্যানের ফিনফিনে পাতা খুলে নিজেকে যথার্থ কাল্‌চারড্ মনে করবে। যেন, পুজো তো কী ? যেন পুজো কিছুই নয়।

আমি তা ভাবতে পারি না। মহালয়ার ভোরে, আধো-ঘুমে-আধো-জাগরণে বালিশটা আঁকড়ে ধরে শুয়ে শুয়ে যখন মহিষাসুর বধের বর্ণনা শুনব রেডিওতে, যখন সেই শেষরাতে, সমস্ত পাড়া সমস্ত কলকাতা শহর, সমস্ত বাংলাদেশ গম্‌গম্ করবে এক শুদ্ধ বিমুগ্ধ প্রভাতী বন্দনায়, তখন যে কী ভাল লাগবে সে কী বলব ! শুধু আমার কেন ? খাঁটি বাঙালি মাত্রেরই লাগবে। পুজো আসছে। ভাল লাগবে না ?

তারপর মহালয়ার ভোর হবে। শরতের নীল আকাশে রোদ্দুর ঝিলিক দেবে। সকালে হয়তো রেডিওতে কণিকা ব্যানার্জির গান থাকবে— শরৎ আলোর কমল বনে, বাহির হয়ে বিহার করে, যে ছিল মোর মনে মনে...। শুনব, চুপ করে বসে কান পেতে শুনব ; চোখ চেয়ে শরতের রোদ দেখব, নাক ভরে শিউলি ফুলের গন্ধ নেব ; আর ভাল-লাগায় মরে যাব।

সেই পুজো এসে গেল।

অনেকদিন থেকে ভেবেছিলাম যে, নয়নাকে একটি ভাল শাড়ি কিনে দেব পুজোয়। পথ চলতে হঠাৎ কোনও শো-কেসে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি অনেকদিন। কোনও সুন্দর শাড়ি দেখেছি। মনে মনে নয়নাকে সে শাড়ি পরিয়ে, মনের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে কেমন দেখিয়েছে, ভেবে নিয়েছি। তারপর মনে হয়েছে, এ চলবে না। এ রঙ বড় ক্যাটকেটে ; রঙ ভাল লেগেছে যদি-বা তো পাড় পছন্দ হয়নি। পাড় যদি বা পছন্দ হয়েছে তো আঁচলটা বড় জবরজং লেগেছে !

পথে পথে দোকানে দোকানে এ ক'দিন অবকাশ পেলেই ঘুরেছি, কিন্তু নয়নার শাড়ি পছন্দ হয়নি। নয়নাকে যে শাড়ি আমি দেব সে তো নিছক একটি শাড়ি মাত্র নয়। তা আমার ভালবাসার সুতো দিয়ে বোনা, তাতে যে আমার দুঃখের পাড় বসানো— সে শাড়ির আঁচলার জরিতে যে আমার অনেক অবুঝ চাওয়া শরতের আলোয় জ্বলবে ! সে শাড়ির সমস্ত মসৃণতায় আমি যে আমার নয়নাসোনার সমস্ত শরীরে মিশে থাকব, ছড়িয়ে থাকব। আমি যে জড়িয়ে থাকব।

অনেক বেছে বেছে শেষে পছন্দ হল একটি তসরের শাড়ি। শাড়ির মতো শাড়ি। আমার পুজোর ড্রয়িংস্-এর বেশ একটি মোটা অঙ্কই তাতে চলে গেল।

ভাগ্যিস গেল।

নইলে ও টাকায় আমার কী হত ? টাকায় কী হয় ? কারই বা কী হয় ? একটা সীমা— ন্যূনতম ভদ্রলোকি সীমায় পৌঁছনোর পর টাকায় কারই বা কী হয় ? ভালবাসার জনকে উপহার দেবার মতো মহৎ উপায় নষ্ট করা ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা থাকার মানে হয় না। আমি এ ব্যাপারে অনেক ভেবেছি। নিজের প্রয়োজন কোনওদিন মিটবে না। প্রয়োজনের শেষও হবে না। বাড়ালেই বাড়বে। তার চেয়ে নিজের প্রয়োজন সীমিত রেখে, যাদের ভালবাসি, তাদের জন্যে কিছু করতে পারলে আনন্দে বুক ভরে যায়।

যে টাকায় নয়নাকে শাড়ি কিনে দিলাম, সে টাকায় আমার একটি ভাল টেরিলীনের স্যুট হত। কিন্তু বিনিময়ে এ যে আমার কত বড় পাওয়া হল আমিই জানি।

নয়না যেদিন পুজোর মধ্যে ওই শাড়িটি পরে আমার সঙ্গে দেখা করবে, ওই শাড়িটি পরে যখন হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চাইবে, তখন আমি দশ-দশটি টেরিলীনের স্যুট-প্রাপ্তি আনন্দ পাব। সব আনন্দের মাপ কি একই কাটায় হয় ? এ আনন্দ অন্য আনন্দ। উদার আনন্দ। মহৎ আনন্দ !

পুজোর দিনে পুজোমণ্ডপে ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, ভোগের খিচুড়ি রান্নার গন্ধ, ঢাকের শব্দ, শিশুর কান্নার শব্দ, যুবতীর উচ্ছল হাসির জলতরঙ্গ, এবং বিধবার করুণ বিষণ্ণ নিস্তব্ধতার মাঝে মা দুর্গার সামনে নয়না এই শাড়ি পরে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন আমি ভাল-লাগার পবিত্রতায় নিস্তরঙ্গ হয়ে যাব। তখন আমি নয়নাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চাইব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চান-করা খোলা চুল ওর পিঠময় ছড়িয়ে থাকবে। ওকে আমি নিচু হয়ে প্রণাম করব। ও বলবে, আঃ কী করছেন ঋজুদা! ওকে আমি প্রণাম করব, মা দুর্গাকে প্রণাম করব, সেই পুজোর সকালকে প্রণাম করব, আমার সুগন্ধি ভালবাসাকে প্রণাম করব। কী করে হবে জানি না, সেই মুহূর্তে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে নয়নাকে মায়েরই অন্য এক রূপ বলে আমার মনে হবে। সেই সকালে নয়নার কাছে আমি সস্তা কিছু চাইব না। শুধু মনের সুগন্ধ চাইব, শুধু নিচু হয়ে মাথা নত করে প্রণাম করতে চাইব। নিজেকে ছোট করে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে, ধুলো করে মায়ের সামনে নিজেকে জানার চেষ্টা করব।

আজ মহাষ্টমী। স্নান করে জাস্টিস্ মুখার্জীর বাড়ির পুজোমণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে এসেছি। এখন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিজের ঘরে বসে আছি। ভাবছি, কী করা যায়। যতিদের বাড়ি পুজো হয়। দুপুরে যেতে বলেছে। খেতে বলেছে। পুজোর পরই ওরা ক'দিনের জন্যে হাজারিবাগে যাচ্ছে শিকারে। অনেকবার যেতে বলেছে আমায়। সুগতও যাচ্ছে। রঞ্জনও যাবে। ভাবছি, ঘুরেই আসি। অনেকদিন যাই না জঙ্গলে। ঘোড়ফরাসদের সঙ্গে কথা বলি না। টুঙি পাখির শিস শুনি না। কালি-তিতিরের ডাক শুনি না। মাদলের আওয়াজ শুনি না। মানে, অনেক কিছু অনেকদিন দেখি না, শুনি না ; গন্ধ নিই না। অতএব যাব।

সুগতকে একটি ফোন করলাম। বললাম, যতির বাড়ি এসো। কথা আছে। আমিও হাজারিবাগ যাচ্ছি।

ও বলল, খুব ভাল কথা। এগারোটা নাগাদ চলে এসো। আমিও পৌঁছচ্ছি।

ফোন রেখে দিলাম।

এমন সময় দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কে যেন আমার ঘরের খোলা দরজায় দু'বার টোকা দিল।

চেয়ে দেখি, পর্দার নীচে ফলসা-রঙা শাড়ির ঝালর দুটি পা—খালি পা। এ পায়ের পাতা আমি চিনি। এ পায়ের পাতা অনেক রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি।

নয়না বলল, আসতে পারি ?

উঠে বললাম, এসো এসো, আমার কী সৌভাগ্য !

ও ঘরে ঢুকল। একটু হাসল, তারপর আমার লেখার টেবলের সামনের চেয়ারে বসল।

বলল, মিনুদির সঙ্গে দেখা করে এলাম। উনি এক্ষুনি বেরুচ্ছেন। কাকিমাও দক্ষিণেশ্বরে গেছেন।

হুঁ। ভাগ্যিস গেছেন। নইলে কি রাধারাণীর পা আমার ঘরে পড়ত ?

পড়ত না ?

না।

কী করে জানলেন ?

জানি।

ও উত্তরে কিছু বলল না। আমার দিকে চেয়ে থাকল চুপ করে।

বললাম নোড়ো না। চুপ করে বোসো। তোমাকে আশ মিটিয়ে দেখি। পর্দাগুলো সরিয়ে দি—ঘরটা আলোয় ভরে থাক। তোমার আলোয়।

ও, কথা না বলে, আমার পর্দা সরানো দেখতে লাগল।

পর্দা সরাতে আমাকে ওর কাছে যেতে হল। ওর গা দিয়ে নতুন তাঁতের শাড়ির গন্ধ বেরুচ্ছে—। নতুন ব্লাউজ পরেছে— চুলের তেলের গন্ধ এবং নতুন শাড়ি-জামার গন্ধ মিলে ওকে কেমন নতুন নতুন লাগছে।

আবার এসে বসলাম মোড়াতে।

ও পা দু'টি জোড়া করে সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে।

চুপ করে আমি ওর পায়ের পাতার দিকে চেয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী দেখছেন ? অসভ্যর মতো ?

তোমার পায়ের পাতা। আমায় একটু ধরতে দেবে ?

ও উত্তেজিত হয়ে বলল, না। না। দেখতেও দেব না। বলেই শাড়ির পাড়ের আড়ালে পা ঢেকে নিল।

বললাম, তুমি এত কৃপণ কেন ? পায়ের পাতা তো ভিখিরিকেও লোকে ধরতে দেয়। তুমি আমার সঙ্গে এমন করো কেন ?

আপনি ভিখিরি নন বলে !

আমি তবে কী ?

কী, জানি না। তবে ভিখিরি নন।

নয়নার চোখে এমন একটি ভাব দেখলাম, যেন ও আমার এই পাগলামি দেখে কষ্ট পাচ্ছে। যেন ও আমাকে কিছুই যে দিতে পারল না, এই পুজোর দিনে, যে দিনে ভিখিরিরাও ভিক্ষে পায়, সে দিনে আমার এই সামান্য চাওয়াও ও পূরণ করল না— আমাকে এমন করে ফেরাল বলে, মনে হল, যেন ও দুঃখ পাচ্ছে।

আমি কিছু বললাম না। ওর অপমান এখন আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ও-ও আর কিছু বলল না। চুপ করে মুখ নামিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ পর আমার টেব্‌লে যে লেখাটি পড়ে ছিল সেটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বলল, এটা কী লিখছেন ?

তোমাকে নিয়ে যে গল্প লিখব বলেছিলাম, মনে আছে ? সেই গল্প লিখছি।

যে-কোনও অন্য মেয়ে হলে উল্লসিত হয়ে উঠত। কিন্তু আমি আমার নয়নাকে চিনি। ও কিছুই করল না। আমার দিকে একবার চাইল, যেন বলতে চাইল, এ আবার কী নতুন পাগলামি ?

শুধোলাম, তোমার নিজের কী নাম হলে তুমি সবচেয়ে সুখী হতে ? মানে, তোমাকে যদি তোমার নিজের নাম রাখতে বলা হত, তাহলে তুমি কী নাম রাখতে ?

ও ওর হাতের রুপোর বালাটা নাড়তে নাড়তে বলল, নয়না।

বললাম, বেশ। নায়িকার নাম তাহলে নয়নাই থাকবে। তোমার নিজের নামের নায়িকা হবে— তোমার ভয় করবে না ?

আমি তো বলেছি আপনাকে যে, আমি কাউকে ভয় করি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, গল্প গল্পই। গল্প পড়ে আবার আমাকে সলিসিটরের নোটিশ দিয়ো না যেন।

ও আমার কথা ঘুরিয়ে বলল, জানি, দেব না, কারণ গল্প গল্পই।

তারপর চুপ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

ওর দিকে চেয়ে ভাবলাম, এ গল্প সত্যি সত্যি লেখার হয়তো দরকার ছিল না। কিন্তু নয়নার প্রতি আমার ভালবাসা যে নিছক খেলা নয়, নিছক ছেলেমানুষী নয়, নিছক পাগলামিই নয়, নয়নাকে তা জানানো দরকার। নয়নাকে মুখে যা বলতে পারিনি, চিঠিতে যা লিখতে পারিনি, তা আমি এই গল্পে বলতে পারব। আমার যা ছিল, সব যে ওকে আমি দিয়ে ফেলেছি, তা ওর জানা দরকার। আমার এই অসহায়তা সম্বন্ধে ওর একটু ভাবা দরকার।

যখন রোজ একটি করে চিঠি লিখে নয়নাসোনাকে এবং তার বাড়ির অন্যান্যদের আমি আর বিব্রত করব না— তখন আমার এই বই নয়না হাতের কাছে রাখতে পারবে। কখনও যদি কোনও মেঘলা দুপুরে কি কোনও উদাস বাসন্তী রাতে কখনও ভুল্ করে তার এই পাগলকে মনে পড়ে, সে তখন আমার এই গল্পের দিল্‌রুবা নেড়েচেড়ে দেখবে। আমি মৃত্যুর পর যেখানেই থাকি না কেন, সে মুহূর্তে একটি সুন্দর কাঁচপোকা হয়ে জানালা দিয়ে উড়ে এসে সেই দিল্‌রুবার দুঃখের সুরে গলা মিলিয়ে নয়নার কানের কাছে গান গাইব। নয়না যদি আমাকে কোনওদিন একটুও ভালবেসে থাকে, তাহলে সেই মুহূর্তে সেই কাঁচপোকার করুণ কান্না সে ঠিক চিনতে পারবে। হয়তো আমার জন্যে তার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে এই বইয়ের উপরেই পড়বে।

www.BanglaBook.org

তাই, একে শুধু গল্পই বা বলি কেন ! এ যে অনেক কিছু। আমার জবানবন্দী।

নয়না বলল, গল্পের নাম ঠিক করেছেন ?

না। ভাবছি— হলুদ বসন্ত।

কেন ? আমার নাম কেন ?

বাঃ রে, তোমার গল্প, তোমার নামের নায়িকা, আর তোমার সোহাগী নামের নাম হবে না ? তুমি যে সত্যিই আমার হলুদ-বসন্ত পাখি।

সত্যি ? ওই নামের কোনও পাখি আছে ?

নেই ? ভারী সুন্দর পাখি। আমি ছোটবেলায় না চিনে একটি পাখি মেরেছিলাম। উড়িষ্যায়। এত কষ্ট হয়েছিল কী বলব। কী যে সুন্দর পাখি। হুবহু তোমার মতো।

জানি না। আপনি কী যে করছেন। কী সব লিখছেন। শেষকালে লোকে ভাবুক ভুল কিছু।

আমার বুকের মধ্যেটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। বললাম, লোকে কী ভাববে ? নয়না ঋজু বোসকে ভালবাসত ? তোমার কোনও ভয় নেই সোনা। লোকে তা ভাববে না। যা সত্যি নয়, যা আগাগোড়া মিথ্যা, তা তারা কেন ভাববে ? তারপর একটু থেমে বললাম, তোমাকে আমি কাঙালের মতো চেয়ে নিজেকে নিঃশেষ করেছি মাত্র। তুমি তো আমাকে কিছুমাত্র দাওনি, ভালবাসোনি, অন্যায় করোনি, তাই তোমাকে ভুল বোঝার কিছুই নেই এতে। তুমি বাস্তবে যেমন শীতল, নিষ্ঠুর এবং মহৎ, তোমাকে তেমনি করেই আঁকব।

আর আপনাকে ?

আমার মতো হীন, নীচ ও বঞ্চিত করে।

অনেকক্ষণ পর ও আমার চোখের দিকে সোজা একবার চাইল। তারপর আবার চোখ নামিয়ে নিল।

একটু পরে বললাম, কিছু খেয়েছ ?

হ্যাঁ। লেমন স্কোয়াস খেয়েছি।

আর কিছু খাবে ?

না। অনেক দেরি হল। এবার উঠি।

উঠবে ?

হ্যাঁ, আজ উঠি।

মনে হল, আমার সমস্ত আনন্দ, ওকে চোখের সামনে দেখার আনন্দ, ওকে সামনে বসিয়ে অনর্গল কথা বলার আনন্দ—সব আনন্দ শেষ হয়ে গেল।

বললাম, তুমি এলে বলে খুব ভাল লাগল।

আপনার কাছে আসতে আমারও খুব ভাল লাগে।

কেন ?

জানি না। হয়তো আপনার মতো এমন একজন বন্ধুর আমার খুব দরকার। এমন বন্ধু হয়তো আমার আর নেই বলে।

গেটের কাছে এসে বললাম, যাবে কীসে ? গাড়ি কোথায় ?

গাড়ি তো দাদা নিয়ে বেরিয়েছে। বাসে চলে যাব।

থাক। দাঁড়াও। বাসে যাব বললেই তো পুজোর দিনে বাসে যেতে পারবে না। আমি গাড়ির চাবিটা নিয়ে আসছি। পৌঁছে দেব।

ভাবলাম, তাও আরও দশটা মিনিট তো ওর সঙ্গে একা থাকতে পারব। ও জানে না, ওর উপস্থিতিটাই আমার কাছে একটা কতবড় পুরস্কার।

গাড়িতে নয়না বলল, ঋজুদা, আজ রাতে প্রতিমা দেখাতে নিয়ে যাবেন ? রাণী রাসমণির বাড়ির প্রতিমা নাকি খুব ভাল হয়েছে।

কখন যাবে ?

এই আটটা-নটা নাগাদ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ। আমি যাব। তুমি তৈরি হয়ে থেকো বাড়িতে।

আচ্ছা।

নয়নাকে নামিয়ে দিয়ে এলাম বাড়িতে।

১১

যতিদের বাড়ি শ্যামবাজারের কাছাকাছি।

সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে গাড়ি রেখে নামলাম।

পথে কত লোক। কত বেলুন, কত মেলা, কত হাসিখুশি শিশু, কত দুঃখভোলা দুখী। পুজোর ওই ক'টা দিনে ভারী ভাল লাগে। সব কিছু ভাল লাগে।

যতিদের বাড়ির সামনে বেশ বড় প্যান্ডেল হয়েছে। পুজো হচ্ছে ভিতরের চত্বরে। অ্যাম্প্লিফায়ারে পুরুতমশাই মন্ত্রোচ্চারণ করছেন।

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

যতিদের গেটের বাইরে, দিল্লী দেখো, বোম্বাই দেখো, কালকা গাড়ি, কোলকাত্তা দেখো হচ্ছে। চোঙাওয়ালা কলের গান বাজছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোল গোল চোঙে চোখ লাগিয়ে অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যাবলী চোখ দিয়ে গিলছে।

গান শুনে থমকে দাঁড়াতে হল। হেমন্ত মুখার্জীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বাজছে— 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে, ডাক দিয়ে সে যায়, আমার ঘরে থাকাই দায়'— কিন্তু রেকর্ডটি এমন স্পীডে বাজছে যে মনে হচ্ছে যেন ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস চলেছে। কোঁৎ কোঁৎ করে আওয়াজ বেরুচ্ছে।

পত্‌দিয়েকে। যায়গোচলে।
ডাক্ দিয়েসে। যায়—
আমার্। ঘরেথাকাই দায়।

সে এক বীভৎস আওয়াজ। একা একাই হাসতে লাগলাম। কলকাতার পথেঘাটে এমনি কত মজাই না আছে। বিনি-পয়সার মজা।

যতি 'এসো এসো' করে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। একটি ঘরে রঞ্জন সুগত ওরা সবাই গল্প করছিল। সে ঘরে নিয়ে গেল।

সুগত শুধোল, অঞ্জলি দিয়েছ?

দিয়েছি।

চলো আর একবার দেবে।

আরে নাঃ, খেয়েছি যে।

কী খেয়েছ?

চা।

আরে চা আবার খাওয়া নাকি?

চলো চলো। একা একা ভাল লাগে না।

অগত্যা যেতে হল।

ডাকের সাজের ঠাকুর। তেলতেলে মুখ। লাবণ্য চুঁইয়ে পড়ছে। চোখ দুটি ব্যক্তিত্বসম্পন্না; চোখের দিকে চাইলে মনে হয়, এ দেবীর কাছে ভরসা করে কিছু চাওয়া যায়— চাইলে হয়তো পাওয়া যাবে।

ফুল বেলপাতা হাতে নিয়ে পুরুতমশাইর সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম। কেন হয় জানি না, এই মন্ত্রের মধ্যে কী যেন যাদু আছে—একবার দু'বার বললেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে; নাভির কাছটা পিন্‌পিন্ করে ব্যথায়, মনে হয় যেন যুগযুগান্ত ধরে এমনি ভক্তিভরেই পুজো করে আসছি।

www.BanglaBook.org

তিন তিনবার অঞ্জলি দেবার পর— সকলে মাথা নিচু করে গড় হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। আমিও মাথা নিচু করলাম। কিন্তু মায়ের কাছে কী কামনা করব ভেবে পেলাম না। নয়নার মুখটি মনে পড়ল। একটু আগে ও যখন আমার ঘরে বসে ছিল— সেই পুজোর সকালের শুচি-মুখটি মনে পড়ল। খুব ইচ্ছে হল বলি, ঠাকুর, তুমি আমার নয়নাকে কেবল আমার করে দাও— এ জন্মের মতো, বরাবরের মতো, আমার একার করে দাও। ও আমার ভালবাসা চিনতে পারুক।

কিন্তু পরক্ষণেই কী যেন হল! কোনও অদৃশ্য হাত যেন আমার মুখ চেপে ধরল। মনে হল, মা বছরে মোটে তিনদিনের জন্যে আসেন, তাঁর কাছে নিজের জন্যেই চাইব শুধু? সে বড় স্বার্থপরতা হবে। তার চেয়ে কামনা করি, নয়না আমার সুখী হোক, দশজনের একজন হোক, যে ভাবে ও সুখী হতে চায়, সে ভাবে হোক। ও বাংলাদেশের সেরা মেয়ে হয়ে উঠুক। এবং এই কামনা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যে মাঝে মাঝে উদারও হতে পারি, সবসময় যে হ্যাংলামি করি না, এইটে জানামাত্র ভীষণ গর্বও হতে লাগল। ভারী ভাল লাগতে লাগল। মহাষ্টমীর সকালটা যে অভীষ্ট সিদ্ধির সকাল নয়, এ যে মঙ্গলকামনার সকাল, এইটে ভেবেই ভীষণ আনন্দ হল। আমিও মাঝে মাঝে বড় হতে পারি। এ জানা যে কত বড় জানা, সে কী করে বোঝাব!

অঞ্জলি দিয়ে ফিরে এসে, সকলে মিলে সেই ঘরে গুলতানি শুরু হল। সুগত বলল, তাহলে আমাদের যাওয়া ঠিক। কী বলো যতি?

নিশ্চয়ই। পাক্কা!

যতি বলল, ঋজুদাকে বোলো না, ও খালি দর বাড়ায়। আর যেন কেউ কাজ করে না।

বললাম, কাজ করবে না কেন? এমন চাকরি তো কেউ করে না। করলে বুঝতে।

যাঃ যাঃ, তোর খালি বাজে কথা। রঞ্জন বলল।

বুঝলাম। তা যাবে ঠিক কোন জায়গায়?

হাজারিবাগ। সেখান থেকে কুসুম্‌ভা। ক্যাম্প করা যাবে।

তার মানে বেড়ানো। বিগ-গেমস্ তেমন কিছু হবে না।

বাঃ, হবে না কেন? গত বছরই সুগত একটা কোটরা মারল ছুলোয়াতে। শুয়োর আছে অনেক। তাছাড়া পাখির প্যারাডাইস্। চিতাও বেশ আছে।

যতি বলল, সুগতদা তো কালি-তিতির ও মুরগি আর রাখেনি ওখানে। সব শেষ।

সুগত বলল, এমন বাড়িয়ে বলিস না, মানে হয় না।

আমি বললাম, বেশ চল। শিকার হোক চাই নাই হোক, তিন-চার দিন জঙ্গলে থাকা তো হবে। কুসুম্‌ভা আমার বড় ভাল লাগে। তাছাড়া আমাদের ছোটবেলার কত স্মৃতি ছড়ানো আছে ওখানে— কী বলো সুগত?

যা বলেছ। মনে আছে ঋজু, সেই বর্ষার রাতে ধানক্ষেতে কাড়ুয়ার সঙ্গে ছোটবেলায় খরগোস মেরে বেড়ানো?

বললাম, আছে, আর মনে আছে, সেই রাত আড়াইটে নাগাদ মেঘ ফুঁড়ে পানুয়ানা টাঁড়ের দিকের আকাশে কেমন চাঁদ উঠল?

সুগত বলল, মনে নেই? কী বলো! ও চাঁদের কথা আমি জীবনে ভুলব না।

রঞ্জন বলল, রেমিনিসেন্স ছাড়— তাহলে আমরা যাচ্ছি?

যতি বলল, হ্যাঁ, তা তো যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে নিয়েই ভয়। মনে আছে গৌরী-কারমার কাছে সেবারে কার পোষা শুয়োর মেরেছিলে জংলি ভেবে? কী কেলেঙ্কারী!

রঞ্জনের এটা বড় দুর্বল স্থান। চটে গিয়ে বলল, যাঃ যাঃ, ওরকম সকলেরই দু'একবার ভুল হয়। ঋজুকে জিজ্ঞেস কর-না, কার সঙ্গে গিয়ে ও মীর্জাপুরে শম্বর ভেবে পা-বাঁধা ঘোড়াকে গুলি করেছিল। আমার বেলাই তোদের যত সব মনে থাকে।

অনেকদিন পর জমিয়ে আড্ডা মারা হল। ঠিক হল, বিজয়াদশমীর একদিন পর ভোরে আমরা হাজারিবাগের দিকে রওনা হচ্ছি। যতির জীপেই যাওয়া হবে। আমি, যতি, রঞ্জন সুগত। হাজারিবাগে এক রাত সুগতদের বাড়ি কাটিয়ে পরদিন ভোরে কুসুম্‌ভা। কুসুম্‌ভায় তিন-চার দিন

www.BanglaBook.org

থেকে আবার ফেরা হবে কলকাতায়।

নয়না বলেছিল রাত আটটা-নটা নাগাদ যেতে। সাড়ে আটটা নাগাদ ওদের বাড়ি গেলাম। দেখলাম নয়না নেই। ওর দিদি ময়নাদি সেজেগুজে বসে আছে। ময়নাদি এ ক'বছরে যা মোটা হয়েছে তা বলার নয়। অথচ বিয়ের আগে দারুণ ফিগার ছিল। বাঙালি মেয়েরা যে কেন এমন হয় জানি না। চা-বাগানেও দেখেছি, সাহেব ম্যানেজারের স্ত্রীরা সারা দিন বাগান করছে, রান্না করছে, ঘরের কাজ করছে, আর বাঙালি ম্যানেজারের স্ত্রীরা দিনরাত ঢাউস বস্তার মতো খাটে-বাঁধা অবস্থায়, বেঁকে শুয়ে, হয় ঘুমোচ্ছে, নয় নভেল পড়ছে। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। নয়নাও হয়তো বিয়ের পর এরকম হয়ে যাবে। ঈস্‌, ভাবা যায় না।

শুধোলাম, নয়না নেই?

না। ও একটু পুজো মণ্ডপে গেছে। এক্ষুনি আসবে। তোমাকে বসতে বলে গেছে।

আপনি একা যে? দিলীপদা কোথায়?

আর বলো কেন ভাই? ছুটির মধ্যেও কাজ করে বড়সাহেবকে প্লিজ করছে।

মনে মনে বললাম, এই রকম করে রোজগার-করা টাকার তৈরি বাড়ি যেন ধ্বসে যায়। কোনও মানে হয়?

ভাবছি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

অবাক হলাম; বললাম, কোথায়?

প্রতিমা দেখতে!

হেসে বললাম, বেশ তো! খুব আনন্দের কথা।

কিন্তু মনে মনে নয়নার উপর এমন রাগ হল যে কী বলব। ও কি জানে না যে, ও একটু একা আমার সঙ্গে থাকলে আমার কতখানি ভাল লাগে? আমি কি ওদের ড্রাইভার যে, পুজোর দিনে ওর মোটা দিদিকে প্রতিমা দেখিয়ে বেড়াব? তাছাড়া সুজয় ওয়ার্থলেস্‌টা কী করছে? সে নিশ্চয়ই ইয়ারদোস্তী নিয়ে আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। আর আমারই যেন কোনও বন্ধু-টন্ধু থাকতে নেই; তাদের সঙ্গে যেন আমি আড্ডা মারতে পারতাম না। রাগে গা-জ্বালা করতে লাগল।

এমন সময় নয়না এল। সঙ্গে নীতীশকে নিয়ে।

আব্দারে গলায় বলল, ঋজুদা, নীতীশদাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব কিন্তু।

জোর করে হাসলাম, বললাম, বেশ তো। ভাল কথা।

এ যাত্রা নীতীশের অগস্ত্য যাত্রা হলেই ভাল হত। কী কুক্ষণেই আমি আজ এখানে এসেছিলাম! যদিও বা ময়নাদিকে সহ্য করা যেত— তার উপর নীতীশ— সোনায় সোহাগা! অল-অল-পার্সনস্‌ নীতীশ। নীতীশ সেন।

সত্যি, নয়না কী ভাবে আমাকে? আমি ওকে ভালবাসি বলে কি ও মনে করে, ও আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করাবে? ও বললেই বা আমি করব কেন? মহাষ্টমীর সন্ধেটাই আমার মাঠে মারা গেল। নীতীশ সেনের ড্রাইভার হয়ে প্রতিমা সন্দর্শনে যাব। দরজা খুলে সাহেব মেমসাহেবদের নামাব-ওঠাব। ভাবতে পারি না। আমি যথার্থই একটি কুকুর।

আমাকে দেখে নীতীশ দেখানো বিনয়ের হাসি হাসল।

বলল, কেমন আছেন?

এই চলে যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। আপনি?

ভাল আছি।

ছুটি ক'দিন?

দশমীর পরের দিনই চলে যাব সকালের প্লেনে।

বললাম, আমি গত মাসে গেছিলাম একবার শিলঙ। আপনার ঠিকানা ছিল না, তাই দেখা করতে পারিনি।

ওহোঃ, আগে জানলে খুব ভাল হত। আমাদের কোম্পানির গেস্ট-হাউসে থাকতে পারতেন।

বুঝলাম, চাল দেখাচ্ছে। কেন? আমার কি থাকবার জায়গা নেই?

www.BanglaBook.org

বললাম, আমি পাইন্-উডে ছিলাম।

বলল, ওঃ তাহলে তো কথাই নেই।

নয়না ভিতর থেকে ফিরে এসে বলল, চলুন যাওয়া যাক।

সবাই গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

বলবার কিছু নেই। আমি গাড়ি চালাচ্ছি। নীতীশ সেন আমার পাশে। সেই জীবনানন্দ দাশ নাটোরের বনলতা সেনকে ভালবেসেছিলেন, আর আমি শিলঙের নীতীশ সেনকে ভালবেসেছি— মধ্যে বেবাক সমুদ্দুর। একটি ট্রাফিক পুলিশ আচমকা হাত তুলল। কোনওক্রমে ব্রেক কষলাম। ভিতরে ভিতরে ভীষণ টেন্সনে ছিলাম। আমি মেজাজ দেখালাম। সে কী একটা বলল। আমি ওকে অগ্রাহ্য করে গাড়ি চালিয়ে দিলাম— ব্যাটা নম্বর নিল।

আজকালকার লিটল-লার্নিং-ডেঞ্জারাস্ কনস্টেবলদের কিছু বলেও পার পাবার উপায় নেই। তত্ত্বকথা শুনিয়ে দেবে। আগেই ভাল ছিল। এক গাল হেসে বলতাম "গল্‌তি হো গ্যয়া পাঁড়েজী"। পাঁড়েজী গোঁফ ঝুলিয়ে, গাল ফুলিয়ে বলত, "ঠিক্কে হ্যায়, গল্‌তি সব্‌হিকা হোতা। ফিন গল্‌তি মত্ কিজীয়ে"।

নীতীশ মন্তব্য করল, কলকাতায় গাড়ি চালানো আজকাল—সত্যি ডিস্‌গাস্টিং। ভীষণ স্ট্রেন হয়।

পেছন থেকে নয়না বলল, এমন কিছুই না। ঋজুদা একটুতে রেগে যান। বড় অধৈর্য উনি। এ জন্যে আরও বেশি স্ট্রেন হয়। তাছাড়া বললে কী হবে ঋজুদা, আপনি বেশ জোরে গাড়ি চালান।

ময়নাদি বললেন, তোর দিল্লীপদা কিন্তু খুব সাবধানী। বলেন, শহরে কুড়ি মাইলের বেশি জোরে গাড়ি চালানোই উচিত নয়। উনি কিন্তু খুব আস্তে আস্তে গুটি-গুটি করে গাড়ি চালান।

এমন রাগ হল যে, ইচ্ছে হল বলি, গুটু-গুটু বাবুর বাবা বোধহয় গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ছিলেন। নইলে গুটু-গুটু বাবু অমন ঈশপ ফেবলের কচ্ছপের মতো চলবেন কেন?

জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। বেশ ভিড়।

চত্বরে ঢুকলাম।

নয়না এই রাতে আমার-দেওয়া শাড়িটি পরেছে। আমাকে নিঃসন্দেহে সম্মানিত করেছে। নইলে, মহাষ্টমীর রাতে আমার দেওয়া শাড়ি পরত না।

নয়না আর নীতীশ আগে আগে চলেছে।

নীতীশ একটি সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছে, আর ধুতি। পান খেয়েছে। হিরো-হিরো তাকাচ্ছে। যাচ্ছে, যেন রাজকুমার। ছেলেটা সত্যিই আমার চেয়ে দেখতে অনেক ভাল। ভগবানই আমাকে মেরে রেখেছেন। আমার চেহারা ভাল হলে কি আর নয়না আমাকে এমন করে ব্যথা দিতে পারত? একটু না একটু ভাল বাসতই।

নয়নাকে খুব খুশি খুশি লাগছে। নয়না ওর খুব কাছ ঘেঁষে হাঁটছে। দুজনে কী যেন বলাবলি করছে— নয়না হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে— নীতীশ বাধ্য-বেড়ালের মতো ওর কথা শুনছে— ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি না— ঢাকের শব্দে সব কথা ডুবে যাচ্ছে। ময়নাদি আমার পাশে পাশে আসছিলেন। হঠাৎ বললেন, এই ঋজু, অত তাড়াতাড়ি যেও না। আমি হারিয়ে যাব।

দাঁড়ালাম।

বেশ বললেন ময়নাদি। উনি যেন ছুঁচ। হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নয়না আর নীতীশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

আমি যে আছি— আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেছে নয়না, মনে হচ্ছে। খুশিতে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে আছে। দুধলি হাঁসের মতো সুখের জলে বিলি কাটছে।

বেশ লাগছে কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়ানো ওদের দুজনকে।

নয়নার সরু কোমর, চুড়ো করে বাঁধা চুল, চমৎকার মরালী-গ্রীবা।

নীতীশের সুন্দর, দীর্ঘ চেহারা, ধবধবে রঙ, সব মিলিয়ে চমৎকার মানিয়েছে।

পরমুহূর্তে সংবিৎ ফিরে এল। চমকে উঠলাম।

www.BanglaBook.org

আমি কি নয়নার দাদু যে, নাতনি-নাতজামাইকে জোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আহ্লাদে আহা-আহা করছি ?

এতদিনে নিজের শত্রু নিজে চিনলাম না ?

শত্রুকে বাহবা দিচ্ছি।

আমার কপালে দুঃখ নেই তো কার কপালে আছে ?

এতক্ষণ ব্যাপারটা সীরিয়াস্‌লি ভাবিনি। হঠাৎ ঢাকের শব্দ, কাঁসরের শব্দ, আরতির নৃত্য থেমে যাওয়াতে—একটি নিবিড় ক্ষণিক নিস্তব্ধতা—যা একমাত্র অনেক লোকের ভিড়েই অনুভব করা সম্ভব, তা সারা চত্বরে, ঠাকুর ঘরে, প্রত্যেকের মনে মনে ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই একটি শিশু কেঁদে উঠল। একজন বৃদ্ধ থামে মাথা ঠেকিয়ে মা ! মা ! করে উঠলেন।

কিন্তু সেই একটি নিস্তব্ধ মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার ভিতরের সবকিছু ওই মুহূর্তটির মতোই নিস্তব্ধ, শীতল, ভ্যাকুয়াম হয়ে গেল। মনটা ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। নয়না আর নীতীশের কথা ভেবে। সত্যি সত্যিই আমার নয়নাসোনা আমাকে একটুও ভালবাসে না। এই কথাটি প্রতি মুহূর্তে জানি, নতুন করে বুঝতে পাই, তবু যেন কেন মনে ধরে বিশ্বাস করতে পারি না। যেদিন এ কথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করব সেদিন এ পৃথিবীর উপর, জীবনের উপর, সব আশা, সব ভরসা, সব ভালবাসা আমার চলে যাবে। আমি তখন এই আমি থাকব না। আমার কিছুই আর বাকি থাকবে না।

নয়না পেছন ফিরল। হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকল। চেঁচিয়ে বলল, ঋজুদা, হারিয়ে গেলেন কেন ? আসুন।

ভিড় ঠেলে আমি ওর দিকে এগোতে লাগলাম।

অনুক্ষণ তো আমি হারিয়েই যাই— ভাগ্যিস নয়না মাঝে মাঝে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে।

রঞ্জন বলল, এই যতি, কী হচ্ছে কী ? আস্তে চালা না ! জীপ উল্টে মারবি নাকি ?

মারবার মতো ড্রাইভার আমি নই।

সুগত বলল, তবু, মেটাল-ফেটিগ বলে একটা কথা আছে তো। এত জোরে চালাবার তোমার কী দরকার বাবা ?

দরকার কিছুই নেই। এমনিই চালাই। মজা লাগে বলে।

এবার গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে, বাগোদরে বাঁয়ে মোড় নিলাম। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কলকাতা থেকে বেরোতে বেরোতেই দেরি হয়ে গেছিল। এখন পথটা এঁকেবেঁকে চলেছে শালবনের মাঝে মাঝে। মাইল আট-নয় গিয়ে, কোনার ড্যাম, গোমীয়া ইত্যাদি যাবার পথ পড়বে বাঁয়ে। আমরা সোজা চলে যাব। টাটিঝারিয়া হয়ে হাজারিবাগ।

যাই বলো ঋজু, হাজারিবাগে এলেই আমাদের যেন কীরকম ভাল লাগে, তাই না ?

রঞ্জন বলল, যেন কী এক স্পেশাল ভাল-লাগা।

বললাম, আসলে আমরা এমন একটি বয়সে বন্দুক হাতে এখানের বনেপাহাড়ে পাগলামি করে বেড়িয়েছি যে, সে বয়সে সবকিছুকেই ভাল লাগত। চোখটা সবকিছুতেই রামধনু দেখত।

যতি বলল, এমন করে বলছ, যেন কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চুল্লির মধ্যে বসে কথা বলছ। তবে, সে বয়সটা সত্যিই ভাল বয়স। মানে, যে বয়সে কাক ডাকিলে কোকিল বলিয়া ভ্রম হয়, পরের বোনকে নিজের বোন অপেক্ষা অধিক সুন্দরী বলিয়া মনে হয়। সেই বয়স।

তুই বড় ফাজিল হয়েছিস যতি। বড়দের সামনে কী করে কথা বলতে হয় জানিস না।

যতি একটি হেয়ারপিন-বেন্ড নেগোশিয়েট করতে করতে বলল, প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষেণ...

রঞ্জন বলল, তোর আজকাল সত্যিই বেশি জ্ঞান হয়ে গেছে।

যতি ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, শাস্ত্র পড়েছো ? শাস্ত্রে লিখেছে, অজ্ঞানকে জ্ঞান দিবে।

www.BanglaBook.org

হনুমানকে কলা খাওয়াইবে।

অনেকক্ষণ একটানা টপ গীয়ারে জীপ চলছে গোঁ গোঁ করে বাঘের বাচ্চার মতো। সুগতটার ঝিমুনি মতো এসেছে। মাঝে মাঝে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঝিমিয়ে নিচ্ছে। হেডলাইটের আলোটা লাফাতে লাফাতে চলেছে গাড়ির আগে আগে।

হঠাৎ সুগত ঘুম ভেঙে চেঁচিয়ে উঠে বলল, আরে থামো থামো। চলেছ কোথায় ? টাটিঝারিয়া পেরিয়ে এলে যে।

চা খাবে না ?

যতি কুতকুত করে হেসে উঠল। বলল, দাদার ঘুমটা ভালই এসেছিল। তুমি কি খোয়াব দেখছ ? টাটিঝারিয়া নয় ওটা। টাটিঝারিয়া সামনে। দাঁড়াব নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডায় আমার হাত জমে গেছে। স্টিয়ারিং ধরতে পাচ্ছি না।

বললাম, সত্যি কথা। তুমি একটানা চালাচ্ছ যতি অনেকক্ষণ। এবার আমায় দাও।

ও বলল, চলো টাটিঝারিয়া অবধি। এসে গেছি। তারপর নিও।

টাটিঝারিয়ার পণ্ডিতজীর দোকানে চা খাওয়া হল। আর ছোট ছোট চৌকো-চৌকো নিম্‌কি। দোকানে শুনলাম, এই রাস্তায় এগারো মাইলের মাথায় একটি বড় বাঘকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে রাস্তা পার হতে।

যতি বলল, ঋজুদা, রাইফেলটা বের করে রাখি ? যদি পাওয়া যায় পথে।

রঞ্জন বলল, থাম্ তো তুই। এ রকম কত রাস্তা-পেরুনো বাঘের গল্প শুনলাম এ পর্যন্ত। কারও সঙ্গেই তো কখনও দেখা হল না। বাঘ তোর মতো বরিশালিয়া কিনা যে, হাটখোলায় বসে কীর্তন গাইবে।

যতি টিপিকাল বরিশালিয়ার মতো উত্তেজিত হয়ে বলল, এই তো তোমার দোষ। রসিকতা করো করো, কিন্তু বদ-রসিকতা কেন ?

এখন জীপ চালাচ্ছি আমি। কেন জানি না, আমার হাতে থার্ড গীয়ারটা মোটে বসছে না। কেবলি স্লিপ্ করছে। যতি পেছন থেকে ডিরেকশন দিচ্ছে— হ্যাঁ, পুরো ক্লাচ করো, একটু উপরে ঠেলে ফেলো লিভারটাকে,—হ্যাঁ। এমন সময় ও-পাশ থেকে একটি ট্রাক আসল। স্পীড কমালাম। সেকেন্ড গীয়ারে দিলাম— আবার থার্ড গীয়ারে দিতে গেলাম এবং আবার সেই গণ্ডগোল— এবং সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন ফিসফিস করে বলল, চোখ, চোখ—বাঘের চোখ !

এদিকে গীয়ার ফাঁসার উপক্রম। কোনওরকমে ম্যানেজ করলাম। অ্যাক্সিলারেটর একদম ছেড়ে দিলাম— এমন সময় আমিও দেখলাম, জীপের হেডলাইটে পথের ডানদিকে শালবনের আড়ালে এক জোড়া লাল বড় চোখ জ্বলজ্বল করছে। দেখতে দেখতে, জীপ গড়াতে গড়াতে প্রায় তার কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

আরে, এ যে সত্যি সত্যিই বাঘ। রীতিমতো বড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বেশ কায়দার সঙ্গে, কলার তুলে আস্তে আস্তে রাস্তা পেরোল। ডানদিক থেকে বাঁয়ে। বন্দুক রাইফেল সব পেছনে বাক্স-বন্ধ। তার উপরে যতি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছে।

বাঘটা রাস্তা পেরিয়েই, একটি বড় লাফ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

বাঘটা অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে, যতি অদ্ভুতভাবে খিক্‌খিকিয়ে হাসতে লাগল। সে এক বিচিত্র হাসি। তারপর রঞ্জনের কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, কী হে সবজান্তা, বাঘ হাটখোলায় কীর্তন গায় কি না দেখলে ? তোমাদের দ্বারা শিকার-টিকার হবে না। তোমরা বেহালা বাজাও। এমনভাবে বন্দুক প্যাক করে রেখেছ যে বন্দুকের বাক্স না বেহালার বাক্স, বোঝে কার সাধ্যি।

সত্যি সত্যিই ব্যাপারটার অভাবনীয়তায় আমরা সকলে অবাক হয়ে গেছিলাম।

সুগত বলল, তোমাকেও বলিহারি যাই ঋজু, আর একটু হলে তো বাঘের লেজে বাম্পার ঠেকত। অত কাছে যাবার কী দরকার ছিল ?

বললাম, আমি কি ইচ্ছে করে গেছি ? মুখ নিচু করে ভাল করে গীয়ারটাকে নিরীক্ষণ করছিলাম। ইতিমধ্যে গাড়ি গড়িয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

যতি বলল, একটু হলে ঝুলিয়েছিলে। নিরস্ত্র অবস্থায় বাঘের থাপ্পড় খাবার মানে হয় ?

রঞ্জন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তা যা বলেছিস। হাতে বন্দুক থাকলে ব্যথা কম লাগত।

হাজারিবাগের আলো দেখা যাচ্ছে। কন্‌হারি— সিলাওয়ার আর—সীতাগড়ার পাহাড় ঘেরা হাজারিবাগ। যত বার আসি, তত বার নতুন করে ভাল লাগে !

গয়া-রোডে সুগতদের বাড়ি। চমৎকার। ছবির মতো। খিদমদগার চমনলাল বুদ্ধিমান লোক। ইচ্ছে করলে কানে শোনে, নইলে শোনে না। খিচুড়িটা দারুণ রাঁধে। হাসিটা কর্ণমূলে পৌঁছনো এবং নয়নাভিরাম।

পরদিন ভোরে উঠেই এককাপ করে চা খেয়ে কুসুম্‌ভার দিকে বেরিয়ে পড়া গেল। বড়কাগাঁও রোড দিয়েও যাওয়া যায়— সীমারীয়া যাবার রাস্তা দিয়েও যাওয়া যায়। যখন আমাদের কারওই কোনও বাহন ছিল না— তখন সীমারীয়ার পথে বানাদাগ অবধি আমরা সাইকেল-রিক্সায় চড়ে আসতাম— কিচিং কিচিং করতে করতে। তারপর ঝুলি-ঝালা নিয়ে পায়দল মারতাম খোয়াই ভেঙে শালবনের পথ দিয়ে। অনেকখানি পথ।

পথে বোকারা নদী পেরুতে হত। নদীর বালুরেখায় কোটরা হরিণ খেলা করত। বহুদূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই পালাত। পথের বাঁ-দিকের ঝাঁকরা অশথগাছে বড় বড় জীরহুল ফুলের মতো জাঙ্গীলেরা শীতের সকালের রোদ পোয়াত। টাঁড় থেকে কালি-তিতির ডাকত। সিরকার দিক থেকে বনমোরগ ডাকত কঁকরক্ক—কঁ-কঁ-কঁ-কঁ। ভারী ভাল লাগত। হাঁটতে হাঁটতে দূরে কুসুমভার মাটির ঘরগুলি চোখে পড়ত। পুরনো নিমগাছটি। বনদেওতার থানের বটগাছটি। নয়াতালাও-এর উঁচু পাড়।

কাড়ুয়া ছাগল চরাত গ্রামের সীমানায়। টিকি দুলিয়ে দৌড়ে আসত। ওর ভাই আশোয়া আসত। নাগেশ্বরোয়ার ঘরে, নিমগাছের তলায় আমাদের আস্তানা হত।

পুরনো রাস্তা বেয়ে আমরা জীপে করে যাচ্ছি। রাস্তা অবশ্য খুবই খারাপ। তবু, যে সময়ে আমরা এখানে হেঁটে আসতাম, সে সময়ে কোনও গাড়ি যে এখানে আদৌ আসতে পারবে তা ভাবাই যেত না। এখন গ্রামের অনেক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু সে প্রশান্তি যেন আর নেই। নেই সেই নিস্তব্ধ নিরুপদ্রবতা। কেমন শহর-শহর ভাব হয়ে গেছে। নাগেশ্বরোয়ার ছেলে একটি ছাতার কাপড়ের কালো ড্রেইন্‌পাইপ পরে নিজেকে শাম্মী কাপুর মনে করে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। ভয় হল, এক্ষুনি না হাত পা ছুঁড়ে—

"ও হাসিনো জুলপোওয়ালো যানে যাঁহা—
ম্যায়ফিল্ ম্যায়ফিল্ হ্যায় শামা,
ম্যায়ফিল্ ম্যায়ফিল্ হ্যায় শামা..."

গান না জুড়ে দেয়।

সেই চিৎকারে হয়তো চকুতরার সব কবুতর চটপটিয়ে উড়ে যাবে। যে এক জোড়া রাজঘুঘু ঘুঘুর-ঘু করে ঘুমের গানের নূপুর বাজাচ্ছিল, উদাসী শিশিরভেজা হাওয়ায়—তারা ভয় পেয়ে যাবে। নয়াতালাও থেকে সবক'টি সল্লি হাঁস সর্‌সরিয়ে দ্রুত পায়ে জল সরাতে সরাতে, শরবনের আড়ালে মুখ লুকোবে। মানে, আমাদের সেই পুরনো কুসুম্‌ভা হারিয়ে যাবে।

তবু ভাল লাগে। কলকাতাটা যে কী ক্যাঁটকেঁটে নাইলন শাড়ি-পরা, ঠোঁটে রঙমাখা মেয়ের মতো অন্তঃসারশূন্যা, দরিদ্র, তা জঙ্গলে না এলে বোঝা যায় না। কুসুম্‌ভা আমার সেই পুরনো সুরাঙীয়া—আমার নয়নার মতো। যার কাছে এলেই নিজেকে স্নিগ্ধ, সুস্নাত মনে হয়।

কুসুম্‌ভায় এলেই, রাত কাটালেই আমি সুন্দর সুন্দর সব মৌসুমী ফুলের মতো স্বপ্ন দেখি। আমার ইচ্ছে করে আমার মতো নয়নাও স্বপ্ন দেখুক, ঘুমের মধ্যে কথা বলুক ; মাঝরাতের টুঙি পাখির মতো ভাললাগায় শিউরে উঠে, ও পীটি-টুঙ্ পীটি-টুঙ করে ঘুমের মধ্যে শিস দিয়ে উঠুক।

কুসুম্‌ভাতে দুদিন হয়ে গেল।

দুপুরে ছুলোয়া শিকার হল। কালি-তিতির, মুরগি, আসকল, তিতির, বটের, খরগোশ অনেক কিছু মারা হল। আমি কিন্তু মারিনি।

www.BanglaBook.org

নয়না আমাকে বারণ করেছিল। অনেকদিন থেকে ও এ বাবদে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে। পাখি মারা নিয়ে। বলেছিল, আপনি যে-পাখিই মারুন, জানবেন আপনি হলুদ-বসন্ত পাখিকে মারলেন। তারপর থেকে নিজে পাখি মারতে পারিনি আর।

সুগত বলেছিল, তুমি একটি ফার্স্টক্লাস হিপোক্রিট।

আমি ওকে বোঝাতে পারিনি।

আমি কখনও কারও কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারিনি। নিঃসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি। সুগতর মতো দু'একজন তাদের চোখে, তাদের বুদ্ধির প্রদীপ জ্বেলে আমায় আংশিকভাবে আবিষ্কার করেছে মাত্র। চিল্‌কার ছড়-পরিয়ায় একবার থার্টি-ও-সিক্স্ রাইফেল দিয়ে একটি কৃষ্ণসার হরিণ মেরেছিলাম। দূর থেকে। গুলিটি মেরুদণ্ডে লেগেছিল। হরিণটি ঝাউবনের বালিতে পড়ে ছটফট করছিল—কিন্তু উঠতে পারছিল না। কাছে দৌড়ে যেতেই দেখলাম দুপুরের রোদে রক্তমাখা হরিণটি খাবি খাচ্ছে। দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

কী হল জানি না। নিজের উপর বড় ধিক্কার জন্মাল। জলের বোতল খুলে তার মুখে গব্‌গব্ করে জল ঢালতে লাগলুম। ঘৃণায় কি অপারগতায় তা জানি না, সে আমার হাতের জল খেল না।

এমন সময় স্থানীয় উড়িয়া শিকারী, মার্কণ্ড এল—এসে আমায় ঠেলা দিয়ে সরিয়ে শট্-গান দিয়ে হরিণটির গলায় গুলি করল। একটু কেঁপে উঠে হরিণটি নিশ্চল হয়ে গেছিল।

তখনও সুগত আমাকে বলেছিল যে, আমি ভণ্ড। হয়তো ভণ্ড। কারণ, যে নিজের মনের সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতায় আস্থাবান নয়, তার এমন আংশিক নিষ্ঠুরতায় ভর করে প্রাণী হত্যা করা ঠিক নয়। আংশিক ভণ্ডামির চেয়ে সর্বৈব ভণ্ডামি শ্রেয়।

জানি না। আমি সত্যি সত্যি ভণ্ড কিনা জানি না। তবে যখন উড়ে-যাওয়া তিতির কি আস্‌কলের দিকে বন্দুক তুলি—নয়নার মুখটি মনে পড়ে যায়, সেই হলুদ কট্‌কি শাড়িপরা চেহারা—হলুদ-বসন্ত পাখির কথা মনে পড়ে। গুলি করতে পারি না। আমার আবাল্য অভ্যাস, আমার বাহাদুরি-প্রবণতার, প্রশস্তি-প্রাপ্তির সমস্ত প্রয়াস, তখন অসার্থক হয়। বন্দুকের দু-ব্যারেলের মাছির দুপাশে নয়নাসোনার কালো চোখদুটি ভেসে ওঠে। ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াতে পারি না। কিছুতে পারি না। আর বোধহয় কোনওদিন আমি পাখি হরিণ মারতে পারব না। সুগতরা আমায় ওদের দল থেকে তাড়িয়ে দেবে। ওরা আমার কথা বুঝতে পারে না—আমায় ঠাট্টা করে—বলে, নবদ্বীপে গিয়ে বোষ্টম হও। ওরা তো কেউ আমার মতো করে ভালবাসেনি কাউকে—কোনওদিন। আমায় তাই বোঝে না।

সন্ধে হয়ে গেছে। আগামী কাল কোজাগরী পূর্ণিমা। ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। একা একা পানুয়ানা-টাঁড়ের দিকের জংলি পথ বেয়ে হেঁটে আসছি। বেশ ঠাণ্ডা। দূরে গোন্দা-বাঁধের উঁচু পাড় একটি পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে। একদল নাক্‌টা হাঁস মাথার উপর দিয়ে চিঁউই-চিঁউই করতে করতে আকাশ সাঁতরে কোণাকুণি উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি যাচ্ছে ওরা গোন্দা-বাঁধের জলে—ঝুরুক্‌ঝারির ঝিল থেকে উড়ে আসছে। একটি টী-টী পাখি টীটীরটি-টীটীরটি করতে করতে পথের ডানদিকের জঙ্গলে ডেকে ডেকে উড়ছে। চিতা-টিতা দেখে থাকবে।

আজ টস করা হয়েছে। মাচায় বসবে যতি আর সুগত। সকালে জঙ্গলে একটি হরিণের ন্যাচারাল কিল খুঁজে পেয়েছি আমরা। চিতায় মেরেছে হরিণটিকে কাল রাতে। বিকেল থাকতে ওরা গিয়ে মাচায় বসেছে। রঞ্জন ভাল রাঁধুনে। মুরগি রান্নার তত্ত্বাবধানে রয়েছে ও কুসুম্‌ভাতে।

পথটি একটি টিলার উপর দিয়ে গড়িয়ে এসে বুরহি-করমের নদী পেরিয়ে সির্‌কার দিকে চলে গেছে। নদীর কালভার্টের উপর বসলাম। পাইপটা ধরালাম।

চমৎকার দুধ্‌লি রাত, সুগন্ধি রাত, নিরুপম নির্জনতার রাত। ভাবলাম এমন রাতে নয়নাকে ক্ষমা করা যায়। নয়না শুধু খুশি হোক। আমার মতো সামান্য অকিঞ্চিৎকর ছেলে এর চেয়ে বেশি কী আশা করতে পারে নয়নার মতো মেয়ের কাছ থেকে?

কালভার্টের তলা থেকে একটি বড় গিরগিটি বলে উঠল, ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। অমনি টী-টী পাখিটা কোত্থেকে জঙ্গল ফুঁড়ে ডাকতে ডাকতে কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে উড়ে আসতে লাগল। চিতাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি আমার দিকে আসছে ? আমি ভয় পেলাম। হঠাৎ আমার মনে হল এ কোনও শরীরী চিতা নয়, এ আমার ছদ্মবেশী অশান্ত কামনা। আমার এই মুহূর্তের সমস্ত মহত্ত্ব ও উদারতাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে বলে সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে ছায়ার আড়ালে আড়ালে। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। ও আমাকে মহৎ হতে দেবে না। ও আমাকে বরাবর এমনি একজন সস্তা, সামান্য, হীন, সাধারণ মানুষ করে রাখবে। আমি কোনওদিন নয়নার ভালবাসার যোগ্য করে তুলতে পারব না নিজেকে।

১৩

সবাই স্বপ্ন দেখে কিনা জানি না, তবে অনেকে দেখে। আমিও দেখি। আমার ধারণা সবাই স্বপ্ন দেখতে শেখেনি।

স্বপ্ন মানে—খুব যে একটা বিরাট কিছু তা নয়। অল্প একটু জমি, এই কাঠা দশেক হলেই চলে—তাতে একটি ছোট বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি। ইটালিয়ান ধাঁচের পোর্টিকোওয়ালা। ঘর থাকবে মোটে তিনটি—চারপাশে কাচ থাকবে—শুধু কাচ। প্রচুর জায়গা নিয়ে একটি স্টাডি। চতুর্দিকে বই। বই—বই—রাশীকৃত বই। এক কোণায় ছোট একটা কর্ণার টেবল—তাতে একটি সাদা টেবল-ল্যাম্প থাকবে। সেখানে বসে আমি লিখব। ফার্নিচার বেশি থাকবে না। পাতলা এক-রঙা পার্সিয়ান কার্পেট থাকবে মেঝেতে। একেবারে সাদা ধবধবে টাইলের মেঝে হবে। প্রতি ঘরে ঘরে রোজ ফুল বদলানো হবে। চারিদিকে চওড়া ঘোরানো বারান্দা থাকবে। থোকা থোকা বোগেনভিলিয়া লতায় চারদিক ভরা থাকবে। গেটের দু পাশে দুটি গাছ থাকবে—কৃষ্ণচূড়া নয়, রাধাচূড়া। কৃষ্ণচূড়া বিরাট বড়—ওই ছোট্ট বাড়িতে বিরাট কিছু মানাবে না। বারান্দায় রেলিং থাকবে। সাদা। রট আয়রনের। বাথরুমটা বেশ বড় হবে, যাতে নয়না গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে ঘুরে শাওয়ারের নীচে চান করতে পারে।

বসন্তকালে লনের চেরী গাছের নীচে বেতের চেয়ারে বসে চা খাব আমরা। আমি আর নয়না। কোনও ভিজে, সোঁদা-সোঁদা-গন্ধ-দিনে চাঁপা ফুলের গন্ধবাহী হাওয়ার সঙ্গে যখন ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়বে তখন সেই স্টাডিতে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে, কি কিছু লিখতে লিখতে আমি কফি খাব—আর নয়না একটা কালো মডার্ন ফ্রেমের চশমা নাকে দিয়ে বেশ ভারিক্কি গলায়, যেন শাসন করছে এমনভাবে, আমাকে বলবে—বেশি কফি খেও না, লিভারটার কি বারোটা বাজাবে ?

কিংবা কোনও গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে চেরী গাছের তলায় পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বসব। আমার নয়না স্নান করে, চুড়ো করে চুল বেঁধে সুগন্ধি স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা শরীর নিয়ে পাশে এসে বসবে। সুন্দর ছোট্ট ট্রেতে করে আমাদের চাকর (একমাত্র চাকর ; একটু কমবয়েসী, মানে ১৫-১৬ হলে ভাল হয়, খুব চটপটে হবে) চা নিয়ে আসবে। ট্রেতেও একটি ছোট্ট ফুলদানি থাকবে, স্যান্ডউইচের প্লেট—পাইপের টোব্যাকো, এ্যাসট্রে সবকিছু। শেষ সূর্যের ম্লান আলো এসে নয়নার গ্রীবা ছোঁবে। নয়নাকে ভীষণ সুন্দর দেখাবে। মেয়েদের সুন্দর না দেখালে আমার খারাপ লাগে। অসহ্য লাগে। নয়না একটু হাসবে। আমি বলব, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে তো। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি তুলে নয়না তখন সম্পূর্ণভাবে হাসবে। আমি ওর দিকে অপলক চেয়ে থাকব। দুজনে দুজনের চোখের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকব। ঝিরঝিরে হাওয়ায় রাধাচূড়ার ফিনফিনে পাতারা লনের ঘাসে নরম নিভৃত নিরুপদ্রবতার বাহন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে।

স্বপ্ন ভেঙে গেল। ফোনটা বেজে উঠল। অফিসে বসে স্বপ্ন দেখাটা খুব খারাপ। সব বুঝি, তবু অবাধ্য মনটা বোঝে না। ছোট ছেলের মতো স্বপ্ন দেখে, কল্পনার লাল নীল ল্যালিপপ চুষে চুষে খায়।

হ্যালো।

ঋজু বোসের সঙ্গে কথা বলতে পারি ? জড়ানো-জড়ানো গলায় কে যেন বলল।

কথা বলছি।

আমি যতি।

www.BanglaBook.org

কী ব্যাপার ? এত উত্তেজনা কীসের ?

উত্তেজিত হয়ে আছি তাই। 'অপারেশন চাইনিজ' সাক্সেসফুল।

মানে ?

মানে, ছ'দিন চাইনিজ খাওয়া অর্জন করলাম। আধ ঘণ্টা আগে লাভ ইন দ্য আফটারন্যুনের সঙ্গে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে আমার জিপ নিয়ে মুখোমুখি লড়ে গেলাম। জিপ নিয়ে বনেটের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে একেবারে সামনের সিটের নরম চামড়ার কুশানে।

উদ্বিগ্ন গলায় বললাম, ড্রাইভারের কী হল ?

কী আবার হবে ? হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বেশি আর কী হবে ? মরে যাবে। তার বেশি তো আর কিছু নয়। তবে ও জাগুয়ার গাড়ি বিধুমুখীর এ জন্মে আর চড়তে হবে না।

যতিটা একটা পাজি। এমনভাবে বলছে যেন সত্যি সত্যিই ড্রাইভারের জন্যে ওর কোনও ভাবনাই নেই।

তবু, খুশি হলাম। কেবল চাইনিজ নয়—তোমায় আর যা কিছু খেতে চাও খাওয়াব। তোমার কিছু হয়নি তো ?

বিশেষ কিছু নয়। পেছনের পাটির দু'খানা দাঁত ভেঙে গেছে। ভালই হয়েছে। ও দুটো দাঁতে পোকা বড় জ্বালাতন করত। তাছাড়া মাথা একটু কেটে গেছে—তিনটে স্টিচ্ করেছে। আমার জন্যে ভেবো না। ফাইন আছি।

যাক, তাও বাঁচোয়া, অল্পের উপর দিয়ে গেছে। কাল রাতেই চলো—বাইরে খাওয়া যাক।

কাল যেতে পারব না। আমি তো অ্যারেস্টেড। জামিনে খালাস পেয়েছি। এসব ঝামেলা পুইয়ে নিই—তারপর দিল খুস্ করা যাবে।

বললাম, শোনো। এসব খরচাখরচের একটা হিসেব-টিসেব রেখো। রঞ্জন কী বলছে ?

সে তো ন্যাকামি করছে এখন। বলছে, কী দরকার ছিল এত বাড়াবাড়ি করার ? ড্রাইভারটা যদি মরে যায় ? আচ্ছা তুমিই বলো, একটি দেড় লাখ টাকার গাড়ি ধ্বসোতে একটি লোক মরবে তাতে ন্যাকাকান্নার কী আছে ? আমি যে প্রাণে বেঁচে গেলাম—সে কথাটা একবারও বলছে না এখন।

বললাম, ও নিয়ে মাথা ঘামিও না, ও একটু নার্ভাস টাইপের—নিজেই হুজুগ তুলে এখন নিজেই পস্তাচ্ছে। যো হুয়া সো হুয়া। যো হুয়া আচ্ছাই হুয়া।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের অফিস সাড়ে পাঁচটায় ছুটি। তাছাড়া এই খবরটা শোনা মাত্র বেশ খুশি-খুশি লাগছিল মনটা। হাতটাকে মুঠো করলাম জোরে—আনন্দ হল—। শালা ! রোজ রোজ আমরা ভাঙা অ্যাম্বাসাডরে চড়ব, আর তুমি রোজ লাখ টাকার গাড়ি এনে ফুটুনি মারবে—ননীর পুতুল—বিধুমুখী আমার ! বেশ হয়েছে। বড় আনন্দ হয়েছে।

এই আনন্দ কীভাবে সেলিব্রেট করব বুঝতে পারছি না। নয়নাকে একটা ফোন করলে হয়। জাগুয়ারের ড্রাইভারটাকে একবার দেখতে যাওয়া দরকার। ওর চিকিৎসাপত্রর যেন কোনও ত্রুটি না হয়। মনে হচ্ছে মরবে না। মনে হচ্ছে যখন, তখন নিশ্চয়ই মরবে না।

নয়নার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে বেশ হয়। এই কলকাতায় কোন চুলোতেই বা আর বেড়াব। যেখানে যাব সেখানেই তো ফুচকাওয়ালা আর ট্রানজিস্টার আর কদাকার কদাকার মহিলারা। যাচ্ছেতাই যাচ্ছেতাই। তার চেয়ে নয়নাকে নিয়ে কোনও ভাল ছবি দেখতে গেলে হয়। নয়নাকে এই ঘটনা বা দুর্ঘটনা যাই হোক—এর কথা বলতেই হবে এবং এ কথা ওকে আজই—এক্ষুনি বলতে হবে। বললেই ও প্রথমে চোখ বড় বড় করে শুনবে, কৌতুকভরে বলবে, সত্যি ? তারপরই বকবে—ভীষণ বকবে। বলবে—ছিঃ ছিঃ, লেখাপড়া জানা বড় বড় ছেলেরা যে এরকম কাজ করতে পারে ভাবতে পারিনি। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আমাকে এক্ষুনি গাড়ি থেকে নামিয়ে দিন। এ তো মানুষ খুন করার সামিল। এরকম যদি আপনারা করতে পারেন, তো আরও অনেক কিছু করতে পারেন। ঈস, ভাবা যায় না। আপনার মতো ছেলেও···। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওকে শান্ত করতে নিঃসন্দেহে বেগ পেতে হবে। তবু আমার বিশ্বাস আছে ও শেষকালে ক্ষমা

www.BanglaBook.org

করবে। যতি ও রঞ্জনকে ও চেনে না—ওদের ক্ষমা করবে কি না জানি না—কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে যে, অবশেষে ও আমায় ক্ষমা করবে।

ফোনটা ডায়াল করলাম। সুজয়ের ওয়েস্ট জার্মানিতে যাওয়া ঠিক। কয়েক মাসের মধ্যেই যাবে! আজকাল বাড়িতে একটু-আধটু থাকে—ওরকম দিবারাত্রি আড্ডা মারা ছেড়েছে। ও-ই ফোনটা ধরল। বলল, নয়না তো নেই রে। নীতীশ কাল সকালের প্লেনে শিলঙ চলে যাচ্ছে—তাই নয়না আর ও সিনেমাতে গেছে। এলে কিছু বলব?

বললাম, নাঃ, এমনি! ছেড়ে দাও! তোমার সঙ্গে পরে দেখা করব। বলেই, ঝটাং করে ফোন ছেড়ে দিলাম।

নীতীশ। নীতীশ সেন। এই নামটা শুনলেই আমার শোণিতস্রোত উল্টো ঘুরতে শুরু করে। মিঃ সিধুর গাড়ি না ভেঙে ওকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম। কোনও শর্ট-গানে, এল-জি ভরে একটি ক্লীন লেগ-শট; অথবা, পয়েন্ট টু টু রাইফেল দিয়ে কানে মারা! মজা বুঝবে। ন্যাকা, মেয়েলি ভাল ছেলে, অসহ্য।

অফিস থেকে বেরুলাম। চৌরঙ্গীর মোড় পেরুলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল—মেট্রোর সামনে নয়না আর নীতীশ রাস্তা পার হচ্ছে। মেট্রোয় যাবে। আলোতে ওদের দুজনকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নীতীশ একটা কালো স্যুট পরেছে। বেশ হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে।

নয়না নীতীশের একেবারে গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে চলেছে!

নয়না বোধ হয় কোনও দোকানে খোঁপা বেঁধেছিল সেদিন। একটি কমলারঙা সম্বলপুরী সিল্কের শাড়ি এবং লো-কাট ব্লাউজে ওর গ্রীবাটি অন্য সব দিনের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওই ঝলমলে আলোয় ওকে চিল্কার আকাশের আসন্ন সন্ধ্যায় উড়ে-চলা ফ্লেমিংগো পাখি বলে মনে হচ্ছিল। আমার মাথায় খুন চেপে গেল। কী হল জানি না। কেমন করে হল জানি না। স্টিয়ারিংটাকে শক্ত করে দু' হাতে ধরে যত জোরে পারি অ্যাক্সিলারেটরে সমস্ত জোর দিয়ে চাপ দিলাম—গাড়িটা চৈত্র মাসের হাওয়ার মতো হু হু করে এগিয়ে চলল! দুজনকে এক সঙ্গে চাপা দেব—গুঁড়িয়ে ফেলব—চাপ চাপ গাঢ় রক্ত লেগে থাকবে রাস্তায়—কালো স্যুট আর কমলারঙা শাড়ি রক্তে লাল হয়ে যাবে। ফ্লেমিংগো পাখি ঘাড়-মটকে পড়ে থাকবে কমলারঙা শাড়িতে। পৌঁছে গেছি—পৌঁছে গেছি—আর এক মুহূর্ত—হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টানে নীতীশ নয়নাকে সরিয়ে নিয়ে গেল আমার আওতা থেকে—কিন্তু অত অল্প সময়ে ব্রেক কষা সম্ভব হল না—গিয়ে পড়ল গাড়ি সামনের গাড়ির উপরে—সে গাড়ি লাফিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারল তার সামনের গাড়িতে। দু'গাড়িরই দু' ড্রাইভার নেমে এল। এসে আমাকে গালাগালি করতে লাগল। দোষ সম্পূর্ণই আমার। উচিত ছিল চুপচাপ থাকা। আমি উল্টে ওদের গালাগালি দিলাম—চেঁচিয়ে বললাম—keep your bloody mouth shut. বলতেই, সামনের লোকটা আমার কলার ধরল। কলার ধরতেই মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না—টেনে মারলাম এক আপার-কাট। লোকটা হেঁচকি তুলে সরে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমবেত সমর্থকবৃন্দ আমাকে চাঁদা করে মারতে আরম্ভ করল। একজন সার্জেন্ট না এসে পড়লে কী হত জানি না। কে যেন খুব জোরে একটা ঘুষি মারল আমার রগের উপর, কপালে—তারপর দেখলাম একটি একটি করে আলোগুলি নিভে যেতে লাগল—ঠাণ্ডা লাগতে লাগল—মনে হল ঘাড়ের কাছে কেউ যেন ওডিকোলনের শিশি উপুড় করে দিয়েছে। সমস্ত মাথার মধ্যে অনেকগুলো কট্‌কটি ব্যাঙ ডাকতে লাগল! আর কানের মধ্যে ঝনঝন করতে লাগল নয়নার গলা—কী অসভ্য ড্রাইভার! নীতীশও চেঁচিয়ে কী একটা বলেছিল! শুনতে পাইনি! ভাগ্যিস্ ওরা কেউ আমায় চিনতে পারেনি।

সার্জেন্ট আসাতে সামনের ভিড় কমল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে থানায় গিয়ে ডাইরি করতে হবে। সব কিছু করতে হবে। কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে করল না। ইচ্ছে করল ঘুমোই।

গাড়ি স্টার্ট করে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। জামার বোতাম ছিঁড়ে গেছে। টাই ধরে টানাটানি করাতে গলায় খুব লেগেছে। জল পিপাসা পাচ্ছে খুব। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছিল না এই অবস্থায়।

www.BanglaBook.org

পার্ক স্ট্রিটে এসে দাঁড়ালাম। কোথাও বসে এক কাপ কফি খেলে বেশ হত। রুমাল দিয়ে ঠোঁটটা ভাল করে মুছলাম। ঠোঁটের কোণটা কেটে গেছে। ওরা খুবই মেরেছে; তবু দুঃখ নেই তার জন্যে। আসলে আপশোস, নয়না আর নীতীশকে আমার জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না!

একটা কোণা-কফি নিয়ে সায়ান্ধকারে একটি কোণায় বসে বসে অনেক পুরনো দিনের কথা—অনেক টুকরো ঘটনা চোখের উপর সারি সারি ভেসে-ওঠা ছবির মতো দেখছিলাম। সে সব ছবি দেখতে দেখতে বর্তমানের সবকিছু মন থেকে উবে গেল।

একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল, ট্রাম স্ট্রাইক ছিল। শুধু বাস চলছিল। প্রচণ্ড ভিড়। অফিসে বসে হঠাৎ আমার মনে পড়ল নয়নার কলেজ ছুটি হবে। ওই সময় ট্যাক্সি পাবে না—ওই ভিড়ে বাসেও উঠতে পারবে না। বৃষ্টিতে ভিজবে এবং নির্ঘাত জ্বরে পড়বে। পরশুদিন ফোনে কথা বলার সময় ও ঘং ঘং করে কাশছিল। অতএব অফিস পালিয়ে ওর কলেজের চারপাশে ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর কনকনে হাওয়ায় চক্কর মেরে বেড়াতে লাগলাম। কলেজ থেকে বেরুনো অন্যান্য মেয়েরা এবং হয়তো পথচারীরাও ভাবল যে, আমার উদ্দেশ্য শুভ নয়। ওরা কী করে জানবে যে, ওদের মধ্যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা যে, তার সম্বন্ধেও আমার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই। আমি কেবল আমার নয়নার খোঁজে এসেছি। পাছে সে বৃষ্টিতে ভেজে, পাছে তার কষ্ট হয়, পাছে ভীষণ ভিড়ের বাসে তার সুন্দর পায়ের পাতা কোনও বদখত লোক কাদাসুদ্ধ জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দেয়—আমি তাই অফিস পালিয়ে পাগলের মতো কুড়ি মিনিট হল দাঁড়ি কাটছি। আমার ভাগ্যদেবীর হাতে দণ্ডিত হচ্ছি। সেদিন দেখা হয়নি নয়নার সঙ্গে। কারণ ওর ক্লাস সেদিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আরেক দিনের কথা মনে পড়ল। পাইপটা ধরালাম। কিছু তেল হয়। মার খেয়ে বেশ খিদে পেয়েছে। একটা হ্যামবার্গার নিলাম।

একবার নয়নার সামান্য জ্বর হয়েছিল। অফিস থেকে ফিরে রোজ ওকে দেখতে যেতাম। বেণী এলিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ও শুয়ে থাকত। গেলে ও খুশি হত। কিন্তু তার চেয়ে আমি খুশি হতাম অনেক বেশি। বোধ হয় ওকে আমার নিজের জীবনের চেয়েও ভালবাসি বলে, ওকে অসুস্থ, অসহায় দেখলে আমার ভাল লাগত। মনে হত, ওর জন্যে কিছু করি। ওর কাছে বসে ওকে একটু ভাললাগা দিয়ে, নিজে সার্থক হতাম। ভাবতাম, ওর জন্যে কিছু করার একটি সুযোগ মিলল।

ওকে অনেকদিন বলতাম আমি—তোমার বেশ বড় কোনও অসুখ হোক। তোমায় যাতে অনেকদিন নার্সিং হোমে থাকতে হয়। অনেকদিন। প্রথম প্রথম আত্মীয়স্বজন, তোমার দেখানো-হিতাকাঙ্ক্ষীরা, বন্ধু-বান্ধবেরা খুব ভিড় করবে। তোমায় দুবেলা দেখতে যাবে। তারপর আস্তে আস্তে কেউ আর সময় করে উঠতে পারবে না। সকলেরই কিছু-না-কিছু জরুরি কাজ পড়ে যাবে। এমনকী সুজয় পর্যন্ত তোমাকে দেখতে আসার সময় করে উঠতে পারবে না। তখন আমি প্রতি সন্ধ্যায় অফিস-ফেরতা তোমার কাছে যাব। তোমার কেবিনে বসে থাকব। রোজ তোমার জন্যে ফুল নিয়ে যাব। মাঝে মাঝে ক্যাডবেরিও নিয়ে যাব নার্সকে লুকিয়ে, ভেঙে-ভেঙে, টুকরো করে তোমার ঠোঁটে দেব। তোমাকে একটুও বিরক্ত করব না। কিচ্ছু করব না—শুধু তোমার ঘামে-ভেজা গরম দুখানি হাতে হাত রেখে, তোমার শুকতারার মতো চোখে চোখ রেখে, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকব। তোমাকে যদি সবাই কোনওদিন ত্যাগ করে—সবাই তোমাকে ভুল বোঝে—একমাত্র সেদিনই তুমি জানতে পারবে আমি তোমার জন্যে কতটুকু করতে পারি। আমি তোমার কে।

এরকম গড় গড় করে পাগলের মতো বলতাম, একটু থামতাম, একটু ভাবতাম; আর নয়না কনুইয়ে-ভর-করা হাতের পাতায় মুখ রেখে বড় বড় চোখ মেলে উৎসুক হয়ে শুনত—তারপর অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায়, যেন এতক্ষণ কিছুই শোনেনি—এমনি ভাবে বলত—ইস্। কল্পনাও করতে পারেন আপনি। একটি জলজ্যান্ত মেয়েকে মাসের পর মাস নার্সিং হোমে শুইয়ে রাখবেন—কেবল আপনি আমার কে তা বোঝাবার জন্যে? সত্যি! আপনাকে নিয়ে চলে না। আপনার মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে।

জানি না, হয়তো তাই গেছে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শিশুর কাছে মা'র স্তনের মতো, প্রথম কৈশোরের নিঃশ্বাসের মতো, প্রথম যৌবনের স্বপ্নভরা আম্রমুকুলিত দিনগুলোর মতো নয়না আমার অন্তরের অংশ হয়ে উঠেছে। ও যে সত্যি আমার কে, তা ওকে কোনও দিনই আমি বোঝাতে পারব না। ও কোনওদিন বুঝতে চায়ওনি—চাইবেও না।

অথচ এইটুকু সহজ অঙ্ক কখনও আমার মাথায় ঢোকে না। কানা ষাঁড়ের মতো কেবলি আমি লাল-কাপড়ের দিকে ছুটে যাই—আর কোনো তরুণ, দৃঢ় মাতাদোরের মতো নয়না আমাকে প্রতিবারই ওর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের ছোরা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে তোলে।

জানি না, সত্যি সত্যি আমি কী চাই নয়নার কাছে? ভাল ব্যবহার, এমনকী মৌখিক ভালবাসা তাও সে আমাকে দিয়েছে। সে আমাকে অনেকানেক ব্যাপারে অনুপ্রেরণাও জোগায়। এর জন্যেই—মানে ও যা দিয়েছে তা নিয়েই ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অথচ, তবু আমি সর্বদা ছটফটিয়ে মরি। তাহলে কি শরীর—আমি কি তাহলে শরীরটাকেই চাই? তার রজনীগন্ধার মতো প্রস্ফুটিত ছিপছিপে শরীরটাই কি চাই তাহলে?

পাইপের টোব্যাকোটা তেতো তেতো লাগতে লাগল। থুথু ফেললাম অ্যাশট্রেতে। নীতীশের মুখে ফেললে ভাল হত। কোনওরকমে নয়নার উপর প্রতিশোধ নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এ যদি শুধু শরীরই হয় তবে এত ব্যথা কীসের এত যন্ত্রণা কীসের? যৌবনের সোনার সময়কে এমনি করে মোমের মতো বিনা প্রয়োজনে ক্ষয় করাই বা কীসের জন্য?

কিন্তু ভয় করতে লাগল। শুনেছি, ছোটবেলা থেকে শুনেছি যে এই পাড়া, এদিক-ওদিক গলি-ঘুঁচি, আলো-অন্ধকার সবকিছুই অর্থবাহী। পয়সা থাকলে নাকি পাওয়া যায় না এমন আনন্দ নেই কলকাতায়।

গাড়িটা ওখানেই থাকল। চোরের মতো, লাথি-খাওয়া ঘেয়ো-কুকুরের মতো প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, লেজ গুটিয়ে ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট ধরে পা-টিপে পা-টিপে হাঁটতে লাগলাম। একটু এগোতেই, একটি বড় ফ্ল্যাট বাড়ির ফটকের সামনে, পানের দোকানের পাশে, একটা শিয়ালে-খাওয়া কইমাছের চেহারার লোক সোজা আমার চোখের মণি লক্ষ করে তাকাল। আমার কান গরম হয়েছিল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ছিলাম। মাথা নোয়ালাম। লোকটা পচা-মাংস-চিবানো হায়নার মতো দাঁত বের করে হাসল, হাত তুলে সেলাম করল, ফিসফিস করে বলল, কেয়া চাহিয়ে সাহাব? পাঞ্জাবী, পার্সী, অ্যাংলো, যো কহিয়েগা। ইকদম বেহেতরিন চীজ।

আমি উত্তরে বেশ কেটে কেটে বললাম, মুঝে বাঙ্গালি লা-দো। বলেই, নয়নার চেহারার হুবহু বর্ণনা দিলাম—ওকে একটু অন্ধকারে টেনে নিয়ে।

ও বলল, আপ্ বেফিক্কর্ রহিয়ে—জেরা টাইমকা বাত হ্যায়—মগর ম্যায় লায়গা জরুর।

এর আগে আমার মতো আনাড়ী মুরগি এই ধানক্ষেতে কখনও যে ধান খায়নি, তা ওর চোখ দেখেই বুঝলাম।

লোকটা আমায় ভিতরের চত্বরে একটু হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা সোফা-সাজানো ঘরে বসাল। সে ঘরের দেওয়ালময় উগ্র অঙ্গভঙ্গিমায় নানারকম মেয়েদের "আয়-না-দেখি" গোছের ছবি।

লোকটি বলল, ম্যায় চলে হুজুর। মগর পঁচাশ রুপেয়া লাগেগা।

আমি বললাম, রুপেয়াকা ফিকর মতো করো।

ওই ঘরে বসে বসে একা আমার ভয় করতে লাগল। যদি কোনও চেনা লোক দেখে ফেলে? যদি বলে, আরে ঋজু? এখানে কী করছ? যদি কেউ দেখে ফেলে, যদি কেউ একান্ত দেখে ফেলেই, তাহলে কাটা-ঠোঁট দেখিয়ে, মার-খাবার দাগ দেখিয়ে বলব—তাকে বলব যে, দ্যাখো আমার নয়না আমাকে কী করেছে। তাই তার উপর আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি। আমার বিশ্বাস, যে-কেউ আমার কথা বুঝবে।

তারপর কতক্ষণ সময় কেটে গেল জানি না। একটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক—বেঁটে-সেঁটে তেল-চুকচুকে কালো—এসে বলল, রুপেয়া অ্যাডভান্স দিজিয়ে—কামরাকা কেরায়া দিজিয়ে। হাম্ দোনোকো বকশিশ দিজিয়ে। তারপর শুধোল, মামুলি কামরা লিজিয়েগা, না এয়ার-কন্ডিশানড?

www.BanglaBook.org

কেউ ভেজিটারিয়ান না নন-ভেজিটারিয়ান শুধোলে যেমনভাবে উত্তর দিই, তেমন করে বললাম, এয়ার-কন্ডিশানড। আলবৎ এয়ার-কন্ডিশানড। এই কলকাতার ধুঁয়ো-কালিতে আমি আমার নয়নাসোনার সঙ্গে মিলিত হতে পারব না। তার সঙ্গে আমি এই প্রথমবার মিলিত হব—শুধু তাই বা কেন ? জীবনে এই প্রথমবার কোনও নারীর সঙ্গে মিলিত হব। তা ছাড়া জীবনের এসব স্মরণীয় দিনগুলোতে কার্পণ্য যে করব না, তা ছোটবেলা থেকেই ভেবে এসেছি।

আজকে নয়নার সমস্ত গর্ব আমি ভেঙে দেব। ও আমাকে যত ব্যথা দিয়েছে, সব ব্যথা আমি সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব। আমার অনভ্যস্ত ও অনিয়ন্ত্রিত আরতিতে নয়নার ধূপের গন্ধের মতো আর্তি আমি তিল তিল করে উপভোগ করব।

সেই গুণ্ডাটা হিসাব-নিকাশ করে আমার কাছ থেকে সবসুদ্ধ একশ কুড়ি টাকা নিয়ে নিল। বলল, সাব্, হুইস্কি-উইস্কি কুছ নেহি পিজিয়েগা ?

আমি বললাম, কুছ নেহি।

ও চলে গেল। আমার ঠোঁট থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। আমার নিজের নোনা রক্ত আমি চেটে চেটে খাচ্ছি—সমস্ত শরীরের রক্ত এখন টগবগিয়ে ফুটছে—। নেশায় আমি এখন আলাউদ্দিন খাঁর সরোদের মতো বাজছি। তোমরা এখন শুধু আমার নয়নাকে নিয়ে এসো।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। সেই গুণ্ডামতো লোকটির সঙ্গে একটি ছিপছিপে অল্পবয়সী মেয়ে ঘরে ঢুকল। অবাক হলাম। বেশ দেখতে তো। কে বলবে যে, মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এ কোহিনূর হীরে বিকোবে। কিন্তু গায়ের রঙটা অসম্ভব ফর্সা। ঠিক নীতীশের মতো। হ্যাঁ—নীতীশ সেনের মতো ফর্সা।

মেয়েটি কাছে এল। ছোটবেলায় চিড়িয়াখানায় উদবেড়ালের চৌবাচ্চায় সিংগি মাছ ফেলে যেমন চোখে আমরা চেয়ে থাকতাম---ভাবটা, কী করে গিলে ফেলে, দেখি—মেয়েটি তেমন চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমরাও যেমন বুঝতাম না, জেলের দিকে আগে কামড়াবে না মাথার দিকে, তেমনি অবুঝের মতো না-বুঝে মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। তারপর বলল, চলুন, ঘরে যাই।

এবার উজ্জ্বল আলোয় মেয়েটির মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম। কই ? সে চোখ কই ? যে চোখে চাইলে আমার সমস্ত সত্তা জলতরঙ্গের মতো বেজে ওঠে, ভাল লাগায় আমি সজনে ফুলের মতো কাঁপতে থাকি, সে চোখ কই ? এ তো চোখ নয়, যেন মরা ভেটকির কোল। এ চোখে চাওয়া যায় না। এ শরীরে যাওয়া যায় না। এ তো আমার নয়না নয়, এ কাকে এরা এনে দিল আমায় ? এর শুধু গড়নই নয়নার মতো, এমনকী, বুক চিবুক, সবকিছু—কিন্তু আর কিছুই যে নয়নার মতো নয়। সেই বুদ্ধি কই ? সেই দুষ্টুমিভরা হাসি কই ? এ আমার নয়না নয়। আমি যে কেবল নয়নাকেই চেয়েছিলাম---তার সব কিছু মিলিয়ে আমি যে একমাত্র তাকেই চেয়েছিলাম। আমার তো অভিমান শুধু নয়নার উপরে, পৃথিবীর অন্য কোনও মেয়ের উপর তো আমি প্রতিশোধ নিতে চাইনি। আমি কেবল তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম ; বোঝাতে চেয়েছিলাম ; কী যে বোঝাতে চেয়েছিলাম তা আমি নিজেও জানি না।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি অবাক চোখে তাকাল। এমন উদবেড়াল সে জীবনে দেখেনি। বলল, কী হল ? আমি বুঝি দেখতে খারাপ ?

আমি বললাম, তাড়াতাড়িতে, ভয় পেয়ে তোতলাচ্ছিলাম. বললাম—তা নয়, তা নয়, এখানে আমি একজনকে খুঁজতে এসেছিলাম ভাই। তাকে পেলাম না।

মেয়েটি আরও অবাক হল। বলল, সে কী ? কে সে ? নাম কী ? মিলি ?

আমি বললাম, না। অন্য একজন। সে হারিয়ে গেছে।

এবার মেয়েটির মুখ সম্পূর্ণ বদলে গেল, কী এক কান্না-কান্না, নিষ্পাপ ভাব তার প্রসাধিত মুখে ছড়িয়ে গেল—উদ্বিগ্ন গলায় শুধাল, পাকিস্তানে বুঝি দেশ ছিল ?

বললাম, না : শিলঙের এক গুণ্ডা তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর খুঁজে পাচ্ছি না। চলি : বলেই ঘর ছেড়ে চত্বরে নামলাম। মেয়েটা দরজা থেকেই বলল, শুনছেন ; এই যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনছেন—

আর পেছন ফিরে তাকালাম না। আমার ভীষণ কান্না পেতে লাগল। নিজের জন্যে। নয়নার জন্যে। এবং নাম-না-জানা এই মেয়েটির জন্যেও।

সোজা ক্লাবে এলাম।

আমি ভীরু নই। কার সঙ্গে লড়তে হবে জানলে আমি লড়তে পারি কি না দেখাতাম। কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজে আমি লড়তে শিখিনি কোনওদিন। পারি না। নয়না কোনওদিন আমাকে একবারের জন্যেও বলেনি কী করলে আমি ওর যোগ্য হতে পারি। নীতীশ যে কেন এবং কী বাবদে আমার চেয়ে ভাল, এ কথার জবাব কোনওদিন জানতে পাব না। হয়তো অনেক প্রশ্ন আছে যার জবাব কেউ দেয় না। যার জবাব কালের স্রোতে, জোয়ারে-ভাসা কুটোর মতো হয়তো এমনিই ভেসে আসে। ভালবাসলে কী করতে হয় আমি জানি না। নয়নাও একদিন বলেছিল, জানে না। কেউ জানে কি, তাও জানি না।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার আর কোনও ইচ্ছে নেই। নয়নার মুখটা শুধু আমার চেতনা থেকে, আমার অবচেতন থেকে মুছে ফেলতে চাই। তার প্রশান্ত কপাল, তার উজ্জ্বল চোখ দুটি আমি যেন আর্তনাদ করেও, সমস্ত রকমে চেষ্টা করেও, কখনও মনে না আনতে পারি। কোনওদিন কোনওদিন, কোনওদিন মনে না আনতে পারি।

হুইস্কি লাও। বেয়ারা, হুইস্কি লাও।

১৪

লাইট-হাউসের সামনের বইয়ের দোকানে বই দেখছিলাম। দুটো বই অর্ডার দেওয়া ছিল। ওরা সে দুটো প্যাক করে দিচ্ছিল। বই দুটি নিতেই এসেছিলাম।

আজ শনিবার। এখন চারটে বাজে। অফিস থেকে বেরিয়ে এই এসেছি। বইগুলো নাড়ছি-চাড়ছি। এমন সময় আমার বাহুতে আঙুল ছুঁইয়ে কে যেন বলল—এই!

ঘাড় ফেরাতেই দেখি নয়না।

প্রথমে ঠিক করলাম, কথাই বলব না। কিন্তু নিজের অজান্তেই পরক্ষণেই আমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললাম, কী?

অসভ্য।

অসভ্য কেন?

কতদিন আসেন না বলুন তো। কত বছর?

বললাম, বছর তো নয়, দু'য়েক মাস মাত্র। এমনিতেই যাই না। বড় হবার চেষ্টা করছি। তাছাড়া গেলে তোমার পড়াশুনার অসুবিধে হয়।

বুঝলাম। কিন্তু ফোন করলেও কি অসুবিধে হত?

একটু শক্ত গলায় বললাম, হত বৈকি। ওই একই অসুবিধে হত।

আমার গলার স্বর শুনে ও আমার চোখে চোখ মেলে সম্পূর্ণভাবে চাইল—তারপর মুখ নিচু করে বলল, আপনার দেরি হবে? আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

ভাবলাম বলি যে, তুমি যেতে পারো। তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই! থাকবেও না কোনওদিন।

কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারলাম না। নয়না যদি এ জীবনে কখনও কোনও সময়ে, এমনকী যখন আমার ভুরু সাদা হয়ে যাবে, চুল ধবধবে করবে, তখনও যদি কখনও আমার চোখে তাকিয়ে বলে, ঋজুদা, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল—তখনও আমার সব কাজ ফেলে আমাকে ওর কথা শুনতে হবে। কারণ It is my destiny. পূর্বজন্মের কোনও অজানা ঋণের বোঝা আজীবন আমায় শোধ করতে হবে নয়নার কাছে। শোধ করতেই হবে। আমার মুক্তি নেই।

বললাম, একটু দাঁড়াও। দুটি বই অর্ডার দিয়েছিলাম। বেঁধে দিচ্ছে।

www.BanglaBook.org

ও ঘাড় হেলিয়ে বলল, আচ্ছা !

অনেকদিন পরে নয়নাকে দেখলাম। এতদিন ওকে বড় দেখতে ইচ্ছে করেছে—বড় কথা বলতে ইচ্ছে করেছে ওর সঙ্গে। তবু, খাঁচায়-বন্ধ বাঘের মতো লোহার শিকে আছড়ে, মাথা কপাল রক্তাক্ত করেছি। তবু ওর সঙ্গে দেখা করিনি, বা কথা বলিনি। যদি কেউ আমার মতো করে কখনও কাউকে ভালবেসে থাকে তবে কেবলমাত্র সে-ই বুঝতে পারবে—এতদিন পর নয়নাসোনাকে দেখে আমার কতখানি ভাল লাগছিল। এই শীত-শেষের বিকেল বড় ভাল লাগছে। একটা চাঁপারঙা কার্ডিগান পরেছে নয়না, চাঁপারঙা কাশ্মীরী সিল্কের শাড়ির উপর। অনেকদিন পরে দেখছি বলে কিনা জানি না মনে হচ্ছে এ ক'মাসে ও যেন অনেক বড় ও আরও বেশি সুন্দরী হয়ে গেছে। আরও বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্না।

বললাম, তুমি এখানে কী করছিলে ?

আমি ? এই একটু কেনাকাটা করতে মার্কেটে এসেছিলাম।

বইটা নিয়ে বললাম, বলো কোথায় যাবে।

আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।

মনে হচ্ছে ফাঁসির আসামীর ইচ্ছাপূরণের মতো আজ তুমিও আমার ইচ্ছাপূরণে বদ্ধপরিকর।

যা বলুন !

তোমার হাতে সময় আছে তো ?

আছে। রাত এগারোটা অবধি। ছটার শোতে সুমিতা সিনেমার টিকিট কেটেছিল। রাতে ওদের বাড়ি খাওয়ার নেমন্তন্নও ছিল। একটু আগে জানলাম, মানে বাড়ি থেকে বেরুনোর পর, যে দুটোই ক্যানসেল। সুমিতার এক মামার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে—তাই ওরা সবাই বাড়িতে বলে এসেছি। তাই এগারোটা অবধি চিন্তা করবে না কেউ।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ফেরাজিনীতে এসে বসলাম। গাড়ি রেখেছিলাম লাইট-হাউসের সামনে। গাড়ি ওখানেই থাকল। কোণের একটি টেবলে—দুজনে বসলাম। আজ বহুদিন বাদে নয়না আমার সঙ্গে কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ওর হাতে—কোলানো কালো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটি ছোট প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিল।

অবাক হয়ে শুধোলাম, কী ?

আপনার জন্যে দুটি টাই ও দুটি মোজা কিনেছিলাম।

রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়লাম। বললাম, কেন ? কী ব্যাপার ?

ও হাসল। বলল, ব্যাপার কিছু নয়। অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল, আমাকে যে আপনি স্নেহ করেন তার স্বীকৃতি হিসেবে, যেদিন নিজে রোজগার করব, সেদিন আপনাকে কিছু কিনে দেব।

এই 'স্নেহ' কথাটাকে আমি ঘেন্না করি—আমি ওকে কোনওদিন ছোটবোনের মতো ভালবাসতে পারিনি—চাইনি—আজও চাই না—অথচ ও সব সময় আমাকে শ্রদ্ধা দেখায়, দাদার মতো দেখে।

বললাম, তুমি চাকরি আরম্ভ করে দিয়েছ নাকি ?

না ! একটি বাটিকের শাড়ি বানিয়েছিলাম। তার সম্মানী পেয়েছি ষাট টাকা।

আর সেই টাকার প্রায় সবটাই খরচ করে ফেললে একটা লোকের জন্যে, যে তোমাকে কেবল জ্বালালই চিরদিন।

নয়না চোখ তুলে বলল, আপনি ভীষণ খারাপ। অমন করে বলবেন না। আমার ভাল লাগে না।

বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেল।

আমি বললাম, তারপর ? তোমার কী খবর বলো ? নীতীশ সেন কেমন আছে ?

নয়না আমার চোখে একবার চাইল। যেন ও বলতে চাইল—নীতীশকে আমার এত অপছন্দ কেন ?

ও কিছু বলার আগেই—ওই নামটা উচ্চারণ করতেই জানত আমার গলার স্বরটা সম্পূর্ণ বদলে গেল—মাথায় আবার সেদিনকার সেই যন্ত্রণাটা, যেদিন এক কঙ্কিত নয়নার উপর আমার সমস্ত ইচ্ছা

www.BanglaBook.org

আরোপ করার দুরাশায় একটি ঘৃণিত অভিজ্ঞতার চৌকাঠে পা দিয়ে ফিরে এসেছিলাম, সেটা ফিরে এল।

নয়না ঠাণ্ডা গলায় চোখ নিচু করে বলল, নীতীশদা ভালই আছে—কলকাতা আসছে আবার সামনের দোলে। আপনি বোধ হয় জানেন না, নীতীশদার বিয়ে হয়ে গেছে। অবশ্য বেশিদিনের কথা নয়। এই তো দিন পনেরো আগে ওরা শিলঙ ফিরল।

নাঃ, আজকেও নয়না দেখছি আমায় হারিয়ে দেবে।

আমি খুব ঠাণ্ডা গলায় আমার সমস্ত উত্তাপ ঢেকে বললাম, শুনিনি তো! কোথায় বিয়ে করল?

নিজেই পছন্দ করে করেছে।

খুব বড়লোকের মেয়ে বুঝি?

খুব না হলেও বেশ বড়লোকের মেয়ে। বেশ সুন্দরী। নীতীশদা যে কোম্পানিতে কাজ করে সে কোম্পানির একজন ডিরেকটরের মেয়ে। বিয়ে অবশ্য কলকাতাতেই হয়েছিল, বরযাত্রী যেতে বলেছিল আমাকে।

তুমি গেছিলে নাকি?

বাঃ নেমন্তন্ন করল, যাব না? গিয়েছিলাম।

ঘরের কোণায় নিচু গ্রামে বাজনা বাজছিল। চাঁপারঙা পোশাকে সেই প্রায়ান্ধকারে নয়নাকে কোনও জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার বিশীর্ণ শুকনো চাঁপাফুল বলে মনে হচ্ছিল। কৃশাঙ্গী, সুগন্ধি, তেজস্বিনী, করুণ কোনও ক্যাথলিক নান্-এর মতো। এতদিন ওর চোখে চেয়ে ওর চোখের পাতায় চুমু খেতে ইচ্ছে করেছে। আজ হঠাৎ মনে হল ওর চোখেমুখে কোথাও কোনও দেবীমহিমা আরোপিত হয়ে গেছে, যা আগে কখনও লক্ষ করিনি।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম।

আমি ভেবেছিলাম, মানে একটু আগেও ভাবছিলাম যে, আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আত্মহত্যা করাতে আমি ওয়াকওভার পেয়ে যাব। এবার আমি আমার জয়ধ্বজা ওড়াব, সেলিব্রেট করব, কিন্তু নয়নার মুখে চেয়ে আমি ওসব কথা আর ভাবতে পারছি না। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, এখন নয়নার বুকের ভিতর কী হচ্ছে। অথচ বাইরে তার আভাসমাত্র পৌঁছচ্ছে না।

বললাম, নীতীশ বেশ ভাল ছেলে।

কেন বললাম, জানি না।

নয়না বলল, নিশ্চয়ই। খুব ভাল ছেলে!

ও তো বলবেই—। ও যে ভালবাসে—মানে ভালবাসত। আর কেউ না বুঝুক আমি তো ওকে বুঝতে পারি। শালা নীতীশ। এই নাকি ভাল ছেলে। একটি মেয়ে, যে কোমল স্বর্ণলতার মতো একটি সজীব সবুজ মনোমত গাছকে আকড়ে মনে মনে লতিয়ে উঠেছিল সকালের সোনালি আলোয়, তাকে কিনা সে নিজে হাতে নিষ্ঠুরের মতো আঁকসি দিয়ে নিড়িয়ে দিল একটানে। ছিঁড়ে ফেলে দিল। তবুও নয়না বলবে, নীতীশ ভাল ছেলে। এসব ছেলেকে মড়িতে-হাজির বাঘের ঘাড়ে মাচা থেকে ফেলে দিতে হয়। অবশ্য নয়নার কদর ও কী করে বুঝবে? ওর তো শুধু টাকা আছে। শুধু টাকা দিয়ে ভাল ইলিশ মাছ কেনা যায়, কিন্তু ভালবাসা চেনা যায় না। যে ছেলে বড়লোকের পিয়ানো-বাজানো গিমলেট-গেলা কোনও ইনসিপিড মেয়ের বিনিময়ে নয়নার মতো মেয়েকে হারাল—সে আজীবন পা ছড়িয়ে বসে কাঁদবে। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

কতক্ষণ চুপচাপ করে কাটল জানি না। বোধহয় অনেকক্ষণ। নয়না পেয়ালায় চা ঢালছিল। বাঁ হাতে একটি মাত্র কাঁকন পরেছে। কার্ডিগানটির হাতাটি গুটিয়ে তুলে নিয়েছে। ডান হাতে রিস্টওয়াচ। ওর স্বপ্নিল আঙুলে ও চামচে ধরে সুগারকিউব, পেয়ালায় ফেলে চিনি মিশোচ্ছে। অর্কেস্ট্রাতে বেলাফন্টের গান বাজছে ওরা। নিচু গ্রামে—। মনে হচ্ছে কোনও একটা দমবন্ধ যন্ত্রণা কোনও গভীর শীতল পাতকুয়ো থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আসছে। নয়নার চোখের দিকে চাইতে পারছি না।

সত্যি কথা বলতে কী, এক মুহূর্ত আগেও আমি যা কল্পনাও করতে পারিনি—নয়নার হেলানো

www.BanglaBook.org

বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে হঠাৎ আমার তাই মনে হল। নীতীশ নয়নাকে বিয়ে করলে আমি সবচেয়ে সুখী হতাম। নিজের মাথার চুল হয়তো টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম—হয়তো শটগানের মাজল গলায় ঠেকিয়ে পা দিয়ে ঘোড়া টেনে দিতাম—কিন্তু তবু, আমি হয়তো এখনকার চেয়ে সুখী হতাম।

নয়নাকে যে ঠিক এতখানি ভালবাসি তা একটু আগেও আমি বুঝতে পারিনি। পরম কামনায় কঁকিয়ে-কেঁদেও যে যন্ত্রনা পাইনি—আজ নয়নার ব্যথায়-ভরা চোখে চেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণা পেতে লাগলাম। নয়নার দিকে তাকাতে পারলাম না।

ফেরাজিনী থেকে বেরিয়ে, নয়না যেন কেমন হঠাৎ প্রগল্‌ভা, সস্তা হয়ে গেল। ও যা কোনওদিন ছিল না, ও তাই হয়ে গেল। গাড়িতে আমার খুব কাছ ঘেঁষে বসল। আমার বাঁ কাঁধে দু-দু'বার মাথা নুইয়ে রাখল।

বললাম, কী হল সোনা ?

নয়না ফিসফিস করে বলল, আপনার চিঠিগুলোর কথা ভাবছিলাম। এত সুন্দর চিঠি লেখেন কী করে আপনি ?

বললাম, সকলকে লিখতে পারি না। তুমি তো সে কথা জানো যে, চিঠি লিখিয়ে নেবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। চিঠি লেখবার ক্ষমতার চেয়ে চিঠি লিখিয়ে নেবার ক্ষমতা অনেক বড়। সে ক্ষমতা তোমার আছে। তাই হয়তো তোমাকে ভাল চিঠি লিখতে পারি।

ও অস্ফুটে বলল, জানি না।

বললাম, এবার কোথায় ?

ও বলল, আমি জানি না। আমার এগারোটা অবধি ছুটি—আপনি আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে যান—।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গাড়ি রেখে দু'জনে নামলাম। বললাম, চলো একটু হাঁটি—তারপর ফিরপোয় গিয়ে ডিনার খেয়ে সকাল সকাল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

শেষ শীতের সন্ধ্যার কুয়াশায় বাতিগুলো গলে গলে পড়ছে। নুড়িগুলো ভিজে রয়েছে। নয়না হয়তো স্বপ্ন দেখছে। ঠিক আমি যেমন করে দেখি। এই শীতের সন্ধ্যার কুয়াশা ওর চোখ থেকে মুছে গিয়ে শিলঙের পাইন-ভরা হেঁয়ালি মাখা সন্ধ্যা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। লাইটমুকরার কোনও পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট কটেজ। ভিতরে গোলাপি ল্যাম্পশেডে আলো জ্বলছে—পেলমেট থেকে ভারী সুন্দর সুন্দর পর্দা ঝুলছে জানলায় জানলায়। নীতীশ বোধ হয় এখুনি অফিস থেকে ফিরল। মুখ-হাত ধুয়েছে। ওরা ছোট্ট খাবার ঘরে দু'জনে চা খেতে বসল। নয়না চিংড়ির কাটলেট বানিয়েছে—গরম গরম। বলল, তোমাকে একটু চিলি সস্ দিই ? নীতীশ বলল, দাও ; একটু দিয়ো।

আদরে টী-কোজির গায়ে হাত দিয়ে, কেটলি থেকে তুলে নয়না চা বানাল, চা ঢেলে দিল। সুরেলা রাত গড়িয়ে চলল।

এমন সময় একটি ববারের বল এসে নয়নার গায়ে লাগল। আমার অথবা নয়নার স্বপ্ন ভেঙে গেল। একটি দুরন্ত দুষ্টু গাবলু-গুবলু তিন বছরের ছেলে সুন্দর কালো সার্জের পোশাক পরে দৌড়ে এসে নয়নাকে বলল, আমার বল দাও। নয়না বলটি নিজে হাতে তুলে দিল। তারপরে ছেলেটির দিকে তাকাল। ধবধবে ফর্সা ছেলেটি। নীতীশের মতো ফর্সা। নয়নার সমস্ত স্বপ্ন ধীরে ধীরে কোনও জাপানি চিত্রকরের ওয়াশের কাজের মতো একটা হাল্কা এক-রঙা অপস্রিয়মান ছবিতে গড়িয়ে গেল। সব মুছে গেল। কিছুই আর বাকি রইল না।

অনেকক্ষণ আমরা হাঁটলাম। নয়নার হাবভাব দেখে আমার ভাল মনে হচ্ছিল না। এখন ও একেবারে চুপ করে ছিল। সেখান থেকে বাইরে এলাম। তারপর আটটা নাগাদ ফিরপোতে এসে একটি ছোট্ট টেবলে বসলাম।

হাত দিয়ে টেবল-ক্লথটা সমান করতে করতে নয়না বলল, আচ্ছা ঋজুদা, খাওয়ার পর আমরা কোথায় যাব ?

কেন ? বাড়ি ! তুমি অন্য কোথাও যেতে চাও ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না ! মানে, না । কিচ্ছু না ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ ।

বেয়ারা স্যুপ দিয়ে গেল । স্যুপ খেতে খেতে নয়না বলল, ঠাণ্ডাটা বেশ প্রেজেন্ট লাগছে, না ?

হুঁ ।

আপনাকে এই স্যুটটা পরে কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, ঋজুদা ।

তাই বুঝি ? কাপড়টা তো তুমিই পছন্দ করে দিয়েছিলে, মনে নেই ?

হ্যাঁ । মনে আছে ।

বললাম, নয়না, তোমার কাছে আমার যে চিঠিগুলো আছে, সেগুলো এক-জায়গা করে রেখো । আমি একদিন গিয়ে নিয়ে আসব ।

নয়নার চোখ দুটি জ্বলে উঠল । বলল, কেন ? ও চিঠিতে আপনার কী অধিকার ? ও চিঠি তো আমার চিঠি ।

বললাম, তা ঠিক । কিন্তু এগুলো আমার মনের অসংবদ্ধ প্রলাপ ছাড়া আর তো কিছুই নয়—আমার ডাইরীও বলতে পারো । তাছাড়া চিঠিগুলোর দাম যখন কিছুই নেই ।

ও উত্তেজিত গলায় বাধা দিয়ে বলল, অনেক দাম, অনেক দাম । আপনি কী বুঝবেন ? দাম ফেরত দিতে পারি না বলে কি দাম বুঝতেও পারি না ঋজুদা ! আমাকে এত হীন ভাবেন কেন ?

এরপর আর কোনও কথা চলে না ।

পুডিঙের প্লেটে চামচ দিয়ে কাটাকুটি করতে করতে নয়না বলল, মনে আছে ঋজুদা, একদিন আমি আপনাকে শুধিয়েছিলাম, ভালবাসলে কী করতে হয় ? উত্তরে আপনি বলেছিলেন, জানি না । তখন আমিও বলেছিলাম, আমিও জানি না । অথচ আমরা দুজনেই জানতাম যে, দুজনেই মিথ্যা কথা বলছি । বলুন ? সত্যি না ?

আমি বললাম, হয়তো সত্যি । কিন্তু তাতে কী ? সে তো অনেক পুরনো কথা ।

নয়না বলল, উঠুন ।

চলো ।

ফিরপোর গালচে-ঢাকা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মাঝ বরাবর এসে দু'পাশে ক্যাবারে ড্যান্সারদের ছবি যেখানে আছে, সেখানে নয়না থমকে দাঁড়াল । বলল, ওরাও নিশ্চয়ই কারও না কারও ভালবাসা পেয়েছে । না ?

বললাম, হয়তো পেয়েছে ।

ও বলল, ঈস্—ওদেরও কেউ-না-কেউ ভালবাসে, অথচ আমাকে কেউ ভালবাসে না ।

আমার ভালবাসাটা ও ধর্তব্যের মধ্যেই ধরে না কোনওদিন, তা ভালভাবে জেনেও সেই মুহূর্তে ওর হাতটা মুঠি করে ধরে বললাম, তোমাকেও অনেকে ভালবাসে । আমিও তোমাকে ভালবাসি । ওদের সঙ্গে তোমার নিজেকে তুলনা করার দরকার কী ? তুমি যেন কী হয়ে যাও মাঝে মাঝে ।

বলতেই, ধুলো-মাখা চড়াইয়ের মতো ও ফুলে দাঁড়াল ; বলল, দরকার নেই ? কেন দরকার নেই ? আমাকে যে কেউ ভালবাসে না তার প্রমাণ আমি পেয়েছি, কিন্তু আমাকে যে কেউ ভালবাসে তারই প্রমাণ পাইনি ।

গাড়িতে উঠে নয়না বলল, গঙ্গার ধারে চলুন । এখনও হাতে অনেক সময় আছে ; আপনার সঙ্গে ছিলাম জানলে মা রাগ করবেন না ।

গঙ্গার ধারে রাতে বিশেষ লোকজন নেই, দুটো-একটা গাড়ি এখানে-ওখানে পার্ক করানো আছে । জাহাজে আলো জ্বলছে । এখন জোয়ার । কুলকুল করে জল এসে পাড়ে লাগছে ।

গাড়িটা একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে দাঁড় করাতেই নয়না সরে এসে আমার গায়ে ঝুঁকে পড়ে অস্বস্তি-ভরা গলায় আমাকে বলল, এই ! আপনার হাতটা আমার হাতে রাখুন ।

অবাক হলাম ।

একদিন আমি ওর হাতটি আমার হাতে ধরতে চেয়েছিলাম । সেদিন ও ঠাট্টা করে বলেছিল, আজ বুঝি বাংলা ছবি দেখে এসেছেন ? নইলে এত ঢং কীসের ? সেদিন ও বোঝেনি, জানেনি যে, যাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ সত্যিকারের ভালবাসে তার হাতে হাত রাখার মতো মহৎ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কোনও কথা বললাম না।

আমার বাঁ হাতটি ওর কোলে রাখলাম।

ও ওর দু হাতের পাতায় আমার হাতটি নিয়ে বসে থাকল। মাথাটি আমার কাঁধে হেলিয়ে রাখল।

পাশ দিয়ে হেডলাইট জ্বেলে একটি গাড়ি গেল।

ভাবলাম, লজ্জা পেয়ে ও এবার সরে বসবে।

কিন্তু পরক্ষণেই একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। নয়না আমার বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফুলে ফুলে কিন্তু প্রায় নিরুচ্চারে কাঁদতে লাগল।

আমি কী করব জানি না। আমি সাধারণ। যে নয়নাকে আমি আমার অস্তিত্বের সর্বস্বতা দিয়ে, ভিখিরির মতো, কাঙালের মতো এতদিন চেয়ে এসেছি—যাকে ভুলে থাকার চেষ্টায় নিজেকে তিল তিল করে ক্ষইয়ে ফেলেছি—মনোসংযোগ নষ্ট করেছি, শরীর নষ্ট করেছি, আত্মঘাতী আর্তিতে অনুক্ষণ অনন্ত অস্বস্তি পেয়েছি—সেই নয়না আজ আমার বুকে থরথরিয়ে কেঁপে মরছে। ভবিষ্যতের স্বপ্নভরা কুঠুরীর চাবিকাঠি এখন আমার হাতের মুঠোয়।

এখন আমি কী করি ?

আমার সাদা জামায় ওর লিপস্টিকের টিপ লেগে একাকার হয়ে গেছে। কপালের টিপটি ধেবড়ে গেছে। রুক্ষ শ্যাম্পু করা চুলগুলো এলোমেলো। নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস বইছে, চোখের পাতা ভেজা। নয়না কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ঋজুদা, আমি একদম ফুরিয়ে গেছি—একদম ফুরিয়ে গেছি ঋজুদা। ওর মতো শান্ত, সংযত স্বল্পবাক বুদ্ধিমতী মেয়ে যে এমন হয়ে যেতে পারে তা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

গাড়িটা স্টার্ট করে খুব আস্তে আস্তে চালাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে এক ঝলক ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, দোলের আর দেরি নেই। মনে মনে অনেকদিন ভেবেছিলাম, নয়নাকে নিয়ে মণিপুরে একবার দোল-পূর্ণিমায় যাব—ওকে ঝুলন দেখাব। লকটাক্ হ্রদের পাশে দুজনে, একেবারে দুজনে—সঙ্গে আর কাউকে না নিয়ে—পিকনিক করব ; থৈবীখাম্বার নাচ দেখব। দোল আসছে। দেখতে দেখতে একটা বছর ঘুরে গেল।

মনে হল, নয়না যেন কিছুটা ফিরে পেয়েছে। সরে বসল। সরে বসে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। চুপটি করে। সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে গাড়িটা দাঁড় করালাম। আয়নাটা ঘুরিয়ে দিলাম ওর দিকে। গাড়ির ভেতরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে ওকে বললাম, নাও তো লক্ষ্মী মেয়ে, মুখটা আর কপালটা ভাল করে মুছে নাও তো। বাড়িতে বলবে কী ? ছিঃ ছিঃ। সঙ্গে চিরুনি আনতে ভুলে গেছ বুঝি ?

বাচ্চা মেয়ের মতো ও মাথা নাড়ল।

আমি আমার পার্স থেকে বের করে ছোট চিরুনিটা ওকে দিলাম। চুপ করে ও রুমাল দিয়ে চোখ মুছল, মুখ মুছল, চিরুনি দিয়ে কপালে-পড়া চুল আর এলোমেলো অলকগুলোকে ঠিক করে নিল।

হঠাৎ ওর চিবুকে হাত ছুঁইয়ে ওর মুখটা আমার দিকে ঘুরিয়ে বললাম, দেখি ? খুকি হাসো তো একটু।

কান্না-ভেজা চোখে আমার পাগলামিতে ও ফিক করে হেসে উঠল—বলল, অসভ্য কোথাকার !

বললাম, আমি অসভ্য ?

বলতেই, ও আবার কাঁদতে লাগল।

আমি বললাম, আবার কাঁদলে কিন্তু এখানেই থাকতে হবে সারারাত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বোকা মেয়ে। এই নাকি তুমি আমার এত গর্বের নয়নাসোনা ? একটা বাজে ছেলের কাছে তুমি হেরে যাবে ? নীতীশ তোমার পায়ের নখের যুগ্যি নয়। তোমাকে ব্যথা দিয়েছে বলে বলছি না। সত্যি সত্যিই বলছি। তোমার যোগ্য ছেলে যে নেই তা নয়, অনেক আছে এবং একদিন না একদিন এত বড়

www.BanglaBook.org

কলকাতা শহরে তাদের কারও-না-কারও সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাবেই। ইয়াং, হ্যান্ডসাম, বুদ্ধিমান, মদ-খায় না-একটুও ; ঠিক যেমনটি তুমি চাও। শুধু তুমি নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ো না।

ওর কান্না-ঝরা চোখের মণিতে ও যেন কোনও নতুন ঋজুদাকে আবিষ্কার করল, যাকে ও কোনওদিন জানেনি—আমিও কি ছাই এই—আমিকে চিনতাম ?

নয়নাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। নয়না গাড়ি থেকে নামবার সময় আমার বাঁ হাতটি ওর হাতে নিল। তারপর কান্না-কান্না গলায় বলল, আপনি যদি না আসেন, কিংবা ফোন না করেন, তাহলে ভীষণ খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।

বললাম, আসব পাগলী মেয়ে, নিশ্চয়ই আসব। একশোবার ফোন করব।

১৫

ক্লাবে সপ্তাহে তিনদিন বুকিং করেছি। রাতে মার্কারের সঙ্গে প্র্যাকটিস করি। অফিস করি, গরমে পুলোভার পরে টেনিস খেলি, তারপর বাড়ি এসে চান করে ঘুমোই। বন্ধু-বান্ধবেরা আমায় প্রায় অনেকদিন হল ত্যাগ করেছে—এক জঙ্গলের বন্ধুরা ছাড়া। শহরের বন্ধুদের তো কোনও সময়ই দিতে পারি না—তাই ওরাও অনেকদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করে করে, অবশেষে আমায় পুরোপুরি ত্যাগ করেছে। ওদের দোষ দিই না।

আজকে বিয়ান্দকারের সঙ্গে বাজি ছিল, যদি ও আমাকে হারাতে পারে তো ওকে একদিন লাঞ্চ খাওয়াতে হবে। জিততে পারলাম না। হেরে গেলাম। কবে কোন প্রতিযোগিতাতেই বা জিতেছি ? ওর সার্ভিসটা খুব জোরালো আর ব্যাকহ্যান্ডে ক্রশকোর্ট যা মার মারে তা বলার নয়। দারুণ দারুণ মার আছে ওর হাতে।

ভাবলাম, ক্লাবেই চান করে, কিছু খেয়ে, রাত ন'টার শোয়ে কোনও সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরব।

অন্ধকারে হার্ড-কোর্টগুলো পেরোচ্ছি, এমন সময় মনে হল ওপাশ থেকে সুজয় আসছে।

ওকে দেখে বিয়ান্দকার বলল, হ্যালো চাড্ডী। হ্যাভন্ট সিন ইউ সিন্স্ এজেস্।

সুজয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ইয়া ম্যান, আই ওজ টু বীজি। আই এ্যাম ফ্লাইং দ্য ডে আফটার টু-মরো।

জানতাম ও যাচ্ছে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে যাচ্ছে জানতাম না। অনেকদিন ওদের বাড়ি যাই না। নয়নার সঙ্গেও দেখা বা কথা হয় না। অতএব জানার সুযোগও হয়নি। অবাক হলাম। একটু লজ্জিতও হলাম।

সুজয় বলল, ঋজু, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

বিয়ান্দকার, সী ইউ এগেন বলে চলে গেল।

বললাম, কী কথা রে ?

ও বলল, সময় লাগবে। চল। লনে গিয়ে বসি।

ক্লাবের লনে বেতের চেয়ার পাতাই ছিল। আমরা গিয়ে বসলাম।

কিছু খাবি ?

ও বলল, নাঃ, থ্যাঙ্কস।

ও যেন কেমন ইচ্ছে করে ফর্ম্যালি হয়ে যাচ্ছে। এ রকম ও ছিল না।

মনে হল সুজয় এমন কিছু একটা বলবে আমাকে, যার জন্যে আমি মনে মনে প্রস্তুত নই। ওর মুখটা দেখে ও যে আমার কলেজের বন্ধু সুজয়, তা মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল ওকে আমি চিনি না। অন্তত, ও আমার বন্ধু নয়।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ও বলল, সোজাসুজিই বলি কথাটা। দ্যাখ ঋজু, অন্য কোনও ছেলে হলে আমি হয়তো কিছু ভাবতাম না, কিন্তু তোর এমন কীর্তি ? ভাবতে পারি না।

চমকে উঠলাম আমি।

বললাম, কী কীর্তি ?

www.BanglaBook.org

কী, তা তুই জানিস না ! নয়নাকে তুই ভালবেসে চিঠি লিখিস ! তোর লজ্জা করে না ?

আমি চুপ করে থাকলাম।

ওকে বলতে পারতাম যে ভালবাসি, ব্যস্। ওই পর্যন্ত। তার জন্যে আমার নিজের ছাড়া অন্য কোনও ক্ষতিই কারও আমি করিনি। নয়নারও না। কিন্তু ভালবাসি।

এটা অস্বীকার করতে পারি না। ভেবে দেখলাম, এ সব কথা সুজয় বুঝবে না। গত তিন-চার বছর হল ওর বন্ধু-বান্ধবের দল সব অন্যরকম হয়ে গেছে। ও আমার কথা বুঝতে পারবে না। বোঝাতে চাইলেও বুঝবে না।

একেবারে বদলে গেছে সুজয়। ও কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। তাই চুপ করেই রইলাম।

ও রেগে গেল। বলল, কী ? চুপ করে আছিস যে ?

বললাম, কী জানতে চাস বল ?

জানবার কিছু তো বাকি নেই। তোর জন্যে নীতীশ নয়নাকে রিফিউজ্ করেছে। তুই আমাদের পরিবারের শনি। আমার পরিচয়ে আমাদের বাড়ি গিয়ে কি তুই আমাদের এই উপকার করলি ? নীতীশকে তুই কী বলেছিস নয়নার নামে, বল !

বললাম, কিছুই বলিনি।

ও ধমকে বলল, মিথ্যা কথা।

অনেকদিন আমি অত রেগে যাইনি। আমার সারা গা থরথর করে কাঁপতে লাগল, বললাম, তুই আমার কাছে মার খাবি সুজয়। ভদ্রভাবে ও বুঝে-সুঝে কথা বল।

ও বেশ চেঁচিয়ে বলল, তাহলে কি তুই বলতে চাস, নয়না খারাপ ? আমার বোনই খারাপ ?

বললাম, তোর বোন খারাপ নয়। তোর চেয়ে অন্তত অনেক ভাল।

সুজয় বলল, দ্যাখ ঋজু, তোর কাছে আমি তত্ত্বকথা শুনতে আসিনি। তোর সঙ্গে কথা বলাও বৃথা। তুই একটা ইডিয়ট। ফার্স্টক্লাস ইডিয়ট। একটা কথা শোনো, আমি কলকাতা থেকে যাবার আগে তোমাকে কথা দিয়ে যেতে হবে আমায়।

কীসের কথা ?

তুমি আমাদের বাড়ি যাবে না, আমাদের বাড়ি ফোন করবে না এবং আমার বোনকে চিঠি লিখবে না। যদি তুমি এ কথা না দাও, তাহলে খারাপ হবে।

খারাপ হবে মানে ?

মানে, অনেক কিছু হতে পারে।

কী ভাবে সুজয়টা আমাকে ? কী ভাবে ও ? তখন আমার রাগ আর নেই। দুঃখে, অপমানে, নয়নার উপর অভিমানে, আমার তখন কান্না পাচ্ছিল।

সুজয় বলল, তুই জানিস ? তোর চিঠি নয়না সকলকে পড়ায় ? টেবিলের উপর রেখে দেয়, খোলা-ড্রয়ারে রাখে। যে আসে সেই পড়ে। তোকেও আমি ভালবাসি ঋজু। অন্তত ভালবাসতাম। এতে তোর জন্যেও কষ্ট হয়। তোর কি মানসম্মান বলে কিছুই নেই ? ও আমার বোন হোক আর যেই হোক, ও কী এমন মেয়ে যে, তুই ওর পায়ে চুমু খেতে চাইবি, পা ধরতে চাইবি ? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? তোর কি মানসম্মানবোধ সব লোপ পেয়ে গেছে ? তোর জন্যে আমার মাথা কাটা যায়। এটুকু তুই জানিস যে, নয়না তোকে ভালবাসে না, কোনওদিন ভালবাসেনি। বাসবেও না কোনওদিন।

চুপ করে রইলাম।

কী ? কথা বলছিস না যে ?

বললাম, জানি তা।

চেঁচামেচিতে বেয়ারা দৌড়ে এল। সুজয় মুখ রক্ষা করার জন্যে স্মার্টলি বলল, দোগো কোকাকোলা লাও।

আমি আর কোনও কথা বললাম না।

নয়নার নিজের হাতে অনেক অপমান সয়েছি। আজ সুজয়ের কাছেও অপমানিত হয়ে আমার

www.BanglaBook.org

অপমানের ঝুলি পূর্ণ হল। সুজয় আমার কাছে যে কথা চেয়েছিল, তা তাকে দিলাম।

সুজয় আমাকে আরও অনেক কথা বলল। বলল যে, নীতীশ খুব ভাল ছেলে—নিছক আমার ভালবাসাটা স্পেল করেই ও অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য হল। আরও আরও আরও অনেক কথা বলল। তা আমার কানে গেল না। আমি তখন বসে বসে অনেক কিছু ভাবছিলাম। অনেক পুরনো কথা। ভাবছিলাম, ও নয়নার কথাটা একবারও ভাবছে না! নয়না কি সুজয়ের রিস্টওয়াচ যে, ও যাকে খুশি তার হাতে তাকে পরিয়ে দেবে? নয়নার কি নিজের মন বলে কোনও জিনিস নেই? নীতীশ যদি নয়নাকে রিফিউজ করে থাকে, তাতে নয়নার হার হয়নি কোনও। তাছাড়া আমার এতে কী করার ছিল? উত্তীয় যেমন করে শ্যামাকে ভালবাসত আমি তো নয়নাকে তেমনি করেই ভালবেসেছি। নিজের মৃত্যু ছাড়া আমার তো অন্য কিছু পাওয়ার ছিল না। নীতীশ ওকে বিয়ে করলেও ছিল না। এখনও নেই। কোনওদিনও থাকবে না। আমার সঙ্গে সুজয় এমন করে নোংরা ভাষায় কথা বলছে কেন?

তাছাড়া নয়না আমার সঙ্গে এ কী করল? আমার চিঠিগুলি কি এতই মূল্যহীন? ওর চোখে আমার সবকিছুই কি এতখানি সস্তা হয়ে গেছে? আমার এক্ষুনি গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, কী এমন আমি অন্যায় করেছি, ওর কাছে, নীতীশের কাছে, মাসীমার কাছে যে, সুজয় আমাকে ওদের পরিবারের শনি বলে ভাবতে পারে? ওদের সকলের জন্যে, নয়নার জন্যে, এই ক'বছর যত কল্যাণকামনা, যত মঙ্গলকামনা করেছি, তার একভাগও নিজের জন্যে করলে আমি আজ এমন ভাবে সুজয়ের মতো ছেলের হাতে অপমানিত হতাম না।

বুঝতে পারিনি, নয়নাকে আমি চিনতে পারিনি, হয়তো কোনওদিনও চিনতে পারব না। আমি ওকে কুটিল, নীচ, নোংরা, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন বলে কোনওদিন চিনতে চাই না। তার চেয়ে আমার চোখে ও অপরিচিতই থাকুক। আমার চোখের অপরিচয়ের সূচ্যন্ধকারে ও যে মহিমাময়ী মূর্তিতে বিরাজ করছে সেই মূর্তিতেই বিরাজ করুক। আমার সব দুঃখ আমি সইতে পারব, কিন্তু মনে মনে যে নয়নাকে চিনি সে নয়নাকে আমি কোনওদিন অন্য নয়না বলে ভাবতে পারব না।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছিল, কিছু হয়েছিল; যে কারণে ও আমার চিঠিগুলির এমন অসম্মান করেছে। কোনওদিন জানতে পারব না, কী ঘটেছিল।

কানের কাছে সুজয়ের গলাটা কেবল ঝমঝম করছিল—

ঋজু, তুই একটা ইডিয়ট; একটা ফার্স্টক্লাস ইডিয়ট।

সুজয় অনেক কথা বলছিল, হাত নাড়ছিল; আমার কানে কিছুই যাচ্ছিল না।

সুজয় একসময় উঠল। ক্লাবের ভাউচার সই করল। আমার কাঁধে হাত রাখল। বলল, চলি রে।

বললাম, আয়।

ক্লাব থেকে সোজা বাড়ি এলাম। এসে খেলার জামা-কাপড় না-ছেড়েই ড্রয়ার ঘেঁটে ঘেঁটে নয়নার সেই চিঠিটি বের করলাম। সেই দিনে সে চিঠিটির বিশেষ ভূমিকা ছিল।

অনেকদিন আগে লেখা চিঠি। একটা ইনল্যান্ড লেটার।

৮।৯।৬৪

ঋজুদা,

এবারে আর Romanticism চলে না। বাড়িতে ফিরে এসেই ব্যাগ খুলে দেখলাম যে, আর একটি চিঠি রয়েছে।

প্রথমে বলতে ইচ্ছা করল—"আহা কী পাইলাম···ইত্যাদি···।" কিন্তু যখন দেখলাম যে, সেই পুরনো চিঠিটা নেই, আপনি চুরি করেছেন, তখন খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আপনার ওই চিঠিটা আমার এত ভাল লাগত যে আমি সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম। লাইব্রেরিতে বসে সময় পেলে পড়তাম। বার বার পড়তাম। আমার আশা যে, আপনি চিঠিটা আমাকে ফেরত দিয়ে দেবেন।

আজকের চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে, আপনি আমাকে আর চিঠি দেবেন না—আর, কেন দেবেন না তাও লিখেছেন। কিন্তু আপনি ওই সামান্য ব্যাপারের জন্য যদি আমাকে চিঠি দেওয়া বন্ধ

www.BanglaBook.org

করেন তবে সেটা আমারই দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিতে হবে।

কিন্তু আজকে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আপনার চিঠি আমি আর কাউকে দেখাব না।

এর পরেও আমি আর আপনাকে চিঠি দেবার জন্য অনুরোধ জানাব না, শুধু এইটুকুই বলি যে, আপনার চিঠি পেতে আমার খুব ভাল লাগে—যার জন্যেই হয়তো ইডিয়টের মতো সকলকে তা দেখিয়ে বেড়াই।

সবশেষে বলি, আপনার ধারণা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোনওদিন আমিই নাকি আপনাকে ইডিয়ট বলে প্রতিপন্ন করব, আর এ কথা আপনাকে নাকি আমার দাদাই বলেছে। দাদাই বলুক আর যেই বলুক—আপনি যদি এ কথা মেনে নেন—তবে বলব যে, আপনি এখনও আমাকে ঠিক চিনতে পারেননি।

শেষ করি।

নয়না।

১৬

আজ দোল-পূর্ণিমা।

সারা সকাল বাইরে যাইনি। দুপুরেও না। বিকেল থেকে বাগানের বেতের চেয়ারে বসে আছি। একটি সর্বপ্রকাশী হলুদ চাঁদ আকাশ ছেয়ে উঠেছে। রঙ্গনের ডালে একজোড়া বুলবুলি পাখি ডেকে ডেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে বাতাসে এক আদিগন্ত ভাল-লাগা। অথচ আমার কোনও ভাগ নেই এতে।

সকালে বাড়িতে অনেকে আবীর খেলতে এসেছিলেন। চতুর্দিকে, দেওয়ালে, মেঝেতে, বাগানে আবীরের দাগ। লনেও আবীর পড়ে রয়েছে। তার উপরে খালি পায়ে, মিনুর পাঁচ বছরের মেয়ে মিঠুয়া ঘুরে ঘুরে কাঁপা-কাঁপা গলায় গাইছে—

"ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছ পাতায় পাতায় ডালে ডালে···ও আমার···"

চুপ করে বসে বসে ওকে দেখছি। আমার অনেক কিছু ইচ্ছে ছিল, এ জন্মে তার কিছুই পূরণ হল না। মিঠুয়াকে আমি নয়নার মতো অনন্যা করে বড় করে তুলব। নয়নার মতো সেও কম কথা বলবে, চোখ দিয়ে হাসবে, অমনি সংযতা হবে, নয়নার মতন করে ব্যথা পেতে জানবে এবং ব্যথা দিতে জানবে না। মিনুর কাছ থেকে মিঠুয়াকে আমি চেয়ে নেব। তারপর একটি একটি করে আমার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিকে ওর মধ্যে আমি পুঁটিলেখা ফুলের পাপড়ির মতো ফুটিয়ে তুলব। তারপর, মিঠুয়া যখন বড় হবে, তখন একদিন প্রৌঢ়া নয়নার কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে বলব, এই দ্যাখো, তোমার পুরনো-তুমিকে আমি ফিরিয়ে এনেছি। তখন নয়না হয়তো লজ্জিত হবে, বিব্রত হবে, ওর হ্যান্ডসাম এক্সিক্যুটিভ স্বামীর সামনে অপ্রতিভ হবে, বলবে : কী ছেলেমানুষী করছেন ঋজুদা?

দিনের আলোর গভীরে রাতের কোনও তারাই থাকে না। ও সব মিথ্যে কথা ; বানানো কথা। আমার নয়না আমাকে একেবারে ভুলে যাবে। যা হবার তা হয়ে গেছে এ জন্মের মতো।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। যতীন এসে বলল, দাদাবাবু, তোমার ফোন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরে গেলাম।

ইয়েস্। ঋজু কথা বলছি।

ঋজুদা? আমি নয়না।

কোনওদিন নয়না আমাকে নিজে ফোন করেনি। মানে, নিজে থেকে। দায়টা বরাবর আমারই ছিল। তাই আশ্চর্য হলাম।

বললাম, কী ব্যাপার?

কী ব্যাপার? এতদিন তো দেখাই নেই, আজও এলেন না। ভেবেছিলাম সকালে আসবেন। বেলা একটা অবধি আপনার জন্যে চান না করে বসেছিলাম।

সত্যি কিছু মনে কোরো না। কোথাওই যাইনি। তারপর একটু থেমে বললাম, তোমরা বুঝি খুব

www.BanglaBook.org

মজা করলে ?

কীসের মজা ?

তোমার বন্ধু-বান্ধবীরা আসেনি এবার ?

এসেছিল। ওরা সবই এসেছিল। খুব হৈ হৈ হয়েছিল। কিন্তু মজা হয়নি।

কেন ?

জানি না।

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরময়। সমস্ত কলকাতা শহরটা দোল-পূর্ণিমার হাসনুহানা রাতে একটি হাসিনী হলুদ বেলুনের মতো হাওয়ায় উড়ছে। আমার ঘর এমনিতে আজ অন্ধকার। বাল্‌বটা কেটে গেছে। আকাশের হলুদ ঝাড়লণ্ঠন নিভে গেলে হয়তো অন্ধকারেই থাকবে। হয়তো আলো জ্বলবে না আর।

নয়না বলল, কী হল ? কথা বলুন ?

কী কথা বলব ? সব কথাই তো আমার বলে ফেলেছি। তাই চুপ করেই রইলাম।

কী হল ?

বললাম, পড়াশুনা করছ তো ? ফার্স্টক্লাস পেতে হবে কিন্তু। মনে থাকে যেন।

পেয়ে কী হবে ?

কী হবে তা জানি না। অন্তত নিজে সার্থক হবে।

কেবলমাত্র নিজের জন্যেই যারা সার্থক হতে চায় তারা কিন্তু স্বার্থপর।

তুমিও ?

জানি না। হয়তো আমিও। ভাল করে ভেবে দেখিনি কখনও।

তুমি ফার্স্টক্লাস পেলে আমার কিন্তু খুব গর্ব হবে।

জানি আমি। যদি পাই তো সেটা হয়তো পাওয়ার একটা কারণ হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

জাস্টিস মুখার্জির বাড়ির গাড়োয়ালি দারোয়ান বাঁশি বাজাচ্ছে। বাঁশির বেদনার সুর কেঁপে কেঁপে হাওয়ায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। যেন নীল আকাশে সাঁতার কেটে উপরে পৌঁছে চাঁদের হলুদ লণ্ঠনকে ব্যথায় নীল করে দেবে।

কতদিন পরে নয়নার সঙ্গে কথা বলছি। কী যে ভাল লাগছে !

আপনি যেন কেমন হয়ে গেছেন ঋজুদা !

কেন ?

আগের মতো করে কথা বলছেন না তো আমার সঙ্গে !

আসলে আমি ভুলে গেছি, আগে তোমার সঙ্গে কী করে কথা বলতাম। তুমি কী শাড়ি পরে আছ আজ ?

বলব না।

কেন ?

খুশি।

বোকামি কোরো না নয়না। কোনওদিন কি আমি বড় হব না ?

না। আপনাকে আমি কোনওদিন বড় হতে দেব না।

আমি চুপ করে রইলাম।

কই ? তবু কথা বলছেন না যে ?

আমাদের এখানে দারুণ চাঁদ। আমার ঘরে আজ আলো জ্বলেনি। চাঁদের আলোয় ঘর হলুদ হয়ে আছে।

তাহলে আপনার হলুদ-বসন্ত পাখিকে সে ঘরে ডাকছেন না কেন ? এই নামের জন্যে কিন্তু আমার ভারী গর্ব, ঋজুদা। অন্য কাউকে আপনি এ নামে ডাকতে পারবেন না। এ আমার একান্ত নাম।

কোনও জবাব দিলাম না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী ? কিছু বলবেন ? না ফোন ছেড়ে দেব ?

এই তো ভাল। তোমার কথা শুনতে ভাল লাগছে। তুমিই বলো।

হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়াতে ও বলল, মনে পড়ে গেল পাখির কথায় ; বলুন তো এই লাইন দুটি কার ? বলেই সুর করে টেনে টেনে আবৃত্তি করল—

"সুখ নেইকো মনে,
নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে
হলুদ বনে বনে···"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, কী ? জানেন না তো ?

বললাম, পংক্তি ক'টি দারুণ। তবে কার লেখা জানি না।

অনেকক্ষণ ও চুপ করে রইল, তারপর বলল, আপনি কিছুই জানেন না। আপনি নিজেকে জানেন ?

বললাম, আমি নাই বা জানলাম। তুমি তো জানো।

ও বলল, জানি। মুখে বলি না বলে কি ভাবেন জানি না ? আমি সব জানি। এমন অনেক কথা আছে যা না বললেই অনেক স্পষ্ট করে বলা হয় ! আপনি হয়তো বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমি করি। আসলে আজকাল আপনি আমাকে দেখতে পারেন না। একটুও ভালবাসেন না, কিচ্ছু না ; খারাপ।

আমার জবাবের আগেই শুনতে পেলাম ও রিসিভারে মুখ রেখেই উঁচু গলায় বলল—যাচ্ছি মা।

তারপরই বলল, ঋজুদা, কারা যেন এসেছেন, মা একা আছেন, আমায় ডাকছেন। আজকে রাখি, হ্যাঁ ?

রিসিভার রাখতে রাখতে তাড়াতাড়ি বলল, বলুন কবে আসবেন ? এবার থেকে রোজ আসতে হবে।

বললাম, আসব, দেখো ঠিক আসব।

সত্যি ?

সত্যি।

নয়না একদিন বুঝতে পারবে যে আমি আমার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আর কোনওদিন ওর কাছে গিয়ে নির্লজ্জের মতো কাঙালপনা করব না। এতদিন তো ভিখিরির মতোই ভালবেসেছি—কিন্তু সেদিন আমায় যে রাজমুকুট ও নিজে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল সে মুকুট খুলে ফেলার মতো এত বড় হীন আমি কী করে হব ? রাজার অভিনয় করে আমি আমার অনন্যা নয়নার সমকক্ষ হব। ও একদিন সবই জানবে। সবই জানতে পাবে। কিন্তু ও কোনওদিন জানবে না যে, আমার এই বুকভরা আর্তি থাকবেই। ওর সঙ্গে দেখা হলেই ভিতরের ভিখিরিটা রাজার মুখোস ছিঁড়ে ফেলে হাঁটু গেড়ে বসে ভিক্ষা চাইবেই।

এই ভাল। দেখা না হওয়াই ভাল। কথা না হওয়াই ভাল। তার চেয়ে আমার দুরন্ত লোভগুলি আমার বুকের ভিতরেই ঘুমিয়ে থাকুক অথবা বুকের ভিতরেই ঘুম-ভেঙে উঠে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে ক্যানসারের মতো কুরে কুরে খেয়ে ফেলুক ; তবু নয়না আমার সুখে থাকুক, খুশি থাকুক। আমার অশেষ আর্তি তার সুখকে কোনওদিন যেন বিঘ্নিত না করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেলা যখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গড়িয়াহাটার মোড়ে বাস থেকে নামতেই দেখলাম সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। কারণ, রিহার্সাল শুরু হয়ে যাবার কথা ঠিক সাড়ে ছ'টায়। মোড় থেকে হেঁটে যেতে ভিড় ঠেলে অন্তত মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে।

খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে সত্যিই খুব রাগ হয়। গানের স্কুলে গান শিখব, তাতেও এত কড়াকড়ির কোনও মানে হয় ?

সুনীলদার তত্ত্বাবধানে রিহার্সাল।

তাড়াতাড়ি দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই দেখলাম রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে।

ঘরের বাইরে চটির সমুদ্র। কোনও রকমে তা পার হয়ে চোর-চোর মুখ করে ছেলেদের ঠেলেঠুলে এক কোণায় বসে পড়লাম।

একপাশে ছেলেরা বসেছিল, অন্যপাশে মেয়েরা।

সুনীলদা গাইতে গাইতেই চোখ দিয়ে একবার আমাকে চাবুক মেরে আস্থায়ী শুরু করলেন, "বাজাও তুমি কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর, দ্রব জীবন ঝরিবে ঝরঝর নির্ঝর তব পায়ে।"

গানটার ধরা ছাড়া ও ছোঁড়ার কাজ রীতিমতো কঠিন।

মনোযোগ দিয়ে সুনীলদার গান শুনতে লাগলাম। সুনীলদার গলা একেবারে সুরে বসানো। বড় নির্দ্বিধায় শুদ্ধ ও কোমল পর্দা ছমছম করে ছুঁয়ে যান উনি।

সুনীলদা অন্তরা ধরেছেন, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল তার দিকে।

তাকে এর আগে আমি কখনও দেখিনি। কিংবা হয়তো দেখেছি, লক্ষ করিনি। না, বোধহয় দেখিইনি। দু'দিকে দুই বিনুনী ঝুলিয়ে একটি বাসন্তি-রঙা শাড়ি পরে দু'কানে দু'টি রক্তকরবির দুল পরে সে বসেছিল।

কপালের উপরে যেখানে চুল শুরু হয়েছে সেখানে একটি কাটা দাগ।

মুখ নিচু করে সে বসেছিল আসন কেটে। তার বসার ভঙ্গির মধ্যে, তার চোখের উদাসীনতার মধ্যে কী যেন কী ছিল, যা আমাকে হঠাৎ চমকে দিল। এমনভাবে আর কোনও কিছু দেখেই আমি এর আগে চমকাইনি।

তার চারপাশের এই ঘনসন্নিবিষ্ট ছেলেমেয়েদের ভিড়ে তাকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ভাল করে চাইতেই বুঝতে পেলাম, সব কিছু মিলিয়ে তার সমপর্ণী উদাসীন ছিপছিপে অস্তিত্বে কোনও এক আশ্চর্য অসাধারণত্ব এলেবেলে অবহেলায় আরোপিত হয়ে ছিল।

আমার বুকের মধ্যে যেন কীরকম করছিল।

চোখ নামিয়ে সকলের সঙ্গে কোরাস গাইছিলাম।

কিছুক্ষণ পর সুনীলদা হঠাৎ গান বন্ধ করে ভুরু কুঁচকে বললেন, কে ? কে ? কোন জন ?

আমরা সকলেই চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকালাম।

উনি তর্জনী তুলে আমারই দিকে দেখিয়ে বললেন, তুমি, তুমি। তুমিও ? একেবারে 'ইউ টু

www.BanglaBook.org

ব্রুটাস'-এর মতো।

আমি তখন অন্য জগতে অবস্থান করছিলাম।

অবাক হয়ে শুধোলাম, কী?

সুনীলদা বললেন, কী-ই যদি বুঝবে, তাহলে তো দুঃখই ছিল না।

বেসুরো হচ্ছে। বেশ বেসুরো। মন দিয়ে খোঁজখাঁজগুলো তুলো। বুঝলে, রাজা!

মুখ নিচু করে রইলাম। কর্ণমূল গণ্ডমূল সব লাল হয়ে গেল। ঘরভর্তি ছেলেমেয়েদের সামনে কী বে-ইজ্জৎ!

আড়চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে হাসছে না বটে, কিন্তু তার পুরীয়া-ধানেশ্রী চোখে একটা দারুণ দুষ্টু হাসি স্থির হয়ে আছে।

"বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত" এই গানের পর একে একে কোরাসের আরও অনেক গান তোলা হল। দু'একটা ডুয়েটও ছিল।

এমন সময় সুনীলদা তার দিকে চেয়ে বললেন, ধর খুকী।

সুনীলদা হারমোনিয়াম বাজালেন। সেই খুকী শুরু করল, "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন।"

গানটা শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার মন বলতে লাগল, এমন গান আমি আর আগে শুনিনি। তার অঙ্গবয়সী চিকন গলার স্বরে কী যেন কী ছিল। জলতরঙ্গের মতো, ভোরের পাখির ডাকের মতো, বুকের মধ্যের নিঃশব্দ অথচ স্পষ্ট কান্নার মতো। আমার মনের মধ্যে এত দিন যত কিছু অধন্য ছিল, অধন্য থাকত চিরদিন—সেই সব কিছুকে তার গান ধন্য করে তুলল।

যতক্ষণ না গান শেষ হয়, আমি মুখ নিচু করে মোহাচ্ছন্নের মতো গানটা শুনছিলাম। গান শেষ হতেই মুখ তুলে তার দিকে চাইলাম।

সে সংকোচহীন সরল চোখ মেলে তাকিয়েছিল। কিন্তু আমার চোখে মুখে একটা বিরক্তি ফুটে উঠল।

পরক্ষণেই সে মুখ নামিয়ে নিল।

রিহার্সাল শেষ হল। আমিও প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেলাম। অথবা শূন্য হলাম। বুঝতে পারলাম না।

সকলে একে একে চলে গেল।

সুনীলদা নীচে গিয়ে মুরলীর বানানো চারটে ডিমের এক মস্ত বড় ওমলেট খেতে লাগলেন। সুনীলদা ডিম খেতে খুব ভালবাসতেন।

কিন্তু আমি তখনও বসেই রইলাম। একা-একা।

অনেকক্ষণ পর যখন সিঁড়ি বেয়ে চলে যাচ্ছি নেমে, সুনীলদা দেখতে পেয়ে বললেন, কী হে? রাগ হয়েছে নাকি?

আমি হাসলাম; বললাম, না। না।

মনে মনে বললাম, হয়েছে বিলক্ষণ। তবে আপনার উপর নয়।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে অনেকক্ষণ আয়নার সামনে বসে নিজেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করলাম। আমার মুখে কোনও সৌন্দর্য ছিল না, কিন্তু আমার চোখে চোখ পড়লে কেউ বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবে এমন কোনও কদর্যতা বা বৈকল্যও দেখতে পেলাম না আয়নায়।

সেদিন রাতে ভাল ঘুমোতেই পারলাম না।

তার গান শুনলাম এই-ই মাত্র। সে কে! তার বাবার নাম কী? সে কোথায় থাকে, কিছুই জানা হল না।

যদি জানতেও পেতাম যে, সে কে!

পরদিন অফিসে গিয়েই নড়িদাকে ফোন করলাম। মানে ফোন না করে পারলাম না।

নড়িদা আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল। ভাল গান গাইত। সব সময় ফিটফাট ফুলবাবুটি। আমরা

www.BanglaBook.org

গানের স্কুলে একই ক্লাসে ছিলাম। নড়িদা আমাকে খুব স্নেহ করত।

নড়িদাকে শুধোলাম, নড়িদা, কাল 'জগতে আনন্দযজ্ঞে' গাইল সে মেয়েটি কে ? জানো ?

নড়িদা বলল, কেন ? সে গান শুনে তোমার এত নিরানন্দ কেন ?

আমি বললাম, বলো না কে ?

নড়িদা হাসল।

বলল, আলাপ করার অসুবিধা নেই। ওদের বাড়িতে চলে যেতে পারো। ওরা খুব উদার। খুব ভাল পরিবার।

আমি বললাম, মহা মুশকিল তোমাকে নিয়ে, বাড়িটা কোথায় তাই বলো না ? ওর নাম কী ? ওর বাবার নাম কী ?

নড়িদা ফোনে খুব হাসতে লাগল। বলল, তোমার অবস্থা খুব খারাপ দেখছি।

আমি বললাম, প্লিজ বলো।

নড়িদা বলল, ওর নাম বুলবুলি। ওর বাবাকে তুমি দেখেছ।

আমি অবাক হলাম ; বললাম, কোথায় ?

নড়িদা বলল, আমাদের স্কুলের গৃহপ্রবেশের দিন সকালবেলা এসেছিলেন, মনে আছে ? একটা কালো ফিয়াট গাড়ি থেকে নামলেন, হাওয়াই শার্ট পরা, হাতে স্টেট-এক্সপ্রেসের টিন। বিজুদা গিয়ে হাত ধরে নিয়ে এলেন। মনে আছে ? তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে, এ ভদ্রলোক কে ? মনে নেই ? বুলবুলি ওঁর মেয়ে, রূপের বোন এবং বিজুদার ভাইঝি।

আমি বললাম, সর্বনাশ।

নড়িদা খুব হাসতে লাগল, বলল, কেন ? সর্বনাশ কেন ?

আমি বললাম, না। কিছু না।

বলেই, ফোন ছেড়ে দিলাম।

বিজুদার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই আমার ভয় করে। বোধ হয় অনেকেরই করে। যদিও তিনি আমার জ্যাঠামশাই নন, আমার অ্যাকাডেমিক প্রফেসর সাহা সাহেবও নন, নেহাত শখ করে যেখানে গান শিখতে যাই, তিনি সেখানের সর্বেসর্বা।

ভয় পাবার কোনও সঙ্গত কারণও নেই। কিন্তু কেন জানি না, ভীষণ ভয় হয়, কারণ না থাকলেও ভয় করে।

সে যে বিজুদার ভাইঝি, এ-কথা শুনেই মনে মনে ঠাণ্ডা মেরে একেবারে কুঁকড়ে গেলাম। আমি নির্ভয়ে বাঘের সামনে দাঁড়াতে পারি, কিন্তু বিজুদার ভাইঝিকে ভাল-লাগার মতো দুর্বিপাকে যেন আমাকে কখনও না পড়তে হয়, মনে মনে এই কথাই বার বার নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম।

রূপদাকে আমি চিনতাম। মানে, জাস্ট চিনতাম। এই পর্যন্তই।

চেহারাটা দারুণ ছিল। আর্টিস্ট। ভাল গান করতেন। অভিনয়ও ভাল করতেন ; 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় প্রত্যেকবার বাল্মীকি হতেন। স্টেজে যখন তিনি মেক-আপ নিয়ে বাল্মীকির সাজে খড়্গহাতে দাঁড়াতেন, যখন উইংস থেকে তার কাটা-কাটা শার্প মুখে রঙিন আলো এসে পড়ত, আর উনি গাইতেন,

"রাঙাপদযুগে প্রণমি গো ভবতারা !
আজি এ নিশীথে পূজিব তোমারে তারা"

তখন রূপদার প্রতি এক দারুণ স্তুতিতে আমার সমস্ত ছেলেমানুষী মন ভরে যেত।

তাই তাঁর বোন সে, একথা শুনে খুব ভাল লাগল।

সবই ভাল। একমাত্র অসুবিধা বিজুদা। বিজুদার কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসত।

মনে আছে, দূর থেকে এক ভদ্রলোক গান শিখতে আসতেন। উনি আমাদের ক্লাসেই ছিলেন।

ভদ্রলোক পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে, সেলুনে চুল-টুল কেটে, ঘাড়ে খুব করে সুগন্ধি পাউডার মেখে একদিন ক্লাসে এলেন।

ক্লাসের পর বিজুদা বললেন, দেখুন এটা একটা শিক্ষায়তন। এখানে এভাবে আসবেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি বললেন, তার মানে ? আমি কি পয়সা দিয়ে গান শিখি না ? আমি এখানে গান শিখতে আসি, আর কিছু করতে নয়। তা ছাড়া আপনি কি আমার লোকাল গার্জেন না আমি কিন্ডারগার্টেনের শিশু যে, আমি কী পরে আসব না আসব তা আপনি বলে দেবেন ?

বিজুদা বললেন, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। এরকমভাবে পায়জামা পরে এলে আপনাকে গান শেখানো হবে না। আপনাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হবে।

তিনি বললেন, কলকাতায় কি গানের স্কুলের অভাব ? ছেড়ে দিলে আমার কোনওই ক্ষতি নেই ; ক্ষতি আপনার, আমার মাইনেটা স্কুলে জমা হবে না।

বিজুদা বললেন, শুধু মাইনের বিনিময়ে আমরা কাউকে গান শেখাই না। আপনার মতো ছাত্রর জন্যে এ স্কুল নয়। আপনার এ মাসের মাইনেও ফেরত নিয়ে যাবেন। আপনি আর আসবেন না।

এ ঘটনা নিয়ে ছেলেদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল।

অনেকেই বলেছিল যে, এটা বাড়াবাড়ি।

আজ বিজুদা নিজেই সব সময় পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেন, কিন্তু যখনই পিছন ফিরে চাই, তখনই মনে হয়, সে ঘটনাটা একটা নিছক পায়জামাঘটিত সামান্য ঘটনা ছিল না।

সেই গানের স্কুলের মিলিটারি নিয়মানুবর্তিতা, গোঁড়ামি, বাড়াবাড়ি, এ সবের কথা এখন মনে পড়লে বার বার মনে হয় যে, বিজুদার মতো দু'-চার জন লোক আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে থাকলে দেশের ছেলেমেয়েদের বোধ হয় ভাল ছাড়া খারাপ হত না।

বিজুদাকে ভয় করতাম, সব সময় একটা দূরত্ব রেখে চলতাম। কিন্তু আমার ভীষণ ভাল লাগত বিজুদার স্ত্রীকে।

উনি আমাদের সকলেরই বৌদি ছিলেন। উনি যখন গরমের দিনে গা ধুয়ে ছাপা শাড়ি পরে বিকেলে স্কুলে ঢুকতেন, তখন কেন জানি না, ভাল-লাগায় মন ভরে যেত।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি আজ পর্যন্ত ওঁর চেয়ে বেশি রমণীসুলভতা কোনও রমণীর মধ্যে দেখিনি।

ওঁর চেহারা, কথা বলা, গান-গাওয়া সব মিলিয়ে উনি যখনই আমাদের মধ্যে থাকতেন কোনও ব্লক-প্রোগ্রামের মহড়ায় বা সরস্বতী পুজোর দুপুরের খিচুড়ির আসরে, ওঁর নরম মেয়েলি ব্যক্তিত্ব আমাদের সকলকেই এক দারুণ ভাল-লাগায় ভরিয়ে দিত।

যে-ক'দিন সমাবর্তন উৎসবের মহড়া চলল ততদিন আমার সেই গায়িকাকে রোজই দেখতে পেতাম ; কিন্তু এক মহড়া এবং অন্য মহড়ার মধ্যের ঘটনাবিহীন দিনগুলোতে ওকে একবার দেখবার জন্যে ভীষণ ছটফট করতাম।

অথচ দেখার উপায় ছিল না।

আমি এমন সপ্রতিভ ছিলাম না যে, সটান রূপদাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হই। উপস্থিত হলেও ব্যাপারটা বোকা বোকাই হত। ওর বাবার সঙ্গেই হয়তো দেখা হয়ে যেত। অথবা রূপদার সঙ্গে।

রূপদা বলতেন, কী ব্যাপার ? তুমি ? হঠাৎ ?

আমি বলতাম, এই কাছেই এসেছিলাম, তাই ভাবলাম ঘুরে যাই।

রূপদা বলতেন, আমি যে এক্ষুনি অফিসে বেরুচ্ছি। আর একদিন এসো, কেমন ? ছুটির দিনে।

আমি বলতাম, আচ্ছা।

তারপর নিজের ঠোঁট নিজে কামড়ে, নিজেকে অভিশাপ দিতে দিতে হয়তো বাড়ি ফিরে আসতাম।

তার চেয়ে এই-ই ভাল।

অনেকদিন পর পর তাকে একবার দেখা। তারপর না-দেখার দিনগুলোতে তার কথা ভেবে কাটানো।

তা ছাড়া অন্য মুশকিলও অনেক ছিল।

যেদিন গানের স্কুলে ভর্তি হলাম, মা বললেন, দেখিস, তুই যা ক্যাবলা, আবার প্রেমে-টেমে পড়িস না যেন। তোর নামে যেন কারও চিঠি-টিঠি না আসে ; ফোন-টোনও যেন কেউ না করে।

www.BanglaBook.org

এ-রকম অনেক প্রি-কন্ডিশান শিরোধার্য করে আমি গান শিখতে গেছিলাম। যদিও ছেলেদের ক্লাস ও মেয়েদের ক্লাস আলাদা আলাদা হত।

আমাদের বাড়িতে প্রেম ব্যাপারটা কুষ্ঠরোগের চেয়েও ভয়াবহ ছিল।

বাবা এসব ব্যাপারে কোনও আলোচনা কখনও করতেন না, তবে বাবা একবার নিরুৎসাহব্যঞ্জক চোখে তাকালেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত।

যা-কিছুই বলবার আমাদের, মা-ই বলতেন, বাবার নাম করে। তার মধ্যে বাবার বক্তব্য কতখানি ছিল সে সম্বন্ধে বাবার নিজের স্বার্থেই তদন্ত হওয়া উচিত ছিল।

কিছু হলেই, অথবা মা'র মনঃপূত নয় এমন কিছু হব-হব হলেই মা বলতেন, বাবা জানলে আর রক্ষা রাখবেন না।

সেই অরক্ষিত অবস্থাটার প্রকৃত স্বরূপ যে কী, সে সম্বন্ধে আমার অথবা ভাই-বোনেদের কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না; তবে সেটা গিলোটিনের চেয়ে যে কিছুমাত্র ভাল নয়, সে সম্বন্ধেও আমাদের মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

সুতরাং, একজনকে ভাল-লাগার আনন্দটাকে গিলোটিনের ভয় সব সময় ব্লটিং পেপারের কালির মতো শুষে নিত।

দেখতে দেখতে আমাদের সমাবর্তন উৎসব এসে গেল।

আশুতোষ কলেজের হলে সময়মতো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আমরা সকলে উপস্থিত হলাম। মেয়েরা সবাই সাদা জমি সবুজ পাড়ের শাড়ি পরে এসেছিল।

সেদিন আর কে কে গেয়েছিলেন ভাল মনে নেই। তবে তড়িৎদা গেয়েছিলেন, 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম, চোখের বাহিরে'। গানটা এখনও কানে লেগে আছে।

রূপদা যেন কার সঙ্গে ডুয়েট গেয়েছিলেন, বোধ হয় ইলা সেনের সঙ্গে, 'আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ।'

তারপর গেয়েছিল সে।

আমি যদিও শুধু কোরাসেই ছিলাম সেবার (এবং সারা জীবন তাই-ই থাকব জানতাম) তবুও আমাকে বসতে বলা হয়েছিল প্রথম সারিতে অন্য অনেকের সঙ্গে। রূপদা, তড়িৎদা সব প্রথম সারিতেই বসেছিলেন।

তার গাইবার পালা যখন এল তখন সে মেয়েদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল লঘু পায়ে, এসে তার ছিপছিপে সুগন্ধি শরীরে তড়িৎদার পাশে এসে বসল।

তাকে আমার এত কাছে বসতে দেখেই, আমার ভারী আনন্দ হচ্ছিল।

সেই গানটিই গাইল সে—একক—'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।'

গানের রেশ শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে থাকল, এবং ওর গান যে সকলকে মুগ্ধ করল, এই জানাটা আমাকে এক দারুণ অনধিকারীর গর্বে গর্বিত করে তুলল।

ও গান গেয়ে উঠে পিছনে যাবার সময় আমার হাঁটুর সঙ্গে ওর পা লেগে গেল।

অনেকক্ষণ আমি আর হাঁটু নাড়ালাম না একটুও—যেমন আসন করে বসেছিলাম, তেমন পদ্মাসনেই বসে রইলাম। আমার সমস্ত শরীর ও মন এক প্রসাদী পদ্মগন্ধে সুরভিত হয়ে গেল।

তড়িৎদা ফিসফিসে গলায় রূপদাকে বললেন কানের কাছে মুখ নিয়ে, ভারী ভাল গেয়েছে বুলবুলি।

আমি তড়িৎদার কথা রিপিট করে রূপদাকে বললাম, দারুণ গেয়েছে! তাই না?

রূপদা আমার দিকে মোটর-সাইকেলে চড়া লোক যেমন সন্দেহের চোখে পথের কুকুরের দিকে তাকান, তেমন চোখে তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, বলছ?

আমি সপ্রতিভতার ভান করে অপ্রতিভতাকে চাপা দিলাম, বললাম, বলছি।

মনে মনে রূপদার উপরে বেশ চটে গেলাম।

কিন্তু কী করব? বুলবুলির দাদার উপরে কি আমি রাগ করতে পারি?

সেই সন্ধ্যায় ওকে কিছুক্ষণ কাছে পাবার সুখটুকুকে, উৎসব শেষে ওকে আর দেখতে পাব না, এই

www.BanglaBook.org

ভাবনার দুঃখটা একেবারে ছেয়ে ফেলল।

সেদিন আশুতোষ কলেজ থেকে হাঁটতে হাঁটতে যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন সুখের বা দুঃখের জন্যে জানি না, মনের মধ্যে একটা ভীষণ ভার অনুভব করতে লাগলাম।

এর আগে কখনও আর আমাকে এমন সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক পাতা ডাইরি লিখলাম সেদিন।

তারপর "তোমাকে" এই শিরোনামায় একটা কবিতা লেখার উচ্চাশার নাগরদোলায় চেপে অবশেষে অনেক পাতা ছিঁড়ে, কলম কামড়ে রাত দুটো নাগাদ সেই কবিতাকে ঘুম পাড়িয়ে, নিজেও ঘুমিয়ে পড়লাম।

২

অফিস থেকে ফিরেই বাবা ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ঘরে।

বাবার ডাকের দুটো মানে হত। এক হয়তো কলম বা কোনও কিছু উপহার এনেছেন—সেজন্যে, নইলে কোনও অন্যায়ের শাসন করার জন্যে।

যখন সজ্ঞানে কোনও অন্যায় করতাম, তখন ডাক আসলেই বুঝতে পারতাম। যখন অজ্ঞানে করতাম, তখন দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবতাম, কী কী অন্যায় আমি অজ্ঞানে করে ফেলতে পারি!

সেদিন ঘরে ঢোকার আগেই শুনতে পেলাম, বাবা ও মা দু'জনে একসঙ্গে খুব হাসাহাসি করছেন।

ঘরে ঢুকতেই মা বললেন, কী রে? তোর বাবা লোক কীরকম তা তুই পথে পথে যাচাই করে বেড়াচ্ছিস?

পুরো ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল।

এরকম সাংঘাতিক কথা হাসিমুখে মা বলছেন দেখে প্রথমে অবাক হলাম। তারপরই হেসে উঠলাম।

ব্যাপারটা সেদিনই ঘটেছিল। দু' নম্বর বাসের দোতলায় উঠেছি অফিস যাব বলে। জানালার পাশে সিট পেয়ে বসেও পড়েছি। এমন সময় দেখা রাঘবদার সঙ্গে। রাঘবদাকে 'রাঘবদা' বলেই জানতাম। তাঁর পদবি জানতাম না। তিনি ওকালতি করতেন কলকাতা হাইকোর্টে। আমাদের সঙ্গে ক্লাবে একসঙ্গে টেনিস খেলতেন। রবির দাদা।

আমার পাশের সিটটা খালি হতেই রাঘবদা এসে বসলেন। বললেন, সাতসকালে অফিস-পাড়ায় কোথায় চললে—এই গরমে?

আমি বললাম, কেন? অফিসে!

অফিস কী হে? এরই মধ্যে অফিস? পড়াশুনা সব শেষ? গ্র্যাজুয়েশানের পর আর পড়লে না?

আমি বললাম, পড়ছি তো। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়ছি যে। আর্টিকেল্ড ক্লার্কদের তো অফিস যেতে হয়।

রাঘবদা বললেন, ও আচ্ছা! বেশ! বেশ! কোন ফার্মে?

ফার্মের নাম বললাম। বাবা সে ফার্মের একজন পার্টনার। ফার্মের নাম বলতেই রাঘবদা বললেন, কার আন্ডারে সার্ভ করছ? বাবার নাম বলতেই উনি আবার বললেন, আরে তাই নাকি? উনি তো আমার ভীষণ চেনা। তুমি আগে বলবে তো! তা হলে তোমার সম্বন্ধে একটু বলে দিতাম। উনি আমাকে খুব ভাল চেনেন, এই সেদিনই তো আমাকে লিফ্‌ট দিলেন।

তারপর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বললেন, ঠিক আছে। বলে দেব।

আমি বললাম, কী বলবেন?

রাঘবদা বললেন, তোমার প্রতি যেন বিশেষ ইন্টারেস্ট নেন! দেখবে, আমি বললে হয়তো অ্যালাউন্সও বাড়িয়ে দেবেন।

আমার খুব মজা লাগছিল। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, উনি লোক কেমন?

www.BanglaBook.org

রাঘবদা বললেন, আরে, চমৎকার লোক। যদিও রাশভারী। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস লোক।

রাঘবদার কথা শেষ হতে না হতে চৌরঙ্গীর মোড় এসে গেল। আমি উঠে বললাম, চলি।

রাঘবদা বললেন, ওঁকে আমার নমস্কার দিও।

আমি নেমে যাবার সময় বললাম, উনি আমার বাবা হন।

বলতেই, রাঘবদা তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাগে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। বললেন, কী সাংঘাতিক! তুমি তো মানুষ খুন করতে পারো হে!

আমি ততক্ষণে নীচে নেমে গেছি।

উনি বাসের দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, তোমার মতো ফাজিল ছেলে আমি দেখিনি। ওঁর সম্বন্ধে আমি যদি যা-তা বলে ফেলতাম?

আমি হেসে বললাম—বলেননি তো। তা হলেই হল।...

বাবা বললেন, আজ রাঘব এসেছিল সন্ধের সময়, বার-ফেরত। এসেই বলল—দাদা, কী ডেঞ্জারাস ছেলে আপনার, বাজারে যাচাই করে বেড়াচ্ছে আপনি লোক কেমন?

আমি মুখ নামিয়ে বাবাকে বললাম, উনি যে আমাকে কিছু বলতে দেবার সুযোগই দিলেন না আগে।

এ নিয়ে বাবা ও মা অনেকক্ষণ হাসাহাসি করলেন।

একটু পরে বাবা বললেন, তুমি থিয়েটার করছ নাকি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। ভয়ে ভয়ে।

বাবা বললেন, থিয়েটার কবে? কোথায় হবে?

আমি বললাম, দেরি আছে। নিউ এম্পায়ারে।

উনি বললেন, থিয়েটারই করো আর গানই গাও, পড়াশুনাটা ঠিকভাবে কোরো। রোজ সকালে দু' ঘণ্টা বিকেলে দু' ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে ঘড়ি সামনে রেখে অ্যাকাউন্ট্যান্সির অঙ্ক কোরো—নইলে পরীক্ষার সময় তিন ঘণ্টার মধ্যে অতগুলো ব্যালান্স শিট কখনও মেলাতে পারবে না।

আমি মাথা নেড়ে নীচে নিজের ঘরে চলে এলাম।

মাথা তো নাড়লাম, কিন্তু এই অ্যাকাউন্ট্যান্সির সঙ্গে আমার মোটে বনে না। যত টাকা-আনার হিসেব। ডান দিকের সঙ্গে বাঁ দিক মেলাও। হাতে মেসিন লাগিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পাটের মহাজনের মতো অঙ্ক কষো।

ভাবতাম, অনেক গাধা মরে বাবার বড় ছেলে হয়, আর অনেক বড় ছেলে মরে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সির ছাত্র হয়। ভেবেছিলাম, আর্মিতে যাব, অথবা এয়ার-ফোর্সের পাইলট হব। সেকেন্ড প্রেফারেন্স ছিল শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করার। গাছতলায় বসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কাঁধে চাদর ফেলে ফুরফুরে হাওয়ায় অনেক বাধ্য ছাত্র ও সুন্দরী ছাত্রীদের নিয়ে মনের মতো জ্ঞান দেওয়ার কথা তখন প্রায়ই ভাবতাম। তা না, পড়তে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট্যান্সি।

এ আমার লাইন নয়। যাদের লাইন, তাদের আমি শ্রদ্ধা করি, তাদের কোনও রকমে ছোট করে দেখি না। কিন্তু এ আমার জন্যে নয়। অথচ এ লাইন থেকে ডিরেইলড হব, এমন কোনও উপায়ই নেই।

আমার অ্যাকাউন্ট্যান্সি-পড়া বন্ধু সাবু শিলং গেল বেড়াতে। সেখানে গিয়ে কোথায় অমিত রায় আর লাবণ্যের কথা মনে পড়বে, কোথায় 'মোর লাগি কেউ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে' ইত্যাদি ইত্যাদি মনে পড়ে যাবার পর বেশ মেঘ-মেঘ বৃষ্টি-বৃষ্টি ভেজা-ভেজা দারুণ রোম্যান্টিক চিঠি লিখবে, তা না, ও লিখল—ভাই রাজা, এখানে কাল আসিয়াছি। আনারস ভীষণ সস্তা। খুব খাইতেছি। আলু, পটল এবং অন্যান্য শাক-সব্জিও দারুণ সস্তা। সবচেয়ে আনন্দের কথা, এখানে সিলেটের ইলিশ অফুরন্ত। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি...।

এমন চিঠি, একজন একুশ-বাইশ বছরের শিলং-এ প্রথম পা দেওয়া ছেলে, সে যদি হবু চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট না হয়, তবে আর কে লিখতে পারে?

চিঠি পাওয়ামাত্র বুঝতে পেলাম, অ্যাকাউন্ট্যান্সিই ওর লাইন এবং ও অক্লেশে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং জীবনে বিলক্ষণ উন্নতি করবে।

কিন্তু আমি ?

যখন আমার দরজা বন্ধ করে ঘড়ি ধরে হোল্ডিং কোম্পানির ব্যালান্স শিট মেলাবার কথা, ঠিক তক্ষুনি ষড়যন্ত্র করে দুপুরের রোদে বাড়ির লনে একজোড়া ঘুঘু এসে ঘুরঘুর করে, রঙ্গনের ডালে বসে বুলবুলি সুমধুর শিস তোলে, পাশের বাড়ির রেডিওতে হঠাৎ মোহরদির সুরেলা গান বেজে ওঠে, বুকের মধ্যে এক ভাললাগা-ভরা ব্যথার শাওয়ার খুলে যায়। অথবা হঠাৎ সেই রুবির দুল-পরা মেয়েটির মুখ মনে পড়ে যায়।

আমার সব গোলমাল হয়ে যায়।

ঠিক যখনি আমার অঙ্ক কষার কথা, তক্ষুনি ভীষণ কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে ; ছবি আঁকতে, সাহিত্য পড়তে বা গান গাইতে ইচ্ছে করে, অথবা কিছুই-না-করে হাওয়ায়-দোলা নিমগাছের ফিনফিনে পাতাদের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমার সব কিছুই করতে ভাল লাগে, শুধু এই অ্যাকাউন্ট্যান্সির অঙ্ক করা ছাড়া। অথচ আমি জ্ঞান-পাপী। এই অঙ্ক করাটা যে আমার আশু-কর্তব্য, এই বোধটা আমাকে সব সময় পীড়িত করে। ভিতরের খেয়ালী, ভাবুক, অন্যমনস্ক আমিটা বাইরের খোলা অঙ্কের বইয়ের দিকে উদাস চোখে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যের কবিটা বাইরে এসে দূর থেকে বুকের মধ্যে হবু-অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ভয়-ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে। বেলার মনে বেলা বয়ে যায়, অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে হলে একটা নির্দিষ্টকাল যে চোখ-কান-বোঁজা ঘানি-টানা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সে-সবের ধারেকাছে যেতে মন সরে না আমার।

একদিন বাবা ব্রেক-ইভন্ পয়েন্ট-এর গ্রাফ আঁকতে দিয়েছিলেন। দেখি, অনবধানে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভাব ও সুরের সুষম সমন্বয়ের গ্রাফ এঁকে বসে আছি।

এই কুকর্ম আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই নিজের কান মলেছি। যাই করি-না কেন, আমার সমস্ত মন অনেকগুলো অ্যাম্প্লিফায়ারের মধ্যে দিয়ে আমার কানের কাছে সব সময় বলত, আমার সামনে দুরন্ত দুর্দিন। আমার জন্যে আমার বাবা এবং আমি দু'জনেই সমান দুঃখিত ও আহত হব। দু'জনেরই সমান অসহায় অবস্থা হবে। এ কথা ভাবলেই, বাবার কথা ভাবলেই, আমার মধ্যের অপরাধবোধটা কাঁটার মতো বিঁধত। অথচ আমার কিছু করার ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও আমি ভিতরের অন্য আমিটাকে বদলাতে পারতাম না। মনে মনে বলতাম, ওই আমিটাকে গলা টিপে মেরেও আমার একজন সার্থক কাজের লোক হওয়া উচিত। কিন্তু পারতাম না, জানতাম যে, কখনও পারব না। একা আমার নিজের মধ্যে এমন জোর ছিল না যে, আমি একজন অবিন্যস্ত ভাবুক ও কবিকে টপকে গিয়ে বিন্যস্ত প্র্যাকটিক্যাল হিসাবরক্ষক হই।

তখন আমার এমন একটা বয়স যে, সে-বয়সের প্রত্যেকের বাবা তাঁর আদরের ছেলের মধ্যে একজন প্রতিপক্ষের অস্পষ্ট আভাস পান এবং প্রত্যেক মা তাঁর অনাগত পুত্রবধূর অনেকানেক কাল্পনিক দোষ সম্বন্ধে মনের মধ্যে কল্পনার কুণ্ডলি পাকান। ঠিক সেই সময়, সেই অমোঘ মুহূর্তে অ্যাকাউন্ট্যান্সির অঙ্ক ও সেই রুবির দুল-পরা মেয়েটি আমার ব্যক্তিগত শান্ত ঘটনাবিহীন জীবনে এক সাংঘাতিক সাইক্লোন তুলল।

তার সাঁই সাঁই রব আমাকে ভয়ে সিঁটিয়ে দিল।

বাবার কাছ থেকে নীচে নেমে এসে দেখি, অর্ঘ্য এসে বসে আছে।

অর্ঘ্যকে দেখেই অ্যাকাউন্ট্যান্সির বই তাকে তুলে রেখে বললাম, গান শোনাও। অর্ঘ্য জর্জদার কাছে গান শিখত।

দিনকয় আগে সুনন্দা পট্টনায়ক ও নাজাকৎ আলি সালামৎ আলি আমাদের বাড়িতে গান গেয়েছিলেন। অর্ঘ্যও শুনতে এসেছিল। সে সম্বন্ধে ও কথা তুলতেই বললাম, কথা পরে হবে, আগে গান শোনাও। অর্ঘ্য গাইল, 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না'। তারপর একে একে অনেক গান গাইল। অর্ঘ্যর গলায় গাওয়া আমার তখনকার প্রিয় গান ছিল, 'এই সকাল বেলার বাদল আঁধারে, আজ বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে।'

www.BanglaBook.org

রাত প্রায় ন'টা নাগাদ অর্ঘ্য উঠলে, আমি খেতে এলাম উপরে। বাবা খাওয়ার টেবিলে আমার উল্টোদিকে বসেছিলেন। রোজ বাবা একই চেয়ারে বসতেন।

বাবা বললেন, রাজা, তোমার গান-বাজনা, থিয়েটার একটু বেশি হচ্ছে না ? এরকম করলে পাস করতে পারবে না কিন্তু ! মনে থাকে যেন।

তারপরই বললেন, গানের স্কুলটা ছেড়ে দিতে পারো না আপাতত ?

আমি মুখ নিচু করে রইলাম, জবাব দিলাম না।

বাবা বললেন, ভেবে দেখো। এখন বড় হয়েছ। নিজের ভাল নিজে না বুঝলে আর কে বুঝবে ?

বাবার কথার মধ্যে সত্য ছিল। হয়তো সত্যিই বাড়াবাড়ি করছি আমি। কিন্তু বাবাকে কী করে বোঝাব যে দোষটা গানের স্কুলের বা বাইরের কোনও কিছুর নয়।

দোষটা আমার ভিতরের।

বাবা যা বলেন তা স্বভাবতই আমার ভালর জন্যেই।

কিন্তু ভাল হওয়া বোধহয় আমার কপালে নেই। গুরুজনেরা ভাল হওয়া বলতে যা বোঝেন তার ছিটেফোঁটাও নেই আমার মধ্যে।

তা ছাড়া গানের স্কুল এই মুহূর্তে ছাড়া যায় না। এখন স্কুল ছাড়লে তো আর তাকে দেখতে পাব না। সে তো হারিয়ে যাবে বরাবরের মতো। এত বড় কলকাতায় এত লোকের ভিড়ে কোথায় আমি খুঁজে পাব সেই একরত্তি বেণী-ঝোলানো মিষ্টি গলার মেয়েটিকে ?

এত কথা বাবাকে বলা যায় না।

আমি চুপ করে খেতে লাগলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভাবলাম, পড়াশুনোয় বসি। কিন্তু আজ আর মন বসছে না। অর্ঘ্যের গান, বাবার কথা, এসব মিলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় রোজই এরকম কিছু না কিছু হত। এমনকী কোনও চাক্ষুষ কারণ না থাকলেও গোলমাল হত।

ঘরের আলো নিবিয়ে জানালার কাছে এসে বসলাম চেয়ার টেনে। বাইরে জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। নিমগাছের কাকেরা ভুল করে ভোর হয়েছে ভেবে কা-কা-কা করে ডেকে উঠছে। জ্যোৎস্নার একটা লম্বা ফালি জানালা দিয়ে এসে ঘরের মধ্যে বিছানার উপরে পড়েছে।

পথ দিয়ে সেই বেহালাওয়ালা ছড়ির টানে টানে পরজ বসন্তের রেশ উড়িয়ে দিয়ে জ্যোৎস্নাভরা আকাশের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

বেহালার সুরটা কাঁপতে কাঁপতে বুকের মধ্যে সযতনে তুলে রাখা কোনও জলতরঙ্গে তরঙ্গ কাঁপাতে কাঁপাতে একসময় মুছে গেল।

এলোমেলো হাওয়ায় ঘরে ও বাইরে গাছগাছালিতে পিছলে-পড়া চাঁদের আলোর নীচে ছায়াগুলো নাচানাচি করছিল। নানারকম ফুলের গন্ধ আসছিল লনের পাশের বাগান থেকে।

আমার হঠাৎ সামুকাকার কথা মনে পড়ে গেল। পুরনো বাড়িতে সপ্তাহে দু'দিন করে আসতেন সামুকাকা আমাকে গান শেখাতে তাঁর দিলরুবা কাঁধে ঝুলিয়ে। সেই বাড়ির পশ্চিমের ঘরের জানালার পাশে বসে দিলরুবা বাজিয়ে সামুকাকা এমন-এমন রাতে পরজ বসন্ত অথবা কানাড়ায় বসানো কোনও গান গাইতেন। ওঁর কাছে আমার গান শেখার চেয়ে গান শোনার আগ্রহটা বেশি ছিল।

ওঁর কুচকুচে কালো চোখে, কাটাকাটা মুখে আর কাঁচা-পাকা চুলে কী যেন একটা উদাসী যোগীর ভাব ছিল।

গলাটা ছিল ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু বড় দরদ-ভরা।

এমনই এক রাতে সামুকাকা আমাকে 'আজি এ গন্ধ-বিধুর সমীরণে' গানটা তুলিয়েছিলেন। আমি তানপুরা ছেড়ে তুলছিলাম আর উনি দিলরুবা বাজিয়ে গাইছিলেন। মনে পড়ে। খুব মনে পড়ে।

সেই সব দিনের কথা মনে পড়লে ভীষণ ভাল লাগে। কিন্তু পরক্ষণেই বড় কষ্ট হয়। আর কখনও তো সেসব দিন ফিরে আসবে না।

সুরেলা গলা শুনলে, আমার গায়ের সব রোম খাড়া হয়ে যায়, নাভির কাছটা আনন্দের ব্যথায়

www.BanglaBook.org

পিন্‌পিন্ করে, স্বরের উদারা, মুদারা, তারা, সুরের আলাপ, তান, বিস্তার এসব মিলিয়ে আমায় কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন পায়ের তলায় মাটি পাই না। মনে হয়, এই সুরের স্রোতে, এই ভাল-লাগার অবশ করা আনন্দে যে জাহান্নমে গিয়ে পৌঁছবই পৌঁছব!

নাই-ই বা হলাম এ জীবনে সাকসেসফুল। না-ই বা চড়লাম মার্সিডিস গাড়ি।

এই আমি, আমার সুস্থ দেহ, জানালার পাশের এই লতানো বোগেনভেলিয়া, একটা আধ-পোড়া সিগারেট, মাথার মধ্যে ঝুমঝুম করে বাজা একজনের ভাবনা, আর এই একান্ত করে পাওয়া এলোমেলো হাওয়া-বওয়া একটি চাঁদের রাত—এই নিয়েই একটা চমৎকার বেঁচে থাকা; একটা অভাবনীয় জীবন।

তোমরা যাকে বড় হওয়া বলো, তেমন হতে আমার সাধ নেই, আমার প্রয়োজনও নেই; বিশ্বাস করো। কেজো পৃথিবীর সমস্ত সাকসেসফুল লোকেরা, বাবা, মা, তোমরা সকলে বিশ্বাস করো।

আমার সত্যিই প্রয়োজন নেই।

৩

সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে।

গড়িয়াহাটের মোড়ে আমি সবে বাস থেকে নেমেছি অফিস-ফেরতা। হঠাৎ একটা দোতলা বাসের উপরতলায় জানালার ধারে-বসা তার মুখের একঝলক দেখতে পেলাম।

হু-হু করে আলো-জ্বলা বাসটা চলে গেল। হু-হু করে আমার বুক জ্বলে গেল। সেই মুহূর্তে আমার মন এক ভাষাহীন আনন্দ ও বেদনায় ভরে গেল।

অনেকক্ষণ আমি ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর বাড়ির দিকে হেঁটে আসতে লাগলাম।

বেশ শান্তিতে ছিলাম এ ক'দিন। এমনকী আজ সকালেও বেশ কয়েকটা ব্যালান্স-শিট মিলিয়েও ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম—আমার মধ্যের শীতের দিনের সাপের মতো ঘুমিয়ে-থাকা কেজো লোকটার সমস্ত লক্ষণ ও গুণাগুণ ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হচ্ছে। কিন্তু অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় আবার সব গোলমাল হয়ে গেল!

তার ক'দিন পরে সকালবেলা হঠাৎ রেডিও খুলেই চমকে উঠলাম। কে যেন গাইছে:

'মরি গো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?'

এ গলা আমার ভীষণ চেনা।

প্রশ্বাস নেবার শব্দ, উচ্চারণ, সব কিছু আমার কানে গেঁথে ছিল। গান শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সে গাইছিল:

'দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।'

আমার সমস্ত মন উহু-উহু করে উঠল।

আমার জন্যে কেউ যে কখনও এমন করে গাইতে পারে, তা কখনও আমার মনে হয়নি! আমার মন যেন কেবলই বলতে লাগল, আমার যেমন করে তাকে ভাল লেগেছে, তারও নিশ্চয়ই আমাকে তেমন করেই ভাল লেগেছে। এ ভাবনা, এ বিশ্বাসের কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু আমার মন বারে বারেই বলতে লাগল যে, আমিও তার মতন করেই তাকে বলে আসি, তোমার বাঁশি আমার প্রাণে বেজেছে।

সেই গান শুনতেই বুঝলাম যে, আমার গায়িকা আজকাল রেডিওতে গান গাইছে।

কেন জানি না, ওর গান সেই প্রথম দিন শোনার পর থেকেই আমার মনে হত, মন বলত, একদিন

www.BanglaBook.org

ও খুব বড় গায়িকা হবে। অল্পবয়সের পাখির চিকন গলার স্বর সরে গিয়ে যখন ভরা যুবতীর গলার ঝরণাতলার কলস-ভরার গভীরতা লাগবে গলায়, তখন সে সম্পূর্ণা হবে।

আমার মনে হত, রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্য সব গানের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুরের সঙ্গে তাল মেলালেই এখানে গান জন্মায় না। এখানে ভাব, গায়কী, সুর, তাল, লয়, উচ্চারণ, নিঃশ্বাস ফেলা আর প্রশ্বাস নেওয়া, প্রতিটি সূক্ষ্ম ও আপাত সহজ ব্যাপারই অত্যন্ত জরুরি। এ সমস্ত কিছু মিলেমিশে ওরিশী ফিলিগ্রী গয়নার মতো এই গানের আবেদন। শুধু গলা থাকলে, শুধু সুর থাকলে, শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পটভূমি থাকলেই এ গান কেউ যথার্থভাবে গাইতে পারে বলে আমার মনে হত না।

গানের কথার মধ্যে দিয়ে যা বলা হয়েছে, মনের কথার সেই আভাস, গায়কীর বিভাসে প্রতিভাত না হলে, সুরের সঙ্গে ভাবের, লয়ের সঙ্গে তালের এক আশ্চর্য আশ্লেষের মধ্যে পরিপ্লুতি না ঘটলে এ গান আর গান হয় না। তাই অনেকেই যদিও রবীন্দ্রসঙ্গীত গান, কিন্তু তা সঙ্গীতই হয় ; রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় না।

এ সব কথা মাঝে মাঝে আমার গানের স্কুলের বন্ধু রাণাকে বলতাম। নড়িদা, সৈয়দ আমানুল্লা, অমর, ওদের সঙ্গেও আলোচনা করতাম। ওদের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ ও গায়কী নিয়ে আলোচনা হত। আমরা সকলেই সোৎসাহে আলোচনা করতাম, অন্যের মতামত শুনতাম, নিজের মতামত জানাতাম।

আলোচনার শেষে আমি বলতাম, দেখো, বুলবুলি কালে একদিন বেশ ভাল গাইবে।

রাণা তাচ্ছিল্যের গলায় বলত, ফুঃ—কিস্‌সু হবে না। কাকার স্কুল থাকলে অনেকেই এমন সোলো গানের চান্স পায়। এ জীবনে মই ধরে কাউকে তোলা যায় না, বুঝলে রাজা। তোলা হয়তো যায়, তা কিছুটা অবধি, তারপর সবাইকেই নিজের নিজের পায়ে ভর করেই দাঁড়াতে হয় ; একমাত্র নিজের গুণে। সেই উচ্চতায় পৌঁছে কাকা জ্যাঠা মামা মাসি কেউই আর কাজে লাগে না।

আমি রাণার কথা শুনে হাসতাম। ঝগড়া করতাম না, কিন্তু বলতাম, দেখো হয় কিনা !

আসলে ওর রাগের কারণটা আমি বুঝতাম।

ওর প্রতি আমাদের স্কুলের একটি মেয়ে খুব অনুরক্তা ছিল। ও-ও তাকে খুব ভালবাসত। সেই মেয়েটি গান গাইত ভালই। কিন্তু তাকে সোলোর চান্স দেওয়া হয়নি সেবারে। তাই রাণার মনে লাগার কথা।

এ কথা জেনেই ওর সঙ্গে ঝগড়া করতাম না। তা ছাড়া, এটা ঝগড়ার বিষয়ও না। বিশ্বাসের বিষয় ছিল। আমিই ঠিক কি রাণাই ঠিক, তা প্রমাণিত হবে আজ থেকে দশ-পনেরো বছর পরে। এখন এই মুহূর্তে আমার কল্পনার মানসী এবং রাণার জলজ্যান্ত গার্লফ্রেন্ড দু'জনেই গাইয়ে জীবনের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দু'জনকেই প্রমাণ করতে হবে নিজের নিজের গুণ—তাদের নিজের নিজের জীবনে ও যৌবনে।

এ দিকে থিয়েটারের রিহার্সাল পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেছে। আমরা এ বার রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গীর একটি গল্প—"রবিবার" নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ করব। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীমতী শান্তিশ্রী নাগ।

শান্তিদি প্রায়ই রিহার্সালে আসতেন। খুব সুন্দর করে সাজতে জানতেন শান্তিদি।

এখন অনেকেই সাজতে শিখেছেন। কিন্তু তখন রুচি ব্যাপারটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ছিল, রুচিটা আজকের মতো এমন স্ট্যান্ডার্ডাইজড্ হয়ে যায়নি। তখন যাঁরা সাজতে জানতেন, তাঁরা বেশি ছিলেন না সংখ্যায়।

উনি ঘরের কোণায় বসে মহড়া দেখতেন।

বৌদি 'বিভা'র চরিত্রে অভিনয় করছিলেন, রবিবার-এ বিভার চরিত্রে বৌদিকে অভিনয় করতে হত না। ওঁর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের বিভা এমনিতেই আরোপিত হয়েছিল।

মহড়ায় আরও আসতেন সলিল সেনগুপ্ত, প্রায় রোজই।

উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুল। চশমা চোখে অপলকে আমাদের দিকে চেয়ে থাকতেন। দেখতেন, কে কেমন অভিনয় করি। দেখতেন আর অনর্গল সিগারেট খেতেন।

www.BanglaBook.org

মহড়া ব্যাপারটা যখন বেশ একঘেয়ে হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, রবিবার-এর নাট্যরূপে একটা কলেজের ফাংশানের ব্যাপার আছে। তাতে চন্দ্রিকা নাচবে এবং বুলবুলি গান গাইবে।

ওরাও মহড়ায় আসতে আরম্ভ করল মাঝে মাঝে।

গানটা ছিল বাহার রাগাশ্রিত। 'আজি কমল মুকুল দল খুলিল, দুলিল রে দুলিল, মানসসরস রস পুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।' যেদিন ওরা প্রথম এল মহড়াতে, সেদিন থেকেই মহড়ার আকর্ষণ আমার কাছে অনেক বেড়ে গেল।

চন্দ্রিকা ভারী ভাল নাচত।

ওর চোখমুখের অভিব্যক্তির তুলনা ছিল না।

আরও একজনের নাচ খুব ভাল লাগত। তাঁর নাম ছিল মন্দিরা সেন রায়।

যাই হোক, বুলবুলির সঙ্গে ওখানে আমার প্রায়ই দেখা হতে লাগল। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

চোখে চোখ পড়লেই আমার বুকের মধ্যেটা কেমন করত যেন। ও-ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিত, মুখ দেখলে মনে হত, এইমাত্র ক্যাস্টর অয়েল খেয়েছে।

যখন দেখা হত না, তখন বাড়িতে আয়নার সামনে বসে ওর সঙ্গে কী কী কথা কেমন করে বলব, সেসব বিহার্সাল দিয়ে রাখতাম। কিন্তু দেখা হলে বৃষ্টি-ভেজা কাকের মতো মিইয়ে যেতাম। যতটুকু সময় ও সামনে থাকত ততটুকু সময় ও যে আছে, আমার সামনে আছে, কাছে আছে, এই জানাটুকুই আমাকে দারুণ এক ভাল-লাগায় আচ্ছন্ন করে রাখত। ওর দিকে তাকাবার প্রয়োজনই বোধ করতাম না। মনে মনে ভাবতাম, ও তো আমারই ; তাড়া কীসের ?

আসলে, ও যখন আমার পাশে থাকত তখন আমি রাজার মতো ব্যবহার করতাম। যেন আমার কিছুরই অভাব নেই। প্রয়োজন নেই তার ভালবাসার। অথচ ও যেই চলে যেত, অমনি কাঙালের মতো হায় হায় করত আমার সমস্ত মন।

মন বলত, কেন আর একটু তাকালাম না ওর দিকে, কেন একটু সাহস করে কথা বললাম না।

সেদিন মহড়ার শেষে বেরোচ্ছি স্কুল থেকে, সলিলদা বললেন, কী হে ? সিনেমা করবে ?

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম।

থিয়েটার করছি তাতেই মধ্যের হবু অ্যাকাউন্ট্যান্টের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। তার উপর সিনেমা ?

সলিলদা শুধালেন, তোমাদের বাড়ি কি খুব কনসার্ভেটিভ ?

একটু ভেবে বললাম, যাদের কনসার্ভ করার কিছু থাকে তারাই সাধারণত একটু কনসার্ভেটিভ হয়।

উনি বললেন, জিগ্‌গেস করে রেখো।

ভাবলাম, জিগ্‌গেস করে কে মার খাবে ?

তবুও পর দিন সত্যি সত্যিই সকালে সলিলদার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে যেতে হল। যাঁর কাছে গেলাম, তাঁর নাম চিত্ত বসু। ফিল্মের পরিচালক।

লোকে যেমন করে চোর-ছ্যাঁচড়কে দেখে, তেমন করে সেই সুপুরুষ পরিচালক আমার মুখে চেয়ে রইলেন। ক্যামেরা ফেসের খোঁজে।

নাকটা ছোটবেলায় রীতিমতো শার্প ছিল, কিন্তু শ্রদ্ধেয় ঠাকুমা সেটাকে আরও উন্নত করার চেষ্টায় খাঁটি সর্ষের তেল নাকে রগড়ে রগড়ে ঘষে আমার বাঁশির মতো নাকটির সর্বনাশ ঘটিয়ে রেখেছিলেন।

চিত্তবাবু বললেন, করবে ?

বললাম, কী বই ?

উনি বললেন, পুত্রবধূ। উত্তমকুমার, মালা সিন্‌হা হিরো-হিরোইন।

আমি বললাম, আর আমি ? ভিলেইন ?

না। ভিলেইন না। খুব ভাল ছেলের রোল।

এবং বোকা ছেলের ? আমি বললাম।

www.BanglaBook.org

বোকা নয়। মহৎ। উনি বললেন।

আমাকে বাড়িতে জিগ্‌গেস করতে বলা হল। কিন্তু বলা বাহুল্য, সে সাহস আমার ছিল না। একে পরীক্ষার আগে থিয়েটার করছি, তার উপর সিনেমা!

অবশ্য আমাকে চিত্তবাবুর পছন্দ হয়েছিল কি না, এবং আমার চিত্তবাবুকে পছন্দ হয়েছিল কি না, তা আমরা কেউই কাউকে স্পষ্ট করে জানাইনি।

যে কারণেই হোক, আমার সিনেমা করা হল না।

উত্তমকুমার জানলেনও না যে, সেদিন তাঁর কত বড় ফাঁড়া কেটে গেল!

দেখতে দেখতে থিয়েটারের দিন এসে গেল।

নিউ এম্পায়ারের জেন্টস্ গ্রিন-রুমে আয়নার সামনে বসেছিলাম। মেক-আপ ম্যান মেক-আপ দিচ্ছিল।

আমার আশেপাশে অন্য সব অভিনেতারাই বসে মেক-আপ নিচ্ছিলেন।

এই গ্রিন-রুম ব্যাপারটা আমার দারুণ লাগে।

এক মুহূর্ত আগে ছিলাম একজন, পর মুহূর্তে হয়ে গেলাম অন্যজন।

মেক-আপ নেবার পর আয়নায় নিজের ছবি দেখে নিজেকেই চমকে উঠতে হয়। বলতে ইচ্ছে করে আয়নার আমি কে—এই যে, ভাল আছেন? আপনাকে বেশ ভালই দেখাচ্ছে!

মেয়েদের মেক-আপ রুম থেকে বৌদি বেরুলেন।

মেক-আপ নিয়ে বৌদির বয়স দশ বছর কমে গেছে। চশমাখোলা, তীক্ষ্ণ নাক, বড় বড় বুদ্ধিভরা চোখ ও দারুণ ফিগারে বৌদিকে কী যে মিষ্টি লাগছে!

দেখি, বৌদির পাশেই সে মানে, সেই গাইয়ে।

একটা লালের উপর কালো কাজের মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি পরেছে। সেও একটু সেজেগুজে নিয়েছে। গানই তো গাইবে, তার আবার অত সাজ কীসের?

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। মনে মনে বললাম, আমার বয়েই গেল!

এতদিন মহড়া দিয়েছিলাম, ঠিকই ছিল। কিন্তু আসল সময়ে স্টেজে ঢুকতেই মাথা ঘুরে গেল!

এতগুলো লোক ড্যাব ড্যাব করে আমার দিকেই চেয়ে আছে, যেন আমি শর্মিলা ঠাকুর। তার উপর আবার মুখের উপর আলো পড়ছে উইংস-এর পাশ থেকে।

প্রম্পটার জোরে জোরে প্রম্পট করতে লাগলেন।

প্রথম কয়েক মিনিট রীতিমতো নার্ভাস ছিলাম। তারপর যেমন করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাইফেলের ব্যারেল আস্তে আস্তে গরম হয়ে ওঠে, তেমন করে আমিও পার্ট বলতে বলতে গরম হয়ে উঠতে লাগলাম!

স্টেজে উঠলেই আমার মনে হত, জগন্নাথ যদি কখনও মঞ্চের অভিনেতা হতেন তাহলে নির্ঘাত সমস্যাটা থাকতো না। কারণ তাঁর হাতের বালাই নেই। স্টেজে ওঠবার পর হাত দুটোই হয় সবচেয়ে বড় সমস্যা। সে দুটোকে কোথায় রাখি, সে দুটোকে নিয়ে কী করি, এই ভাবতে ভাবতেই পার্ট ভুলে যেতে হয়।

রূপদার এক জ্যাঠতুতো বোনের সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। ও খুব ভাল নাচত। ও সব সময় হাসিখুশি থাকত। নাম ছিল দীপা। বয়সে ও বুলবুলির চেয়ে অনেক ছোট ছিল।

আমি স্টেজ থেকে উইংস-এ ঢুকেছি, এমন সময় দীপা দৌড়ে এসে বলল, রাজাদা, দারুণ হয়েছে, দারুণ। জানেন, বুলবুলিদি না খুব ভাল বলেছে।

আমি অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওকে বোঝার চেষ্টা করলাম। কারণ, ও হচ্ছে বুলবুলির চর। অনুচর ও চর দুই-ই। সব সময়ে পিছনে পিছনে থাকে তার দিদির।

ওর মনের ভাব বুঝে নিয়ে বললাম, তোর দিদিকে বলিস, গানও খুব ভাল হয়েছে।

দীপা হাসল, বলল, আচ্ছা।

ও চলে যেতেই আমার গা জ্বলে গেল। মনে মনেই বললাম, কেন? তোমার দিদি কি বোবা?

www.BanglaBook.org

নিজের মুখে কি কথাটা বলা যেত না ?

থিয়েটার শেষ হবার পর একবার তার সঙ্গে চোখাচোখি হল।

সে হাসছিল, বন্ধুদের সঙ্গে অনর্গল গল্প করছিল, কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়েই চোখ নামিয়ে নিল। চুপ করে গেল।

ওকে দেখলে আমি এত খুশি হই, আর ও আমাকে দেখলে এমন বিমর্ষ হয় কেন ? আমাকে কি ও দেখতে পারে না ? আমি কি ওর দু' চোখের বিষ ?

জানি না, আবার কতদিন পর, কীভাবে ওর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু পরের কথা পরে। আজকে আমার বড় আনন্দ। সে আমার অভিনয়কে ভাল বলেছে।

ভাবছিলাম, যা আমার অভিনয় নয়, যা সরল সত্য, যা বড় যন্ত্রণাময় আর আনন্দময় সত্য, তাকেও কি সে এমনি করে ভাল বলবে ? একদিন ? কোনওদিন ?

৪

অফিসে বসে বাংলা খাতার পোস্টিং চেক করছিলাম।

ইংরিজি, মাড়োয়ারি ও অন্যান্য খাতার মতো বাংলা খাতাও স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। 'হরজাই' খাতে চার টাকা পাঁচ আনা ডেবিট।

'নাজাই' খাতে সাতশো পাঁচ টাকা ডেবিট। 'গরমিল' খাতে তিন টাকা দু আনা ক্রেডিট।

'হরজাই' এর ইংরিজি প্রতিশব্দ মিসলেনিয়াস। 'নাজাই' মানে বোড ডেট্স। 'গরমিল' অর্থাৎ ডিফারেন্স ইন ট্রায়াল ব্যালান্স। এরই নাম অ্যাকাউন্ট্যান্সি।

অ্যাকাউন্ট্যান্সির আরও রকম আছে।

যেমন, "শরীর মেরামতি" খাতে। অবশ্য এ খাতে সব খাতায় থাকে না। ক্যাশিয়ারবাবুর আফিং-এর নেশা ছিল, তাই মুহুরিবাবু প্রতিদিন শরীর মেরামতি খাতে দু'আনা করে ডেবিট করতেন আফিং-এর খরচা বাবদ।

মাঝে এক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর কোম্পানির খাতা অডিট করতে যাচ্ছিলাম রোজ। দেখতে দেখতে এসে পড়লাম --ফিল্মের ডিরেক্টরের নামে তিন পয়সা ডেবিটে।

তিন পয়সা ডেবিটের গভীর তাৎপর্য বুঝতে না পেরে অ্যাকাউন্ট্যান্টকে শুধোতেই তিনি বললেন, ফিল্ম ডিরেক্টর আমাদের অফিসে এসে ভুলে ছাতাটা ফেলে গেছিলেন। বেয়ারা দিয়ে ছাতাটা তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। তাই বেয়ারার সেকেন্ড ক্লাস ট্রাম ভাড়া তিন পয়সা তাঁর নামে ডেবিট করা হয়েছে।

সেদিন থেকে ফিল্ম লাইনের উপর আমার অভক্তি।

অফিসে বসে পোস্টিং করি সবুজ পেনসিল দিয়ে।

রাস্তার ওপাশের গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে রেকর্ড বাজে।

মনটা পাগল পাগল করে। মনের মধ্যে কী যেন একটা অসুখ। খেতে ভাল লাগে না, বসতে ভাল লাগে না, কাজ করতে ভাল লাগে না। পড়াশুনা করতে তো নয়ই। কিছুই ভাল লাগে না। শুধু মাঝে মাঝে বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

অডিট নোটস্-এর পাতায় কোনও গানের স্বরলিপি তুলি, স্কেচ আঁকি।

বাবার অফিস না হলে অনেকদিন আগেই আমার চাকরি যেত।

পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, বিয়ে বাড়িতে কোথাও কোনও মেয়ের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করে না। পৃথিবীর তাবৎ হেলেন, ক্লিওপেট্রারা একটি বিরক্ত মুখের অল্পবয়সী মেয়ের কাছে নস্যাৎ হয়ে যায়।

অফিসে যাওয়া-আসার পথে জানালায় বসে শুধু তার কথাই ভাবি। অন্য কোনও কথা মনে করতে পারি না।

সেদিন অফিস-ফেরতা বিজুদার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম।

রাস্তাটা পেরোব এমন-সময় একটা কালো অস্টিন গাড়ি প্রায় আমাকে চাপা দিয়ে ফেলেছিল।

www.BanglaBook.org

যিনি চালাচ্ছিলেন সেই হোঁৎকামতো ভদ্রলোক জোরে ব্রেক কষে মুখ বার করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, কী ব্যাপার ছোকরা ? লব করছ নাকি ?

রাগে আমার সারা গা জ্বলে উঠল। কিন্তু কিছু বলার আগেই গাড়িটা চলে গেল।

বিজুদার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম বিজুদা নেই। বৌদি আছেন।

বৌদি বললেন, কী হে সেন্টিমেন্টের বড়ি ? বসো, বসো, চা খাও।

চা আসার আগেই প্রীতিদা এলেন। প্রীতিদার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। যেবারে বিয়ে ঠিক হল সেবারে বসন্তোৎসবে আমরা সকলেই শান্তিনিকেতনে গেছিলাম। খুব মজা হয়েছিল সেবারে। সকলে মিলে বিজুদার বাড়ি উঠেছিলাম পূর্বপল্লীতে।

যখনই শান্তিনিকেতনে যেতাম তখন কোনও উৎসব থাকলে মোহরদি স্নেহপরবশে আমাদের ডেকে ডেকে বৈতালিকে নিতেন।

বৈতালিকে গান গাইতে আমার কোনওদিনও ভয় করত না, কারণ আমার সরেস গলা অতজনের গলার মধ্যে চাপা পড়ে যেতই। ওই সব সমাবেশে কিছু কিছু ভাল গলার গায়ক-গায়িকা থাকেই লিড করার জন্যে। তাদের গলাই আলাদা করে শোনা যায়। অন্য সকলের গলা কোপাইয়ের বানের জলের মতো একসঙ্গে খড়কুটো বালি-পাথরে মিশে যায়।

সেবারে আলো দত্ত নাচলেন, 'দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা হৃদয় আকাশে'। ভীষণ ভিড় ছিল। আমরা ভিড়ের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে নাচ ও যিনি নাচলেন তাঁকে দেখলাম। প্রীতিদা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু হয়ে তন্ময় হয়ে নাচ দেখছিলেন। নাচ শেষ হবার পরেই শুনলাম, প্রীতিদার সঙ্গে আলোদির বিয়ে হচ্ছে। মোহরদি ঘটক মেকার।

মোহরদির স্নেহচ্ছায়ায় থাকলে আমারও কোনওদিন এরকম চাঁদের আলোয় শালফুলের গন্ধে ভরা কোনও সুমুহূর্তে সদ্গতি হতে পারে মনে করে মোহরদির সঙ্গ ছাড়তাম না।

বউদি বললেন, মোহরদি আসছেন শান্তিনিকেতন থেকে প্রীতির বিয়েতে। মোহরদির গানের লক্ষ লক্ষ অ্যাডমায়ারারের মধ্যে আমি একজন মাত্র ছিলাম। কিন্তু আমার একমাত্র অ্যাডমায়ারার ছিলেন মোহরদি। মানে, আমার নন, আমার চিঠির। কাউকে চিঠি লিখে আমি আজ অবধি এত প্রশংসা কারও কাছ থেকে পাইনি। মোহরদিকে বলতাম, সার্টিফিকেটটা বাঁধিয়ে রাখব।

মোহরদি আসছেন শুনে বললাম, বাঃ খুব মজা হবে। কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই মজা শেষ হয়ে গেল।

দেখলাম, সে এসে ঘরে ঢুকল।

একটা অফ-হোয়াইট রঙা শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা অফ-হোয়াইট জামা, কপালে বড় টিপ, মুখে অ্যাজ ইউজিয়াল আমার দর্শন মাত্র পৃথিবীর সব রাগ, সব বিরক্তি।

বউদি বললেন, আয় বোস।

আমি ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠলাম। ও যদি আমার সামনে সত্যিই বসে পড়ে তাহলে তো কথা বলতে হবে। কিন্তু কী কথা বলব ?

কিন্তু সেও দেখলাম, ইকুয়ালি আপসেট। সে সটান ভিতরে চলে গেল পর্দা ঠেলে।

তুতলে বলল, আসছি।

বউদি বললেন, বুলবুলি, এখানেই বোস না !

সে বলল, আমার মাথা ধরেছে।

ভাবলাম, মাথা ধরলে কেউ সেজেগুজে বেড়াতে বের হয় ?

আমি লক্ষ করলাম যে ও রীতিমতো তোতলা। তোতলা তো ভাল গান গায় কী করে ?

সে এল না, কিন্তু বিলক্ষণ বুঝতে পারলাম, বসবার ঘরের পর্দার আড়ালেই সে আছে এবং আমি কী বলি না বলি শুনছে।

প্রীতিদার তাড়া ছিল। অনেক জায়গায় নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে। তাই প্রীতিদা উঠলেন।

আমি চা খাব বলেছি বলেই বসে থাকতে হল।

ভেবেছিলাম, তার কাকির বাড়ি এসেছি, চা-টা সে নিজে হাতে ভদ্রতা করে আনবে। কিন্তু চা

www.BanglaBook.org

নিয়ে এল ক্ষ্যান্তমণি—বাড়ির ঝি। কোনও রকমে চা-টা খেয়ে বললাম, চলি বউদি। আরেকদিন আসব।

বউদি বললেন, এসো।

সেদিন বউদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমায় আগে পরীক্ষাটা পাস করতেই হবে। পরীক্ষা পাস না করলে নিজের পায়ে নিজে না-দাঁড়ালে এ ব্যাপারে কিছুতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না।

আমার নিজের বলতে তো কিছুই নেই। ওকে যে আমি চাই, চিরদিনের মতো চাই, একথা ওকে বলবার আগে আমার নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা সুস্থ মূল্যায়ন করা দরকার।

বাবার পটভূমি আমার সেই মূল্যায়নে যেন কোনওরকম ভাবে প্রভাব বিস্তার না করে। আমার মনে হত, যে-পুরুষমানুষ বাবা, মামা কি জ্যাঠাকে অতিক্রম না করতে পারে, তাঁদের স্নেহভাজন হয়েও তাঁদের ছাড়িয়ে না যেতে পারে, তারা পুরুষ নয়। নিকটাত্মীয় পুরুষদের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বোধহয় একটা চাপা প্রতিযোগিতার সম্পর্কও থাকে।

যদি কেউ আমার বাবাকে দেখে আমার দাম ঠিক করে, আমার মনে হবেই যে, আমার দাম কানাকড়িও নয়! সেটা অপমানজনক।

কিন্তু একথাও সত্যি যে, আজকে আমার দাম সাড়ে-ছ'আনাও নয়। এই রকম দামি হয়ে আমি কোন মুখে কোনও গুণী মেয়েকে জানাব যে, আমার তোমাকে ভাল লাগে। নিজে ভাল না হলে, কোনও ভাল মেয়েরা দায়িত্ব সম্মানে সঙ্গে নিতে না পারলে, তার কাউকে ভালবাসার অধিকার নেই বলেই আমার মনে হত।

অমন ভালবাসা মেয়েরা বাসতে পারে। খুব ভাল মেয়ে দয়া করে কোনও বাজে ছেলেকে ভালবেসে ফেললে কিছু বলার নেই। কিন্তু যে ছেলে নিজের অধিকারে তার প্রেমিকাকে চাইতে না পারে, যার জীবনের পরম প্রাপ্তি অন্যের দয়া-নির্ভর করে, সে নিজেকেও অসম্মান, আর যাকে ঘরে আনে তাকে তো করেই।

সবচেয়ে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে আমাকে। তার আগে তার কথা ভাবব না। তার গান শুনব না। তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবার চেষ্টা করব আমি। যেদিন যোগ্য হব সেইদিনই গিয়ে বলব যে, তোমাকে আমি আমার জীবনে চাই। তার আগে কোন মুখে গিয়ে সেকথা বলি? কিন্তু হঠাৎ মনে হল, ওকে যদি আমি বলার আগেই অন্য কেউ ওকে অমন করে চেয়ে বসে অথবা যদি ও বলে বসে—আপনি চান তো বয়েই গেল, আপনাকে আমার একটুও ভাল লাগে না।

তাহলে?

তখন আবার মিইয়ে-পড়া নিজের কাঁধে নিজেই থাপ্পড় লাগালাম, থাপ্পড় লাগিয়ে বললাম, প্রেমের ব্যাপারে কোনও মধ্যপন্থা নেই। হয় বরমাল্য নয় ঝাঁটা। কিন্তু ইনিশিয়েটিভ আমাকেই নিতে হবে। কপাল ভাল হলে পৃথ্বীরাজের মতো ঘোড়া টগবগিয়ে তাকে সামনে বসিয়ে ফিরে আসব, আর কপাল খারাপ হলে সেন্টিমেন্টের বড়ির শিশি হয়ে গিয়ে মোটা মোটা ব্যর্থপ্রেমের উপন্যাস লিখব।

সেদিনই রাতে বাড়ি ফিরে একটা রুটিন করে ফেললাম। পরীক্ষার আর সামান্যই দেরি আছে। এবার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দরজা বন্ধ করে সত্যিই শুধু পড়াশুনো করব। সকালে চিরতার জল খাব, বিকেলে স্কিপিং করব এবং শোবার সময় কালীমাতার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মনে যাতে কোনওরকম অসভ্য ভাবনা-টাবনা না আসে তার প্রতিজ্ঞা করব।

ঠিক করলাম, মন থেকে সেই পাখিকে কাকতাড়ুয়া দেখিয়ে তাড়িয়ে দেব হুস্‌স্ হুস্‌স্ করে।

বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ত, কোনও নতুন গাড়িতে নববিবাহিত কোনও দম্পতি পাশ দিয়ে চলে গেলেন ভুইক করে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে পাঁচ হাজার বাইসন একসঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলত। ভাবতাম, কবে আমিও আমার বুলবুলিকে পাশে নিয়ে এমনি পিঁক পিঁক করে হর্ন বাজিয়ে যাব?

পরমুহূর্তেই মনে হত, প্রত্যেক প্রাপ্তির পিছনেই অন্য একটা ব্যাপার আছে। মূল্য দেওয়ার ব্যাপার। সেই মূল্য দিতে পারলে, কষ্ট করলে, একমাত্র তবেই আমার সামনে এক দারুণ সম্ভাবনাময়

www.BanglaBook.org

পৃথিবী।

পিঁক-পিঁক হর্ন-দেওয়া গাড়ি, পাশে বসে-থাকা গুনগুনিয়ে গান-গাওয়া বুলবুলি। কিন্তু পাস না করতে পারলে দেখতে হবে যে, আমার সামনে দিয়ে কোনও ব্যাঙের মতো ডাক্তার অথবা শিয়ালে-খাওয়া কই মাছের মতো কোনও এঞ্জিনীয়ার বুলবুলিকে পাশে বসিয়ে পিঁক পিঁক করতে করতে আমার বুকে ব্যথার সিরিঞ্জ বসিয়ে চলে গেল।

উপায় নেই।

হায় কবি, হায়! সেন্টিমেন্টের বড়ি, তোমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট না হয়ে উপায় নেই।

একদিন রাত্রে খেতে বসে বাবা ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রেজাল্ট কবে বেরোবে?

বললাম, দশ তারিখ; জানুয়ারির।

বাবা বললেন, তুমি পাস করলে তারপর ইটস্ আপ টু যু। আমি চাকরি করলে এতদিনে রিটায়ার করতাম। তাই আমি রিটায়ার করব। ভাল করলে ভাল করবে, খারাপ করলে খারাপ। বাট হোয়াটেভার ইউ ডু, ইউ মাস্ট বি অন ইওর ওন। তুমি নিজে জীবনে কী চাও, কতখানি চাও তা শুধু তোমার একারই উপর নির্ভর করে। জীবনে যতটুকু দেবে ততটুকুই ফেরত পাবে। বেশিও নয়, কমও নয়। দা চয়েস ইজ ইওরস্।

সেদিন খাওয়ার পর আমার নিজের ঘরে এসে আমি প্রথম ব্যাপারটার সত্যিকারের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম যে, এটা একটা নিছক পাস-ফেলের ব্যাপার নয়, এটা আমার অস্তিত্ব-অনস্তিত্বর ব্যাপার।

সব রকম অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বর ব্যাপার।

পরক্ষণেই হঠাৎ আমার মনে হল, যদি ফেল করি তা হলে কী হবে? ফেল করা কাকে বলে, সেটার স্বাদ কী রকম? কিছুই জানি না। কিন্তু পরীক্ষার আর সাত দিন বাকি। এমতাবস্থায় আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলাম যে, আমি ফেল করতে যাচ্ছি। এবং অন্য কোনও পেপারে নয়। অ্যাকাউন্ট্যান্সিতেই। একমাত্র তাতেই। ভগবানও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। কারণ অঙ্ক আমার আসে না। জাস্ট আসে না। আই কুডন্ট কেয়ার লেস।

আমি তক্ষুনি আস্তে আস্তে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে চোরের মতো বাবার ঘরে ঢুকলাম।

বাবা ইজিচেয়ারে আধোভাবে শুয়ে ছোট বাতি জ্বালিয়ে কী যেন পড়ছিলেন। বললেন, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, আমি পরীক্ষা দেব না।

বাবা সোজা হয়ে বসলেন। বইটা নামিয়ে রাখলেন।

বললেন, কেন?

আমি মুখ নিচু করে বললাম, আমি প্রিপেয়ার্ড নই।

বাবার চোয়ালটা শক্ত হয়ে এল। বললেন, কেন নও? তুমি কি অফিস থেকে ছুটি পাওনি? তোমার কি বইপত্র সব নেই? তোমার কি পড়াশুনার কোনও অসুবিধা হয়েছে?

আমি বললাম, না। আমারই দোষ।

বাবা বললেন, দোষ-গুণের কথা হচ্ছে না। কথাটা হচ্ছে যে তোমার কোনও এক্সকিউজ নেই, যে পড়াশুনা করার সময় পড়াশুনা করে না, তার ফেল করার এমবেরাসমেন্টটা ফেস করা উচিত।

তারপর একটু চুপ করে থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, জীবনে ফেল করার শিক্ষাটাও একটা বড় শিক্ষা। এবার তুমি জানবে ফেল করতে কেমন লাগে। তোমার মনে যে একটা মিথ্যা গর্ব গজিয়ে উঠেছিল নিজের সম্বন্ধে, সেটা ভেঙে যাওয়ার সময় এসেছে।

শোনো, তোমাকে বেশি কিছু বলতে চাই না। শুধু এইটুকুই জেনে রাখো যে, পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে। পাস-ফেলটা বড় কথা নয়, পরীক্ষাতে কমপিট করাটাই বড় কথা। যারা ফেল করার ভয়ে জীবনের কোনও পরীক্ষাতেই যেতে চায় না, তাদের কিচ্ছু হয় না। তারা কিছুই করতে পারে না জীবনে। পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে।

আমি জানতাম বাবা বেশি কথার লোক নন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরের ক'দিন আমার খাওয়া-দাওয়া, স্নান, ঘুম সব মাথায় উঠল। দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা আমি শুধু অ্যাকাউন্ট্যান্সির অঙ্ক কষতে লাগলাম। আর কোনও বিষয়ে আমি ভয় পাই না।

এই বিষয়টা যে আমার বুদ্ধির বাইরে তা নয়। কিন্তু শুধু বুদ্ধি বা কনসেপশন দিয়ে এ বিষয়ে পাস করা যায় না। এতে পাস করতে হলে মেহনতী মজদুর হতে হয়। আক্ষরিক অর্থে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজমিস্ত্রিও যেমন এক হাতে দশ দিনে একটা প্রাসাদ গড়তে পারে না, দশ দিন তেমনি অহোরাত্র অঙ্ক প্র্যাকটিস করেই পরীক্ষার হলে তিন ঘণ্টায় কেউ সব ব্যালান্স-শিট মিলিয়ে আসতে পারে না। এর জন্যে মাসের পর মাস মনোসংযোগ ও প্রস্তুতি লাগে।

আমার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করতে লাগল।

যখন দারুণভাবে খাটার সময়, তখন গান গেয়ে, থিয়েটার করে, টেনিস খেলে বেড়িয়েছি। যতটুকু লেখাপড়ার সময় ততটুকু সময়েও হয় ছবি এঁকেছি, নয় অন্য বই পড়েছি। এখন তো কাঁদলেও আর সময় ফিরবে না। সত্যি সত্যিই ফেল করতে হবে এ কথা কখনও ভাবতে পারিনি।

এ ক'দিন যখনই বাবার অফিস-ফেরতা গাড়ির হর্ন শুনতে পেতাম, ড্রাইভার যখন জোরে ব্যাক করে গাড়ি গ্যারাজে তুলত, তখন বড়ই খারাপ লাগত। উনি সপ্তাহে ছ'দিন অত খাটেন আর ভাবেন, আমি কবে ওঁকে রিলিফ করব, আর আমি কিনা নেচে-গেয়ে দিন কাটাচ্ছি। আমি নিজে যে অন্যায় করেছি সে কারণে নিজের জন্যে যা কষ্ট, তার চেয়েও বেশি কষ্ট হত এই ভেবে যে, আমার জন্যে অন্য কত লোক কত কষ্ট পাচ্ছেন ; কষ্ট পাবেন।

মাঝে মাঝে নিজের মধ্যের খেয়ালিপনা, এই কবিত্বকে হামানদিস্তায় ফেলে ছেঁচতে ইচ্ছে করত। কিন্তু কী করব ? আমার রক্তের মধ্যে যে তা বাসা বেঁধে ছিল।

কখনও বা মনে হত, সবচেয়ে কেজো কোনও রাজস্থানী ব্যবসাদারের শরীর থেকে সিরাম নিয়ে নিজের শরীরে ইনজেক্ট করি, যাতে একটু প্র্যাকটিক্যাল হই।

আমার মরে যেতে ইচ্ছে করত।

কোথায় আর দশজনের মতো হব, সুখ্যাত হব তা নয়, যত অকাজের আর অদরকারি জিনিসে আমার ঝোঁক।

কী যে করি আমি ? কী যে করি ?

মাত্র দশদিন বাকি।

মাত্র দশদিন পরে আমাকে একদল অনিপুণ মাতাদোরের মতো অ্যাকাউন্ট্যান্সির ষাঁড়ের গুঁতোয় রক্তাক্ত হতে হবে। সকলে হাততালি দেবে, আমি সম্মানের লাল নিশান ফেলে পালাতে থাকব, মাথার মধ্যে দেড় হাজার দাঁড়কাক ডাকতে থাকবে—কিন্তু আমার সম্মানের বুঁদির কেল্লা বাঁচানো যাবে না।

তাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

৫

মনের মধ্যে স্মৃতির ভাণ্ডারে যা থাকে তা দুঃখ ও সুখের সমষ্টি। তাতে সুখ ও দুঃখ কাটাকাটি হয়ে যেদিকে নিক্তির ভার বেশি, সে-দিকটাই জ্বলজ্বল করে, মনে থাকে। অন্য দিকটার কথা তেমন মনে থাকে না।

পরীক্ষা শেষ হবার পর কিন্তু মনে হল, পরীক্ষা ভালই হল। শেষের দিকের সব পেপারই ভাল হওয়ায় প্রথম পেপার দুটোর দুঃখজনক স্মৃতি মন থেকে প্রায় মুছে গেছিল।

এখন যতদিন না রেজাল্ট বেরোয় ততদিন আমার মুক্তি। মনে হল জেলখানা থেকে ছাড়া পেলাম।

গানের স্কুলে ইদানীং একটা নতুন বিপত্তি দেখা গেছে। সেটা ভয়েস ট্রেনিং-এর ক্লাস। হারমোনিয়ামের ভালায় ঘন ঘন বাঁ হাতের থাপ্পড়ে গান মরে ভূত হব-হব অবস্থা।

এমনি সময়, আমাদের এক সহশিক্ষার্থী এক দুর্ঘটনার শিকার হল। চক্রবর্তীমশায় ক্লাসে এসেই

www.BanglaBook.org

যে সরগমটি প্র্যাকটিস করে আসতে বলেছিলেন তা তাঁকে গেয়ে শোনাতে বললেন।

ও চোখ বন্ধ করে যথাসম্ভব মনোসংযোগের সঙ্গে গাইল।

ওর ফরসা রোগা গলার নীল শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছিল গাইবার সময়। গান গাওয়া শেষ হলে সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল, চক্রবর্তীমশায় সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তারপর অনেকক্ষণ পর গলা খাঁকরে ওকে বললেন, সাধু সাধু। এই বয়সে তুমি যা আয়ত্ত করেছ তা আয়ত্ত করতে অনেক ওস্তাদের সারাজীবন কেটে যায়। বুঝেছ ?

ও ঝোপের মধ্যের ছাতারে পাখির মতো নড়েচড়ে বসে উৎসাহের গলায় শুধোল, কী ?

চক্রবর্তীমশায় বললেন, এই সেদিন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে স্বরসপ্তকের সাতটি স্বরই বেসুরে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। আমি ভেবে পাচ্ছি না, তুমি এই বয়সেই এই সুকঠিন ব্যাপারটা কীভাবে রপ্ত করলে ?

তারপর এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, সত্যি আশ্চর্য !

ও মুখ নিচু করে বসে রইল।

আমরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

তারপরই আমাদের সতীর্থ স্কুল ছেড়ে দিল।

আমি দেখলাম, ট্রাফিক সিগন্যাল হলুদ হয়েছে—এই সময় সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া ভাল।

এই রকম কষ্ট করে গানের গ্রামারই যদি শিখতে পারব, তা হলে তো ইনসিওরেন্স কোম্পানির ব্যালান্স-শিটের ফর্মই মুখস্থ করে ফেলতে পারতাম।

আসলে কোনও রকম ব্যাকরণই আমার রক্তে নেই।

বাংলা কি ইংরিজি লিখে ফেলতে পারি পাতা পাতা, কিন্তু ব্যাকরণে ক্লাস থ্রির ছেলের কাছেও আমার হার অনিবার্য। বৈয়াকরণদের আমার বড় ভয়। শুধু ভয়ই নয়, তাদের উপর একটা জাতক্রোধ আছে আমার।

আমি জানি, এটা গুণেরও নয় ; দোষের কথা। কিন্তু এটা সত্যি কথা। অথচ এই আকট অজ্ঞতারও একটা দারুণ সুখ আছে। এ সুখটা পজিটিভ সুখ নয়, নেগেটিভ সুখ। যাঁরা এ সুখে সুখী, একমাত্র তাঁরাই জানেন এ সুখের গভীরতা কতখানি।

খেয়ালি, কবি ও ভাবুক ছেলেটা, যে ছেলেটার চাঁদ উঠলে গান গাইতে ইচ্ছে করত, কি বৃষ্টি পড়লে যার সঙ্গে বৈয়াকরণ লোকটার ভীষণ ঝগড়া লেগে যেত, সেই ভাবালু স্বাভাবিক গায়কটাকে যে মুহূর্তে ওস্তাদে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা দেখা গেল, সে মুহূর্তেই সে পালিয়ে যাবে ঠিক করল।

অথচ ব্যাকরণ না জানলে যে কোনও কিছুই তেমন করে শেখা যায় না, এ কথাটা তার একবারও মনে হল না।

ইতিমধ্যে একদিন পরীক্ষার ফল বেরুল।

আমি ফেল করলাম।

কথাটা যত সহজে বলা গেল, মন অত সহজে নিল না।

যা ন্যায্য ও অমোঘ বলে জানতাম, অন্তত জানা উচিত ছিল, সেটাকেও নির্লিপ্তমনে মেনে নিতে পারলাম না, কারণ সেটা আমার মনঃপূত নয়। ফেল করব জানতাম, তবু ফেল করার পর মনে হল যেন আমাকে পাশ করানোই উচিত ছিল।

খবরটা অফিসে বসে পেলাম।

সমাজদার পি টি আই থেকে জেনে এল।

ও পাস করেছে, হয়তো স্ট্যান্ডও করবে। ও আবার নতুন করে বে-ইজ্জত করল আমাকে।

অফিসের বাথরুমে গিয়ে চোখ জলে ভরে গেল।

ফেলুড়ে হয়ে গেলাম আমি ? জীবনে যা কখনও ছিলাম না !

সেদিন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথে এগোলাম।

মোড়ের মাথায় কলেজের এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। সে তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল—রাজা, আমার বন্ধু ; খুব ভাল ছেলে। পড়াশুনায় খুব ভাল।

www.BanglaBook.org

কে যেন আমার বুকে একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিল।

হঠাৎ আমার মনে হল, ও জানে না যে, আমি এই মাত্র ফাইনাল সি এ পরীক্ষার অ্যাকাউন্টস্ গ্রুপে ফেল করেছি। ও জানলে আমাকে কখনও ভাল ছেলে বলত না। আর কেউ কখনও বলবে না যে, আমি ভাল ছেলে, বা কখনও ভাল ছেলে ছিলাম। আমার ভালত্বের পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেছে।

সেদিন বাড়ি ফিরে অ্যাকাউন্ট্যান্সির খাতা, পিকলস স্নাইসার-পেগলার, ফুকলিঞ্চ ইনস্টিট্যুটের কাগজপত্র, ইয়রস্টন ব্রাউন অ্যান্ড স্মিথ-এর ভলুমস্ সব টেনে টেনে নামিয়ে সেগুলোকে টেবিলের উপর রাখলাম।

বাবা আগামী রবিবার অনেক লোককে খেতে বলেছিলেন বাবার বাগানে। আমার পাসের খাওয়া!

আমার উপরে বাবার এত বিশ্বাস ছিল যে, আমি প্রিপেয়ার্ড নই বলা সত্ত্বেও বাবা কখনও ভাবতে পারেননি যে, আমি সত্যি সত্যিই ফেল করতে পারি।

বাবা দিল্লি গেছিলেন কাজে। সন্ধ্যার প্লেনে ফিরলেন।

আমি গাড়ির শব্দ শুনলাম। সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ শুনলাম।

আমার মনে হচ্ছিল, বাবা যদি একটা শঙ্করমাছের চাবুক নিয়ে এসে আমাকে খুব চাবকাতেন তো আজকে আমার খুব ভাল লাগত। আমার অন্যায়ের, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে ওঁর কাছ থেকে শাস্তি পেলে আমার নিজের হাতে হয়তো আমাকে এমন করে শাস্তি পেতে হত না।

কেউ যদি কাউকে নিঃশর্তভাবে বিশ্বাস করে, সেই বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি যে বিশ্বাসঘাতককে এমন করে যন্ত্রণা দেয় তা আমার জানা ছিল না।

বাবা উপরে গিয়েই নিশ্চয়ই জানবেন খবরটা। শুনেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন। যদি ডাকেন, তা হলে আমি উপরে গিয়ে বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলব, বাবা, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো না, আমাকে মারো; খুব মারো। চাবুক দিয়ে মারো।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

বাবা তবুও ডাকলেন না।

আমার পড়ার টেবিলে হাতে মাথা রেখে বসেছিলাম আমি। মনে মনে আমার কাব্য রোগ, আমার খেয়ালিপনা, আমার সেই মিষ্টি গলার বক্তৃতা, এই অভিশপ্ত আমিকে, আমার সবকিছুকেই থুথু দিচ্ছিলাম।

নিজেকে বলছিলাম, আমার চেয়েও কত সাধারণ ছেলে এ পরীক্ষা সহজে পাস করে যায়, আর আমি পারলাম না?

ওদের কাছে হেরে যাওয়াটা বড় অপমানজনক।

অথচ আমি মনে মনে জানি যে, অর্থকরী পড়াশুনা করা ছাড়া, একটা ডিগ্রি পাওয়া ছাড়া এবং তারপর সেই ডিগ্রির জোরে পাওয়া একটা কভেনান্টেড চাকরি, কোম্পানির গাড়ি, সপ্তাহে একদিন চাইনিজ খাওয়া, ভাল ফিগারের একজন অন্তঃসারশূন্য ন্যাকা স্ত্রীর কামনা ছাড়া ওদের অনেকের জীবনেই আর কোনও কামনা নেই। ওদের কাছে জীবনের মানে ওইটুকুই।

অথচ ওদের কাছে এই পক্ষান্তরে সহজ পরীক্ষায় আমি এমন কঠিনভাবে হেরে গেলে কী করে প্রমাণ করব যে, এর চেয়ে কঠিনতর পরীক্ষায় ওদের আমি অক্লেশে হারাতে পারি। যে পরীক্ষায় কোনও টেক্সট-বুক নেই, যে পরীক্ষার সময়টা কোনও দিন বিশেষে বা ঘণ্টা বিশেষে নির্ধারিত নয়; যে পরীক্ষা জীবনময়, যে পরীক্ষা প্রতিমুহূর্তে, সেই পরম পরীক্ষার নাম জীবনের পরীক্ষা, অস্তিত্বের পরীক্ষা।

এ বাবদে আমার মনে কোনও সংশয় ছিল না যে, সেই যুদ্ধে আমি ওদের হ্যান্ডস-ডাউন হারাব, শুধু যদি এই প্রথম তোতা-পাখি পুঁথি-পড়া পরীক্ষাটায় পাস করতে পারি।

এ সব ভাবতে ভাবতে নোনা-চোখে কতক্ষণ অমনভাবে কেটে গেছিল জানি না, হঠাৎ পিঠে যেন কার হাতের স্পর্শ পেলাম।

মুখ ফিরিয়ে দেখি, বাবা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে চান-টান করে বাবা এসেছেন।

বাবা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, কখনও পিছনে তাকিয়ো না। কাল থেকে ভাল করে শুরু করো। জেনো, এটাও একটা শিক্ষা; বড় শিক্ষা। ফেলিওরস্ আর দ্য পিলারস্ অফ সাকসেস। টেক ইট অ্যাজ আ ব্লেসিং।

বাবা আর কিছু না বলে, আবার উপরে চলে গেলেন। আমাকে বকলেন না, আমার প্রতি বিরক্তি দেখালেন না, আমার উপর তাঁর বিশ্বাসে যে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরেছে তা কোনওক্রমেই বুঝতে দিলেন না।

আমি মেয়েদের মতো ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগলাম। নিজের উপরে ঘৃণায় এবং বাবার ক্ষমাময় পুরুষালি ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার গলা বুজে এল।

বাবা একটু পরে ফিরে এসে বললেন, তুমি গানের স্কুলটা আপাতত ছেড়ে দাও। পরীক্ষাটা পাস করে নিয়ে তুমি সবকিছু কোরো, বারণ করব না।

তারপর একটু থেমে বললেন, আমার মনে হয়, ইউ হ্যাভ টু মেনি এগস্ ইন ইওর বাস্কেট। ভেবে দেখো।

আমি চুপ করে রইলাম।

মুসৌরি থেকে মুখার্জিজেঠু লিখলেন, 'ইউ মাস্ট পাস ইন ইওর ফিয়ার এডুকেশনাল একজামিনেশনস, দ্য ব্যাটল অফ লাইফ ইজ ইয়েট টু বিগিন।'

চিঠিটা পড়ে প্রথমে খুব রাগ হল।

এ তো পরীক্ষা নয়, এ যে আখ-মাড়াইয়ের কল। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং সব পরীক্ষাতেই ব্যাক পেপারস আছে। একমাত্র এ পরীক্ষাতেই সে-সবের বালাই নেই। এমন অদ্ভুত নিয়ম কেন যে করা, তা বুদ্ধির বাইরে। 'ব্যাটল অফ লাইফ' কথাটার মানে যে কী, তা আমি তখন পরিষ্কার বুঝতাম না। তবে এটুকু বুঝতে পারতাম যে, গরিব বড়লোক নির্বিশেষে মানুষমাত্রকেই ব্যাটল অফ লাইফ লড়তে হয়। প্রত্যেক যথার্থ পুরুষকেই লড়তে হয়।

কেউ হয়তো শুধু নিজের প্রিয়জনদের কোনওক্রমে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে লড়াই করেন, কেউ বা করেন কোনও বিশ্বাসকে বা কোনও সুনামকে বাঁচানোর জন্যে। কেউ বা নেহাত তাঁর নিজেকে বা নিজের পরিবারকে বাঁচানোর জন্যেই নয়, তার চেয়েও কোনও বড় কারণের জন্যে লড়াই করেন। এসব লড়াইয়ের সব লড়াই-ই লড়াই। কোনও লড়াই-ই অন্য লড়াইয়ের চেয়ে কম নয়।

সে লড়াইকে আমার ভয় নেই, ভয় ছিল না কোনওদিন; একমাত্র ভয় এই চৌকাঠটাকে।

সে রাতে না-খেয়ে না-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বার বার ঘুমের মধ্যে জেগে উঠলাম। গলার কাছে কী যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠে আসতে লাগল। আমি নিজে কখনও এর আগে নিজের কাছে এমন করে শাস্তি পাইনি।

পরদিন একেবারে সকালেই ফুটপাথের নাপিত ডেকে মাথার চুলে এত ছোট করে কদমছাঁট লাগালাম, যাতে আমি বাইরে মোটে বেরোতে না পারি। মশারি থেকে ঢুকতে বেরুতে মাথায় মশারি আটকে যেতে লাগল।

বাইরে বেরোতে না পারলে বাধ্য হয়ে ঘরেই থাকতে হবে এবং ঘরে থাকলে অঙ্ক করতেই হবে। আমার ভাল লাগুক কি না লাগুক।

ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা অবধি একটা রুটিন করে ফেলে দিনের ও রাতের সমস্ত সময়টুকুকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললাম। যাতে এক চুল পরিমাণ ফাঁক না থাকে, যাতে আমার চোখ বাইরের আকাশে না যায়, কখনও মন গান না গায়, কখনও কবিতা না লেখে। মনে-প্রাণে আমি যেন মুদি হয়ে যাই। অ্যাকাউন্ট্যান্সি যেন আমার রক্তস্রোতে বাহিত হয়।

ভগবানকে বলতাম, ভগবান! তপস্যা করে ন্যাড়া বিবেকানন্দ হয় আর আমি মুদি হতে পারব না?

মাসখানেক পড়াশুনা বেশ এগোল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে, আমি একেবারে প্র্যাকটিক্যাল হয়ে উঠেছি। এমনকী আমার এই আমি-কে আসল আমি-টার চিনতে পর্যন্ত কষ্ট হতে লাগল।

www.BanglaBook.org

এদিকে কলকাতায় বর্ষা নেমে গেছিল।

সারা দুপুর ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি পড়ত। নিমগাছে ভিজে কাক গা ঝাড়া দিত। লনের কোণার ঝোপ-ঝাড় থেকে কুটুরে ব্যাঙ ডাকত। কার্ণিশে নরম কবোষ্ণ পায়রাগুলো বকম বকম করত।

আমার গারো পাহাড়ের জিঞ্জিরাম নদীর বুকে নৌকোর ছইয়ের নীচের সেই বৃষ্টির দিনগুলোর কথা মনে পড়ত। বরিশালের স্টিমারঘাটের ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি। রংপুরের হরিসভার মাঠের পাশের কদমফুলের গাছ; বৃষ্টির মধ্যে হরিসভার পুকুরের মধ্যের পুরনো কলার ভেলার উপরে হলুদ জলঢোড়া সাপের বৃষ্টিতে ভেজার কথা মনে পড়ত।

মনটা কিছুতেই সিঙ্গল এন্ট্রি বা ডাবল এন্ট্রিতে বাঁধা থাকতে চাইত না। এমন একটা দেশে ছুটে যেতে চাইত, যেখানে অ্যাকাউন্ট্যান্সির জন্যে চিরদিনের নো-এন্ট্রি।

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে পথেঘাটে জল দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের বাড়ির ছোকরা চাকর সাদার্ন অ্যাভিন্যু থেকে দেড়সেরি কাতলা মাছ ধরে নিয়ে এল গামছা দিয়ে। বাচ্চারা কাগজের নৌকো ভাসিয়ে আর চিৎকার চেঁচামেচি করে পাড়া সরগরম করে তুলল।

সেদিন পিছ-মোড়া করে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখা কবিটাকে আর রাখা গেল না। সে সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল।

গায়ে খেলার গেঞ্জি চাপিয়ে আর সাদা শর্টস পরে জল ভেঙে বেরিয়ে পড়লাম।

একা একা জল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে বুলবুলির কথা ভীষণ মনে পড়তে লাগল।

জানি না, সে এখন কী করছে। সে কি জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখছে? তারও কি সব সময় আমার কথা মনে হয়? আমার যেমন তার কথা মনে হয়! মনে যদি হয়ই থাকে তো সে সেই কথা জানায় না কেন? আমি যে সব সময় কত কষ্ট পাই, বুকের মধ্যেটা যে সব সময় মোচড়াতে থাকে, তবু কি সে বুঝতে পারে না? টেলিপ্যাথি বলে কি সত্যিই কিছু নেই?

হাঁটতে হাঁটতে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ের চা খেলাম।

তারপর পাশের দোকান থেকে বুলবুলিদের বাড়িতে একটা ফোন করলাম।

টেলিফোন করেই ভাবনায় পড়লাম যে, কী বলব? ভাবলাম, যদি সে ধরে, তা হলে তার গলার স্বর তো শুনতে পাব একবার!

কিন্তু সে ধরলে কি কথা বলতে পারব? আর বলবই বা কী?

এমনই বরাত যে, ফোন ধরল বাড়ির চাকর।

বলল, কাকে চাই?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বললাম, দীপা।

দীপা এসে ফোন ধরল।

বলল, কী ব্যাপার? রাজাদা? আপনি হঠাৎ ফোন করলেন!

আমি বললাম, জল দেখতে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের ওখানে জল হয়েছে?

বলেই বুঝলাম, একেবারে বোকা বোকা কথা বললাম।

ও বলল, জল মানে? থৈ থৈ করছে। সিঁড়ি অবধি জল। আমাদের আমগাছের একটা কাক মরে গেল। একটু আগে।

আমি বললাম, ঈস্—। কী করে?

ও বলল, যা বৃষ্টি! ডাবল নিউমোনিয়া।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

ভাবলাম, মেয়েদের যখন মায়া পড়ে, তখন একটা কেলে কাকের উপরেও কত মায়া পড়ে! আর যখন পড়ে না? তখন আমার মতো কোনও মানুষ মরে গেলেও তারা তাকায় না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললাম, কী করছিলে?

ও উত্তেজিত গলায় বলল, আপনি জানেন, আজ বুলবুলিদির রেকর্ড বেরিয়েছে! আমরা গান শুনছিলাম।

www.BanglaBook.org

আমি অবাক হলাম খুব।

বললাম, তাই নাকি ? আমি জানতাম না তো ! কী কী গান ?

ও বলল—'আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া' আর 'আজ শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে'।

দীপা একটু পরে বলল, একদিন আমাদের বাড়ি আসুন না ? সবাই মিলে গান-বাজনা করব ? আমাদের বাড়িতে এখন খুব মজা।

আমি বললাম, কেন ? মজা কেন ?

দীপা বলল, রূপদার বিয়ে।

রূপদার যে কত অ্যাডমায়ারার তার ইয়ত্তা ছিল না। অমন চেহারা, তার উপর অমন গুণ, কোন মেয়ের না তাঁকে ভাল লাগে ?

দীপা বলল, কার সঙ্গে জানেন ?

আমি বললাম, বাঃ, আমি কী করে জানব ?

দীপা বলল, ঝুমাদির সঙ্গে।

উনি না বোম্বেতে থাকতেন ?

হ্যাঁ ! থাকতেন। এখন কলকাতাতেই থাকবেন। আমাদের বাড়িতেই।

আমি বললাম, সেকী ? উনি তো আমাদের বাড়ির সামনেই থাকেন !

দীপা বলল, জানি তো।

আমার মনে পড়ল, ওঁর ফিকে হলুদ-রঙা মার্সিডিস গাড়িতে প্রায়ই ওঁরা পিকনিকে যেতেন। রূপদাকে প্রায়ই দেখতে পেতাম। রঙচঙে ছুটির দিনের পোশাক পরে আসতেন এবং একসঙ্গে মিলে চলে যেতেন হইহই করতে করতে পিকনিকে।

আমি বললাম, বাঃ, বেশ মজা তো তোমাদের।

ও বলল, তাই-ই তো। চলে আসুন একদিন।

টেলিফোন ছেড়েই আমি ঠিক করলাম এক্ষুনি গিয়ে রেকর্ডটা কিনতে হবে।

রূপদা কাকে বিয়ে করছে না করছে তা দিয়ে আমার কী দরকার ? আমার বুলবুলির রেকর্ড বেরিয়েছে, আনন্দে আমার ফেটে পড়তে ইচ্ছে করতে লাগল। এখন আর অন্য কিছু করা বা ভাবা নয়।

তাড়াতাড়ি জল ভেঙে মোড়ের গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমাদের সঙ্গে 'রবিবার'-এ অভিনয় করেছিল কণিকা মজুমদার, সুস্মির ভূমিকায়। ভারী মিষ্টি মেয়ে। ওর এক কাকা এ দোকানে কাজ করতেন।

আমাকে দেখে হাসলেন, বললেন, কী ব্যাপার ? এই দুর্যোগে ?

আমি বললাম, একটা রেকর্ড কিনতে এলাম।

উনি বললেন, কার রেকর্ড ?

জোরে জোরে উচ্চারণ করলাম বুলবুলির পুরো নামটা।

নামটা উচ্চারণ করতে যে কী ভাল লাগল, কী বলব !

বললাম, আছে ?

উনি একটা রেকর্ডের বাক্স নামালেন উঁচু তাক থেকে, দেখে বললেন, এতে তো নেই !

তারপর তাঁর পাশের ভদ্রলোককে বললেন, বুলবুলি কোথায় আছে ?

ভদ্রলোক বললেন, পা দিয়ে নীচের ড্রয়ার খোলো, ওই যে বাঁ-দিকের ড্রয়ার। ওর মধ্যে সব বুলবুলি আছে।

আমার ভীষণ রাগ হল।

ভদ্রমহিলাদের পুরো নামটাও কি উচ্চারণ করা যায় না ?

কণিকা, রাজেশ্বরী, সুচিত্রা, নীলিমা—কী অসভ্যর মতো নাম ধরে ধরে ডাকছেন ওঁরা সকলকে, যেন গায়িকারা সকলেই ওঁদের ইয়ার্কির পাত্র। আর এমন করে বললেন না, পা দিয়ে ড্রয়ার খোলো, ওর মধ্যে বুলবুলি আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাগে গা জ্বলতে লাগল।

রেকর্ডের দাম দেওয়া হলে বললাম, কেমন বিক্রি হচ্ছে ?

উনি বললেন, ভাল। নতুন রেকর্ড হিসেবে সেল ভাল।

তারপরই বললেন, আপনার কেউ হন নাকি ?

লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে গেল।

বললাম, না, কেউ হন না। আমি একজন, মানে, এই একজন অ্যাডমায়ারার।

উনি বললেন, 'অ'। হুঁ, আপনার মতো অনেক অ্যাডমায়ারার আছে ওঁর।

রেকর্ড নিয়ে বেরিয়ে এসে মনে মনে বললাম, কিছু হয় না মানে ? আলবত হয়। আমার হয় না তো কি আপনার হয় ? আজ কিছু না হলেও, একদিন হবে। আপনারা তো কার্ডবোর্ডের বাক্সে বুলবুলির রেকর্ড রেখেছেন, আমি আমার ঘরের মধ্যে পুরো বুলবুলিকে রেখে দেব, তখন দেখবেন।

বাড়ি ফিরেই, আমার ঘরের গালচেতে আসন কেটে বসে রেকর্ড শুনতে লাগলাম।

গান শুনে আমার কান জুড়িয়ে গেল। সমস্ত বর্ষাকালটা যেন ময়ূরের কেকাধ্বনি, কেয়াফুলের গন্ধ, কদমফুলের নরম স্নিগ্ধতা, আকাশের মেঘ-গর্জন, জলপড়ার টুপটুপানি সমেত সেই গান দুটির মাধ্যমে আমার ঘরের মধ্যে চলে এল।

আমি রেকর্ডটাকে চুমু খেলাম। বললাম, সাবাস বুলবুলি !

এখন আমার শুধু যোগ্য হতে হবে নিজেকে।

আমাকে তোমার গানের যোগ্য করে তুলতে হবে।

এ ক'দিন পড়াশুনা করে এই অ্যাকাউন্ট্যান্সির ম্যারাথন দৌড়ে অনেকখানি বুঝি এগিয়েছিলাম, কিন্তু রেকর্ড কোম্পানি একটি রেকর্ড বের করে আমাকে আবার স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

পরদিন রাতেই আবার নতুন বিপদ দেখা গেল।

আমি ভিভানে শুয়ে কস্টিং পড়ছিলাম, হঠাৎ পাশের বাড়ির রেডিওতে একজনের গলা শুনেই আমার গায়ে ইলেকট্রিক শক্ লাগল।

তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে আমি জানালা খুললাম।

এ গলা অন্য কারও হতেই পারে না।

অ্যানাউন্সার একটু পরেই জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন ওর নামটা।

আমার ভীষণ ভাল লাগতে লাগল।

বুলবুলি আবার গাইল—

"মম দুঃখের সাধন যবে
করিনু নিবেদন তব চরণতলে,
শুভ লগন গেল চলে,
প্রেমের অভিষেক কেন হল না
তব নয়নজলে ॥
রসের ধারা নামিল না, বিরহ তাপের দিনে
ফুল গেল শুকায়ে
মালা পরানো হল না তব গলে ॥"

কেন জানি না, ওর গান শুনলেই আমার সমস্ত শরীর-মন হাওয়া-লাগা কৃষ্ণচূড়ার মতো থরথর করে কাঁপতে থাকে, বুকের মধ্যেটায় কী রকম যেন করে। তখন পৃথিবীর সব খারাপ লোকদের ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছা হয়।

গান শুনলেই মনে হয়, এ যেন রবি ঠাকুরের কথা নয়, গায়িকার নিজেরই মনের কথা। কারও মনের কথা এমন স্পষ্ট করে, এমন বাঙ্ময়ভাবে আর কীসেই বা বলা যায় ? রবি ঠাকুরের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ লাগে নিজেকে—তাঁর গান না থাকলে বুলবুলি কি এমন করে তার কথা আমাকে বলতে পারত ? অবহেলায় অথচ পরম যত্নে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর রেডিও প্রোগ্রাম টেপ করেছিলাম সেদিন। সেই টেপ এবং ওই রেকর্ডের গান দুটো, দিন নেই রাত নেই, বাজাতে লাগলাম।

আমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া মাথায় উঠল।

ছুটির দিন একদিন দুপুরবেলা মেঝের গালচেতে বসে সামনে ইজেল নিয়ে ছবি আঁকছিলাম।

ভেবেছিলাম, ওর এই গানের (মানে রেকর্ডের) একটা বিফিটিং উত্তর দেওয়া উচিত—ওকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। ঠিক করেছিলাম, একটা ছবি এঁকে ফেলব বুলবুলির, অয়েল কালারে।

ছবি আঁকতে আঁকতে অনবধানে গুনগুনিয়ে গাইছিলাম—

'একলা বসে হেরো তোমার ছবি, এঁকেছি আজ বাসন্তী রঙ দিয়া, খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী মৌমাছি ; ঐ গুঞ্জরে বন্দিয়া— ।'

ছবিতে নাক মুখ চোখ চিবুক অবিকল হল, কিন্তু ওর মুখের সেই ভাবনাটুকু আঁকতে পারলাম না। কবে যেন তা চুরি হয়ে গেছিল।

কত দিন ওকে দেখিনি !

বিকেল গড়িয়ে গেছিল, ছবি তখনও শেষ হল না।

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল।

চমকে উঠে বললাম, কে ?

ওপাশ থেকে মা'র গলা শুনলাম, আসব ?

আমি বললাম, এসো। খোলা আছে।

মা ঘরে ঢুকতেই বললাম, কী মা ? আমার ঘরে ঢুকতে কি তোমার পারমিশানের দরকার হয় ?

মা'র মুখ গম্ভীর দেখলাম।

মা বললেন, আজ হয় না, একদিন হয়তো হবে।

কী হয়েছে মা ?

বুলবুলির রেকর্ডটা পড়েছিল রেডিওগ্রামটার উপরে।

মা সেদিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

বললেন, ওটা কার রেকর্ড রে ?

আমি বুলবুলির নাম বললাম। আমার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

মা বললেন, মেয়েটি কে ? তুই চিনিস ?

আমি বললাম, চিনি বলা যায় না ; মানে আলাপ নেই। তবে চিনি না বললেও মিথ্যে কথা বলা হয়। ভারী ভাল গান গায়, জানো না ?

মা বললেন, হ্যাঁ ! গান তো এ ক'দিন ধরেই শুনছি, সারাক্ষণই শুনছি। তবে সব সময় গানই শুনবি তো পড়াশুনা করবি কখন ? তোর কি পরীক্ষায় পাস করার ইচ্ছা নেই ?

আছে। তবে পরীক্ষার সঙ্গে আমার যোগাযোগটা ঠিক হচ্ছে না মা।

মা বললেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোর জন্যে খারাপ লাগে। আমরা ক্লাবে যাই, পার্টিতে যাই, বেড়াতে যাই, আর তুই দিনরাত ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে পড়াশুনা করিস।

আমি বললাম, পড়াশুনার চেষ্টা করি বলো ! তুমি তো জানো যে এ আমার ভাল লাগে না।

মা বললেন, যাই হোক, আমার খুবই খারাপ লাগে।

তারপর মা আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, পাসটা কর, তারপর তুই গান গাস, ছবি আঁকিস, কিচ্ছু কেউ বলবে না। কিন্তু পরীক্ষাটা পাস কর। বুঝতে পারি যে তোর খারাপ লাগে। কিন্তু দেখিস, পাস করলেই তোর খারাপ লাগা চলে যাবে।

পরক্ষণেই মা বললেন, এটা কার ছবি আঁকছিস রে ?

আমি এক গাল হাসলাম। বললাম, বুলবুলির।

মা বললেন, তোর লজ্জা করে না ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মা'র সুন্দর মুখটা খুব কঠিন দেখাল।

বললেন, যা শুনছি তা হলে সত্যি ! এই মেয়েটাই তোর মাথা খাবে। এ সব বন্ধ কর, বন্ধ কর রাজা। তোর ভালর জন্যেই বলছি। তোর বাবা এখনও এসব জানেন না ! জানলে হয়তো তাঁর নির্ঘাত স্ট্রোক হবে। ছিঃ ছিঃ, তুই আমাদের এমন দুঃখ দিবি কখনও ভাবিনি।

আমি মেঝে থেকে উঠে ডিভানে বসে বললাম, আমি তো কোনও অন্যায় করিনি মা। তুমি কি শুনেছ জানি না, তবে তুমি যখন এ কথা তুললে, তখন বলি যে ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

ওকে মানে ? ওর গান ? মা বললেন।

হ্যাঁ, গান। গানও ভাল লাগে, ওকেও ভাল লাগে।

গান ভাল লাগে তো রেকর্ড শুনলেই হয়, রেডিও শুনলেই হয়। গান ভাল লাগে বলে গায়িকা-শুদ্ধু বাড়ি এনে তুলতে হবে এমন কথা তো শুনিনি কখনও। তার উপর গাইয়ে-বাজিয়ে বিয়ে করে কি কেউ সুখী হয় ? তুই যখন সারাদিন পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরবি, দেখবি সে হয়তো গান গাইতে গেছে, কি রিহার্সালে গেছে। সংসারে সুখী হতে হলে সাধারণ সংসারী মেয়ে বিয়ে করতে হয়। এমন মেয়ে বিয়ে করে কেউ সুখী হয় না কখনও।

আমি উঠে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম ; বললাম, মা, আমি কখনও এমন কিছু করতে পারি না, যাতে তুমি বা বাবা দুঃখ পাও। তবে তোমরাও তো আমাকে দুঃখ দিতে চাও না ? তাই আমার একমাত্র অনুরোধ যে, আমার স্ত্রী কে হবে সে সম্বন্ধে মন স্থির করার আগে আমাকে কথা দিতে হবে যে, ওকে তোমরা দেখবে, ওকে বিচার করবে। যাচাই না করেই বাতিল করা কি ঠিক মা ?

মা'র মুখটা সৌন্দর্যরহিত হয়ে উঠল।

মা বললেন, খুব বড় বড় কথা শিখেছিস তো ! এত সাহস তোর কী করে হল ?

আমি চুপ করে রইলাম। কী বলব ভেবে পেলাম না।

মা বললেন, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। তবে এটুকু তোমাকে বলে গেলাম যে, তুমি যা ভাবছ, তা হবে না ! কখনও হবে না। তুমি যে এমন খারাপ হয়ে গেছ, খারাপ হয়ে যাবে, এমন বকে যাবে, তা কখনও ভাবিনি ! তোমার বাবার মুখের দিকে চাইলে আমার কষ্ট হয়। এর জন্যেই কি তোমাদের বড় করা, মানুষ করা।

এ কথা ক'টি বলেই মা দুম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

আমি অনেকক্ষণ একা ঘরে বসে থাকলাম চুপ করে।

বাবার জন্যে, মা'র জন্যে আমার মনটা ভারী খারাপ লাগতে লাগল। অথচ কী আমি করব, কী আমার করা উচিত, আমি বুঝতে পারলাম না।

যার জন্যে আমার এত কষ্ট, সে তো কখনও জানল না যে, তাকে ভালবেসে আমার সবকিছু নষ্ট হতে বসেছে। তাকে যদি কখনও জীবনে পাইও, আমি জানি না সে আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করবে, সে আমার এই ভালবাসার, এই যন্ত্রণার মূল্য দেবে কি না। আমি কিছুই জানি না।

বুলবুলির রেকর্ডটা তুলে রাখতে রাখতে বললাম, বুলবুলি, তুমি ভীষণ খারাপ। তোমার জন্যে আমার কত যে কষ্ট তা তুমি কখনও কি জানবে, কোনও দিনও কি জানতে পারবে ?

৬

ভোরবেলা উঠে চান-টান করে গায়ে হলুদ খদ্দরের পাঞ্জাবি চাপিয়ে ধাক্কা পাড়ের ধুতি পরে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম।

আজ আমাদের স্কুলের স্টিমার পার্টি।

অনেকেই এসে গেছিল। কিন্তু এসে পর্যন্ত আমার চোখ যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তাকে দেখা গেল না।

আমি ভাবছিলাম, তা হলে এসে কী লাভ হল ? এত বন্ধু-বান্ধবী, এত গান, এত হাসি, এত হুল্লোড়, এত খাওয়া-দাওয়া, সবই আমার কাছে আনন্দহীন বলে মনে হতে লাগল। সে যদি না-ই

www.BanglaBook.org

আসে, তা হলে আমি এলাম কেন ? তার চেয়ে বাড়ি বসে অ্যাকাউন্ট্যান্সির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করা ভাল ছিল।

শ্যামলদা এসেছিলেন। খুব ভাল ভূশণ্ডীর মাঠের গান গাইতেন শ্যামলদা।

শ্যামলদা ডেকের উপরে সতরঞ্জি বিছিয়ে হারমোনিয়ম সামনে নিয়ে বসেছিলেন। ছেলেমেয়েরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল।

বড়দা, মানে বিজুদা, সুনীলদা, সুবিনয়দা, এঁরা সকলে একটু আলাদা বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন, গল্প করছিলেন।

বৌদি বড়দের এবং ছোটদের সঙ্গে সমানে আড্ডা মারছিলেন।

মেয়েদের মধ্যে কী কী গুণ পুরুষরা আশা করে তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না, কিন্তু বৌদির মতো সম্পূর্ণা নারী আমি বেশি দেখিনি।

মোহরদি খুব সেজে এসেছিলেন।

সাজলে মোহরদিকে দারুণ লাগে। না-সাজলেও লাগে।

শান্তিনিকেতন বন্ধ। বীরেনদাও এসেছিলেন সেবারে।

আমি চিরদিন মোহরদির গানের এবং খেয়ালি অন্তরের অন্ধ ভক্ত।

মোহরদিকে যখন চিঠি লিখতাম, তখনই মোহরদি সেই চিঠির প্রশংসা করে আমাকে রীতিমতো ফুলিয়ে দিতেন। জানি না, সেটা ঠাট্টা ছিল কি না।

আমি বললাম, আজ অনেক গান শোনাতে হবে কিন্তু।

মোহরদি পান খাচ্ছিলেন। ঢোক গিলে বললেন, শোনাব। ঢোক গেলার সময় ওঁর ফরসা গলার নীল শিরা বেয়ে লাল পানের পিক নামতে দেখলাম।

আমার কেবলই মনে হত যে, মেয়েরা (সুন্দরী, অথবা অসুন্দরী) যেমন সাজতে ভালবাসেন, তেমন তাঁদের সাজের অ্যাপ্রিসিয়েশন পেতেও খুব ভালবাসেন। যদি অ্যাপ্রিসিয়েটই না করতে পারলাম, তবে ওঁরা কষ্ট করে সাজবেনই বা কেন ? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজে দেখবার জন্যে তো কেউ আর সাজেন না ? অন্য লোকের চোখের আয়নায় তাঁদের প্রতিফলিত করবার জন্যেই সাজেন। তাই সেই আয়নাগুলোই যদি ফাটা হয়, তাতে যদি পারা খসে গিয়ে থাকে, তা হলে মেয়েদের সুন্দর সাজের মতো ব্যর্থতা আর কিছুই নেই। সেই ব্যর্থতার জন্য দায়ী আমরাই ; আমাদের অপারগ আয়নাগুলো।

মঞ্জরীদি, সুশীলদা, অমলদা, বাণী, সুহৃতা সকলেই এসেছিলেন। আরও কতজন এসেছিলেন।

সুহৃতা সেদিন অনেকগুলো অতুলপ্রসাদের গান শুনিয়েছিলেন আমাদের। অমলদা শুনিয়েছিলেন শচীন কর্তার নতুন বেরোনো রেকর্ডের আড়ে-আড়ে গাওয়া গান।

স্টিমার ছেড়ে দিয়েছিল অনেকক্ষণ। সকালের চা ও জলখাবার খাওয়া হয়ে গেল। অথচ এ পর্যন্ত তাকে একবারও দেখা গেল না।

আমার চোখ সর্বক্ষণ চাতক পাখির মতো চমকে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু তৃষ্ণার জলের দেখা ছিল না।

নড়িদা আমার উপর খুব চটে ছিল।

ভয়েস ট্রেনিং ক্লাসের মাস্টারমশাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কারফা ঝম্পক রূপকড়া এবং আরও অনেক কঠিন কঠিন তালের মাত্রা কত কত !

আমি যথারীতি ভুলভাল বলেছিলাম।

মাস্টারমশাই শুধিয়েছিলেন, কে শিখিয়েছে ?

আমি অম্লান বদনে বলেছিলাম, নড়িদা।

নড়িদার দোষের মধ্যে নড়িদা নিজের সময় নষ্ট করে আমারই অনুরোধে বাড়িতে আমাকে তাল সম্পদে তালেবর করতে এসেছিলেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলেছিলাম, নড়িদা শিখিয়েছে।

নড়িদা কেবলই বলছিল যে, আমি সব ঠিক জেনেও নাকি ইচ্ছা করে ভুলভাল বলেছিলাম, নেহাত নড়িদাকে অপদস্থ করার জন্যেই। কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই ভুলভাল বলেছিলাম।

www.BanglaBook.org

নড়িদা এত রেগে ছিল যে, মোটে কথা বলছিল না আমার সঙ্গে।

এক ঝাঁক সী-গাল উড়ছিল গঙ্গার উপরে। স্টিমারের প্রপেলারের ঢেউ দূরে দূরে নদীর পাড়ে পাড়ে আছড়ে পড়ছিল। জলের উপর দোল খাচ্ছিল ছোট ছোট মেছো নৌকোগুলো। ছইয়ের নীচে হুঁকো-হাতে বসে-থাকা মাছের মহাজন স্থির চোখে জলের দিকে তাকিয়েছিল। বোধ হয় ঢেউ গুনতে গুনতে ভাবছিল, কী করে আরও টাকার মালিক হওয়া যায়।

হালে-বসা পেট-পিঠ এক হওয়া মাঝি দূরের দিগন্তে চেয়েছিল।

মাঝির সাদা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছিল। সেই মাঝিকে ঠিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি-র হোসেন মিঞার মতো দেখতে।

সী-গালগুলো তাদের নরম সাদা শরীর আর কমলা-রঙা ঠোঁটে ঘুরে ঘুরে, স্টিমারটার সঙ্গে সঙ্গে উড়ছিল।

ওদের ওড়ার ছন্দ আমার চোখে লেগেছিল। রেলিং-এ ভর দিয়ে বসে আমি ভাবছিলাম যে, সব তালকেই যদি মাত্রার বাঁধনে বেঁধে লিপিবদ্ধ করা যেত, তাহলে সী-গালের ওড়াতে কোন তালের তালি বাজত ? অথচ যদি কেউ বলে যে, যেহেতু এ তাল স্বীকৃত নয় সঙ্গীত শাস্ত্রে, সুতরাং ওদের এই ওড়ার মধ্যে, হাওয়ার গালচেয় নাচের মধ্যে, রুপোর জলে ছোঁ মারার মধ্যে কোনও ছন্দ নেই, তাল নেই, ওদের বিরহী নগ্ন নির্জন স্বরের মধ্যে সুর নেই, তাহলে আমি মানতে রাজি নই।

সী-গালদের ওড়ার ও ওদের স্বরের উত্থান-পতনের স্বরলিপি বানাতে বললে কি ওদের ডানা কেটে, মাংস ছাড়িয়ে, ঠোঁট চিরে ওদের মধ্যের তাল ও সুরের শবব্যবচ্ছেদ করতে হবে ? ওদের এই জীবন্ত নরম ডাকের কোনও স্বরলিপি হয় না কেন ? আর নাই-ই যদি বা হয় তাহলে স্বরলিপির প্রয়োজন কী ?

যা লিপিবদ্ধ করা না যায়, তা কি স্বর নয় ! সুর নয় !

কেন জানি না, এসব কথা ভাবলেই আমার কেবলই মনে হত যে, গানের গোড়ার কথা হচ্ছে শ্রুতি এবং গায়কী। যাদের ভগবান এ দু'টি আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাঁরা লক্ষ্ণৌর গরমে ভাতখণ্ডে স্কুলে গিয়ে দিনের পর দিন ভাত খেলেও কখনও গান শিখতে পারবেন না।

যার নিজের মধ্যে গান নেই, তাকে স্কুল কী করে গান গিলিয়ে দেবে, সে যত বড় স্কুলই হোক না কেন ?

গান শিখতে হলে গানের বিজ্ঞান অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে, (যা পারব না বলে আমার কোনওদিনও গান হবে না) তবুও আমার কেবলই মনে হত যে, গান কখনও শুধু বিজ্ঞাননির্ভর নয়।

ব্যাকরণ হচ্ছে সী-গালদের রক্ত, মাংস, হাড়, আর গান হচ্ছে ওদের উড়ে চলা, ওদের হাওয়ায় হাওয়ায় নাচ, জলের মধ্যে হীরে-ছিটিয়ে ওদের ছোঁ-মারা। যেটুকু ব্যাকরণ পড়ে শেখা যায় না, সেটুকু নিজের মধ্যের জেনারেটরে উৎপাদিত করে নিতে হয়।

নিজের ভাবনায় নিজে বুঁদ হয়ে বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখি, নীচের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ডেকে সে উঠে আসছে।

হলুদ আর লাল ডুরে একটা ধনেখালি শাড়ি, একটা লাল ব্লাউজ, দু'দিকে দুটি লম্বা বিনুনি।

ওইটুকু মেয়ে, কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সত্যিই যেন কত বড় হয়ে গেছে। কিংবা কী জানি, আমার চোখই হয়তো ওকে বড় করে দেখে আনন্দ পাচ্ছে।

হুহু-হাওয়ায় তার শাড়ির আঁচল উড়ছিল, বেণী দুলছিল, আর আমার মনের মধ্যে সুশীলদার গলায় শোনা সুরে ভবপুর সেই গানটি গুঞ্জরন করে ফিরছিল— 'কি সুর বাজে আমার প্রাণে, আমিই জানি আমার মনই জানে'।

স্টিমারের ডেকময় হাওয়াটা আমার বুকের মধ্যের ভাবনার মতো দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল।

ওদিকে ততক্ষণে শ্যামলদার ভুশণ্ডীর মাঠে রীতিমতো জমে উঠেছে।

ও-ও গিয়ে ওখানে বসল।

আমি একা গেলে দেখতে খারাপ লাগত ; অন্য কারও কাছে নয়, হয়তো আমার নিজের কাছেই, তাই আমি নড়িদাদের সাধাসাধি করে নিয়ে গেলাম। বললাম, চলো না, গান শুনি গিয়ে, কী এক

www.BanglaBook.org

কোণে বসে আছ ?

নড়িদা বিড় বিড় করে বলল, তোমাকে বোঝা ভার ! তুমিই তো এতক্ষণ বললে যে ভিড় ভাল লাগে না, এসো নিরিবিলিতে বসি !

নড়িদাকে কী করে বলব যে, এই মুহূর্তে আমার ভিড়ই খুব ভাল লাগছে।

বাণী গাইল, মঞ্জরীদি ও সুশীলদা গাইলেন, তারপর আমরা বসন্তের গান গাইলাম দল বেঁধে।

দেখতে দেখতে বেলা হল !

সময় যেন সী-গালদের মতো উড়ছিল। এত গান, এত ভাল-লাগা, বুলবুলিকে চোখের সামনে এতক্ষণ দেখতে পাওয়ার সুখ, সব মিলিয়ে সময় যে কী করে কেটে গেল টেরও পেলাম না !

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর আনন্দোচ্ছল বৌদিদের কাছ থেকে পান চেয়ে নিয়ে খেলাম।

একসময় স্টিমারটা কলকাতার দিকে মুখ ফেরাল।

বেলা পড়ে এসেছিল।

শেষ বিকেলের ম্লান বিষণ্ণ আলো ডেকময় লুটিয়ে পড়েছিল। তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে অনেক দূরে রেলিঙের ধারে চুপ করে বসেছিল। ওর দিকে তাকিয়ে চার অধ্যায়ের লাইন দু'টি হঠাৎ করে মনে পড়ল আমার—'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ !'

ও-পাশের চটকলের উঁচু উঁচু চোঙায় শেষ বিকেলের রোদ ঠিকরোতে লাগল। ইঁটের ভাঁটার লালচে রঙ আরও লাল হয়ে এল।

বিকেলের চায়ের পর্বও শেষ হল।

আমার ভীষণ মন খারাপ লাগতে লাগল।

আবার কতদিন বুলবুলিকে দেখতে পাব না !

এই ভাল-লাগা, এই উষ্ণতা একটু পরেই মরে যাবে। বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ করে অ্যাকাউন্ট্যান্সির দমবন্ধ আবহাওয়ায় ভিরমি খাব আমি। সমস্ত সুখস্মৃতি, আবেশ, এই আশ্চর্য দিনটির মতো নিভে যাবে।

দেখতে দেখতে স্টিমার এসে ঘাটে লাগল।

আমি আগে নামলাম না।

যতক্ষণ বুলবুলি না নামে, আমি নানা অছিলায় উপরের ডেকেই থাকলাম। তারপর এক সময় ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

এ-পাশে শামুকখোল, ও-পাশে হুতোম-পেঁচা, মধ্যিখানে বুলবুলি। একটু যে ভাল করে শেষবারের মতো তাকাব তারও উপায় ছিল না। ধাড়ি পাখিগুলো বুলবুলিকে আড়াল করে ছিল।

ও-ও যেন কী ? ও কি বুঝতে পারে না, আমার ওকে কতখানি ভাল লাগে, আমি ওকে একটু দেখতে পেলে কতখানি খুশি নই ? তা নয়, আমাকে দেখলেই ওর চোখে বিরক্তি, মুখে নিমপাতা। একদিনও ও আমার দিকে ভাল করে চোখ মেলে তাকাল না পর্যন্ত।

কিন্তু আজকে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল।

শ্যামলদার পাশে বসে গান শুনতে শুনতে আমি বাইরে জলের দিকে চেয়েছিলাম। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে সামনে তাকাতেই দেখি, ও পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি চোখ ফেরাতেই ও আবার বিরক্ত চোখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ও কি তাহলে আমার অজানিতে আমার চোখে চেয়েছিল ? ওরও কি আমার দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে ?

ও যখন স্টিমার থেকে জেটিতে নামল তখন আমি ওর পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

উঁচু থেকে নামতে গিয়ে ওর শাড়ি একটু উঠে গেল। পিছন থেকে ওর সুগৌর পায়ের আভাস পেলাম, হলুদ আর লাল ধনেখালি শাড়ি ও সাদা পেটিকোটের নীচে।

হঠাৎ স্টিমারের বন্ধ-হওয়া এঞ্জিনটা স্টিমার ছেড়ে এসে আমার বুকের মধ্যে চলতে শুরু করল। এমন প্রচণ্ড ধ্বক-ধ্বক করতে লাগল বুকটা যে, মনে হল আমি হার্টফেল করব।

সুন্দরী রুমা তো কতদিন শর্টস পরে আমার সঙ্গে ওদের বাড়ির লনে টেনিস খেলেছে—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কতদিন ! কই ? তার অনাবৃত উরু, ফ্রেঞ্চ-পেরাঁ গেঞ্জির নীচে সুবদ্ধ তার সুডৌল বুকের স্পষ্ট আভাসও তো আমার বুকের মধ্যে কাউকে এমন করে কথা বলায়নি ? তবে ? তবে বুলবুলির গোড়ালি আর গোড়ালির উপরেও একটু অংশ দেখে আমার বুকের মধ্যের সমস্ত হলুদ-বসন্ত পাখিগুলো এমন করে ডানা ঝাপ্টাল কেন ?

৭

অভিজিৎ ফোন করেছিল।

বলল, কাল ওদের বাড়িতে বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব গাইবেন, যেন অবশ্য অবশ্য যাই। রুমা বার বার যেতে বলেছে।

অভিজিৎ কলেজে সায়ান্সের ছাত্র ছিল। কিন্তু বলতে গেলে আর্টসের ও সায়ান্সের ছেলেদের মধ্যেই আমার বেশির ভাগ ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিল।

অভিজিৎ মেটালার্জি নিয়ে পরীক্ষা পাশ করে কানাডায় যাবার তোড়জোড় করছিল। ও উজ্জ্বল চোখে বলত জাস্ট ইমাজিন কব, একটা অত বড় সম্ভাবনাময় দেশ পড়ে আছে, জাস্ট ফর ইওর টেকিং। যে জীবনে চ্যালেঞ্জকে নাম দেয়, যে নিশ্চিত সুখের জীবনের চেয়ে অনিশ্চিত সংগ্রামের জীবন বেশি পছন্দ করে, তার পক্ষে কানাডা একটা আশ্চর্য জায়গা।

অভিজিতের বাবা কলকাতার নাম-করা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ছিলেন। এঞ্জিনীয়ারিং-এ ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করার পর, হাওড়ায় ছোট্ট একটি কারখানা দিয়ে জীবন শুরু করে, জীবনের দুই-তৃতীয়াংশে এসে, একজন মানুষ টাকা-পয়সা ও যশের ক্ষেত্রে জীবনে যা যা চাইতে পারেন, তার সব কিছুই উনি পেয়েছিলেন।

অভিজিৎ ওর বাবার একমাত্র ছেলে।

অথচ ও ওর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কখনও রাজি ছিল না। এ নিয়ে ওর সঙ্গে ওর বাবার প্রায়ই আলোচনা এবং মতদ্বৈধতা হত। অভিজিৎ খুব একরোখা ছিল। ও বলত, তোমার কোম্পানিগুলোর আমি এমনিতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে যাব— জাস্ট বিকজ আমি তোমার ছেলে।

যদি আমি তোমার চেয়েও অনেক ভাল করি, তবে তুমি, মা, কোম্পানির কর্মচারীরা এবং পৃথিবীসুদ্ধু লোক বলবে, আরে, বাবার তৈরি কারখানা ছিল, সবই তো বাবার করা, ও আর কী করেছে ? বাবার গদিতে সকলেই বসতে পারে। আর যদি খারাপ করি তো বলবে, বাবার হাতে-গড়া এমন জিনিসটা বাঁদরটা তছনছ করে দিল !

আমি যদি কৃপণ হই তো বলবে, বাবার টাকা হাতে পেয়েছে, নিজের তো রোজগার করতে হয়নি ; ওয়ান-পাইস্ ফাদার-মাদার।

যদি খরচা করি খুব, তাহলেও বলবে, ওর আর কী ? নিজের পরিশ্রমে তো রোজগার করতে হয়নি, বাবা রেখে গেছিলেন, এখন দু'হাতে ওড়াচ্ছে বকাটা।

অভিজিৎ বলত, দ্যাখ, আমাদের একটাই জীবন, জীবনটা নিজের মতো, নিজের খুশি মতো, নিজের তৈরি করা সুখ, নিজের তৈরি করা দুঃখ নিয়েই কাটানো উচিত। নিজের জীবনে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, সে সুখেরই হোক কি দুঃখেরই হোক, নইলে জীবনের কোনও মানে নেই। বাবার পরিচয় আমাকে সমস্ত জীবন আমার নিজের যা-কিছু নিজস্ব সব কিছুকে আড়াল করে রাখবে, এ আমি ভাবতে পারি না। যদি জীবনে সাকসেসফুল হই তো বলব যে, আমি নিজে করেছি, যদি না হই তো স্বীকার করব নিজের দোষে হেরেছি।

অভিজিতের পরের বোন রুমা আমার কাছে এক দারুণ নরম বিস্ময় ছিল।

গভর্নেসের হাতে মানুষ, ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ অনর্গল বলতে পারত, সংস্কৃতে মূল মেঘদূত পড়ে শোনাত আমাদের। রুমা দেখতে এমন মোম-মোম পবিত্র-পবিত্র ছিল যে, ওকে দেখলেই মনে হত আমিও পবিত্র হয়ে গেলাম।

www.BanglaBook.org

ওর ধবধবে ফরসা রঙে কোনও উগ্রতা ছিল না, একটা শান্ত স্নিগ্ধতা ছিল। একমাথা কালো কুচকুচে চুল, সুন্দর পরিচ্ছন্ন দাঁত, কথাবার্তা হাঁটা-চলা হাসি সবকিছুর মধ্যে এক দারুণ আভিজাত্য ছিল। যা নকল করে পাওয়া যায় না। ওর মধ্যে কোনও চালিয়াতিও ছিল না, যা রুমার দিদির মধ্যে ছিল।

বেশির ভাগ সময়েই ও সাদা শাড়ি পরত, প্রসাধন করত না, চোখের মণির দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলত সরলভাবে। মেয়েদের সহজাত কোনওরকম ন্যাকামির 'ন'ও ছিল না ওর মধ্যে, কোনওরকম জড়তার 'জ'ও ছিল না।

রুমাকে আমার যে শুধু ভাল লাগত তাই-ই নয়, কেন জানি না, ও এত বেশি ভাল ছিল যে, ওকে আমার কেমন ভয় ভয় করত।

মা'র সঙ্গে বুলবুলি সম্বন্ধে সেদিন দুপুরে ওরকম কথাবার্তার পর আমি নিজেকে খুব শাসন করেছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম, তুমি বুলবুলিকে মন থেকে তাড়াও, এমনি না গেলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করো, আড়কাঠির ভয় দেখাও। তাকে বলো যে, সে যেন অমন করে গান না গায়, অমন করে না তাকিয়ে যেন একেবারেই না তাকায় তোমার দিকে।

মা যাই-ই বলুন না কেন, নিজের যাকে পছন্দ নয়, যাকে দেখিনি শুনিনি, যাকে জানি না, এমন কাউকে নেহাত মা-বাবাকে খুশি করার জন্যেই বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাছাড়া যে ছেলে ফেলুড়ে, যে একটা সামান্য পরীক্ষাই পাশ করতে পারছে না, যে নিজের পায়ে এখনও দাঁড়ায়নি, নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেনি নিজেকে নিজের কাছে, বাইরের কাছে, তার আবার বিয়ের ভাবনা কীসের!

তবু, এও সত্যি যে, মা-বাবাকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে আমার কখনও ছিল না। তাই সেদিন অভিজিৎদের বাড়ি যাবার সময় বার বার রুমার কথা মনে হচ্ছিল।

রুমাকে আমার মা ও বাবা দু'জনেই দেখেছেন। ওঁরা রুমার পরিবারের কথাও জানেন। তাই ভাবছিলাম, মনে মনে বুলবুলিকে উড়িয়ে দিয়ে যদি রুমাকে মনের আরও কাছে আনি, তা হলে হয়তো বাবা-মা খুশি হবেন।

কিন্তু তাও কী হবেন?

রুমাকে দেখার আগে আগে মা রুমার কথা শুনেছিলেন আমার কাছে। মাকে নিয়ে একদিন নিউ মার্কেটে গেছিলাম, সেদিন সেখানে রুমা ও রুমার মা'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেছিল। আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম মা'র সঙ্গে।

ওঁরা চলে যেতেই মা বলেছিলেন, মেয়েটি ভারী সুন্দর তো! ওর বাবার নাম কী রে?

বাবার নাম বলতেই মা বলেছিলেন, ও মা! ভদ্রলোক তো প্রচণ্ড হুইস্কি খান। ক্যালকাটা ক্লাবে ওঁকে সকলে চেনেন! তোর বাবাও চেনেন। তারপরই মা বলেছিলেন, তুমি যা ক্যাবলা, দেখো, বেশি মাখামাখি কোরো না।

মা এই মাখামাখি বলতে কী বোঝাতেন জানি না, কিন্তু মা'র বোধহয় ধারণা ছিল, পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী গুণবতী মেয়েই তাঁর অপোগণ্ড ছেলের সঙ্গে মাখামাখি করবার জন্যে মুখিয়ে আছে! জানি না, হয়তো তাঁদের ছেলেদের সম্বন্ধে, ছেলেদের একটা বিশেষ বয়সে, সব মায়েদেরই এরকম ধারণা থাকে।

নিউ মার্কেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনই বুঝেছিলাম যে, মা'র গুড-বুকে বেচারি রুমার নামটা উঠতে না উঠতেই কাটা গেল। তবে এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য। এখন রুমার নামটা বুলবুলির নামটার বদলে প্রার্থী তালিকায় বসালে, শুধু অন্যপক্ষকে হারাবার আনন্দেই মা রুমাকে হয়তো জিতিয়ে দিতে পারেন; বলা যায় না।

অভিজিৎদের বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখি অনেক লোক এসে গেছেন। ফুটপাথের দু'পাশে আধ মাইল লম্বা গাড়ির লাইন।

অভিজিতের বাবা বললেন, এসো, এসো, এত দেরি করলে কেন?

মস্ত বড় হল-ঘর। কার্পেট পাতা। মেয়ে-পুরুষ সকলেই বসে আছেন। ধূপ জ্বলছে ঘরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটি ডিভানের উপর গায়ক বসবেন। দু'দিকে দুটি জোড়া-তানপুরা নিয়ে দু'জন বসে আছেন। তবলচি ওস্তাদ শান্তাপ্রসাদ যথেষ্ট পরিমাণে মঘাই পান ও বেনারসী জর্দা মুখে পুরে প্রথম সারিতে যে-সব চেনা পরিচিত লোক বসে আছেন, তাঁদের সঙ্গে জবজবে গলায় কথা বলছেন পান-মুখে।

আসরের পরিবেশ জমজমাট, কিন্তু খাঁ সাহেব আসেননি।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। তখনও ঘরে ঢুকিনি।

পেছন থেকে কে যেন এসে আমার হাত ধরল। বলল, তোমার ব্যাপারটা কী ? হ্যাভেন্ট্ সীন উ সিন্স এজেস্।

রুমাকে বললাম, ভীষণ ব্যস্ত। পরীক্ষা।

ভাবলাম, জানলে রুমা কী মনে করবে যে আমি ফেল করেছি, কী খারাপই ভাববে আমাকে !

পরক্ষণেই মনে হল ওর সঙ্গে আমি মিথ্যাচার করছি।

তাই সঙ্গে সঙ্গেই হেসে বললাম, তুমি জানো না ? আমি ফেল করেছি ?

রুমা আমার চোখের দিকে তাকাল ; বলল, দাদার কাছে শুনেছি, কিন্তু এ নিয়ে তুমি এত বিচলিত কেন ?

বললাম, বাঃ, ফেল করলাম, বিচলিত হব না ?

রুমা আবারও হাসল। হাসলে রুমার মুখে কেমন একটা স্বর্গীয় ভাব ফুটে ওঠে।

বলল, আমার বুদ্ধি আছে বলেই আমি মনে করি। আমার কিন্তু মনে হয়, ফেল করার জন্যে তুমি একটুও বিচলিত নও, তুমি বিচলিত ফেল করার কারণটা নিয়ে। নইলে ফেল করার ছেলে তো তুমি নও !

আমি হাসলাম। কেন হাসলাম জানি না।

বললাম, আমি যে কী তা তোমার জানার কথা নয়। তোমার দাদা যদি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা কোনও ভাল ধারণা তোমার মনে জন্মিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধ আমার নয়।

রুমা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর ঠোঁটের কোণে এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠেছিল।

ও বলল, আমার নিজের সব ধারণাই আমার নিজের। আমার মতামত অন্যনির্ভর নয়।

তারপরই বলল, যাক, তুমি ভিতরে গিয়ে বসো। ওই তো দাদা বসে আছে !

বলেই, দরজার কাছে গিয়ে ডাকল, দাদা, এই দাদা, শোনো, এই দ্যাখো, রাজাদা এসেছে।

অভিজিৎ হাত নেড়ে ডাকল আমাকে। দেখলাম, আমাদের অনেক বন্ধুরা ওখানে বসে আছে।

আমি ভিতরে ঢোকার আগেই রুমা বলল, গান শুনেই চলে যেয়ো না কিন্তু রাজাদা। তোমার সঙ্গে অনেক গল্প আছে। আচ্ছা, দাদা কি তোমাকে বলেছে যে দাদাকে আমি গত রবিবার স্ট্রেইট-সেটে হারিয়েছি ! তুমি তো আজকাল আসোই না একদম টেনিস খেলতে ? কেন আসো না ? ভয়ে ? আমার কাছে হেরে যাবার ভয়ে ?

আমার খুব বলতে ইচ্ছে করল, হেরে তো আছিই, হেরেই তো থাকি, সব বিষয়েই। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। হাসলাম শুধু।

ও আবার বলল, চলে যেও না কিন্তু।

আমি বললাম, আচ্ছা।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, খাঁ সাহেবের পাত্তা নেই।

তাঁকে আনতে গাড়ি গেছে অনেকক্ষণ।

আরও প্রায় আধঘণ্টা পরে খাঁ সাহেব এলেন। দেখে মনে হলো, শরীর খুব অসুস্থ।

দু'জনে দু'পাশে ধরে তাঁকে এনে ডিভানে বসালেন।

খাঁ সাহেব মুখ নিচু করে বসে রইলেন। গোঁফ দুটো ঝুলে রইল। মনে হলো, খাঁ সাহেবের মাথাটা এক্ষুনি বুঝি কোলে ঢলে পড়ে যাবে।

কানের পাশে জোড়া-তানপুরা বাজছিল। অনেকক্ষণ থেকে বেজেই যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে যে গুঞ্জরন উঠেছিল খাঁ সাহেবের অসুস্থতা দেখে, তা প্রায় থেমে এসেছিল।

ওস্তাদ শান্তাপ্রসাদ দু' বগলের নীচে দু'হাত দিয়ে বসে একদৃষ্টিতে খাঁ সাহেবের মুখের দিকে

www.BanglaBook.org

চেয়েছিলেন।

এমন সময়, সেই মুখ-নিচু-করা অবস্থাতেই খাঁ সাহেব যেন অন্য কোনও মুগ্ধ বিমূর্ত জগৎ থেকে বললেন, সা...।

কী বলব, স্বরসপ্তকের সেই প্রথম সুরের ছোঁয়ায় আমার এবং উপস্থিত সকলের বুকের মধ্যে কোথায় যেন কোন তারের সঙ্গে কোন তারের যোগাযোগ ঘটে গেল।

ভাল লাগায় সেই মুহূর্তে আমরা সকলেই মরে যেতে বসলাম। বুকের মধ্যে আনন্দের আলোর ফুলঝুরি ঝরতে লাগল।

তারপর আলাপ শুরু করলেন খাঁ সাহেব।

মিঞাকি-টোড়ি গাইবেন উনি।

গান্ধারটা এমনভাবে লাগালেন যে, আমার সমস্ত মন একটা গন্ধরাজ ফুল হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে আলাপ চলল।

ওখানে বসে মনে হচ্ছিল, আলাপই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মৃগনাভি। আলাপের মতো এমন মন্থর, এমন গায়কের হৃদয়-নিংড়ানো ও শ্রোতার হৃদয়-মথিত করা অনুভূতি আর কিছু নেই।

এক সময় খাঁ সাহেব আলাপ শেষ করে তানে এলেন।

তারপর তান বিস্তার করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর আমার মনে হলো, সুরের অনেকগুলো হলুদ হরিণ যূথবদ্ধ হয়ে এই ঘরের মধ্যেই ঘুমিয়েছিল। অথচ আমরা কেউই তা জানিনি। হঠাৎ তারা ঘুম ভেঙে উঠে আমাদের মনের আমলকি বনে দারুণ এক ক্ষণিক খেলায় মেতে উঠল।

কখনও বা মনে হতে লাগল, একরাশ দুধলি রাজহাঁস বালিহাঁড়ি ছেড়ে এক সঙ্গে চিল্কার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কখনও বা এত কষ্ট হতে লাগল, মনে হতে লাগল আমার বুকের মধ্যে কখন অনবধানে বুঝি বুলবুলি মরে গেছে।

ঝোলানো গোঁফের পাহারা-ঘেরা মুখ থেকে আর বিশাল ওই পেটের মধ্যবর্তী নাভিমূল থেকে যে অমন পাগল-করা নিখাদ নাদ বেরোতে পারে, তা এমন সামনে বসে না শুনলে কখনও জানতে পেতাম না।

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ যে অন্য এক জগতে বাস করছিলাম জানি না।

স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে তা হলে এইরকম কোনও গায়কের সুরের সিঁড়ি বাওয়া এই পবিত্র পরম অনুভূতিতেই আছে। দুঃখ এটাকেই যে, এ জগৎ থেকে বড় তাড়াতাড়ি নির্বাসিত হতে হয়।

গান শেষ হলে গুচ্ছ গুচ্ছ মেয়ে-পুরুষ ঘর থেকে বেরোতে লাগলেন, বেরিয়ে লনে এলেন।

খাঁ সাহেবও এসে একটা বড় ইজিচেয়ারে বসলেন।

রুমা বেয়ারাদের সঙ্গে করে মিষ্টির থালা, পানের থালা নিয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে লাগল।

সবুজ লনের মধ্যে সাদা শাড়ি পরা সুন্দরী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রুমাকে দারুণ দেখাচ্ছিল। মিঞাকি-টোড়ির রেশ, রুমার নৈকট্য, সব মিলিয়ে আমার কেমন নেশা ধরে গেছিল।

রুমা আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

হোলির ক্লাসিক্যাল ছবিতে শ্রীরাধিকার সখীরা যেভাবে ফাগের থালা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতেন, রুমা তেমনি ভঙ্গিমায় আমার সামনে এসে দাঁড়াল, মিষ্টির থালা হাতে করে।

কথা বলল না কোনও। শুধু চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি মাথা নাড়লাম।

রুমা আদেশ করল, বলল, একটা নাও।

একটা মিষ্টি তুলে নিলাম।

রুমা বলল, তুমি যেয়ো না কিন্তু। তুমি আমাদের সঙ্গে খেয়ে তারপর যাবে।

যাঁরা শুধু গান শুনতেই এসেছিলেন, তাঁরা মিষ্টি ও পান খেয়ে এক এক করে চলে গেলেন। বাকি থাকলেন ওদের বাড়ির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুমা আমার কাছে এসে একটু পরে বলল, বাবাঃ, কর্তব্য শেষ হল। চলো, এবার তোমার সঙ্গে গল্প করা যাক!

রুমা আমাকে নিয়ে একেবারে ওর ঘরে এসে হাজির হল।

বলল, এক মিনিট বসো, হাতটা ধুয়ে আসি।

রুমার পড়ার টেবিলে একটা বোদলেয়ারের কবিতার বই খোলা ছিল, পাশেই একটা খোলা খাতায় ইংরিজিতে কী সব লিখেছে দেখলাম। খুব অবাক লাগল যে, সেই ইংরিজি লেখার মধ্যে এক জায়গায় বাংলায় লিখেছে—

"তুমি যে তুমিই ওগো সেই তব ঋণ,
আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।"

রুমা বাথরুম থেকে বেরোলে, শুধোলাম, কী লিখেছ খাতায়।

রুমা প্রথমে অবাক হল, তারপরই ওর সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে গেল লজ্জায়। বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য! আমার খাতা দেখলে কেন?

আমি বললাম, আমি কী আর ইচ্ছে করে দেখেছি? খোলা ছিল, চোখে পড়ল।

তারপরেই বললাম, কিন্তু সে কে? কে সে?

রুমা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, বলব না!

সে কি নিজে জানে?

রুমা আমার দিকে মুখ ফেরাল। এক আশ্চর্য অভিমানে ওর চোখ দুটি ছেয়ে গেল; বলল, সে জানলে আর দুঃখ কী ছিল?

একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে একটা রেকর্ড শোনাই। আমার এক প্রিয়সখীর। স্কুলে আমরা এক সঙ্গে পড়তাম। তারপর আমি গেলাম লোরেটোয়, আর ও গেল শ্রীশিক্ষায়তনে। কিন্তু আমরা এখনও বন্ধু আছি। ওর নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে।

আমি ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে বললাম, নাম কী?

রুমা কেটে কেটে নাম বলল, বুলবুলি!

তারপর আমার মুখের দিকে না চেয়েই বলল, এল না যে কেন জানি না! ওকেও আজ গান শুনতে আসতে বলেছিলাম। তুমি যে আসবে, তাও বলেছিলাম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমার কথা ওর সঙ্গে কী হল?

রুমা বলল, 'দেশে' তোমার একটা কবিতা বেরিয়েছিল গত সপ্তাহে, তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি বুলবুলিকে বলেছিলাম যে, তোমাকে আমি বিশেষভাবে চিনি, তোমার যে আরও কত গুণ, সব ফলাও করে ওকে বলছিলাম, তোমার হাতে যে কী দারুণ দারুণ ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোকস্ আছে তাও।

আমি বললাম, তুমি কি এ পর্যন্ত আমার টেনিসের ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোকস্‌গুলোকেই একমাত্র গুণ বলে জেনেছ? আমার যে সব ফোরহ্যান্ড গুণ আছে সেগুলো বুঝি কখনও চোখ চেয়ে দেখোনি?

রুমা বলল, তুমি বড় ইন্টারাপ্ট করো, শোনো যা বলছি। ওকে আমি বলেছিলাম যে, তোমার প্রীতিধন্য আমি। বলো, ভুল করেছি? অন্যায় করেছি কোনও?

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। চুপ করে ছিলাম।

রুমা আবার বলল, বুঝলে রাজাদা, ও কিন্তু একেবারে হেড ওভার হিলস্। তুমি নাকি ওদের স্কুলে কী থিয়েটার করেছিলে, তার গল্পে একেবারে পাগল। তুমি তো বেশ! আমাকে কি একটা কার্ড দিতে পারতে না?

আমি বললাম, তোমার মতো মেমসাহেব যে বাংলা থিয়েটার দেখতে যাবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।

ও বলল, ঠিক আছে। তবে তোমার জানা উচিত যে, আমি যাই-ই হই, আমারও একটা মন বলে জিনিস আছে, সেটা অন্য যে কোনও মেয়েরই মতো। বুলবুলিরই মতো। বাইরেটা হয়তো আলাদা আলাদা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সব মেয়েরাই একরকম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, জানি না। তা, তুমি কি বুলবুলির কথা বলবে বলেই আমাকে ডেকেছিলে ?

রুমা যেন হঠাৎ ধাক্কা খেল।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলল ; বলল, না, শুধু সে জন্যেই নয়।

তারপর বলল, বুলবুলির গান শোনো। বলেই, রেকর্ড প্লেয়ারে রেকর্ডটা চাপাল।

গান শেষ হলে বলল, ভাল লাগল ?

আমি মুখ নিচু করেই বললাম, আমি ওর গান খালি গলাতেও শুনেছি, ও সত্যিই ভাল গায়।

রুমা রেকর্ডটা যথাস্থানে তুলতে তুলতে বলল, কথাটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবো। কেমন ?

রুমার গলাটা হঠাৎ ভারী শোনাল। বলল, আমি যদি বুলবুলির মতো গান জানতাম, তবে কী ভালই না হত !

আমি বললাম, তুমি যে কত কিছু জানো, তোমার মতো গুণ ক'জন মেয়ের থাকে ? গান নাই-ই বা জানলে।

রুমা বলল, না। তুমি বুঝবে না। আমার কথা তুমি বুঝবে না।

বললাম, তা হলে বুঝব না !

রুমা হঠাৎ বলল, তুমি পরীক্ষায় ফেল করলে কেন ?

আমি রুমাকে বুঝতে পারছিলাম না। কোথায় ও নিয়ে যেতে চায় আমায়, আমাকে দিয়ে কী বলিয়ে নিতে চায় !

আমি বললাম, পরীক্ষায় অন্য সবাই যে কারণে ফেল করে, সে কারণেই করেছি। পাস করার মতো যথেষ্ট ভাল নই বলে করেছি।

রুমা বলল, আসল কারণটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। তোমার ফেল করার এটা সত্যি কারণ নয়।

তুমি যদি জানোই তবে আর জিজ্ঞেস করছ কেন ?

রুমার গলায় আগুনের আঁচ লাগল ; বলল, জানি, মানে জানি বলেই তো আমার ধারণা। তবে জানাটা সত্যি না মিথ্যে তাই যাচাই করে নিচ্ছিলাম।

আমি বললাম, তুমি কি ঝগড়া করবে বলেই আজ আমাকে ডেকে এনেছিলে ?

রুমার চোখ দু'টি হঠাৎ ঘুঘুর বুকের মতো নরম হয়ে গেল। ও বলল, হ্যাঁ। তুমি দেখো, তোমার সঙ্গে আমি চিরদিন ঝগড়া করব। তুমি পালাতে পারবে না কোনও ক্রমেই।

আমি বললাম, না। তুমি ঝগড়া করবে না। তুমি আমার কাছে কত দামি তা তুমি জানো ? তোমাকে আমি কী চোখে দেখি, তুমি কখনও তা জানার চেষ্টা করেছ ? বিশ্বাস করো রুমা, তোমার মতো বন্ধু আমার একজনও নেই।

বন্ধু ? শুধুই বন্ধু বুঝি আমি তোমার, রাজাদা ? আর কিছুই নই ?

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, রুমা, তুমি সব দিক দিয়ে আমার চেয়ে ভাল। আমি একটা বাজে ফেলুড়ে ছেলে। প্লিজ, তোমার মনে মনে অন্য কিছু কল্পনা করে নিজে কষ্ট পেয়ো না, আমাকেও কষ্ট দিয়ো না। বিশ্বাস করো রুমা, তোমাকে বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কিছু দেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই আমার। কোনও দিক দিয়েই আমি তোমার যোগ্য নই।

রুমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর সমস্ত সুন্দর শরীর কাঁপিয়ে অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, রাজাদা, তুমি একটা ইনসিপিড ; ওয়ার্থলেস্ ছেলে। তুমি পুরুষ নও। তুমি জীবনে কখনও কোনও মেয়ের ভালবাসা পাবে না। অন্য সব কিছু পাবে ; ভালবাসা পাবে না।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমি যা বললাম, তা তোমার ভালর জন্যে। তোমার কাছ থেকে কোনও পুরুষত্বের সার্টিফিকেটের আমার দরকার নেই। সার্টিফিকেট বুকে ঝোলালেই কেউ পুরুষ হয় না, জীবনের সব ক্ষেত্রেই পুরুষত্ব প্রমাণ করার জিনিস।

রুমা কথা ঘুরিয়ে বলল, তুমি খেয়ে যাবে না ?

আমি বললাম, না। আজ নয়।

রুমা রাগের গলায় বলল, তা হলে তুমি চলে যাও।

বললাম, যাচ্ছি !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুমা দরজা অবধি এসে আমার পাঞ্জাবির কোণাটা চেপে ধরল।

আমি অবাক হয়ে পিছন ফিরে বললাম, ওকী ?

রুমা বলল, তুমি আর কখনও আমাদের বাড়িতে আসবে না। আমার সামনে আসবে না। এক মুহূর্তের জন্যেও না।

আমি অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

এক সময় ওর হাত আলগা হয়ে গেল আমার পাঞ্জাবি থেকে।

ঘরের মধ্যে একরাশ হলুদ আলোর মধ্যে সাদা শাড়িতে সজ্জিত একটি একলা রজনীগন্ধার মতো রুমা দাঁড়িয়েছিল।

আমি সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে এলাম।

পথে বেরিয়ে ভাবছিলাম, রুমা ম্যাগনোলিয়া গ্লাডিফ্লোরা ফুলের মতো। আমার জীবন রঙ্গন, যুঁই, কাঠগোলাপের।

ম্যাগনোলিয়া গ্লাডিফ্লোরা রাখার মতো ফুলদানি আমার নেই। যে মেয়ে ছোটবেলা থেকে এয়ারকন্ডিশানড্ ঘরে, এয়ারকন্ডিশানড্ আবহাওয়ায় মানুষ, যে গভর্নেসের কাছে বড় হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন সুখের একঘেয়েমিতে যে পীড়িত, তাকে সুখে রাখার মতো সামর্থ তো আমার নেই, কখনও হবেও না।

ও মহানুভব। ওর সুন্দরী নিষ্কলুষ সরল মনে ও আমাকে ভালবেসেছে— সেটা ওর উদারতা। সেটা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু কোনওদিক দিয়েই ওর যোগ্য নই, এ কথা মনে মনে ভালভাবে জেনেও আমি কী করে ওর ওই ভালবাসা গ্রহণ করি ?

ভালবাসা গ্রহণ করতে দোষ নেই, কিন্তু জীবনে ওকে গ্রহণ করাটা আমার পক্ষে নীচতা হবে।

ও ছেলেমানুষ। ওর ছেলেমানুষী সরল মনে ও যা ভাল বলে জেনেছে তা-ই ও সরলভাবে চেয়েছে। তা বলে আমি জেনেশুনে ওকে ঠকাতে পারি না।

তাছাড়া সত্যি বলতে কী, বুলবুলিকে দেখার আগে আমি হয়তো রুমার প্রতি আমার অনুভূতি যেমন ছিল, তাকেই ভালবাসা বলে জানতাম। কিন্তু আজ আমার মতো করে আর কেউই জানে না যে, ভালবাসা অনেক গভীরতর বোধ। এ কোনওই হিসাব-নির্ভর নয়। এই ক্ষেত্রেই পৃথিবীর তাবৎ অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নিদারুণ হার।

রুমার ব্যাপারে ভাবাভাবির অবকাশ আছে, কিন্তু বুলবুলির ব্যাপারে নেই।

লোহা যেমন চুম্বকের দিকে স্বাভাবিক নিয়মে আকর্ষিত হয়, পূর্ব সমুদ্রে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে যেমন ঝোড়ো হাওয়া স্বভাবসিদ্ধ কারণে ওঠে— তেমন স্বাভাবিক ও অনিবার্য কারণে আমি বুলবুলিকে ভালবাসি। তাকে দেখলে আমার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে যায়, সেখানে রবিশঙ্করের সেতারের ধুন্ বাজতে থাকে।

তার গান শুনলে আমার খিদে পিপাসা ঘুম সব চলে যায়।

তাকে না দেখতে পেলে আমার কিছুই ভাল লাগে না। তার ভাবনা ছাড়া অন্য কোনও ভাবনাতে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও মনোসংযোগ করতে পারি না। তার প্রভাব আমার উপরে সর্বনাশা। অথচ তার চেয়ে বেশি স্নিগ্ধ বিভাসিত হংসধ্বনি রাগের প্রভাব আর কিছুই হতে পারে না।

রুমাকে আমার ভাল লাগে, আমার মনের অবসরের পরিসরে সে আমাকে এক স্নিগ্ধ আবেশে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু বুলবুলিকে আমি না ভালবেসে পারি না। সে আমার সমস্ত মন সর্বক্ষণ এক উদ্দাম উগ্র কানীন কামনায় ভরিয়ে দেয়— সে আমার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাতঙ্গিনীর মতো ম্যারাকাস্ বাজায়।

রুমাকে না পেলে আমি অখুশি হব ; কিন্তু আমার বুলবুলিকে না পেলে আমি বাঁচব না।

কোনও বুদ্ধি দিয়ে আমার এই ভাবনার ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারণ কখনও আমি বুদ্ধিনির্ভর ছিলাম না ; জন্ম থেকেই আমি একমাত্র ও একান্ত হৃদয়-নির্ভর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৮

সেদিন স্কুলে শুনলাম, বিজুদার দাদা, মানে বুলবুলির বাবা হঠাৎ মারা গেছেন।

ঈস্, বেচারির কী কষ্ট! আমি তো ভাবতেই পারি না যে, আমার বাবা নেই।

অথচ ওর কষ্টের সময় ওর কাছে গিয়ে যে একটু সান্ত্বনা দেব তারও তো কোনও উপায় নেই; আমি তো ওর কেউ নই।

আমি শুধু বাড়ি বসে ওর জন্যে, ওর কষ্টে কষ্ট পেতে পারি। এইটুকুই।

দেখতে দেখতে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী এসে গেল। অনেকদিন আগে থেকে হই-হই রই-রই হচ্ছে। স্কুলের পাশের বড় পার্ক জুড়ে মেলা বসল। মঞ্চ তৈরি হল নানা অনুষ্ঠানের জন্যে।

লোকে বলতে লাগল, এই দেশজোড়া শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পরই রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মৃত্যু হবে। এই নাকি শেষ উজ্জ্বলতা, প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে।

পঁচিশে বৈশাখ সকালবেলায় বুলবুলির গান ছিল।

গান শুনতে গেলাম। ও গাইল—'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে।'

গানটা টপ্পার কাজে ভরা—খুব খেলিয়ে গাইল বুলবুলি।

ও গান গাইছে হাজার লোকের মাঝে, সকালের আলো পড়েছে ওর নরম কালো চুলে, ওর প্রেমের মুখে, ক্ষণে ক্ষণে রোদের রঙের সঙ্গে ওর সুরের এবং মনের রঙ বদলাচ্ছে।

সামনে থেকে কে একজন গান শুনে বললেন, আহা!

হায় রে, তুমি যদি জানতে বুলবুলি, সেই মুহূর্তে গায়িকা হয়ে হাজার লোকের প্রশংসা পাওয়ার সুখ, যে সেই গায়িকার গোপন ভালবাসা পেয়েছে তার সেই সুখের কাছে কী অকিঞ্চিৎকর!

সেদিন থেকে মেলায় রোজ যেতাম। মেলায় নাগরদোলা চড়তে বা স্টল দেখতে নয়; বুলবুলিকে কোথাও না কোথাও দেখা যেতই বলে। মেলায় ভিড়ে ঘুরতে ঘুরতে ভাবতাম, এ মেলায় কত লোক এসেছেন, কত নারী কত পুরুষ—কিন্তু তাঁরা যে কীসের টানে এসেছেন তা প্রত্যেকে নিজে ছাড়া অন্য কেউই জানে না।

ইতিমধ্যে মা একদিন বললেন, শুনেছ, তোমার গায়িকা শ্যামলদের বাড়ি এসেছিল গান শোনাতে। শ্যামলের সঙ্গে নাকি ওর সম্বন্ধ এসেছে।

শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

শ্যামল আমাদের আগের পাড়ার ছেলে। দেখতে বোকাবোকা ভাল। ওর কথা শুনলে মনে হয় বামছাগল কথা বলছে। বাবা বড় কনট্রাক্টর। নিজে লেখাপড়া মোটেই করেনি। বাড়ি ভাড়ার পয়সায় দিব্যি আরামে দিন কাটিয়ে দেবে বলে বোধহয় ও সাব্যস্ত করেছিল। ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে আর্টিফিসিয়াল হাসি হাসত, সুগন্ধি পাউডার মাখত মুখে এবং মেয়েদের স্কুল-কলেজের সামনে ইমপোর্টেড লেফ্ট-হ্যান্ড-ড্রাইভ গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ওর রুচি ও ভাষাজ্ঞান অদ্ভুত ছিল। ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেও কখনও দু'মিনিটের বেশি কথা বলতে পারিনি। বোধহয় ওর এবং আমার মনের ওয়েভ লেংথে বিস্তর ব্যবধান ছিল। ও যা বলত আমি বুঝতাম না, আমি যা বলতে চাইতাম ও-ও তা বুঝত না। ওর সঙ্গে আমার কম্যুনিকেশান বা কম্যুনিকেশানের প্রয়োজনীয়তাও ছিল না।

বুলবুলি আর ভরসা পেল না?

যে আমার ভালবাসা পেয়েছে, যাকে আমি আলাপিত-না-হয়েই প্রাণ-মন সব সঁপে বসে আছি, সে আমাকে অপমান করার কি অন্য কোনও পথ খুঁজে পেল না? আমাকে মায়ের কাছে, আমার নিজের কাছে এমন করে ছোট করে তার কী লাভ হল?

মা ফরেন সার্ভিসের লোকের মতো মুখে আমাকে কিছুই আর বললেন না। খবরটা দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। ভাবটা, দ্যাখো, তোমার স্বয়ংবরসভার প্রতিযোগীরা কী রকম?

আমি কী করব ভেবে পেলাম না।

বুলবুলিকে কাছে পেলে তার ঝুঁটি ও সব পালক ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করছিল। অথচ আমার

www.BanglaBook.org

জানার উপায় নেই কোনও যে, ব্যাপারটা সত্যি কী ঘটেছিল। এবং এর পিছনে ওর নিজের মত এবং ইচ্ছা ছিল কতখানি তাও খুব জানতে ইচ্ছা করছিল।

যত দিন যাচ্ছিল, আমি মনে মনে বুঝতে পারছিলাম, বুলবুলির বাসায় ঢুঁ না দিতে পারলে, তাকে আড়কাঠি দিয়ে ধরতে না পারলে আমার এ জীবনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া হবে না! কবি হওয়াও হবে না। আমার কিছুই হওয়া হবে না।

বুলবুলিকে চাওয়া নিছক একজন গায়িকাকে চাওয়া নয়, একটি সুন্দরী দারুণ ফিগারের নারীর শরীরকে চাওয়া নয়। বুলবুলিকে চাওয়া মানে নিজের আয়নাকে নিজের ঘরের দেওয়ালে এনে বসানো। সে আমার দর্পণ।

সে নইলে আমি মিথ্যা, প্রতিবিম্বহীন ; অপরিপ্লুত।

আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না, বুলবুলিকে আমি চাই। তাকে আমি যে-কোনও মূল্যে চাই। এমন কোনও অশুভ নক্ষত্র নেই সৌরজগতে, এমন কোনও শক্তি নেই যা আমার এই পাওয়াকে মিথ্যা করতে পারে। বুলবুলি, তুমি অমল, কমল বা শ্যামলের বাড়ি গানই গাও আর পেয়ারা গাছে উড়েই বেড়াও, তুমি জেনো যে তুমি আমার। আমার তুমি চিরদিন ছিলে ; আছ ; এবং আমি যতদিন বাঁচি আমারই থাকবে। তুমি আমার হৃদয়ে এসেছ ; হৃদয়ে থাকবে।

তোমার সঙ্গে কয়েকদিন তো চোখে চোখে কথা বলেছি ; মুখে নাই-বা বললাম। যা অনেক কথা দিয়ে বোঝাতে পারতাম না, যা অনেক খণ্ড উপন্যাসে বলা যেত না, তা আমার সরল বক্তব্যে ভরা নীরব চোখের ভাষায় বলেছি।

আর তুমিও তো তাই বলেছ বুলবুলি। তোমাকে নিশ্চয়ই প্রকাশিত করেছে, তোমার বিরক্ত ভুরু, তোমার ভয় পাওয়া চোখ বার বার তোমাকে আমার কাছে প্রকাশিত করেছে। তুমি ধরা পড়ে গেছ আকাশের পাখি, বড় নিদারুণভাবে ধরা পড়ে গেছ অন্য একটা পাখির কাছে। তোমার একমাত্র মুক্তি এখন এক সুগন্ধি বন্ধনে। এই ভাবনায় তোমার দু'চোখ ছটফট করে মরেছে, নীরব অব্যক্ত যৌবনের যন্ত্রণায় তুমি কেঁপে কেঁপে উঠেছ। তুমি জেনে গেছ, তোমার মুক্তি নেই এ জন্মে, আমার কাছ থেকে তোমার মুক্তি নেই।

আমি জেনে গেছি বুলবুলি, যুবনাশ্বর সেই বিখ্যাত পংক্তির মতো জেনে গেছি যে—"একই অস্ত্রে হত হবে মৃগী ও নিষাদ।"

আমার হঠাৎই মনে হল ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। এই হেস্তনেস্তর উপরে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এক সঙ্গে দুটো সমস্যার সমাধান করা মুশকিল। বুলবুলি আমার খাঁচায় আসবে কি আসবে না, এটার ফয়সালা করা দরকার আগে। যদি আসে, তাহলে আমি পরীক্ষায় বসব আর পাস করব। যদি না আসে বলে নিশ্চিতভাবে জানি, তা হলে কী হবে বলতে পারি না। পরীক্ষায় ফার্স্টও হতে পারি—অল-টাইম রেকর্ড করতে পারি অ্যাকাউন্ট্যান্সি পেপার ; নইলে, নইলে যে কী তা আমি ভাবতেও পারি না।

আমি ভাবতেও চাই না।

চিঠিটা অবশেষে লিখেই ফেললাম। মোট পাঁচবার লিখে পাঁচবার ছিঁড়ে ফেলে দিতে হল। মাথার মধ্যে এত কথা জমে ছিল যে, তারা সুযোগ পেয়ে কলমের উৎসমুখে একই সঙ্গে উৎসারিত হতে চাইছিল। রাত প্রায় দুটো নাগাদ চিঠিটাকে শেষবারের মতো লিখলাম। আমার আলটিমেটাম।

বুলবুলি,

তোমাকে আমি যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন থেকেই তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন তুমি একজন বড় গাইয়ে হবে। আমি সমঝদার নই, তবু একজন সাধারণ শ্রোতা হিসাবেই, কেন জানি না আমার মন বলে, তুমি নিশ্চয়ই খ্যাত হবে।

তোমার সম্বন্ধে যা ভাবার, যা জানার তা আছে আমার মনের মধ্যে। ভগবান বিরূপ না হলে সেই সব জানাই যে সত্যি বলে একদিন প্রমাণিত হবে, এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

যে জন্যে এ চিঠি লিখছি, তা হল এই-ই যে, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।

www.BanglaBook.org

কিন্তু তুমি কি আমাকে পছন্দ করো ?

তোমার পছন্দ অপছন্দ ঠিক করার আগে, আমি এর পরে যা লিখছি তা ভাল করে পড়ে নিয়ো। আমাকে যেহেতু তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে, আমার সম্বন্ধে মনস্থির করার আগে, আমার সে যোগ্যতা আছে কি নেই, এ কথা তোমার প্রাঞ্জলভাবে জানা দরকার।

আমি জীবনে কারওই দয়া চাই না ; দয়া গ্রহণ করি না। তাই তোমার কাছে কোনওরকম দয়ার প্রত্যাশী আমি নই। দয়া বা করুণার ভিতরে যে সম্পর্কের শিকড়, সে সম্পর্কে শিগগিরি ফাটল ধরে। জোরে বাতাস উঠলেই সে সম্পর্ক উড়ে যায়।

আমি গ্র্যাজুয়েশানের পর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সির ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ও ফাইনালের 'ল' গ্রুপ পাস করে অ্যাকাউন্টস গ্রুপের পরীক্ষা দিয়েছি। এবং ফেল করেছি।

বর্তমানে আমি আমার বাবার অফিসে চাকরি করি। দেড়শো টাকা পাই। আমি যদি পরীক্ষা পাস না করতে পারি তা হলে আমার বাজার দর তিন-চারশো টাকার বেশি হবে না মাসে। অর্থাৎ আপাতত আমার মাসিক অর্থকরী মান তিন-চার বস্তা আখের গুড়ের সমান।

আমার বাবাকে অনেকে অবস্থাপন্ন বলে জানেন। বাবার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে অনেক, আর দায় আছে একটি ; তা হচ্ছে আমি। সম্পত্তিটা বাবার, দায়টা আমার ; আমার নিজের ;—একান্ত নিজের।

এ কথাগুলো এ জন্যেই বলছি যে, আমার বাবার সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেললে খুব বড় ভুল করবে।

আমি আমার জীবনে নিজের পরিচয়েই পরিচিত হতে চাই। যা-কিছু পাবার তা নিজের যোগ্যতা ও গুণপনাতেই পেতে চাই। বাবার কোনও কিছুর উপর আমার লোভ এবং দাবি নেই, প্রত্যাশা নেই কোনওরকম। যে-ছেলে বাবার সম্পত্তির ভরসায় বা তার বিনিময়ে নিজের জীবনে কিছু পেতে চায় ও পায়, আমি তার দলে নেই।

এ কথা আমার তোমাকে জানানো দরকার যে, আমাদের বাড়িতে যাদের মত প্রণিধানযোগ্য, তাদের তোমাকে পছন্দ নয়। অপছন্দর কারণটা আমার জানা নেই, জানা যাবেও না। তাই যদি তুমি আমার স্ত্রী হতে রাজি থাক, তাহলে খুব সম্ভবত আমাকে বাবার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। ওই মাইনেতে যে রকম বাড়িতে আমি থাকতে আশা করি, সে রকম বাড়িতে কি তুমি থাকতে পারবে ? খুব কষ্ট করে, নিজ হাতে বাসনপত্র মেজেঘষে খেতে হবে হয়তো তোমায়। তুমি ভালভাবে আদরযত্নে মানুষ হয়েছ, তোমার তো কষ্ট করা অভ্যেস নেই।

আমার প্রতি তোমার কী মনোভাব জানি না। আমাকে তুমি জানার সুযোগও দাওনি, তবে যদি কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাকে তোমার ভাল লেগে থাকে, তাহলে শুধু আমার জন্যেই আমাকে ভাল লাগতে হবে। আমার বাবার পটভূমির জন্যে নয়। এ কথাটা তোমার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা দরকার।

আমি জানি, তোমার মতো গুণী মেয়ের অনেক স্তুতিকার আছে। এও জানি যে, আমার চেয়ে সবদিক দিয়ে ভাল অনেক ছেলে তোমাকে পছন্দ করে। তবুও আমার মনে হল, আমিও যে তোমাকে পছন্দ করি এ কথাটা তোমাকে এখন না জানালে হয়তো বড় দেরি হয়ে যাবে।

আমার আর কিছু লেখার নেই।

তোমার জবাব এই চিঠি পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে আমার অফিসের ঠিকানায় পোস্ট কোরো।

জবাব দেওয়ার আগে খুব ভাল করে ভেবে জবাব দিয়ো।

আমার মধ্যে যদি ভাল লাগার বা সম্মান করার মতো কিছু দেখে থাকো, আমার নিজের উপর এবং আমার ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের উপর যদি তোমার আস্থা ও বিশ্বাস থাকে, তাহলেই 'হ্যাঁ' কোরো।

তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি

রাজা রায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিঠিটা পড়লাম।

পড়েই মনে হল, কোনও ব্যাটালিয়ানের অ্যাডজুট্যান্ট বুঝি কোয়ার্টার মাস্টারকে চিঠি লিখছে। কে বলবে একে প্রেমপত্র!

চিঠি লেখা শেষ করে রাত দুটোয় চান করে, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চিঠি তো লেখা হল—কিন্তু এরকম সমর্পণী হাঁটু-গেড়ে বসা চিঠি ডাকে দেওয়া যায় না। এ চিঠি হাতেই দিতে হবে।

রোজই মেলায় যাই, বুলবুলিকে দেখতেও পাই, কিন্তু চিঠি দেওয়ার সুবিধে হয় না।

এক একদিন এক এক বাহারি শাড়ি পরে আসে ও। ওর দারুণ ফিগারে ও যাই-ই পরে, তাতেই ওকে খুব মানায়। শাড়ি পরার ধরন, জামার কাট, ওর হেঁটে যাওয়ার সুন্দর ঋজু সুষম ভঙ্গি, সব আমার চোখে লেগে থাকে। যখন কখনও ওকে হঠাৎ একা পাই, বুনোবেড়াল যেমন সাবধানী পায়ে বুলবুলির বাসার দিকে এগোয়, তেমন করে এগোতে থাকি। কিন্তু ও আমাকে দেখলেই ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে এবং ছুলোয়ার তাড়া-খাওয়া হরিণীর মতো তীব্র বেগে পালিয়ে যায় কোনও ভিড়ের অভয়ারণ্যে।

ওর কাছে পৌঁছনো যায় না, ওর হাতে চিঠিটা দেওয়া যায় না।

চার-পাঁচদিন এই করে কেটে গেল। চিঠিটা খামের মধ্যে করে হিপ্-পকেটে রোজ ফেলে নিয়ে যেতাম। মে মাসের প্রচণ্ড গরম, তার উপর প্রায় সব সময় হাঁটার উপরেই থাকতাম, তাই খামটা রোজই ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে উঠত। পাঁচদিনের দিন বাড়ি ফিরে চিঠিটা খুলে দেখলাম, চিঠির লেখা অনেক জায়গায় ঘামে চুপসে মুছে গেছে।

সেই চিঠিটা দেখে দেখে অন্য একটা চিঠি লিখতে হল। অনেক জায়গায় বক্তব্য বদলে গেল।

মেলা শেষ হয়ে যাবে আর দু'দিন পর। আজ সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' ডকুমেন্টারি ছবিটি মেলায় দেখানো হবে। ঠিক করলাম, আজই যে করেই হোক চিঠিটা দিতে হবে।

সেদিন ছবি শেষ হল প্রায় রাত পৌনে দশটায়।

ছবি শেষ হওয়ার পর লক্ষ করলাম, বুলবুলি বাড়ি যাবে বলে এগোচ্ছে।

সেদিন ওর সঙ্গে আর কেউই ছিল না। এমনকী ওর চর ও অনুচর দীপাও ছিল না।

দেখলাম, ও ট্রাম স্টপেজে এসে দাঁড়াল। বুঝলাম, ও ট্রামে চড়ে গড়িয়াহাটার মোড়ে যাবে এবং সেখান থেকে বাস কি ট্রাম চেঞ্জ করে বাড়িতে গিয়ে নামবে।

তাড়াতাড়ি আমি একটা চব্বিশ নম্বর বাসে উঠে পড়লাম। বাস নিশ্চয়ই ট্রামের চেয়ে আগে যাবে।

গড়িয়াহাটার মোড়ে পৌঁছে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বাস স্টপেজে।

আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে আসতে লাগল। মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘের ছুলোয়াতেও আমার এত ভয় করে না। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি পারব না। চিঠিটা ওর হাতে দিতে পারব না।

এক সময় দেখলাম ও এগিয়ে আসছে। সেদিন ও একটা সাদা খোলের খয়েরি-পাড়ের টাঙ্গাইল পরেছিল। একটা খয়েরি ব্লাউজ। হাতে একটা খয়েরি ব্যাগ।

ও এসে বাস স্টপেজে আমাকে দেখেই চমকে উঠল। চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে রইল।

আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম। ওর সামনে দাঁড়ালাম।

ওর চোখে মুখে ভীষণ একটা আতঙ্কগ্রস্ততা ফুটে উঠল, যেন আমি কলুটোলার কোনও কুখ্যাত গুণ্ডা।

আমি চিঠিটা হিপ্-পকেট থেকে বের করে ওকে দিলাম।

ওর সঙ্গে কোনওদিনও কথা বলিনি, তবু সেই মুহূর্তে আমার নিজের গলা আত্মবিশ্বাসে এমন ভারী হয়ে উঠল যে, নিজেই চমকে উঠলাম।

বললাম, এতে একটা চিঠি আছে, ভাল করে পড়ে উত্তর দিয়ো।

ও ব্যাগ-ধরা হাতে চিঠিটা নিয়ে অন্য হাতে কপাল থেকে চুল সরাতে লাগল।

www.BanglaBook.org

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, আমার পায়ের থরথরানি এখন ওর পায়ে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। ও বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, মুখ নামিয়ে বলল, আচ্ছা।

আমি বললাম, উত্তর দিয়ো কিন্তু।

ও আবারও বলল, আচ্ছা।

এর পরেই একটা বাস এসে গেল। ও উঠে পড়ল। আমার দিকে একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। কোনও কিছু বলল না আমাকে।

যতক্ষণ বাসের টেইল-লাইটটা দেখা যায়, আমি ওইখানেই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে রইলাম।

তারপর ধীরে ধীরে ভারমুক্ত মাথায় বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল যে, ন-মামার মতো আমার যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, সব আমি একটা আন্‌ডিপেন্ডবেল্ ঘোড়ায় লাগিয়ে এলাম এক দারুণ জ্যাক্-পটের আশায়। আমার ঘোড়া লাগলে আমি রাজা, সত্যিকারের রাজা। না লাগলে আমি সর্বস্বান্ত।

সেদিন সারা রাত আমি ঘুমোতে পারলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, চিঠিটা পড়ে ও কী ভাবছে? কল্পনা করতে লাগলাম যে, ও বাড়ি গেল, তারপর গা-ধোওয়ার অছিলায় বাথরুমে গেল অথবা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আমার চিঠিটা খুলল।

তারপর?

তারপর যে কী হল সেটাই আসল কথা।

তারপর কী হল আমার জানার উপায় নেই কোনও। এখন তিন-চার দিনের তিতিক্ষা, প্রতীক্ষা; ধৈর্যের পরীক্ষা। সি-এ পরীক্ষার চেয়েও কঠিন।

প্রথম কাজ শেষ হল। এর পর দ্বিতীয় কাজ।

বাবার চিঠিটা ইংরিজিতে লিখতে হল। কারণ, বাবা বাংলা মোটে লিখতে পারতেন না। পড়তেও ভাল পারতেন না। তিনি চিঠি পেতে ও দিতে ইংরিজিটাই একমাত্র পছন্দ করতেন। এমনকী ঠাকুমাকেও তিনি ইংরিজিতে চিঠি লিখতেন বরাবর—যদিও ঠাকুমা তেমন ভাল ইংরিজি জানতেন না।

ইংরিজিতে চিঠি লিখতে একটা সুবিধা এই যে, যে-সব কথা বাংলায় বললে ঠিক বলতে পারা যায় না, ইংরিজিতে অকপটে তা বলে ফেলা যায়।

বাবাকে লিখলাম যে, আমি তোমার ছেলে হিসেবে কখনও তোমার সম্মানহানিকর কিছু করিনি। আমি অনেক ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, সরল সহজভাবে। কিন্তু একজনকে ভীষণ ভাল লেগে যাওয়ার জন্যে শুধু তার সঙ্গেই মিশতে পারিনি। মেশা তো দূরের কথা, কথা বলতে পর্যন্ত পারিনি। সব সময় তার কথা আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করে। এ ব্যাপারের ফয়সালা না-হবার আগে আমি পরীক্ষা পাস করতে পারব না। কারণ আমি মোটেই মনোসংযোগ করতে পারছি না। অনেক চেষ্টা করেছি, পারছি না।

আমি সব ব্যাপারেই তোমাদের খুশি করতে চেয়েছি এ পর্যন্ত। তবে এই প্রথম তোমাদের আমার খুশির কথা জানাচ্ছি। তবে তোমাদের খুশি ও আমার খুশি যদি এক না হয়, তবে তোমাদের খুশিই ডিতবে। কিন্তু আমাকে মহাদেববাবুর মেয়ে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে বলবে না তোমরা। বিয়ে যদি করি তো একেই করব; নইলে কাউকেই বিয়ে করব না।

বিয়ের কথা এখন উঠছে না। যতদিন না আমি নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছি ততদিন বিয়ের কথা আমি ভাবছি না। তবে কাকে বিয়ে করব, এ ব্যাপারটার এক্ষুনি ফয়সালা হওয়া দরকার।

আমার এ চিঠি লিখতে খুব লজ্জা ও সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখলাম, এটা এমন একটা ব্যাপার যার উপর আমার সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ, আমার পড়াশুনা, কাজকর্ম সমস্তই নির্ভর করছে। তাই, নেহাত দায়ে ঠেকেই এ চিঠি লিখছি।

তুমি চিরদিন 'আদার ম্যান'স পয়েন্ট অফ ভিউ'কে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছ—তাই আশা করি তুমি আমার বক্তব্য বুঝবে। আমার সব কথা শুনে তুমি আমাকে তোমার সুচিন্তিত ও পরিষ্কার মতামত

www.BanglaBook.org

জানাবে। তোমার মত জানলে আমি তাকে জানাব। কারণ সে তো আমার জন্য অনাদিকাল বসে থাকবে না। তাকে বিয়ে করার জন্যে অনেক লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কথা শুনে তারপর সে মন স্থির করবে।

আমি এ চিঠি না লিখলেও পারতাম, কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা যে গান, সেই একিলিসের গোড়ালিতে সে মেয়ে তীর হেনেছে। আমার না-মরে উপায় নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চিঠিটা অনেক মোটা হয়ে গেল। ভারীও হয়ে গেল অনেক।

এবারে সমস্যা হল চিঠিটা দেব কী করে বাবাকে?

বাড়িতে দেওয়া চলবে না, কারণ বাড়িতে চিঠি পড়লেই, বাবার নিজের মতামত শোনার আগেই মা'র চোখের জল সে মতামতকে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত করে দেবে। যে বিবাদের মামলা এখনও সাবজুডিস্, সেই মামলার জজকে বায়াসড্ করে দেওয়া বাদী বা বিবাদী দু'পক্ষের পক্ষেই অন্যায়।

ঠিক করলাম, বাবার অফিসের টেবিলে চিঠিটা রেখে দেব। শনিবার বাবার অফিসের টেবিলে চিঠিটা রেখে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যাব। তারপর যদি বাড়িতে আমার স্থান হয় তা হলে ফিরে আসব, নইলে আর ফিরব না।

শনিবার অফিসে গিয়ে কিছুতেই কাজে মন বসছিল না।

বাবা অফিসে এসেই কাজে বেরিয়ে গেলেন।

আমি এই ফাঁকে বাবার চেম্বারের প্রধান বেয়ারার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললাম, খুব জরুরি চিঠি; বাবা এলেই দিয়ে দিয়ো।

চিঠিটা দিয়েই আমি পাততাড়ি গুটিয়ে সোজা চলে এলাম প্রদীপ্তদের বাড়ি। প্রদীপ্ত আমাকে লন্ডন থেকে প্রায়ই চিঠি লিখত। অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে আমার অশান্তি ও অস্বস্তির কথা জেনে সে লিখত যে, প্রত্যেক মানুষের মনেই অনেকগুলো কুঠরি থাকে। নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা, তীব্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, জেদের দ্বারা আমরা সকলে ইচ্ছে করলেই বিভিন্ন সত্তার মানুষ হতে পারি। আফটার অল্ আমরা তো মানুষ, কুকুর-বেড়াল তো নই আমরা?

ইচ্ছে করলে মানুষ কী না করতে পারে?

প্রদীপ্ত বার বার আমাকে উৎসাহ দিত। লিখত, মনের কুঠরিগুলোকে ওয়াটারটাইট করে নে, যাতে একটার জল অন্যটায় না গড়াতে পারে। তুই যখন অ্যাকাউন্ট্যান্ট, তখন কট্টর ছিমছাম অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েই থাক। আর যখন তোর সে-ঘর থেকে ছুটি, তখন তুই তোর মূল মনে ফিরে যা। ঢিলেঢালা ভাবুক হয়ে যা, কবিতা লেখ, গান গা, ছবি আঁক; কেউ তোকে বারণ করবে না।

ও বলত, একই সঙ্গে দু'জন মেয়েকে যদি কেউ সিনসিয়ারলি ভালবাসতে পারে, একই সঙ্গে একাধিক বৃত্তি কেন গ্রহণ করতে পারবে না? আমাদের মনের ক্ষমতা কি এতই সীমিত? আমরা কি এতই সাধারণ? সাধারণই যদি হবি, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কী? পৃথিবীর অনেক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের মতো, যারা জাস্ট নিঃশ্বাস ফেলা ও প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য বাঁচে, যারা চাকরি পাবে বলে পড়াশুনা করে, বিয়ে করবে বলে চাকরি করে এবং সংসার-সংসার পুতুলখেলা খেলবে বলে বিয়ে করে, তাদের সঙ্গে আমার-তোর তফাতটা কী?

নানা কারণে প্রদীপ্তকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। আমার বন্ধুদের মধ্যে ও সবচেয়ে উজ্জ্বল ও স্বকীয় ছিল। ওর মনে মনে এমন এমন সব ভাবনা ও ভাব জাগত, যা অন্য লোকের চিত্তজগতে বিপ্লব ঘটাতে পারত।

প্রদীপ্তর চিঠিতে লেখা ওর কথাগুলো নিয়ে আমি খুব ভাবতাম। নিজেকে বলতাম, চেষ্টা করব, সত্যিই চেষ্টা করব, যাতে একাধিক সত্তায় বেঁচে থাকতে পারি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই-ই যে, বর্তমানে আমার মনের সমস্ত কুঠরিগুলোতেই একটি করে বুলবুলি পাখি বসে আছে। এই বুলবুলির ঝাঁককে তাড়াতে না পারলে আমার কোনও সত্তাই সার্থক হবে না।

প্রদীপ্ত আর্টসের ছাত্র ছিল।

ওর বাবা কলকাতার নাম-করা ব্যারিস্টার ছিলেন। একবার দাঁড়াতে আশি মোহর নিতেন। সেন্ট

www.BanglaBook.org

জেভিয়ার্স থেকে আমরা যে বছর বি-কম পাশ করি, সে বছরে ও বি-এ পাশ করে অক্সফোর্ডে গেছিল ইংরিজি পড়তে—ডক্টরেটও করবে সেখানে। তারপর ও অধ্যাপনা করবে এখানে অথবা বিদেশে।

প্রদীপ্তর মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন খুব। মাকে দেখতে এসেছিল প্রদীপ্ত। কিন্তু এসে দেখতে পায়নি। যেদিন রাতের ফ্লাইটে এল সেদিনই সকালে ওর মা মারা যান। তাই মা'র শ্রাদ্ধ অবধি ও এখানেই থাকবে।

ওর বাড়ি পৌঁছে দেখি ও খাটে শুয়ে বিপ্রদাস পড়ছে শরৎবাবুর।

আমি হেসে বললাম, সে কী রে ? অক্সফোর্ডের ইংরিজিনবিশ-বিপ্রদাস পড়ছে কী রে ?

ও উঠে বসল। বলল, আয় বোস।

তারপর বলল, যাই-ই বলিস, ইন্টেলেকচুয়ালদের বুকনি যাই বলুক, শরৎবাবু—শরৎবাবু। বিপ্রদাস—বিপ্রদাস। এখনও পড়তে পড়তে চোখে জল আসে ; গলা বুজে আসে। আমার তো পড়তে খুব ভাল লাগে।

আমি বললাম, আমারও লাগে।

প্রদীপ্ত বলল, আসলে ব্যাপারটা কী জানিস, আমরা কেউ স্বীকার করি আর নাই-ই করি, আমরা প্রত্যেক মানুষই, যে যত বড় ইন্টেলেকচুয়ালই হই না কেন, বেসিক্যালি এমোশনাল। বেসিক্যালি আমরা সেন্টিমেন্টাল। কেন জানি না, আমার বার বার মনে হয়, যে মানুষের সেন্টিমেন্ট নেই, এমোশন নেই, সে মনুষ্যেতর জীব। তার সমস্ত অধীত বিদ্যা বৃথা হয়েছে। মানুষ, সে বুদ্ধিক্ষেত্রে যত বড়ই হোক, সে কখনওই হৃদয় ছাড়া বাঁচতে পারে না। বুদ্ধি কখনও হৃদয়কে হারাতে পারে না। হৃদয় চিরদিনই থাকে। বল ? ঠিক না ?

আমি বললাম, তুই বোধহয় ঠিকই বলেছিস। তবে আমার মতটা তো মত নয়। কারণ, আমি বেসিক্যালি হৃদয়সর্বস্ব মানুষ, সুবুদ্ধি বল কুবুদ্ধি বল, আমার কোনও বুদ্ধিই নেই। ইন্টেলেকচুয়াল বলতে আজকে যাদের ধরা হয়, আমি কখনও তাদের দলে পড়ব না। কারণ বুদ্ধিতে, বিদ্যাবত্তায় আমি তাদের চেয়ে অনেক খাটো। তাই আমার মতটা মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়।

ও বলল, আমার সঙ্গে খাবি ? হবিষ্যান্ন ?

বললাম, খাব। অধিকন্তু, আমি আজ তোর সঙ্গে থাকব, তোর ঘরে। রাতেও বাড়ি যাব না।

প্রদীপ্তর বুদ্ধিদীপ্ত মুখে একটি উজ্জ্বল হাসি ফুটবল। বলল, ব্যাপার কী ?

বললাম, অনেক ব্যাপার। চল, আগে খেয়েনি, পরে বলব। অনেক সময় লাগবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে মুখোমুখি সোফায় বসে অনেক পুরনো দিনের গল্প হল।

তারপর এক সময় প্রদীপ্ত বলল, এবার বল তোর কথা।

আমি বললাম, বলার কিছু নেই, আমি প্রেমে পড়েছি। একজনকে ভালবেসেছি। নিরুপায়ভাবে।

প্রদীপ্ত সোজা হয়ে বসে বলল, এ তো আনন্দের কথা। এখন আমার অশৌচ চলছে, নইলে তোকে নিয়ে ফিরপোতে গিয়ে সেলিব্রেট করতাম।

পরক্ষণেই প্রদীপ্ত বলল, তুই বললি বটে ; কিন্তু বাসি খবর।

আমি অবাক হলাম। বললাম, সে কী ? তুই জানতেই পারিস না।

প্রদীপ্ত আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল।

বলল, নিশ্চয়ই জানি। আমি তাকে দেখেছি, চিনি এবং খুব ভাল করেই জানি। তোকে আমার খুব হিংসা হয়। প্রেমে যদি কখনও পড়তেই হয়, তাহলে অমন মেয়ের সঙ্গেই পড়তে হয়। বিশ্বাস কর, দেশে ও বাইরে আমার অনেক বান্ধবী আছে, কিন্তু ওর মধ্যে যা আছে আমি কারু মধ্যে তা দেখিনি। ওর মধ্যে দারুণ একটা আন্তর্জাতিক এলিমেন্ট আছে। ও কখনও ভীষণ বাঙালি, কখনও একেবারে মেমসাহেব। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও যেন কোনও ক্রিশ্চিয়ান সুস্নাতা সন্ন্যাসিনী। ওর মতো পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা আমি কোনও মেয়ের মধ্যে দেখিনি।

আমি খুব বিচলিত বোধ করছিলাম।

অধৈর্য গলায় বললাম, তুই কার কথা বলছিস ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রদীপ্ত বলল, কেন ? যেন জানিস না ? রুমার কথা !

আমি চুপ করে গেলাম।

মুখ নিচু করে রইলাম। প্রদীপ্ত বলল, কী ? অবাক হলি তো ?

আমি বললাম, না। তুই ভুল করেছিস। রুমা নয়। তার নাম বুলবুলি। তুই রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিস ? ওর নাম শুনিসনি ?

প্রদীপ্ত রূঢ় গলায় বলল, তুই তো জানিস ন্যাকা-সঙ্গীত আমার ভাল লাগে না। গান বলতে একমাত্র আমি ডাবল-ব্যারেলড্ শট-গানকে বুঝি। গান-ফান আমার ভাল লাগে না।

তারপরই হঠাৎ থেমে বলল, কিন্তু দাঁড়া। ব্যাপারটা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, তুই-ই বল, কোন ব্যাপার ?

প্রদীপ্ত বলল, অভিজিৎ আর রুমা এসেছিল পরশুদিন। অনেকক্ষণ ছিল। তারপর অভিজিৎ বাবার সঙ্গে ওর বাবার কোম্পানির কী একটা মামলার বিষয়ে পরামর্শ করতে গেল। রুমা আর আমি অনেকক্ষণ গল্প করলাম। গল্প করতে করতে তোর কথা উঠল। ওকে তোর সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত দেখলাম যে, বলার নয়। আমাকে লুকোতে পারবি না রাজা, তুই অস্বীকার কর যে, রুমা তোকে ভীষণ ভালবাসে এ কথা তুই জানিস না ?

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রদীপ্ত বলল, কথা বল ? চুপ করে আছিস কেন ?

আমি বললাম, ভালবাসাটা তো এক তরফা জিনিস নয়।

প্রদীপ্ত বিরক্ত হল। বলল, আমি বিশ্বাস করি না যে, তোকে আমি অন্তত যতটুকু জানি, রুমাকে তোর ভাল লাগে না। রুমাকে ভাল লাগে না এমন কোনও শিক্ষিত মার্জিত ছেলে থাকতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম, আমি তো বলিনি যে ভাল লাগে না। কিন্তু ভাল-লাগা আর ভালবাসা তো এক নয়। বুলবুলির প্রতি আমি যে অন্ধ উদ্দাম আকর্ষণ অনুভব করি, রুমার বেলায় সেরকম করিনি কখনও।

প্রদীপ্ত বলল, তোর কি ধারণা ভালবাসার একমাত্র ফর্ম অন্ধ উদ্দামতা ? ভালবাসার আরও তো রকম আছে। রুমা কখনও কাউকে এমনভাবে আকর্ষণ করবে না। রুমা যাকে চায় তার অনেক সৌভাগ্য। তুই কী রে ? তুই একটা স্টুপিড। তোর বুলবুলিকে আমি দেখিনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, রুমাকে হারাতে পারে এমন একজনও মেয়ে কলকাতায় আছে।

আমি বললাম, তা সত্যি। কিন্তু ভালবাসা তো কোনও বাঁধা পথে চলে না। কী করব বল ? আমি যে ভালবেসে ফেলেছি।

প্রদীপ্তকে খুব চিন্তিত দেখাল। বলল, তাহলে তো আমি সেদিন খুব অন্যায় করেছি। রুমার কী হবে ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

না। সেদিন রুমা তোর যত না প্রশংসা করছিল, আমি তার চেয়েও বেশি করছিলাম। তোর সম্বন্ধে কত কিছু বললাম ওকে—যা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে কাছ থেকে জানি, ও বন্ধুর বোন হিসেবে তার কিছুই জানে না। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, ওর কাছে তোর নিন্দা করাই উচিত ছিল আমার। তা হলে যদি মেয়েটার মন একটু শান্ত হত। তোর থেকে মন সরে আসত। এতে তো জ্বালা আরও বাড়বে বেচারির। ঈস্—স্। দ্যাখ তো ! কী অন্যায় করলাম !

আমার খুব খারাপ লাগে রে প্রদীপ্ত। যখনই রুমার কথা ভাবি, খুবই খারাপ লাগে। কিন্তু আমি বড় স্বার্থপর হয়ে গেছি এখন। বুলবুলির পাশে রুমাকে দাঁড় করালে আমার মনে রুমা বার বার হেরে যায়। আমি তোকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না প্রদীপ্ত, কেন এমন হয়। কিন্তু হয়। আমাকে তুই ক্ষমা করে দে।

আমার ক্ষমা করার কথা কীসে আসছে ?

কিন্তু রুমা কি তোকে ক্ষমা করবে ? মেয়েরা ছেলেদের মতো উদার হয় না। মেয়েরা এ সব

www.BanglaBook.org

ব্যাপারে ক্ষমা কাকে বলে জানে না।

তারপর ও বলল, এটা আমার বুদ্ধির বাইরে। আমার মনে হয় কাউকে ভাল-লাগা কি খারাপ লাগার ব্যাপারে প্রত্যেকের সাবকনসাস্ স্টেটে সেক্স-অ্যাপীল দারুণভাবে প্লে করে। বুলবুলির প্রতি তোর যে ভাল-লাগা, তার পিছনে তোর অজানিতে এমন কিছু একটা তোর মাথার মধ্যে কাজ করে যে, তুই নিজেই তার খোঁজ রাখিস না।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, প্লিজ প্রদীপ্ত, এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর। আমি তাকে ভালবাসি, জাস্ট ভালবাসি। তুই এমন করে ভালবাসার শব্দব্যবচ্ছেদ করিস না। আমার খুব খারাপ লাগছে।

তারপর আবার বললাম, জানি না, কৃষ্ণা ওর চারপাশে এমন এমন সব ছেলে থাকতে আমার মতো জ্যাক্ অব অল ট্রেডস্-এর মধ্যে কী এমন দেখতে পেল! আমার প্রতি কৃষ্ণার এই আশ্চর্য আকর্ষণও কোনও নিয়মের মধ্যে পড়ে না। এও এক ব্যাখ্যাহীন ব্যতিক্রম।

প্রদীপ্ত বলল, ঠিক আছে। অন্য কথা বল।

কিন্তু এর পরে অন্য কথা আর জমল না।

প্রদীপ্তর বইয়ের আলমারী থেকে টমাস মানের একটা মোটা বই বের করলাম। ম্যাজিক মাউন্টেন। বইটার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু বইটা পড়া হয়নি।

আমি এক জায়গায় বসে বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলাম, আর প্রদীপ্ত আবার বিপ্রদাস পড়তে লাগল।

আমাদের দুই বন্ধুর সমস্ত ঘনিষ্ঠ নৈকট্য কৃষ্ণা যেন তার স্নিগ্ধ শীতল অনুপস্থিত উপস্থিতিতে বিচ্ছিন্ন করে দিল—শীতলতার সমুদ্রে দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পাশাপাশি ; তবু বহু দূরে, আমরা ভেসে রইলাম।

৯

অচেনা পরিবেশে ঘুম ভাঙলে প্রথমে কিছুক্ষণ বোকা বোকা লাগে।

নিজের ঘরের সিলিং, দেওয়ালের ছবি, জানলার পাশের বোগেনভেলিয়া লতা কিছুই না দেখতে পেয়ে কয়েক মুহূর্ত মাথাটা শূন্য হয়ে রইল।

পাশ ফিরতেই দেখলাম, আমার পাশে মাটিতে কম্বল বিছিয়ে প্রদীপ্ত শুয়ে আছে অশৌচের পোশাকে। ওর মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হবিষ্যান্ন করায় সৌম্য চেহারার এক বিশেষ দীপ্তি লেগেছে।

প্রদীপ্তর সুন্দর মুখে রোদ এসে পড়েছে। প্রদীপ্ত অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

মাথার পাশে মাটিতে টেবল্ ল্যাম্পটা রাখা আছে। নিবানো। তার পাশে বিপ্রদাস।

সবে ঘুম ভেঙেছে, এমন সময় কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল।

দরজা খুলে দেখলাম, প্রদীপ্তর বাবা দাঁড়িয়ে আছেন।

উনি বললেন, এ কি রাজা? তুমি বাড়িতে বলে আসোনি যে, এখানে থাকবে? তোমার বাবা কাল তোমরা শুয়ে পড়ার পর ফোন করেছিলেন। উনি গাড়ি পাঠিয়েছেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য।

বলেই, মেসোমশায় চলে গেলেন।

প্রদীপ্ত ঘুম ভেঙে বলল, কী রে?

আমি বললাম, এখন যেতে হবে। শিয়রে শমন। ফিরে এসে হয়তো তোর ঘরেই থাকতে হবে। থাকতে দিবি তো?

ও বলল, ইয়ার্কি করিস না। কী বলেন আগে দ্যাখ। ফোন করিস। ভুলিস না।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, সাদা ওপেল ক্যাপিটান গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে।

ড্রাইভার একটা চিঠি দিল হাতে। দেখলাম, বাবার লেখা।

ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে বাবা লিখেছেন, 'কাম ইমিডিয়েটলি। সী মি অ্যাজ সুন অ্যাজ উ কাম'।

বাড়ি পৌঁছে, সিঁড়ি দিয়ে বাবার ঘরের দিকে উঠতে উঠতে অনেক কথা মনে হচ্ছিল।

www.BanglaBook.org

মনে হচ্ছিল, এই শেষবারের মতো এ বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠা। এ বাড়িতে আমার কৈশোর শেষ হয়েছে, যৌবন আরম্ভ হয়েছে।

সিঁড়িতে গোপাল ঘোষের দু'টি স্কেচের রিপ্রোডাকসান—। আমিই অনেকদিন আগে কিনে এনে লাগিয়েছিলাম। কত স্মৃতি, কত পুরনো টুকরো টুকরো কথা—সব হারিয়ে যাবে। মুছে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আমার।

বাবা তাঁর ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

আজ রবিবার। বাবা বাগানে যাবেন। পায়ে লাল-রঙা তালতলার চটি। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন।

আমি পিছন থেকে ডাকলাম, বাবা!

বাবা হঠাৎ এক মোচড়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

আমার মনে হল, বাবা তাঁর পয়েন্ট থ্রি টু রিভলবার দিয়ে আমার পেটে গুলি করলেন।

কিন্তু কোনও শব্দ হল না।

তারপর দেখলাম, বাবার মুখ প্রসন্ন এবং মুখে এক বিচিত্র হাসি।

হাতির দলের সর্দার নতুন ছোকরা হাতির বাড়াবাড়ি দেখে যেমন চোখ করে তার দিকে তাকায়, বাবা তেমন চোখে আমার দিকে তাকালেন।

পরক্ষণেই বাবা হেসে ফেললেন। বললেন, পারমিশান গ্রান্টেড। এখন সোজা নিজের ঘরে চলে গিয়ে অ্যাকাউন্টান্সির বই খুলে সামনে ঘড়ি নিয়ে বসে পড়ো। তিন ঘণ্টায় ছ'টা ব্যালান্স শিট মেলাতে হবে।

তুমি যাকে স্ত্রী হিসেবে চাও, তাকে পাবে। এখন প্রমাণ করো যে, তোমার অন্য ব্যাপারেও জেদ আছে। যা চাও তা করতে পারা তো সোজা। যা চাও না, সেটা করাই বাহাদুরি। যাও।

আমার গলায় থুথু আটকে গেছিল।

কী করব, কী আমার করা উচিত, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে আসছিলাম, অথবা উড়ে আসছিলাম।

মা ডাকলেন পিছন থেকে।

মা একটা সাদা খোলের ফলসা রঙা চওড়া পাড়ের তাঁতের শাড়ি পরেছিলেন। চা-টা খেয়ে পান খেয়েছিলেন। মুখ দিয়ে সুগন্ধি জরদার খুশবু বেরোচ্ছিল। গলায় একটা মোটা বিছে-হার।

মা পান-মুখে মুখ উঁচু করে জড়ানো গলায় বললেন, দাঁড়া। কথা আছে।

মাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

দাঁড়ালাম।

মা খাবার-ঘরে ডাকলেন। তারপর বললেন, চা খাবি না! বলে আমার সামনের চেয়ারে বসলেন, চা দিলেন।

তারপর বললেন, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

তোর বাবার জন্যে ভেবে মরলাম, তুই এরকম করছিস জানলে তোর বাবার না জানি স্ট্রোকই হবে ভাবলাম; আর সেই তিনি কিনা আমাকে গালাগালি করে একশেষ করলেন।

পুরুষ জাতটাই বড় অকৃতজ্ঞ।

আমি কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, কী হল?

মা পানের ঢোক গিলে, অভিমানী গলায় বললেন, তোর বাবা আমাকে খুব বকলেন; বললেন যে, আমার জন্যেই নাকি তুই পরীক্ষা পাস করতে পারিসনি। বললেন, ছেলে কি আমার ফেল করার ছেলে? তুমিই তো গোড়া থেকে আমাকে কিছু না-জানিয়ে এমন করেছ। ও যদি কাউকে তেমন করে ভালই বেসে ফেলে, আর একটা অনিশ্চয়তার আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে, তা হলে কি পড়াশুনা করতে পারে? তুমি খুব অন্যায় করেছ আমাকে না জানিয়ে।

বলেই মা চুপ করে গেলেন।

মা'র চোখের কোণায় দু' ফোঁটা জল চিকচিক করতে লাগল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরলাম।

মা তাতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন ; বললেন, আমিই তোর শত্রু, আর সকলেই তোর মিত্র।

আমি বললাম, কী করছ মা, ওরকম কোরো না !

মা আমাকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে সামলে নিলেন নিজেকে।

একটু পরে মা বললেন, এবার পাস করতে পারবি তো ?

আমি হাসছিলাম !

ছোটবেলা থেকে, ঠিক মনে পড়ে না, আজকের দিনের মতো এত খুশি আমি এর আগে কখনও হয়েছিলাম কিনা !

আমি বললাম, নিশ্চয়ই ! তুমি দেখো, পাস করি কি না !

মা বললেন, তোর জীবনটা তো তোরই। তুই যাকে নিয়ে সুখী হবি, তাকেই আমি খুশি মনে গ্রহণ করব। কিন্তু সুখী কি তুই হবি ?

আমি বললাম, এ কথা কেন বলছ মা ?

বলছি এই জন্যে যে, তোকে আমি যত ভাল জানি, আর কেউই তত ভাল জানে না। ছোটবেলা থেকেই তোর স্বভাবটা অদ্ভুত। যা করবি, যার জন্যে তুই বায়না ধরবি, তা না পেলে তুই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবি ; আর যেই তা পাওয়া হয়ে যাবে, অমনি দু'দিনে তা তোর কাছে পুরনো হয়ে যাবে।

তাকে অবহেলায় ধুলোয় ফেলে আবার তুই নতুন কোনও বায়না ধরবি।

জানিস, আমার কেবলই মনে হয়, তোর মনটা ঘাসফড়িং-এর মতো। কোথাও দু' দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না।

বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয়। সমস্ত জীবনের ব্যাপার। অন্য একটা মেয়ের সমস্ত ভাল-মন্দ তোর উপরে নির্ভর করবে। তুই যেরকম খেয়ালী, তোর যেমন অস্থিরমতি, তোর জেনেশুনে কোনও মেয়েকে ঠকানো উচিত নয়।

তুই যদি আমাকে জিজ্ঞেস করিস তো আমি বলব, তোর বিয়েই করা উচিত নয়। কোনও মেয়েই তোকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে না। তোর এমনই স্বভাব। তুই জেদী, রাগী, ভীষণ খেয়ালী, তোর কাছে তোর গায়িকাও দু'দিনে পুরনো হয়ে যাবে। তখন তুই অন্য কারও দিকে হাত বাড়াবি, তার প্রতি অবিচার করে !

আমি চুপ করে থাকলাম।

আমার সম্বন্ধে মা'র কোনও অভিযোগই মিথ্যা নয়।

এবং মা এখন যা বলছেন, তা আমার ভালর জন্যে যত না, হয়তো বুলবুলির ভালর জন্যে তার চেয়েও বেশি।

কিন্তু আমি কী করব ? আজকে আমার জীবনে বুলবুলির চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নেই, তার চেয়ে বেশি প্রার্থনা আমি কিছুর জন্যে, কারুর জন্যেই করি না। তার জন্যে এ মুহূর্তে আমার যা আছে, আমি সব দিতে পারি।

এই সত্য ক্ষণিক কি না জানি না, ক্ষণিক হলেও, এই-ই চরম ও পরম সত্য। ভবিষ্যতে যদি অন্য কেউ আমাকে আবার এমনই কোনও পাগল-করা অনুভূতিতে ভরিয়ে দেয়, আমার সমস্ত সত্তা এমনি করেই আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন আমি কী করব, তা এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়। জীবনে কোনও বাঁধা-ধরা শর্ত মেনে, কোনও বাহিত পথে আমি কখনও চলতে পারব না। আমার মন যা বলবে, হৃদয় যা চাইবে, আমি সেইমতো আগুনের দিকে ধাবিত পতঙ্গের মতো এগিয়ে যাব।

আমি জানি যে, এইভাবে বাঁচা কোনও বুদ্ধিমান দায়িত্বশীল মানুষের বাঁচা নয়। প্রত্যেকের জীবন মানেই কতগুলো শর্ত। সম্পর্ক মানেই অলিখিত চুক্তি। বুদ্ধিমান ও কন্‌সিস্ট্যান্ট মানুষ মাত্রই এই শর্ত, এই চুক্তি মেনে চলেন। আমি বুদ্ধিমানও নই, কনসিস্ট্যান্টও নই। আমি একজন হৃদয়বান, ভাবাবেগসম্পন্ন মূর্খ মানুষ। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার আনন্দ, আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, বুলবুলির অদেখা নরম কবোষ্ণ বুক মুঠিভরে ধরার তীব্র আনন্দের মতো। এতে কোনও ফাঁকি নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুদ্ধিমান হবার জন্যে আমি কখনও ইনসিন্‌সিয়র হতে চাই না। যদি দুঃখ পাই কখনও, সে দুঃখকে সমস্ত আন্তরিকতায় বুকে আঁকড়ে ধরে দুঃখের স্বরূপটাকে বোঝার চেষ্টা করব। যদি আনন্দ পাই তো সেই আনন্দের তীব্র অঙ্গীকারে নিজেকে একটুও বাকি না রেখে ভাসিয়ে দেব। আমার জীবনকে আমি কখনও শতাধীন করে রাখব না কোনও কিছুর কাছেই, কারও কাছেই। এমনকী বুলবুলির কাছেও না। সামাজিক সমস্ত শর্তের জালের মধ্যে বাস করেও আমি এক শর্তহীন, স্বাধীন, অসামাজিক জীবনযাপন করব।

আমার স্বাধীনতা—বাঁচার স্বাধীনতা, ভাল-লাগা আর ভালবাসার স্বাধীনতা আমি কারও কাছে কোনও উচ্চতম মূল্যেও বিকোতে রাজি নই। কিছুতেই—কিছুতেই রাজি নই।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি।

মা এত কথা বুঝবেন না। মা একজন পতি-পরম-গুরুতে বিশ্বাসী সামাজিক অনুশাসনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, লক্ষ লক্ষ বাঙালি মায়ের একজন। তাঁর কালাপাহাড় ছেলের এমন সব বিপ্লবী ধারণার কথা শুনলে মা'র অসুখই শুধু বাড়বে।

তাই-ই চুপ করে থাকলাম অনেকক্ষণ।

তারপর বললাম, মা, ভবিষ্যতের কথা জানি না। ভবিষ্যতের কথা কেই বা জানে? আমি তোমাকে আজকের কথা বলতে পারি। বুলবুলিকে আমি খুব ভালবাসি মা। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এত ভালবাসিনি। এর চেয়ে বেশি আমি কিছু জানি না।

মা আরও একটা পান মুখে দিলেন রুপোর বাটা থেকে।

বললেন, কী জানি! তোর জন্যে এখন যত না চিন্তা হয়, সেই মেয়েটার জন্যে আরও বেশি চিন্তা হয়। সে জানে না, কাকে সে বিয়ে করছে। এমন ছেলেকে বেঁধে রাখা পৃথিবীর কোনও মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। মেয়েটার কপালে অশেষ দুঃখ লেখা আছে।

সেদিন সত্যিই খাবার-ঘর থেকে বেরিয়ে, নিজের ঘরে গিয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্সির বই খুলে বসলাম। সেদিন ব্যালান্স শিটগুলো পটাপট মিলে যেতে লাগল। অ্যাকাউন্ট্যান্সি যে একটা এত সহজ ও ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, তা আমি আগে কখনও জেনেছি বলে মনে হল না। আমার মন বলতে লাগল, পরীক্ষাটা নভেম্বরে না হয়ে আরও তাড়াতাড়ি হলে ভাল হত। কারণ আমার কোনও সন্দেহ নেই মনে যে, এবার বসলেই আমি পাস করব।

আমার মনটা কিছুতেই এতদিন অ্যাকাউন্ট্যান্সির মধ্যে ঢুকতে চাইত না। মনটা আগ্রহী হলে, কিছু জানব বা করব বলে পণ করলে, তা জানতে পারব না বা করতে পারব না, এমন কিছু আছে বলে মনে হয় না আমার।

আমার মন এখন আমার সম্পূর্ণ অধীন। মন এখন বাহির পথে বিবাগী হিয়ার মতো কোনও মরীচিকার পিছনে ধাবমান নয়। মন এখন কেন্দ্রীভূত, কেন্দ্রবিন্দুতে সমাধিস্থ; এ মনের অন্বিষ্ট কিছু থাকলে তা নিশ্চিতভাবে বিন্যস্ত হয়ে আমার কবলিত হবেই। কোনও বাধাই এখন আর বাধা নয়।

সেদিনই বিকেলে অর্ঘ্য ফোন করল।

বলল, তুমি বলেছিলে জর্জদার কাছে গান শিখতে যাবে—আজ তোমাকে নিয়ে যাব। আমি বলে রেখেছি।

আমি বললাম, চলে এসো। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ইতিমধ্যে আমার প্রিয় গানের স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, বেশ কিছুদিন হল। কারণ, বাবা বলেছিলেন বলেই শুধু নয়, সেখানের কড়া নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে আমার পরীক্ষার প্রস্তুতির নিয়মানুবর্তিতার ঘন ঘন সংঘাত হচ্ছিল বলে।

জর্জদা'র বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই। রবিবার রবিবার সকালে সকালে ক্লাস। তাই ঢিলেঢালাভাবে সপ্তাহে একদিন গানের রেওয়াজ থাকবে। এই ভেবেই অর্ঘ্যকে বলেছিলাম।

জর্জদা'র সবচেয়ে নিয়মিত ও প্রণত ছাত্র ছিল অর্ঘ্য। ও গত কয়েক বছরে একদিনও ক্লাস মিস করেনি।

জর্জদা ওকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন।

www.BanglaBook.org

অর্ঘ্যর সঙ্গে সেদিন সকেবেলায় যখন ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের পাশে একটি দোতলা বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম, তখন জানতাম না যে, এমন একজন মেজাজী রসিক লোকের সঙ্গে আলাপ হবে।

ছোট ঘর। চার ধারে স্তূপীকৃত বইপত্র, চাইনিজ ছবি ; নানা কিউরিও মাটিতে অবহেলায় ফেলে রাখা। মেঝেতে সতরঞ্জি পাতা। একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে আর খয়েরি লুঙ্গি পরে সামনে হারমোনিয়াম নিয়ে জর্জদা বসে আছেন। মুখে পান, সামনে পানের বটুয়া, পাশে গলা স্প্রে করার যন্ত্র।

একঘর ছেলেমেয়ে বসে আছেন।

আমি দরজায় দাঁড়িয়ে জর্জদাকে নমস্কার করলাম। অর্ঘ্য আলাপ করিয়ে দিল।

জর্জদা হাসলেন, চোখ তুলে এক অদ্ভুত কৌতুকময় তাচ্ছিল্যের চোখে যেন তাকালেন আমার দিকে। বললেন, চেহারাখান তো লম্বা-চওড়া দেখি, তা গলাখান্ কেমন ? কোথায় গান শেখা হইছে ?

আমি নাম বললাম। জর্জদা বললেন, সব্বনাশ ! তা অত বড় স্কুলের পর আমার কাছে ক্যান ?

আমি বললাম, কারণটা ব্যক্তিগত। তা ছাড়া আপনি বাড়ির কাছে থাকেন।

অ। বুঝছি। বললেন জর্জদা।

সেই প্রথম আলাপ।

সবে গান আরম্ভ হবে। হারমোনিয়াম কোলে তুলে নিয়ে জর্জদা সুর ভাঁজছেন, এমন সময় এক মহিলা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।

জর্জদা তাঁকে দেখে খুব খুশি হলেন দেখলাম।

বললেন, আসো আসো। কী ? পথ ভুইল্যা ?

মহিলা বললেন, না। মোটেই না।

জর্জদা বললেন, বলো, কী খাবা ?

রসগোল্লা। মহিলা বললেন।

জর্জদা ডাকলেন, হতকুৎসিত !

'যাই' বলে উত্তর দিয়ে একটি নিরীহ চেহারার লোক এসে বলল, আজ্ঞে বাবু।

জর্জদা বললেন, পাঁচ টাকার রসগোল্লা নিয়ে এসো।

জর্জদা'র মতো গুরুচণ্ডালী ভাষায় কথা বলতে আমি কাউকে দেখিনি।

এই বাঙাল ভাষায় বলছেন, পরক্ষণেই কলকাতার ভাষায় বলছেন। লোককে সর্বক্ষণ এমন বুদ্ধি ও রসবোধে চমকে রাখতে খুব কম লোককে দেখেছি।

জর্জদা আমার চোখে তাকালেন। আমি নিরীহ বাহনের সঙ্গে হতকুৎসিত নামটার কোনও মিল খুঁজে পাচ্ছি না দেখে, নিজেই হাসতে হাসতে বললেন, ওর আসল নামটা ভাল। তবে আমার মতো কুদর্শন লোকের যে চাকর, তাকে হতকুৎসিত না হলে মানায় না। তাই ওকে হতকুৎসিত বলে ডাকি।

পরক্ষণেই, আমার কাছে কিছু শোনার প্রত্যাশা না করেই, আগন্তুক ভদ্রমহিলাকে একটা নামে ডেকে বললেন, ব্যাপারটা ভালই। বিয়া করণের সময় অমুক ভট্টাচার্যি আর রসগোল্লা খাওনের বেলায় জর্জদা !

আমরা সকলেই হেসে উঠেই থেমে গেলাম আচমকা।

বুঝলাম, পটভূমিকা না জেনে হাসাটা বোকামি। এই সহজ সরল রসিকতা হয়তো নিছক রসিকতা নয়।

তারপর গান আরম্ভ হল---

"কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে॥"

চোখ বন্ধ করে জর্জদা গান গাইতে লাগলেন।

আমার খুব ভাল লাগতে লাগল। গলা কী দরাজ, সুরে ও দরদে ভরপুর ! তখন জর্জদা

www.BanglaBook.org

রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এতরকম একস্‌পেরিমেন্টে নামেননি। জর্জদার গান শুনলেই মনে হত অন্য কোনও এক উচ্চতায় পৌঁছে গেলাম মনে মনে।

গানের একটা জায়গায় এসে বললেন, স্বরলিপি থাউক, যেমন কইর‍্যা গাইতাছি, তেমন কইর‍্যা গাও।

সামান্য একটা পর্দার সামান্য এদিক-ওদিক। শুদ্ধর জায়গায় কোমল লাগাতেই গানটার ডাইমেনশান বদলে গেল। মনে হল, ইস্, স্বরলিপিতে এমন কেন নেই?

জর্জদা হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে অর্ঘ্যকে বললেন, কোনও ফাংশানে আবার এই সুরে গেয়ে বসবে না। লোকে কইবে, জর্জ বিশ্বাস স্বরলিপি মানে না। তবে আমার নির্ঘাত জেল।

আমরাও হাসতে লাগলাম।

জর্জদাও হাসতে লাগলেন।...

মঞ্জুশ্রী চাকী একটু পরে চলে গেলেন। জর্জদার গানের সঙ্গে ওঁর কোনও নাচের প্রোগ্রাম ছিল। পরের সপ্তাহে।

শ্রীলা সেনের চেহারা এবং গলা, দুইয়েরই আমি ভীষণ অ্যাডমায়ারার ছিলাম। উনি আমার কলেজের এক সহপাঠীর দিদি হন। জানতাম, কিন্তু আলাপ ছিল না। তাই সামনে বসে তাঁর গান শোনা ও তাঁকে দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগল।

সেদিন ওই গান শোনার পরই ছুটি হল আমাদের।

বাইরে এসে অর্ঘ্য বলল, কেমন লাগল রাজা?

আমার সত্যিই ভাল লেগেছিল। ওই ঘরোয়া পরিবেশ, ওই শিল্পীসুলভ রসিক মানুষ, তাঁর ঢিলেঢালা বেশবাসের মতো ঢিলেঢালা অনিয়মানুবর্তী জীবন।

বাড়ি এসেই চানটান করে মেঝের গালচেয় পা ছড়িয়ে বসে আবার আমার বুলবুলির রেকর্ড দুটো শুনলাম। না, আমার কোনও ভুল হয়নি। বুলবুলি আমার জাত-গাইয়ে।

একদিন যখন তার মৌটুসী পাখির মতো চিকন গলা সুরে ভরে গিয়ে ভরা কলসির মতো গভীর হবে, সেদিন সে দশজনের মধ্যে একজন হবেই। সে যে বড় গাইয়ে হবেই, এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর, অনেক অনেক রাতের পর, দারুণ আবেশে ঘুমোলাম। আরামে ঘুমোলাম।

সে-রাতে এক দারুণ আশ্লেষভরা স্বপ্ন দেখলাম। সে স্বপ্ন আজও আমার মনে আছে। সে স্বপ্ন কাউকে দেখানো যায়নি; যাবে না কখনও। আমার প্রেমিক ভাবুক ছেলেমানুষী মনে সে স্বপ্ন এক সোনালি নরম উড়ন্ত কাঠবিড়ালির মতো উড়ে বেড়িয়েছে। যত দিন বাঁচব, উড়ে বেড়াবে।

সে স্বপ্ন যদি কোনও দিন সত্যিও হয়, সেই সত্যতা হয়তো কখনও কোনওক্রমেই সেই স্বপ্নের আবেশের সমকক্ষ হবে না।

১০

একটা কঠিন গান আগের দিন তোলানো হয়েছিল। সে গানটা কাল জর্জদা কেমন তোলা হয়েছে, দেখছিলেন।

আমার পাশে যে ছেলেটি বসেছিল, তাকে আমি চিনতাম, নামও জানতাম তার।

তার পালা যখন এল তখন আভোগে এসে সে কোমল রেখাবের জায়গায় শুদ্ধ রেখাব লাগাল। অথচ পুরো গানের মেজাজটা ওই কোমল পর্দার উপর দাঁড়িয়েছিল।

জর্জদা পান খেতে খেতে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি পাশে-বসা ছেলেটির কানের পাশে গুনগুনিয়ে বলতে গেলাম যে, ভুলটা কোথায়।

জর্জদার বোধহয় মেজাজ ভাল ছিল না।

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঠোঁটকাটা ভাষায় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ল্যাংড়া অন্ধরে পথ দেখায়।

www.BanglaBook.org

একটা হাসির দমক ক্লাসসুদ্ধ ছেলেমেয়ের পেট থেকে গলা অবধি এসে আবার পেটে নেমে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু হাসিটা সকলের চোখে ছড়িয়ে রইল। ভীষণ লজ্জা পেলাম।

এ জন্যেই বিদ্যাসাগর মশাই বলেছিলেন, কখনও কারও উপকার করতে নেই।

আমার মনটা এমনিতেই খুব খারাপ ছিল। তার উপর এই হেনস্থাতে মনটা তেতো হয়ে গেল।...

সেই আলটিমেটামের পর ক'দিন পেরিয়ে গেছে। আজ পঞ্চম দিন।

কিন্তু আজ অবধি বুলবুলির কাছ থেকে কোনও উত্তর পাইনি চিঠির।

আমার চিঠিতে আমার অফিসের ফোন নম্বরও দেওয়া ছিল। চিঠি লিখতে সংকোচ হয় তো একটা ফোনও করতে পারত। কিন্তু তাও করেনি।

পাঁচ দিন অবধি ভাবছিলাম, চিঠিটা আসতে সময় লাগছে। পাঁচ দিন অবধি রাগটা পোস্ট অফিসের উপরই ছিল।

পাঁচ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর বুলবুলির উপর রাগ হতে আরম্ভ হল।

অফিসের বেয়ারাদের ঘন ঘন ডাক দেখতে নীচে পাঠাতে লাগলাম।

তারা বারংবার বলতে লাগল, এ সময় কোনও চিঠি আসে না। চিঠি একবার সকালে, একবার দুপুরে ও শেষ সন্ধেবেলায় আসে। এখন দেখে কী হবে?

আমি বললাম, বলছি, যাও না। আমার জরুরি খবর আসবে একটা বোম্বে থেকে।

বেচারারা উপর-নীচ করে, ডাকবাক্স খুলে খুলে হয়রান হল; কিন্তু চিঠি এল না।

সাত দিনের দিনও যখন কোনও চিঠি এল না, তখন হঠাৎ এক সময় বিকেলের দিকে অফিসে বসে কাজ করতে করতে বুলবুলির উপর দমবন্ধ রাগটা হঠাৎ উবে গিয়ে একটা ভীষণ স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডা ভীতি আমাকে পেয়ে বসল। একটা অপমানবোধ আমাকে দারুণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার পেটের মধ্যে সেই ভয়টা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগল।

জীবনে আমি এমন অবস্থায় কখনও পড়িনি।

নিজেকে নিজের লাথি মারতে ইচ্ছে করছিল, নিজের গায়ে নিজে থুথু দিতে ইচ্ছে করছিল।

যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে, এমনভাবে একটা বাজে সস্তা মেয়ে, একটা নির্গুণ গলাসর্বস্ব সাধারণ মেয়ে আমাকে অপমান করতে পারে, আমাকে অপমান এবং প্রত্যাখ্যান করার সাহস সে রাখে, তা হলে কখনও কি আমি যেচে নিজে থেকে ছোট হয়ে তাকে ভালবাসা জানাতে যাই?

নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়ে বললাম, যা হয়েছে, তা ভালই হয়েছে। এ শিক্ষার আমার দরকার ছিল। আমি নিজেকে কী-ই না একটা ভাবতাম! নিজে নিজে মনে মনে নিজের সম্বন্ধে অহেতুক ফেঁপে উঠেছিলাম। কোন সর্বনাশে ভর করে আমি তার পেছনে পথের কুকুরের মতো ধেয়ে গিয়ে তার হাতে আমার মৃত্যু-পরোয়ানা ধরিয়ে দিয়ে এলাম সেদিন? কার দুর্বুদ্ধিতে?

সে কথাই ভাবছিলাম।

ছিঃ ছিঃ, এদিকে বাবা ও মা অনেককে বলে ফেলেছেন যে, আমি নিজের ইচ্ছামতো মেয়ে পছন্দ করেছি। বলেছেন তার নাম-ধাম, তার সমস্ত গুণাবলী। আমার কানে এ-ও এসেছে যে, মা বলেছেন—ছেলে আমার সে মেয়ের প্রেমে পাগল।

তখন ব্যাপারটা তো শুধু আমার নিজের সম্মানেই (যদি এ হতভাগ্যার সম্মান বলে কোনও বস্তু এখনও থেকে থাকে) সীমিত নয়, এখন তো আমার মা-বাবার সম্মানও এর মধ্যে জড়িয়ে গেছে।

রাগে আমার হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু কোনও উপায় ছিল না।

এ-ই প্রথম আমি কাউকে এমন হাঁটু-গেড়ে-বসে ভালবাসা জানালাম, এত নিচু হলাম, নিচু করলাম নিজের অস্তিত্বকে—আর এই-ই কিনা শেষ!

বুলবুলি যদি সত্যিই আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে কি জীবনে অন্য কোনও মেয়েকে আমি কখনও বলতে পারব যে, আমি তোমাকে চাই।

আমার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। আমার নিজের সম্বন্ধে সব বিশ্বাস, সব গর্ব চুরমার হয়ে যাবে। অথচ এখন কিছুই করার নেই। কিছুমাত্র বাকি নেই আর। আমার হাতের তাস চালা হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

এখন হার-জিত অন্যের হাতের তাসে। এখন একটি অন্তঃসারশূন্য ন্যাকা-সঙ্গীত গাওয়া মেয়ের করুণার উপর নির্ভর করে হাঁ করে চাতক পাখির মতো আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হবে।

সেদিন অফিস-ফেরতা একবার ওদের বাড়ির সামনে একটা চক্করও মেরে গেলাম। ওকে দেখা গেল না। বাড়ির ভিতর থেকে অনেক মেয়ে-পুরুষের সম্মিলিত হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

এত হাসি কীসের ? এত হাসি আসে কোথা থেকে ? ভেবেই পেলাম না।

পরক্ষণেই আমার বুক ছমছম করে উঠল। এত বড় চওড়া রাস্তায় অনেক পথচারীর সঙ্গে পথ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমার মনে হল, ওরা বাড়িসুদ্ধ লোক আমার চিঠি নিয়ে হাসাহাসি করছে না তো ?

বুলবুলি কি আমার চিঠি সকলকে দেখিয়েছে ?

জানতে ইচ্ছে হল, তা হলে মানুষের চোখের ভাষা কি কোনও ভাষাই নয় ? মানুষ মুখে যা বলে, অ্যামপ্লিফায়ারে যা চেঁচিয়ে জানায়, সেটাই একমাত্র কম্যুনিকেশান, নীরব চোখে কি কেউ কাউকে কিছু বলতে পারে না ? একে অন্যকে বুঝতে পারে না ? আমি এতদিন যা বুঝলাম, যা বিশ্বাস করলাম, সবই কি ভুল ?

আমার এখন কী করা উচিত ভেবে পেলাম না।

নিশ্চয়ই তাদের বাড়িতে গিয়ে, আমার ভালবাসার বদলে সে আমাকে কেন ভালবাসবে না—এই নিয়ে তার গুরুজনদের সঙ্গে তর্ক করা চলে না। তার সঙ্গে তো নয়ই।

ভাবলাম, সে যদি আমাকে সত্যিই প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমার চোখ অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেব। যাতে তাকে আর কখনও দেখতে না হয়।

পরক্ষণেই ভাবলাম, না। তা কেন ? ও যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে রুমার কাছে দৌড়ে যাব। পরীক্ষায় অল-ইন্ডিয়া রেকর্ড করব। তারপর একদিন নতুন সাদা ছিপছিপে স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়িতে রুমাকে পাশে বসিয়ে বুলবুলি নামক রুমার এক বান্ধবীর বাড়িতে আমাদের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসব—রুমার সঙ্গে আমার বিয়ের কোনও দিক দিয়ে রুমার সে পায়ের নখেরও যুগ্যি নয়।

হাঃ হাঃ ! প্রতিশোধ আমিও নিতে জানি। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

যে-মেয়ে শ্যামলের মতো ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চায়, বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায়, নিজেকে ওজন করিয়ে বেড়ায় প্রসপেকটিভ শ্বশুর-শাশুড়ির অশিক্ষিত বুদ্ধির তুলাদণ্ডে, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ঘৃণা ছাড়া, অনুকম্পা ছাড়া তাকে আমার দেওয়ার কিছুই নেই।

বুলবুলি না হাঁড়িচাঁচা !

অফিস থেকে ফিরে সেদিন চান-টান করে বুলবুলির রেকর্ডটা কাগজে মুড়ে নিয়ে প্রদীপ্তদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।

প্রদীপ্ত ওর বাবার লাইব্রেরির পাশের বড় ড্রয়িং রুমে বসেছিল ওর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে। চার-পাঁচ দিন পর ওর মায়ের কাজ। বাড়িতে অনেক লোকজন। প্রদীপ্ত সকলের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছিল।

আমাকে দেখেই বলল, কী খবর রে ? আয়, চল আমার ঘরে যাই।

প্রদীপ্ত নিজের ঘরে এসে সোফায় বসল। তারপর ধীরেসুস্থে বলল, বল, তোর কনকোয়েস্টের খবর বল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুই জানিস ?

ও অবাক হয়ে বলল, কী ?

না। জানিস কি না বল না ?

কী জানি সেটা আগে বল ?

বললাম, তুই জানিস যে, আমি এক ঠগীর পাল্লায় পড়েছি। বুলবুলি একটা জোচ্চোর, একটা ফোর-টোয়েন্টি।

প্রদীপ্ত গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, তোর দেখছি, ভীষণ অবনতি ঘটেছে। একটি অপরিচিতা

www.BanglaBook.org

মেয়ে সম্বন্ধে, যার তোর স্ত্রী হবার সমস্ত সম্ভাবনা আছে, তার সম্বন্ধে তুই এরকম ভাষা ব্যবহার করতে পারিস কী করে আমি ভাবতে পারি না !

আমি নিজেও লজ্জা পেয়েছিলাম। আমার মুখ থেকে অনবধানে এমন ভাষা বুলবুলি সম্বন্ধে কী করে বেরোল তা আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম না।

আমি চুপ করে মুখ নিচু করে রইলাম।

প্রদীপ্ত বলল, তোর হাতে কী ?

আমি বললাম, ওর রেকর্ড।

প্রদীপ্ত উৎসাহের গলায় বলল, দে, আমাকে দে। যদিও আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসি না, কিন্তু তুই যাকে ভালবাসিস তার গান শুনতে নিশ্চয়ই আগ্রহ হয়।

বলেই, প্রদীপ্ত হাত বাড়াল আমার দিকে। বলল, দে রাজা, আমায় দে।

আমি তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম দেখে, প্রদীপ্ত বলল, আচ্ছা তুই একটু বোস। আমি পিসিমার কাছ থেকে গ্রামোফোনটা চেয়ে আনি।

আমি তবুও কথা বললাম না।

প্রদীপ্ত ঘর থেকে চলে যেতেই আমি রেকর্ডটা আছড়ে ফেললাম মেঝেতে। সেভেন্টি-এইটের রেকর্ড। শব্দ করে রেকর্ডটা ভেঙে গেল। আমি আমার জুতোসুদ্ধ পা দিয়ে রেকর্ডটা গুঁড়িয়ে দিতে লাগলাম। যতক্ষণ না রেকর্ডটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ততক্ষণ লাথি মারতে লাগলাম।

আমার সারা শরীরে একটা চণ্ডালের রাগ আগুনের মতো জ্বলতে লাগল।

আমার মাথার মধ্যে একরাশ অবুঝ রক্ত ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। নিজের উপর আমার নিজের কোনও অধিকার থাকল না। বুলবুলির প্রতি সব ভালবাসা, বুকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা নিজের উপরের সব গর্ব, সব মমত্ববোধ কর্পূরের মতো উবে গেল।

আমি এই রেকর্ডটার মতো নিজেকেও যদি ভেঙে, পদদলিত করে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারতাম, একমাত্র তবেই বোধহয় আমার এই জ্বালা নিভত। আমি এর আগে এমন অনুভূতির সম্মুখীন কখনও হইনি। এই ব্যর্থ, প্রতারিত, প্রত্যাখ্যাত আমিকে, আমি কখনও চিনতাম না। এ যে আমারই বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে ছিল, আমার মতো নিরীহ, নির্বিরোধী, ভাল ভাবনা ও ভালবাসার লোকের বুকেও যে এ-লোক অবলীলায় লুকিয়ে থাকে তা আমার তখনও জানা ছিল না। এই নতুন আমি-র প্রলয়ঙ্করী রূপ দেখে আমি ভীষণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

এমন সময় প্রদীপ্ত ঘরে ঢুকল, ট্রেতে বসিয়ে দু'কাপ কফি নিয়ে।

ওর পিছনে পিছনে ওর বাবার লাইব্রেরীর একজন বেয়ারা হারমোনিয়ামটাকে নিয়ে ঢুকল।

ঘরময় ভাঙা রেকর্ডের টুকরো দেখে প্রদীপ্ত একবার অপাঙ্গে আমার দিকে চাইল।

কফির কাপ দুটো নামিয়ে রেখে, বেয়ারাকে চলে যেতে বলল হারমোনিয়ামটা রেখে দিয়ে।

তারপর প্রদীপ্ত আমার সঙ্গে কোনও কথা না বলে কফির কাপটা হাতে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি যে জলজ্যান্ত ঘরের মধ্যে আছি, আমি যে এমন দাহ্য ও জ্বলন্ত অবস্থায় আছি, এটা সে দেখেও-না-দেখে, আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, একদৃষ্টে জানালার বাইরে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে, যেন বহুদূর থেকে বলছে, এমনভাবে প্রদীপ্ত বলল, কফিটা খা, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কফির কাপটা তুলে নিয়ে সোফায় গিয়ে বসেছি, এমন সময় বাইরে যেন কার হালকা জুতোর শব্দ শোনা গেল— তারপরই রুমার গলা পেলাম।

রুমা বলছে, প্রদীপ্তদা, আপনি কোথায় ?

ডাকতে ডাকতে ঘরের পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই রুমার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। রুমা আমাকে দেখে যেন হঠাৎ নিভে গেল। বলল, তুমি ?

তারপর যেন নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলল, ভাল আছ রাজাদা ?

রুমার গলা শুনে প্রদীপ্ত মুখ ফেরাল।

www.BanglaBook.org

রুমার দিকে ফিরে বলল, খুব ভাল আছে।

রুমার নজর ততক্ষণে মেঝের রেকর্ডের টুকরোগুলোয় পড়েছে। ও আশ্চর্য হয়ে রেকর্ডের চারটা তুলে নিল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, ওকি ? কেন ? কী হয়েছে রাজাদা ?

প্রদীপ্ত বলল, রাজা পাগল হয়ে গেছে।

রুমা হঠাৎ হাসল।

হাসিতে কোনও শব্দ হল না।

রুমা বলল, রাজাদা তো চিরদিনের পাগল। এটা কোনও নতুন কথা নয়। আমি ভাবলাম, কী না হল বুঝি !

প্রদীপ্ত বলল, তুমি এসেছ খুব ভাল হয়েছে রুমা। আমার এখন অনেক কাজ। আমি এখন কটু নীচে যাচ্ছি। তুমি ততক্ষণ রাজার সঙ্গে একটু গল্প করো, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি চে থেকে। আমার মাসিমারা সবাই এসেছেন।

আমি প্রদীপ্তর চোখের দিকে চেয়ে মিনতি করলাম। চোখ দিয়ে বললাম, প্রদীপ্ত,তুই এখন যাস ।

কিন্তু প্রদীপ্ত জেনেশুনেই চলে গেল। ইচ্ছে করে চলে গেল।

ওর মুখ দেখে মনে হল, আমার প্রতি ওর কোনও রকম প্রীতি নেই।

রুমা মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ভাঙা রেকর্ডের টুকরোগুলো তুলছিল।

ওর গলার হারের লকেটটা শূন্যে ঝুলছিল। সুন্দর শ্বেতা পাখির মতো ওর দুটি পেলব বুকের কটুখানি দেখা যাচ্ছিল। দু' বুকের মধ্যের সুন্দর সুগন্ধি খাঁজ !

আমার হঠাৎ মনে হল, আমি রুমার বুকে মুখ রেখে খুব জোরে কেঁদে উঠি। কোনও কথা না লে শুধু কাঁদি। আমি জানি, আমি তা করলে রুমা ওর সান্ত্বনা ও সোয়াস্তির হাত দিয়ে আমার াথার চুল এলোমেলো করে দেবে, আর অস্ফুটে বলবে, তুমি বড় ছেলেমানুষ রাজাদা, তুমি এখনও ড় ছেলেমানুষ।

রুমা রেকর্ডের টুকরোগুলো তার নরম লতানো হাতে করে তুলে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে াখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল।

রুমা বলল, তোমার কী হয়েছে রাজাদা ?

তারপরই বলল, শোনো, এই শোনো তুমি আমার সামনে কখনও এমন মুখ করে থেকো না। এমন মুখ করে এসো না। তুমি বিশ্বাস করো, আমার বড় কষ্ট হয়। আমার বুকের মধ্যে যে কী কষ্ট য়, তুমি কখনও তা জানতে পাবে না। প্লিজ, রাজাদা, প্লিজ, কথা বলো।

আমি তবুও চুপ করে থাকলাম।

রুমা বলল, কথা বলবে না ? আমি তাহলে চলে যাই ? যাব ?

আমি বললাম, বোসো। যেয়ো না।

তবে কথা বলো ? আমাকে বলো কী হয়েছে ? নির্দ্বিধায় বলো। আমি তোমার জন্যে কিছু, কোনও কিছু করতে পারলে, যদি করতে পারি তো আমার বড় ভাল লাগবে। বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না আমি। বিশ্বাস করো, কিছুই চাই না। আমার সঙ্গে অন্য দশটা সাধারণ মেয়ের কোনও মিল নেই। তুমি তা বোঝো না রাজাদা ? আমি যদি সাধারণ হতাম তবে কী তোমাকে এমন করে বোকার মতো ভালবেসে মরতাম ?

আমি বললাম, আমার কিছু বলার নেই রুমা। তোমাকে কিছুই বলার নেই।

রুমা বলল, বুলবুলি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে ? তোমাকে কষ্ট দিয়েছে ? বলো তো আমি বুলবুলিকে এক্ষুনি ফোন করে বলছি।

আমি বললাম, না। ওই নাম তুমি আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। বুলবুলির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

রুমা হাসল বলল, নেই বুঝি ?

তারপরই বলল, তুমি একটা পাগল, সত্যিই পাগল। তুমি নিজেকেই বোঝ না, তুমি অন্যকে

www.BanglaBook.org

বুঝবে কী করে ? বুলবুলি যে তোমাকে কী করে সামলাবে জানি না। তোমাকে সামলে রাখা ওর মতো ঠাণ্ডা মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি বললাম, রুমা, অন্য কথা বলো।

কী কথা বলব ? তুমি বলো।

চলো এখান থেকে আমরা চলে যাই। প্রদীপ্ত এখন ব্যস্ত আছে ; ব্যস্ত থাকবে।

কোথায় ? অবাক হয়ে রুমা বলল।

চলো যেখানে খুশি।

রুমা হাসল। বলল, সেই ভাল।

তারপর একটু থেমে আবার বলল, শুধু আজ নয়, যখনই তোমাকে পাগলামিতে পাবে, সেদিন যেদিনই হোক, তুমি সব সময় আমার কাছে চলে এসো। আমি যেখানেই থাকি না কেন। একথা তুমি হয়তো স্বীকার করবে না যে, তোমাকে আমি যতটা বুঝেছি, তোমার মাও ততটা বোঝেননি। তুমি আসবে, তারপর তোমার পাগলামি থেমে গেলে, যার কাছ থেকে এসেছিলে তার কাছে আবার ফিরে যাবে। তোমার উপর কোনও রকম দাবি থাকবে না আমার। তবু, শুধু এসো। মাঝে মাঝে এসো। তোমাকে যেন দেখতে পাই মাঝে মাঝে।

প্রদীপ্তর বাড়ি থেকে বেরোবার সময় প্রদীপ্তকে বলে গেলাম। আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে বেরোতে দেখে প্রদীপ্ত খুশি হল।

হাসিমুখে প্রদীপ্ত বলল, আয়। আবার আসিস। কাজের দিন সকাল থেকে আসিস কিন্তু। তারপর রুমাকে বলল, তুমি তো আসবেই।

রুমাদের মেরুনরঙা বড় ওলডস্-মোবাইল গাড়িতে উর্দিপরা ড্রাইভার বসেছিল।

ড্রাইভার দরজা খুলল। রুমা বলল, তুমি আগে ওঠো।

আমি উঠে বাঁদিকে বসলাম।

রুমা তারপর উঠল।

রুমা ড্রাইভারকে বলল, ক্লাবমে চলো।

ড্রাইভার বলল, কওন্ ক্লাব দিদি ?

রুমা বলল, সুইমিং ক্লাব।

আমি বললাম, বাড়ি যাবে না ?

রুমা বলল, না। বাড়িতে বাবার অনেক বন্ধুরা আজ খাবেন। ককটেল্ আছে। অনেক লোক।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই রুমা আমার ডান হাতটা তুলে নিয়ে ওর কোলে রাখল।

ও একটা সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছিল। কমলা পাড়। কমলা রঙ ব্লাউজ।

আমার হাতটা ওর দু-হাত দিয়ে ও ধরে রইল। ফিসফিসে গলায় বলল, আপত্তি ?

আমি কথা বললাম না। রুমার হাতে আলতো করে একটু চাপ দিলাম।

সুইমিং ক্লাবে পৌঁছে, গেস্ট বুকে সই করে টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে বড় সুইমিং পুলের পাশে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বসল ও।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছিল। কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার বেগুনি, লাল ও হলুদ ফুলগুলো জলে উড়ে এসে পড়েছিল। ঢেউয়ে দোল খাচ্ছিল। নীল জলের উপর ফ্লাডলাইটের আলো পড়েছিল। সাহেব-মেমরা সাঁতার কাটছিল।

চারটে দারুণ ফিগারের আমেরিকান মেয়ে বিকিনি পরে পুলের মধ্যে কাঠের চাকাটায় চিত হয়ে শুয়েছিল।

একজন ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িওয়ালা ইটালিয়ান ছেলে জলে দাঁড়িয়ে চাকাটা ঘোরাচ্ছিল।

মেয়েগুলো শুয়ে শুয়ে ন্যাকামি করে আঁউ আঁউ শব্দ করছিল।

রুমা বলল, কী খাবে ?

বললাম, কিছু না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুমা বলল, কিছু খাও।

তারপর বেয়ারাকে ডেকে ফিসফিঙ্গার উইথ টার্টার সস্ অর্ডার করল। সঙ্গে ফ্রেশ লাইম উইথ সোডা।

রুমা অনুনয় করে বলল, কথা বলো। রাজাদা, প্লিজ কথা বলো।

আমি চুপ করে ছিলাম।

রুমা আবার বলল, কথা না বললে ভাল হবে না বলছি!

তারপর অনেকক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে থেকে বলল, জানো রাজাদা, আমি আর বেশিদিন তোমাকে জ্বালাব না। আমি নান্ হয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম, বাজে কথা বোলো না। সন্ন্যাসিনী হবে তুমি!

ও বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার মধ্যে গৃহীর লক্ষণ তুমি এমন কী দেখলে যে, আমি সন্ন্যাসিনী হতে পারব না? সত্যি সত্যিই আমি ক্রিশ্চান হয়ে যাচ্ছি, নান্ হবার জন্যে। দেখো, বিশ্বাস না হলে দাদাকে জিজ্ঞেস কোরো, বাবা-মাকে জিজ্ঞেস কোরো।

ওঁরা তোমাকে হতে দিলে তো? আমি বললাম।

আমার গলাটা বোধহয় অসহায় অপরাধীর মতো শোনাল।

কেন দেবেন না? আমার জীবন আমার। তা নিয়ে আমার যা-খুশি করার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু কেন? হবে কেন? কার উপরে অভিমান করে হবে?

এমনিই। আমার নান্দের জীবন ছোটবেলা থেকেই ভাল লাগে। ওঁদের পোশাক থেকে আরম্ভ করে সব-কিছু। ওঁদের সকাল থেকে রাত অবধি এমনই কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয় যে, ওঁদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা একবারও মনে আসে না। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার মতো এত ভাল প্রফেশান কিছু নেই।

লোকের সেবা করব, পীড়িতকে দেখব, নিজেকে সকলের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে দেব। তখন মনে হবে, আমাকে ভেঙে ভেঙে অপরিচিত অনাত্মীয়দের দেবার জন্যেই বুঝি আমি এসেছিলাম। একদিন এমনি করে হয়তো ভুলে যাব যে, আমার নিজের কিছু পাওয়ার ছিল কারও কাছে। একদিন এমনি করে নিজেকেই ভুলে যাব।

তারপর আরও বলল, জানো রাজাদা, জীবনে যখন পুরোপুরিভাবে নিজেকে এবং অন্য কাউকে পাওয়া হল না, তখন নিজেকে অখণ্ড রেখে লাভ নেই। নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে দেওয়াই ভাল। তাতে আমারও লাভ, যাদের তা দেবো, তাদেরও। আমার কোনও অখণ্ড সত্তা থাকবে না।

আমি বললাম, অত সোজা নয়। তুমি যেভাবে মানুষ হয়েছ, পারবেই না অমন কষ্ট করতে। ভাল বুঝি সোজা?

পারব না? বলে রুমা এক অদ্ভুত হাসি হাসল। বলল, পারব না কেন? জন্ম থেকে বড়লোকদের মধ্যে থেকেছি, বড়লোকের মেয়ে হিসেবে মানুষ হয়েছি এবং সে জন্যেই বড়লোকি বা আরামের উপর আমার কোনও মোহ নেই। যারা বড়লোক নয়, অথচ যাদের বড়লোক হবার খুব ইচ্ছা, তারাই হয়তো বড়লোকির বহিরঙ্গ রূপের দিকটাই বড় করে জানে। তারা অন্তরঙ্গ রূপটার খোঁজ রাখে না। সত্যিকারের যে মানুষ, সে মানুষই থাকে, সব অবস্থাতেই থাকে। আরাম, অবসর বা বিলাস কিছুতেই তার ভিতরটাতে মরচে ধরাতে পারে না। যারা মানুষ নয়, তাদের মধ্যেই ঘুণ ধরে, মধ্যের সার পদার্থটা ছিল না বলে তাদের থাকে না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার তো মনে হয়, আমি সবই পারব। আমার একটুও কষ্ট হবে না। শারীরিক কষ্টটা আবার কষ্ট নাকি?

আমি বললাম, তোমাকে আমি তা হতে দেব না।

রুমা খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর গালে টোল পড়ল। আলোর মধ্যে বসে ওকে দেবীর মতো দেখাচ্ছিল।

www.BanglaBook.org

ও বলল, ঈস্, ভারী তো আমার গার্জেন এসেছেন ? আমার কষ্টের কথা ভেবে তো ঘুম হচ্ছে না ?

পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে রুমা বলল, যে কষ্টটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটাই বুঝি কষ্ট, একমাত্র সেটাই চোখে পড়ে, আর যে কষ্ট দেখা যায় না বা বোঝা যায় না, সেটা বুঝি কিছু নয় ?

আমি কথা বললাম না। চুপ করে রইলাম।

অনেকক্ষণ পর বললাম, জানি না রুমা।

রুমা ঝগড়ার গলায় বলল, জানো না তো তর্ক কোরো না আমার সঙ্গে। আমি যা করব ঠিক করেছি, তা করবই। কারও কথাই আমি শুনব না।

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল।

রুমা বলল, খাও।

একটু পরে বলল, খুব ভাল লাগল জানো, আজকে অনেকদিন পর। তোমার সঙ্গে বেশ অনেকক্ষণ কাটানো গেল। জানো, আমার ট্রেনিং-এর পর কোথায় পোস্টিং হবে ?

কোথায় ?

রাঁচি থেকে পনেরো-ষোলো মাইল দূরে মান্দার বলে একটা জায়গায় আমেরিকান মিশান হসপিটালে। তুমি গেছ কখনও ?

না। যাইনি।

যদি ও-পথে কখনও যাও, যেতে তো পারো বেড়াতে, নেতারহাট কি কোথাও, দেখা করে যেয়ো আমার সঙ্গে। আমার খুব ভাল লাগবে। বুলবুলিকেও নিয়ে এসো।

আমি রেগে উঠলাম। বললাম, আবার ওই নাম !

রুমা হাসল। বলল, এটা তোমার বাড়াবাড়ি হচ্ছে। পাগলদেরও লুসিড্ ইন্টারভ্যাল থাকে। তারপরই বলল, কোনও ভয় নেই রাজাদা, তুমি যাকে এমন করে চাও, সে কি তোমাকে ফেরাতে পারে ? তুমি দেখো আমি যা বলছি তা ঠিক কি না। মিথ্যেই রেকর্ডটা ভাঙলে। বলে ও এক অদ্ভুত হাসি হাসল।

খাওয়া-দাওয়ার পর রুমা বলল, চলো এবার উঠি। বাড়ি গিয়ে মাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

রুমা বলেছিল ওর গাড়ি নিয়েই বাড়ি অবধি যেতে।

কিন্তু ওদের বাড়ির কাছাকাছি গেল, বাস ধরব বলে আমি নেমে গেছিলাম গাড়ি থেকে।

বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়েছিলাম।

রুমা অনেকক্ষণ অবধি গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে চেয়েছিল।

তারপর এক সময় গাড়িটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা তীব্র অপরাধবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে মর্মান্তিকভাবে পীড়িত করে ফেলল।

রুমার কাছে নিজেকে বড় ছোট, স্বার্থপর ও অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হল।

আমি মাথা হেঁট করে বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বাস আসছিল না।

আকাশে মেঘ করেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। খড়কুটো ধুলো-বালি উড়িয়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে।

বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হল, আজ আমার জন্যে কোনও বাসই আসবে না। সমস্ত রুটের বাসই বাতিল করে দিয়েছেন কোনও শক্তিমান কেউ, যাতে আমি কোথাও কখনও না যেতে পারি ; কোনও গন্তব্যেই যাতে পৌঁছতে না পারি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অফিসে বসে এক ফার্মের গুডউইলের ভ্যালুয়েশান করছিলাম, এমন সময় ফোনটা বাজল।

অপারেটার বলল, আপনাকে একটি মেয়ে ফোন করছেন।

আমি যেন খুবই বিরক্ত হয়েছি এমন গলায় বললাম, নাম কী?

নাম বলছেন, দীপা।

আমি বললাম, ইয়েস্।

ওপাশ থেকে দীপা বলল, বাজোদা!

আমি বললাম, বলছি।

আমি দীপা বলছি।

বলো। কী ব্যাপার!

দীপা হাসল একবার। তারপর বলল, আপনি বুলবুলিদিকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন?

মনে মনে ভীষণ চটে গেলাম। মনে মনেই বললাম, হোপলেস্! চিঠি দিয়েছি তো কী? সে চিঠির কথা ওকেও কি বলতে হবে? আরও কতজনকে বলেছে তা কে জানে?

বললাম, হ্যাঁ দিয়েছিলাম।

বুলবুলিদি বলতে বলল যে, বুলবুলিদি ভাল চিঠি লিখতে পারে না বলে চিঠি লেখেনি।

বুঝলাম! আমি বললাম।

ও আবার বলল, বুলবুলিদি বলতে বলল যে, পরশুদিন ওর একটা প্রোগ্রাম আছে; ও ওখানে যাবে রাত সাড়ে সাতটায়, আপনি কি ওর সঙ্গে ওখানে দেখা করতে পারবেন?

আমার হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল! বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল।

বাঁ হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে বললাম, পরশুদিন আমার অনেক কাজ! এক্ষুনি বলতে পারছি না। ভেবে দেখব।

তারপর বললাম, তুমি কাল এই সময় আরেকবার ফোন কোরো। যেতে পারব কি না জানাব।

ও বলল, আচ্ছা। তারপর বলল, আসলে কী জানেন? বুলবুলিদি বলেছে ব্যাপারটা খুব জরুরি।

বললাম, তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার কাজ আছে। বোলো যে খুব চেষ্টা করব।

তারপর দীপা আবার বলল, আপনি ভাল আছেন?

হ্যাঁ। তুমি ভাল আছ?

ভাল। ছাড়ছি, কেমন?

আচ্ছা।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

এক গ্লাস জল খেলাম। তারপর নিজেকে বললাম, কেমন দিলাম? কাজ আছে না ছাই! তবে সেও ভেবে মরুক। আমাকে যেমন একদিন ভাবিয়ে মেরেছে। সেও একদিন তেমন করে নরকযন্ত্রণা পাক। সাত-সাতদিন একেবারে চুপ! কী রকম দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোক যে সে! ভেবেই পেলাম না।

আবার মনোযোগ দিয়ে গুডউইল ভ্যালুয়েশান করতে লাগলাম। আমার এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোনও লোকের প্রতি, একজনের প্রতিও কোনও ব্যাড-উইল নেই। সকলের প্রতিই আমার গুডউইল। আমি এই মুহূর্তে আগা খান হয়ে গেছি! পৃথিবীর সব লোককে আমি আমার মনের যত সোনা আছে, সেই সোনায় ওজন করে তাদের দিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু কী আশ্চর্য দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মেয়ে সে! জীবনের একটা অন্যতম বড় সিদ্ধান্ত সে কিনা নিজে নিতে পারল না, মানে, জানাতে পারল না। চিঠিতে লিখতে পারলাম না তো একটা ফোন করতে কী ছিল? এতই যদি লজ্জা তো আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোবে কী করে? আমি আদর করতে গেলে তো লজ্জায় মরেই যাবে সে।

এমন যে হতে পারে তা আমার ভাবনার বাইরে ছিল।

www.BanglaBook.org

ষাট সেকেন্ডে মিনিট, ষাট মিনিটে ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় দিন। কিন্তু আমার মনে হল, এক একটা দিনের এত লম্বা হওয়ার কোনওই প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবী বুঝি সূর্যকে এর চেয়ে অনেক কম সময়ে পরিক্রমা করতে পারত। এত বড় একটা চব্বিশ ঘণ্টার দিন করার কোনও মানেই হয় না।

তবুও, যত ভারীই হোক, সব দিনই কাটে এক সময় ; কাটে সব রাত।

দেখতে দেখতে পরশু দিন এসে গেল।

সেদিন আমার সকাল থেকে খিদে ছিল না। দু-দু'বার গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে অফিসে পৌঁছলাম।

অফিসে সেদিন যে কাজ করেছিলাম, যে-সব ভাউচার দেখেছিলাম, তার মধ্যে কত যে ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেল তা এক ভগবানই জানেন।

যে পার্টনার এই ব্যালান্স শিট সই করবেন তার লাইসেন্স বাতিল হতে বাধ্য। কিন্তু কী করা যাবে— আমি নিজেও যে বাতিল হতে বসেছিলাম। বাতিল হতে হতে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবার মুহূর্তে আমার সামনে একটা হাজারদুয়ারী বাড়ির সব ক'টা জানলা-দরজা খুলে গেল। ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠল ঘরে ঘরে। কে যেন হংসধ্বনির সুর লাগিয়ে কোনও স্নিগ্ধ সুখের বিধুর বেহালা বাজাতে লাগল।

এখন আমার অন্যের কথা ভাবার সময় নেই। জীবনের কোনও একটা সময়ে কারওরই স্বার্থপর হওয়া দোষের নয়, অন্যায়ের নয়।

নিজেকে তাই বোঝালাম।

অফিস থেকে ফিরে চানটান করে আলমারী খুলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার বুলবুলির সঙ্গে অভিসার। জীবনের প্রথম অভিসার।

ভাল করে সেজে না গেলে সে ভাববে কী ?

একটা ব্রিক-কালারের হাওয়াইয়ান-শার্ট বের করলাম। সঙ্গে সাদা কর্ডের একটা ট্রাউজার।

আমার ভাল জামা-কাপড় ছিল না, কারণ, কখনও আমি জামা-কাপড়ে বিশ্বাসী ছিলাম না। মনে করতাম, পুরুষ মানুষের পরিচয় তার গুণে, তার কাজের মধ্যে। তাকে মেয়েদের মতো সাজলে খারাপ লাগে।

কিন্তু আজকের যে সাজ সে তো আমার জন্যে নয় ; অন্য একজনের ভাল-লাগার জন্যে। তার জীবনে আমার এই আজকের চেহারাটাই আঁকা থাকবে চিরকাল, যতদিন সে বাঁচবে। যখন তার চুল পেকে যাবে, দাঁত পড়ে যাবে, তখনও কোনওদিন পিছন ফিরে চাইলে সে দেখতে পাবে যে, ব্রিক-কালারের হাওয়াই-শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরা একটি অল্পবয়সী ছেলে তার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে পৃথিবীর সব প্রেম, সব বিস্ময়, সব ভালবাসা নিয়ে তার দিকে সে তাকিয়ে আছে।

দীর্ঘ জীবনের আবিল আবর্তে, একঘেয়েমির নোনাজলে, ভুল বোঝাবুঝিতে অন্য সব কিছু হয়তো ঘোলা হয়ে যাবে, ফ্যাকাসে হয়ে যাবে একদিন, তবু যখনি আমার বুলবুলি পিছন ফিরে চাইবে— তার সমস্ত স্মৃতি জুড়ে, তার মস্তিষ্কের সমস্ত কোষ জুড়ে আমার এই আজকের শর্তহীন ভালবাসার চেহারাটাই ফুটে উঠবে।

অন্য কেউ, অন্য কোনও বোধ, অন্য কোনও শক্তি আজকের এই আনন্দঘন সন্ধ্যার স্মৃতিকে কখনও ম্লান করতে পারবে না তার মনে। যেদিন আমার এই শরীর চিতায় ছাই হয়ে যাবে, সেদিনও না।

ঘড়ি দেখে সময় মতো দু-নম্বর বাসে উঠে বসলাম।

আজকের এই বিশেষ দিনে বাবার কাছে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে একটা গাড়ির চাবি চাইতে পারতাম।

কিন্তু ইচ্ছে হল না।

আজ তার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনে বাবার গাড়ি চড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাব এ আমার মনঃপূত হল না। সে আমাকে, এই কাঙাল রাজাকে দেখুক আমার ধুলোমাখা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়। আমার নিজের পটভূমি, আমার নিজের বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ সব সে স্বচ্ছভাবে দেখুক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তো নামজাদা অ্যাকাউন্ট্যান্ট ব্রজেশ রায়ের ছেলে হিসেবে তার কাছে যাচ্ছি না ! আমি যে যাচ্ছি দেড়শো টাকা মাইনে পাওয়া, মাথা-ভর্তি পাগলামির পোকাভরা একজন নিছক সাধারণ ছেলে হয়ে। সে আমাকে ভাল লাগে কি না দেখুক, আমাকে জানুক, আমার জন্যে সে তাকে সমস্ত শর্তহীনতায় উৎসর্গ করতে পারি কি না পারে, ভেবে নিক।

আমি তাকে কোনও বড় বড় বুলি বলিনি, বলবও না। কোনও মিথ্যা সম্মান বা বিত্তর লোভ তাকে দেখাব না। আজ আমি যা, আমি তা-ই।

কখনও কোনওদিন যদি নিজের দাবিতে বড় হই, তখন তো সে আমার পাশে থাকবেই। আমার সম্মান, আমার সব তো তারই হবে।

কিন্তু আজ যে তাকে ভীষণ ভীষণ ভীষণভাবে ভালবাসা ছাড়া দেখাবার মতো, দেবার মতো, তার মনে চমক তোলার মতো আমার কিছুই নেই। আমি অমুকের ছেলে তমুক, আমি ফেলুড়ে, আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ওসব জেনেশুনেই ও আমার ভাঙা বাঁশের খাঁচায় আসুক। ওকে আমি সোনার খাঁচার লোভ দেখাব না।

বাসটা ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজারের সামনে এসে দাঁড়াল।

একটা ভিখারি মেয়ে রোজই এই স্টপেজে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চায়। প্রতিদিনই সে জানালা দিয়ে হাত বাড়ালে বিরক্ত হই। হাত তোলা অবস্থায় তার ঝুলে-পড়া বুক, নোংরা বগল দেখা যায়, বমি বমি লাগে আমার। রোজই ওকে দেখলেই বমি বমি পায়।

আজও মেয়েটা এসে হাত বাড়াল।

যা কখনও কোনওদিনও হয়নি, আজ তাই হল। তাকে দেখেই মনটা আমার সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়ে গেল।

আজ বিকেলে চান করবার সময় থেকেই মাথার মধ্যে মেহেরদির গাওয়া মালকোষের সুর ঘুরপাক খাচ্ছিল। আনন্দধারা আজ ভুবনময় বয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি আজকে রাজা, আরও বেচারি কেন ভিখিরিই থেকে যাবে ? আজকে যে আমার ওর নোংরা হাতের আশীর্বাদেরও প্রয়োজন।

আমি হিপ্‌পকেট থেকে পার্স বের করে একটা টাকা দিলাম।

ও অবাক হয়ে রামের সুমতির কারণ খুঁজতে লাগল। ও এত অবাক হল যে, আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া বা আমাকে উদ্দেশ্য করে হাত মাথায় ঠেকাতেও ভুলে গেল।

বাসটা ছেড়ে দিল।

মাথার মধ্যে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে জোর ভল্যুমে কোনও অদৃশ্য স্টিরিও রেকর্ড-প্লেয়ারে বাজতে লাগল।

ধর্মতলার মোড়ে বাস থেকে নেমে ইডেন গার্ডেনস্-এ রেডিও স্টেশনে হেঁটে গেলাম। মাসের শেষ। বেশি টাকা সঙ্গে নেই। ঠিক করেছিলাম, বুলবুলিকে সঙ্গে করে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেব ট্যাক্সি করে।

ভিজিটার্স রুমে এসে বসলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওর প্রোগ্রাম শুরু হতে এখনও মিনিট পাঁচেক দেরি আছে।

তখন সমস্ত প্রোগ্রামই লাইভ-ব্রডকাস্ট হত, এখনকার মতো টেপ করার বন্দোবস্ত ছিল না তখন। ও নিশ্চয় স্টুডিওতে চলে গেছে।

আমি বার বার ঘড়ি দেখছিলাম।

কে একজন কী গান গাইছিলেন। ভিজিটার্স রুমের রেডিওটা এত জোরে বাজছিল যে কানে লাগছিল।

ওই গান শেষ হতে না হতে, বুলবুলির নাম বললেন অ্যানাউন্সার।

বুলবুলি প্রথমে গাইল,

"ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কী তোমার চাই।

www.BanglaBook.org

ওগো ভিখারি আমার ভিখারি,
চলেছ কী কাতর গান গাই' !"

সেই গান শেষ হলে গাইল—

"তোমায় নতুন করে পাব ব'লে
হারাই ক্ষণে-ক্ষণ,
ও মোর ভালবাসার ধন।"

পৃথিবীর কোনও ভি-আই-পিও আজ অবধি বোধহয় এতখানি ইম্‌পরট্যান্স পাননি, আজ আমি যতখানি পেলাম।

আজকের গান ও নিজে বেছেছিল কি না জানি না। নিশ্চয়ই নিজেই বেছেছিল। নইলে আমি যখন ভিজিটার্স রুমে তীর্থের কাকের মতো ওরই জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি, ঠিক সেই সময়ই বিশেষ করে এ দু'খানি গানই ও গাইত না!

গান শেষ হলে, আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগলাম।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসে, ডিউটি-রুম থেকে চেক নিয়ে এখানে আসতে ওর কতখানি সময় লাগতে পারে মনে মনে তার হিসেব করছিলাম।

আমি এতক্ষণ হাঁ করে দরজার দিকেই তাকিয়েছিলাম।

পরক্ষণেই মনে হল, ও এসে ওর প্রতীক্ষায় হাঁ করে আমাকে চেয়ে থাকতে দেখলে ওর গর্ব আরও বেড়ে যাবে। তাই আমি মুখ ঘুরিয়ে যেদিকে ঘরের কোণায় রেডিও সেটটা রাখা ছিল, সেদিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। যেন তাৎক্ষণিক আধুনিক গানে আমার মন একেবারে ডুবে আছে; এমন ভাব করে।

ঘরে আর কেউ ছিল না তখন।

হঠাৎ চোখের কোণে দেখতে পেলাম দরজায় একটি ছায়া পড়েছে। আমি তবুও তাকালাম না।

রিনরিনে মিষ্টি গলায় কে যেন বলল, এই যে! আমি এসেছি।

আমার সমস্ত মস্তিষ্কময় সেই রিনরিনে মিষ্টি গলা বাজতে লাগল, "আমি এসেছি; আমি এসেছি, আমি এসেছি।"

আমি মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়েই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম।

দরজায় আমার এত আনন্দের, এত কষ্টের, এত কল্পনার বুলবুলি দাঁড়িয়েছিল।

হাতি-হাতি কাজ করা বেগুনি আর কালোতে মেশা একটা সম্বলপুরী সিল্কের শাড়ি পরেছিল সে, গায়ে কালো সিল্কের ব্লাউজ। হাতে চামড়া-বাঁধানো একটা গানের খাতা। তার সঙ্গে বুকের কাছে ধরা একটা গীতবিতান। গ্রীবার পেছনে একটা মস্ত খোঁপা হেলানো রয়েছে। পায়ে কালো চটি। কপালে ম্যাড্রাসী সিঁদুরের বেগুনি টিপ।

বুলবুলি দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। হাসলাম। তারপর ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।

সেই মুহূর্তে স্টেজে উঠলে যেমন আমার বরাবর হয়, সেই ভয় আর ভাবনাটা মাথার মধ্যে ফিরে এল।

হাত দুটো কোথায় রাখব?

আমরা দু'জনে কেউ কোনও কথা বললাম না অনেকক্ষণ।

রেডিও স্টেশনের লম্বা করিডোর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

আমরা যে কোনওদিনও পাশাপাশি হব, এমন পাশাপাশি হাঁটতে পারব একে অন্যের একান্ত কাছের মানুষ হয়ে, তা বোধহয় ওর কাছে এবং আমার কাছেও অবিশ্বাস্য ছিল।

আমি যেন কেমন বোকার মতোই বললাম, কোথায় যাওয়া হবে?

ও তোতলামি করে বলল, কো-কোথাও গিয়ে বসলে হয়!

www.BanglaBook.org

কোথায় ? আমি বললাম, নার্ভাসনেস কাটিয়ে উঠে।

ও আবার তুতলে বলল, যে-যেখানে হয় !

আমরা গঙ্গার ধারের দিকে হেঁটে গিয়ে মাঠের মধ্যে বসলাম।

আমি বললাম, বলো।

কী বলব ?

আমার চিঠির উত্তর তো দাওনি এখনও।

ও মুখ নিচু করে ছিল।

এক পলকের জন্যে মুখ তুলে বলল, উত্তরটা কি আমার বলার উপর নির্ভর করেছিল ? উত্তর কি আপনি জানতেন না ?

ওর সপ্রতিভতা দেখে আমার নিজেকে অপ্রতিভ লাগল।

বললাম, না। তবুও এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তুমি কি ভাল করে ভেবেছ ? এ ক'দিনে কি যথেষ্ট ভাবার সময় পেয়েছ ? যদি না পেয়ে থাকো আরও সময় নাও। তাড়াতাড়ি কোরো না। যতদিন খুশি সময় নাও।

কথাটা বলে ফেলেই, মনে মনে নিজেকে নিজে বললাম, ঈস্, ব্যাটা যেন নবাবপুত্তুর। এ ক'দিনেই তো খাবি খেয়ে মরছিলে, এখন ভারী সময় দেনেওয়ালা হয়ে গেছে !

ও বলল, ক'দিনমাত্র কেন ? অনেক আগে থেকেই ভেবেছি। আপনার চিঠি পাবার অনেক আগেই ভাবাভাবি শেষ হয়ে গেছিল।

আমি আনন্দে ঝলমল করে উঠলাম, বললাম, তা হলে আমাকে এতদিন এত কষ্ট দিলে কেন ? আমাকে জানালে না কেন ?

ও অবাক হল। মুখ তুলে বলল, বাঃ, আমি কী জানাব ? আমি তো মেয়ে ! পুরুষ হয়েও আপনার যদি এত সংকোচ, এত লজ্জা তো আমার তো লজ্জা করত না ? আপনি নিজে কবে বলবেন, সেই অপেক্ষায় ছিলাম।

ও ! বললাম আমি।

তারপর বললাম, বাসন মেজে খেতে পরতে তো প্রয়োজন হলে ?

ও হাসল ; বলল পারব ! সত্যিই বলছি, পারব। দেখবেন, পারি কি না ! প্রয়োজন হলে সব পারব।

বললাম, আমি যদি পরীক্ষা পাস না করতে পারি ?

ও কথাটাকে আমলই দিল না ! শুধু বলল, পারবেন। নিশ্চয়ই পারবেন।

তারপরই বলল, আপনাকে খুব বড় হতে হবে কিন্তু ! আমার যেন খুব গর্ব হয়, আপনার জন্যে।

আমি বললাম, জানি না। শুধু কথা দিতে পারি যে, চেষ্টা করব।

তারপর বললাম, তুমি তো এখনই বড়।

ও প্রতিবাদ করল ! বলল, কী যে বলেন ! এখনও কত বছর গান শিখতে হবে। এখন তো সবে শিখছি।

আমি বললাম, মোটেই না। তুমি এখনই বেশ বড়।

ও বলল, ভুল। কোনও কিছুই তাড়াতাড়ি করলে হয় না।

তারপর বলল, এখনও গানের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি আমাকে গান গাইতে দেবেন তো ?

আমি অবাক হলাম ; বললাম, নিশ্চয়ই ! গান গাইতে দেব না তোমাকে ?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তুমি কিন্তু আমার চেয়ে অনেক ভাল ছেলেকে বিয়ে করতে পারতে। সেদিন বৌদির কাছে শুনছিলাম, তোমাকে পাবার জন্যে কোন রাজপুত্র নাকি আসছেন স্টেটস্ থেকে মেটালার্জিতে ডক্টরেট করে ? সেরকম নাকি ছেলে আর হয় না ? সত্যি ?

সত্যি ! ও বলল।

আমি বললাম, কী সত্যি ?

www.BanglaBook.org

ও বলল, আসছে যে সেটা সত্যি। এবং ছেলেও খুব ভাল।

তোমার জন্যেই আসছে, না ?

সেটাও হয়তো সত্যি।

তবে ? তার জাহাজ তো বম্বেতে পৌঁছল বলে !

ও বলল, পৌঁছবে না।

আমি বললাম, তার মানে ?

জাহাজটা ডুবে যাবে। ভরাডুবি হবে, যে আসছে তার। বলেই বুলবুলি মুখ তুলে হাসল।

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, আমি কিন্তু খুব রাগী ; জানো তো ?

ও হাসল। বলল, ছেলেদের একটু রাগ থাকা ভাল ; নইলে ছেলে-ছেলে মনে হয় না।

তারপর বলল, আমার খুব কম লোককেই ভাল লাগে। আমার বাবা বেঁচে থাকতে আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন, খুকির যেমন নাক উঁচু, ওর কাউকেই যখন পছন্দ নয়, তখন ওর বিয়ে দেব না।

তোমার বাবা বুঝি তোমাকে খুব ভালবাসতেন ?

খু—উ—ব।

বলতেই বুলবুলির গলা ভারী হয়ে এল। বলল, বাবার মতো ভালবাসতে খুব কম লোক জানতেন। ওরকম করে সকলকে ভালবাসতে আমি কাউকে দেখিনি। বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তো সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন।

সেই মুহূর্তে ময়দানের অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে বুলবুলির দিকে চেয়ে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

মনে মনে বললাম, বুলবুলি, তুমি দেখো, তোমাকে আমি এত আদর করব, এত ভালবাসব যে, বাবার কথা মনে পড়বে তোমার। তুমি দেখো, তোমাকে আমি তোমার বাবার মতো করে ভালবাসব। তোমাকে এতটুকু কষ্ট দেব না, আঁচড় লাগতে দেব না তোমার গায়ে ; তোমাকে এত আরামে রাখব, তুমি দেখো।

কিন্তু মুখে কিছু বলা হল না।

আমি চুপ করে বুলবুলির দিকে চেয়ে রইলাম।

ও হঠাৎ বলল, এখন উঠলে হয় না ? জায়গাটা বড় নির্জন।

বললাম, উঠবে ? আচ্ছা চলো, আমরা পার্ক স্ট্রীটে যাই। সেখানে 'ম্যাগনোলিয়া'য় কিছু খেয়ে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব ; কেমন ?

বুলবুলি বলল, আপনি যা বলবেন।

একটা ট্যাক্সি ধরলাম।

বললাম, ওঠো।

ও বলল, আপনি আগে উঠুন।

ম্যাগনোলিয়ার সামনে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে ওকে নিয়ে ভিতরে গেলাম।

কোণার দিকে নিরিবিলি জায়গা দেখে বসলাম।

আমি বললাম, কী খাবে বলো ?

ও বলল, আমি শুধু একটা ফ্রেশ-লাইম খাব।

আর কিছু না ?

না।

কেন ?

খেতে ইচ্ছে করছে না।

কেন ইচ্ছে করছে না ?

বুলবুলি চোখ নামিয়ে নিল ; বলল, জানি না। এমনিই।

অন্ধকার থেকে এসে আলোয়-ভরা রেস্তোরাঁয় সামনাসামনি বসে আমারই একান্ত, আমার বুলবুলিকে ভাল করে দেখলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী ভাল যে দেখতে বুলবুলি ! কী দারুণ ফিগার ; কী সুন্দর করে সেজেছে !

কত বড় হয়ে গেছে ও এক বছরে ।

এই তন্বী সুগন্ধি যুবতীর সঙ্গে কোনও মিল নেই সেই রিহার্সালে প্রথম দেখা ছোট ছিপছিপে মেয়েটির ।

ফ্রেশ লাইম দিয়ে গেল বেয়ারা ওর জন্যে । আমার জন্যে কফি ।

ফ্রেশ লাইমের পাশে একটা স্ট্র-ভর্তি কাগজের বাক্স বসিয়ে দিয়ে গেল ।

বুলবুলি একটা স্ট্র বের করে ফ্রেশ লাইমে ডুবিয়ে চুমুক দিতে যেতেই স্ট্রটা ভেঙে গেল ।

আরেকটা স্ট্র নিল ও ।

আমি মুখ নিচু করে কফিতে চুমুক দিলাম ।

ও নিজে হাতে, কাঁকন বাজিয়ে, কফি ঢেলে দুধ ও চিনি মিশিয়ে কফি বানিয়ে দিয়েছিল ।

একটু পরই হুঁশ হল, ও প্রায় দশ-বারোটা স্ট্র ভেঙে ফেলেছে ।

তখনও ক্রমান্বয়ে স্ট্র ভাঙছে ; মোটে ফ্রেশ লাইমে চুমুকই দিতে পারছে না ।

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, কী হল ?

বুলবুলি খুব লজ্জা পেয়ে বলল, ভেঙে যাচ্ছে ।

কেন ? আশ্চর্য হয়ে বললাম আমি ।

আবার শুধোলাম, এতগুলো ভাঙল কী করে ?

পরক্ষণেই দেখি, বুলবুলির ডান হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে ।

আমি বললাম, ও কী ? তোমার কী হয়েছে ? তোমার হাত কাঁপছে কেন ? তোমার হাত কি কাঁপে ?

না তো ! কখনও তো কাঁপে না এমন । জানি না, কী হয়েছে । লজ্জা পেয়ে বুলবুলি বলল ।

তারপর আতঙ্কগ্রস্ত গলায় বলল, এটা কি কোনও অসুখ ?

আমি বুলবুলির চোখের দিকে অপলক চেয়ে রইলাম ।

একটা আশ্চর্য নরম ধরা-পড়া সমর্পণী হাসি ওর মুখময় ছড়িয়ে গেল ।

ও বলল, বিশ্বাস করুন, সত্যিই জানি না, কী হয়েছে আমার । এমন কখনও হয় না কিন্তু, কখনও হয়নি আগে, কোনওদিনও না ।

আমার মুখেও এক দারুণ দারুণ দারুণ সুখের হাসি ফুটে উঠল ।

আমি ওর চোখ থেকে চোখ সরালাম না ।

ওই আলোকিত স্বর্গে ধরে, আমার প্রথম প্রেমিকা, আমার ভাবী স্ত্রীর আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে সেই উৎসারিত আনন্দের উষ্ণতার মধ্যে হঠাৎ এক দারুণ শীতার্ত ভয়ে আমার গা ছমছম করে উঠল ।

আমার হঠাৎ মনে হল, চিরদিন, আজীবন তোমাকে আজ যেমন করে ভালবাসি তেমন করে ভালবাসতে পারব তো ? তুমি আমার সামনে বসে আজ যেমন করে সজনে পাতার মতো ভাল-লাগায় কাঁপছ, চিরদিনই কি তেমন করে কাঁপবে তুমি, বুলবুলি ? যদি না... । না যদি... ।

বুলবুলি কথা বলছিল না কোনও ।

আমার দিকে একদৃষ্টে এক আশ্চর্য উজ্জ্বল অথচ নরম চোখে ও চেয়েছিল ।

যেমন চোখে কাউকে ভীষণ ভালবেসে একমাত্র মেয়েরাই চাইতে পারে ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিন্যাস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১

অনেক বছর আগের এক গরমের দুপুরবেলায় আমার ঘরে বসে বসে স্কুলের পড়া করছিলাম। এমন সময় ভেজানো দরজা কে যেন আলতো হাতে ঠেলল।

পিছন ফিরে দেখি, রাম। হাতে একটা মানি-অর্ডার ফর্ম।

আমার টেবিলের কাছে এসে অনুনয় করে বলল, লিখে দেবে দাদাবাবু?

আমি বই সরিয়ে রেখে বললাম, বল।

ও গড়গড় করে বলে গেল। দশরথ সাই। সাকিন নুয়াকোট। পুস্টাপিসো রুকুঝাকা, জিলা কট্টক।

পরে এই ঠিকানা আমার মুখস্থ হয়ে গেছিল। কম করে কুড়িবার আমি ওই ঠিকানা লিখেছি মানি-অর্ডার ফর্মে। তখন তিরিশ টাকা করে পাঠাত ও প্রতি মাসে ওর বাবাকে।

আমার মানি-অর্ডার লেখা হয়ে গেলে দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে ও হেঁটে যেত পোস্ট অফিসের দিকে। টাকাটা পাঠিয়ে, তারপর এক খিলি অখয়েরি জর্দা মোহিনী পান খেয়ে, সুপুত্রের কর্তব্য করার আনন্দে আনন্দিত হয়ে ফিরে আসত।

মানি-অর্ডার ফর্ম ভরতে ভরতে কল্পনা করতাম যে, সেই মুহূর্তে সুদূর উড়িষ্যার কোনও ছায়া-ঘেরা, ঘুঘু-ডাকা গ্রামে দাওয়ায় ঠেস দিয়ে বসে রামের বাবা দশরথ তার কলকাতাবাসী বড়ছেলের পাঠানো কটা টাকার জন্যে চাতকের মতো প্রার্থনা করছে।

দশরথ সাই-এর কাছে তিরিশ টাকা যে অনেক টাকা!

আমি আর রাম প্রায় সমবয়সী ছিলাম। কত বয়স হয়েছে জিজ্ঞেস করলে ও বলত, যে বার নদীতে দারুণ বন্যা হয়েছিল এবং গ্রামের কারও খেতেই কলাই ফলেনি, সেবার ও জন্মেছিল।

পনেরো বছর বয়সে কী করে তার এক গ্রামের মেসোর সঙ্গে বিনা টিকিটে ভাগ্য অন্বেষণের চেষ্টায় রাম কলকাতার হাওড়া স্টেশনে এক সকালে এসে পৌঁছেছিল, তা রামের আজ প্রায় মনেই পড়ে না। সেই গ্রামতুতো মেসোর দাদা ছিল প্লাম্বার মিস্ত্রি। ভবানীপুরের বস্তিতে তার ঘর। সেই ঘরের মাটির মেঝেতে একমুঠো মুড়ি ও কলের জল খেয়ে কলকাতার প্রথম রাত কাটিয়েছিল ও।

তারপর এ বাড়ি সে-বাড়ি অনেক বাড়ি ঘুরে আমাদের বাড়িতে এসে জোটে। আমাদের বাড়ি বলতে বড়মামার বাড়ি। আমার যখন আড়াই বছর বয়স তখন আমার বাবা মারা যান প্লেন ক্র্যাশে। বাবা আর্মির অফিসার ছিলেন। তারপর থেকে মার সঙ্গে বড়মামার বাড়িতেই মানুষ। বড়মামার এক ছেলে ও এক মেয়ে। কাজলদা আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়, আর রুমি আর আমি প্রায় সমবয়সী। কাজলদা আমেরিকায় আছে বহুদিন। রুমি এখন দিল্লিতে মিরান্ডা হাউসে পড়ে। ওখানেই থাকে হস্টেলে।

রাম প্রথম যেদিন আমাদের বাড়িতে এল সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি নিচু ক্লাসে পড়ি। আমার বাড়ির সামনে বিঘাখানেক জায়গাতে সবুজ লন ছিল। মামা সবে বাড়ি শেষ করেছেন। তখন লনের পরিচর্যা ও লনের চারপাশে গাছ-গাছালি লাগানো হচ্ছে। আমাদের মালির নাম ছিল বাইধর। সে রোজই বলত যে, সে একা একা এত কাজ আর করে উঠতে পারছে না।

www.BanglaBook.org

তার একজন সহকারীর বিশেষ দরকার। সেই ই একদিন রামকে নিয়ে এল :

খালি গা, পরনে গেরুয়া মাটিতে কাচা এক ফালি গেরুয়া-রঙা খাটো ধুতি। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। উঁচু উঁচু দাঁত। কু-দর্শন একটি ছেলে। চেহারায়, ব্যবহারে পুরোপুরি গ্রাম্য।

মামা ওকে প্রথম দর্শনে দেখেই বললেন, এ একটি ক্লাস ওয়ান গ্রেড ওয়ান ইডিয়ট। হাফ-উইট।

মামিমা বললেন, হাফ-উইট না হলে তোমার মতো লোকের কাছে মাসে তিরিশ টাকা মাইনেতে কাজ করতে আসবে কেন ?

মামা তাই শুনে বললেন, তা ঠিক। তবে বেশি চালাক লোকের দরকার নেই। চালাক হলে কখনও ভাল চাকর হয় না। একেই গড়ে-পিটে নেব। এ এখনও কাদা আছে। একে নিজেদের মতো করে গড়ে নিতে কষ্ট হবে না।

প্রথম দিনই বাইধর মালির সঙ্গে তার কাজে সহায়তা করছিল রাম। ও শাবল ধরেছিল, বাইধর হাতুড়ি মারছিল তার উপর। কেরালার ভোয়ার্ফ ভ্যারাইটির নারকোল গাছ পোঁতা হবে বলে গর্ত করছিল ওরা লনের এক কোণায়। এমন সময় বাইধরের ভারী হাতুড়ি স্থানচ্যুত হয়ে এসে পড়ল রামের আঙুলের উপর। দুটো আঙুল থেঁতলে গেল। যন্ত্রণায় কাতরে উঠেই তার পরম হিতার্থী চাকরি-জোগাড় করে দেওয়া তার গ্রামভুতো মেসোর উদ্দেশ্যে রাম অশ্রাব্য গ্রামজ গালাগালির তুবড়ি ছুটিয়ে দিল আত্মবিস্মৃত হয়ে।

মামিমা এবং মামা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন : ভাগ্যে তাঁরা রামের ভাষা বুঝতেন না।

রাম তিনদিন গ্যারাজ ঘরগুলোর পাশে চাকর-বাকরদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘর দুটোর একটিতে শুয়ে রইল। ডাক্তারদের দেওয়া লোশান লাগিয়ে এবং ওষুধ খেয়ে। চতুর্থ দিন থেকে ও কাজে লাগল। ওর আঙুলের কোনও হাড় বোধহয় ভেঙে গেছিল, কারণ তারপর থেকে ডান হাতে ও একেবারেই জোর পেত না।

কিন্তু তিরিশ টাকা মাইনের চাকরের হাড় যদি নিজ প্রচেষ্টাতে জোড়া না লাগে, তাহলে লাগে না। এক্স-রে করার কথা, অর্থোপেডিক্স-এর কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা আমার মামার মতো উদার লোকের মনেও তখন আসেনি।

রামের সমবয়সী ছিলাম বলে, রাম মাঝে মাঝে আমাকে বলত, আমার ডান হাতটা চিরদিনের মতো অকেজো হয়ে গেল। বলেই, ওই গ্রামভুতো মৌসাকে গালাগালি করত। তারপর বলত, সবই কপাল। গরিবের ভগবান ছাড়া আর কে আছে বল ? যার কপালে যা আছে তাই-ই হয়।

ও বার বার বলত, কপাল কেউই খণ্ডাতে পারে না।

সুস্থ হয়ে উঠেই, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই, দেখতে দেখতে রাম মামাবাড়ির একজন হয়ে গেল। দশাসই গ্রেটডেন কুকুর ভিকটরের দেখাশোনা, দুটো গাড়ি ধোওয়া, রাতে গেট বন্ধ করা, চাবি দেওয়া। যতবার গাড়ি ঢুকছে বেরুচ্ছে ততবার গেট খোলা, ঘর মোছা, ফার্নিচার, দরজা জানলা সব ঝেড়ে-পুঁছে রাখা। মামা জাপান থেকে যে সব ভাস নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো চকচকে করে রাখা, পেতলের জিনিসে ব্রাসো দেওয়া, জুতোয় কালি দেওয়া, বাগানে জল দেওয়া, মামার গড়গড়ায় তামাক সেজে দেওয়া, মামির পান সেজে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ রাম করতে লাগল।

ও নিজে কিন্তু বাড়ির পান খেত না। ওর জীবনে ওই একটি মাত্র বিলাসিতা ছিল। দোকানে গিয়ে এক খিলি অখয়েরি গুণ্ডি মোহিনী পান দুপুরে না খেলে ভাত হজম হত না ওর।

আমার বিধবা সেজমাসির স্বামী খুব বড় লোকের বাড়ির ছেলে ছিলেন। ওঁদের অনেক বাড়িভাড়া, বস্তি, বাজার ইত্যাদি ছিল। স্বামীর অকাল-মৃত্যুতে সেজমাসি অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু উনি অবস্থার কারণে নয়, একা থাকতে চান না বলেই বড়মামার বাড়িতে থাকতেন।

সেজমাসি দেওরের ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন। সেই ছেলেটিও রামের প্রায় সমবয়সীই ছিল। সে লা-মার্টিনিয়রে স্কুল-লিভিং সার্টিফিকেট নেওয়ার পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিল।

দীপ এমনিতে বুদ্ধিমান ছেলে ছিল, কিন্তু আর বেশি পড়াশুনা করল না। বলত, ফালতু বেশি পড়াশুনা করে বাঙালি গ্লেরিফায়েড কেরানি তৈরি হয়।

www.BanglaBook.org

ও সকাল ন'টায় ঘুম থেকে উঠত। দুপুরে তিনটেয় ভাত খেত, তারপর ছ'টা অবধি ঘুমোত। কোনও কোনওদিন বন্ধু-বান্ধব ডেকে তাস খেলতে বসত। অথবা সেজমাসির কালো-রঙা ব্যুইক গাড়িটা বের করে বন্ধুদের নিয়ে, পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে কোথাও-না-কোথাও বেরিয়ে পড়ত। নিজের স্বাচ্ছল্য ও নিজের অবকাশ এবং ওর নিশ্চিন্ত আয়ু নিজের মনোমত স্টাইলে খরচ করতে জানত। এইরকম মন্থর পিতৃপুরুষনির্ভর দিনকাটানোর কারণে কোনওরকম গ্লানি ও অপরাধবোধ ওকে পীড়িত করত না। ও নিজেকে বুর্জোয়া বলত, এবং তার জন্যে গর্ববোধ করত।

দীপ কখনও জোরে গাড়ি চালাত না। ধীরে-সুস্থে, রেখে-ঢেকে চেখে-চেখে টেনশানহীন জীবন উপভোগ করার এক আশ্চর্য পরিশীলিত আর্ট ও ছোট বয়সেই রপ্ত করেছিল।

বছর পাঁচেক মালির কাজ করার পরই আবিষ্কৃত হল যে, রাম জাতে ধোপা। মামাবাড়িতে জাতের বিচার কখনও ছিল না। জমাদার যে ছিল বাড়ির, বুধিয়া ; তার ছেলে গিদাই-এর সঙ্গে ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলে আমি বড় হয়েছি। গিদাই আমার অনুচর ছিল। এক থালাতে মিষ্টি খেয়েছি বরাবর। গিদাই চিরদিন আমাকে জল গড়িয়ে খাইয়েছে।

রাম জাতে ধোপা, জানতে পেরে মামিমা একদিন বললেন, তুই কাপড় কাচতে পারিস ?

রাম বলল, হ্যাঁ।

সেদিন থেকে বাড়িতে ধোপা আসা বন্ধ হল। বাড়ির সকলের জামা-কাপড় কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে রাম যার যার ঘরে গুছিয়ে রাখত। তার ফলে ধোপার খরচ বেঁচে গেল।

বাড়িতে অন্য অনেক কাজের লোক ছিল, সেজমাসিমার দেখাশোনার জন্যে আয়া। অল্পবয়সী একটি মেয়ে, নাম লক্ষ্মী। মালি, ড্রাইভার, জমাদার সকলেই ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যদের অনেকানেক কাজ রামের ঘাড়েই চাপতে লাগল। আমরা বাড়িসুদ্ধ সকলেই রামভক্ত হয়ে উঠলাম ধীরে ধীরে।

সংসারে সব জায়গাতেই এই নিয়ম। যে-বোকারা কাজ করে তাদের ঘাড়ে ফাঁকিবাজেরা কাজের বোঝা চাপিয়ে গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়ায়। রামকে পেয়ে অন্যরা তাই করতে লাগল।

চাহিদাহীন রাম সবসময়ই হাসিখুশি থাকত। কাজ বাড়লে যে মাইনে বাড়া উচিত এমন কোনও লজিক ওর জানা ছিল না। জাতে ধোপা বলে কাপড় যদি কম কাচত তবে ওর মেজাজ গরম হয়ে যেত। ও বলত, ধ্যুৎ ! খিদে হয় না। জোর করে কাপড়-জামা ছিনিয়ে নিয়ে যেত ও সকলের ঘর থেকে। মামিমা মাঝে মাঝে রাগ করতেন, বলতেন, মিছিমিছি এত সাবান খরচ করিস কেন ? বিনা দরকারে ?

কিন্তু অল্প কদিনেই রামের অপচেষ্টায় এ-বাড়ির প্রত্যেকের অভ্যেস খারাপ হয়ে গেল। সর্বনাশটা সে কারণেই। বাড়িতেও কেউ ইস্ত্রিবিহীন জামা-কাপড় পরতেন না। এমনকী রোজকার গেঞ্জি-আন্ডারওয়ার-রুমাল সব কিছু পাট পাট করে কেচে ইস্ত্রি করে ও আমাকে পর্যন্ত বাবু করে একেবারে নষ্ট করে দিল। আমা-হেন লোকেরও মনে হতে লাগল যে, সব কিছু এমন কেতাদুরস্ত না-হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

কোনও জামা-কাপড় দু ঘণ্টার জন্যে পরলেও রামের দৌরাত্ম্যে তা আবার যে পরব তার জো'টি ছিল না।

ও বলত, এ কি পরা যায় ? জামাটা যে একেবারে গেছে।

গরমের দিনেও পায়জামা, পাঞ্জাবিতে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করত ও। শোবার সময় গায়ে কাঁটার মতো বিঁধত তা। ওকে বললেও শুনত না। ওর গ্রামের চারপাশের গভীর জঙ্গলের শুয়োরের মতোই জেদি ছিল রাম। কোন কথাটা কেন বলা হয় তার কারণ বোঝার মতো মাথা ও জ্ঞান ওর ছিল না।

রাম ওর সরল বুদ্ধিতে মনে করতে লাগল যে, ওর এ বাড়িতে যতটুকু অধিকার আমার ও দীপেরও তাই—কারণ ও মামা, মামিকে এবং সেজমাসিকে নিজের মা, বাবা, পিসির মতোই ভালবাসে ; মান্যিগণ্যি করে। আমাদের জন্যে ও জীবন পর্যন্ত দিতে পারে। ওর পরম মুখামিতে ও মানতে রাজি ছিল না যে, সংসারে ভালবাসা দিলেই যে ভালবাসা ফিরে পাবে এমন নিয়ম নেই কোনও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দীপ মাঝে মাঝে তার প্রাণপ্রাচুর্যের আধিক্যে এবং করণীয় কিছু না-থাকাতে ওর পিছনে লাগত। ওকে পিছন থেকে চাঁটি মারত, জল খেতে খেতে ওর গায়ে কুলকুচি করে ফেলত। আসলে চিড়িয়াখানার গরাদবন্দি বাঘকে যেমন সাহসী জামাইবাবুরা সুন্দরী শালীদের সামনে ছাতা বা লাঠি দিয়ে খোঁচান, তেমন করে দীপ দেখত এই নিরুপায়, পরনির্ভর, দুটো ভাতের প্রত্যাশী ওর সমবয়সী মানুষটা কতখানি সইতে পারে।

খুব রেগে গেলে, একেবারে অসহ্য হলে রাম ফোঁস ফোঁস করত। দীপের নিরন্তর আদেশ এবং অবুঝ ফরমাস কখনও কখনও অমান্যও করত। তখন দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে ওকে বলত, দ্যাখ রাম, তুই চাকর, সবসময় চাকরের মতো থাকবি।

এই কথায় রাম ক্রুদ্ধ হত না ; বড় ব্যথিত, আহত হত। ও আমাদের সকলকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে যা দিত তা চাকর হিসেবে নয়। ও যা পেত তার চেয়ে অনেক বেশি দিত। কারণ ওর হৃদয় বড় ছিল। সংসারে নিতে, এবং নিক্তির মাপে মেপে নিতে পারে সকলেই ; কিন্তু বেহিসেবির মতো দিতে বেশি লোকে পারে না। ওর মা বাবা ভাই বোন সকলকে ছেড়ে-আসা সদ্যযুবক মানুষটা, ওর গ্রামের ঘুঘুর ডাক, ওর নদীর নীলাভাষ, পড়ন্ত বেলায় চুলে বুনো ফুল গুঁজে কলসি-কাঁখে নদীতে জল আনতে-যাওয়া ওর কোনও মনোমত কিশোরীর স্বপ্ন, ওর গ্রামের পথের মিষ্টি ধুলোর গন্ধ, ওর জঙ্গলের রাতের নিশাচর জানোয়ারের ডাক-ভরা নির্মল নিষ্কলুষ পৃথিবী এবং দিগন্তবিস্তৃত তারা-ভরা আকাশ থেকে বঞ্চিত হয়ে ও আমাদের মেকি ভালবাসা নিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ও নিজেকে মিথ্যামিথ্যি ভাগ্যবান বলে মনে করত। ও মনে করে আনন্দ পেত যে, আমরাই ওর সব। তাই মিথ্যা হলেও ওর সেই পরম গর্বের জায়গায় যখন দীপ তার নোংরা অশিক্ষিত বুর্জোয়া আত্মাভিমান নিয়ে ঘা দিত তখন ওর বড় লাগত।

স্কুল থেকে ফিরে আমি টেনিস খেলতে যেতাম। খেলে এসে যখন আমার ঘরে পড়তে বসতাম, তখন আমার ঘরের পাশের বারান্দায় বসে ও সুর করে ওড়িয়া রামায়ণ পড়ত।

এই ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের কাছে রামায়ণ মহাভারতের ভূমিকা যে কত বড়, কত পরিব্যাপ্ত তা রামের রামায়ণ পাঠের তন্ময়তা লক্ষ করে আমি বুঝতে পারতাম। রামায়ণ পড়তে পড়তে ওর চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ওর ফেলে-আসা শৈশব, কৈশোর, ছিন্নমূল অস্তিত্বের সঙ্গে রামায়ণের চরিত্রগুলিই যেন এই পরিবেশ ইট-কাঠ-পাথরের শহরের একমাত্র যোগসূত্র ছিল। ওই ঘুমপাড়ানি গানের মতো রামায়ণ পাঠের মধ্যে দিয়ে রাম ওর শহরের ইট-চাপা-ঘাসের মুমূর্ষু সত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করত।

অজানা ভাষায় গুনগুন করে পড়া রামায়ণের সুরে আমার মনের দিগন্ত খুলে যেত। ওই শব্দমঞ্জরীর মধ্য দিয়ে গ্রামগঞ্জের, বন-পাহাড়ের কোটি কোটি মানুষে-ভরা এই আসমুদ্র হিমাচলের ভারতবর্ষের গভীর মর্মবাণী আমার অল্পবয়সী হৃদয়ে অনুভব করতাম।

২

আমার যে মামাতো বোন, রুমি দিল্লিতে থাকত, সে কলকাতায় এল কলেজের ছুটিতে। রুমি অতি রূপসী মেয়ে, বিদুষী তো বটেই। মামা মামিমা উঠে পড়ে লাগলেন রুমির বিয়ের জন্যে। কিন্তু ও বিয়ে করতে চায় না। তাছাড়া রুমি সম্বন্ধ করে বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারে না। রূপে গুণে রুমির যোগ্য ছেলে হঠাৎ পাওয়াও মুশকিল। ও যখন এল, আমারও তখন ছুটি। রুমি আমার সঙ্গে রোজ টেনিস খেলতে যেত বিকেলে। দীপ রক্তসূত্রে আমাদের আত্মীয় নয়। কারণ সেজমাসির দেওরের ছেলে সে। কিন্তু সমবয়সী হলেও এবং এক বাড়িতে থাকলেও তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক কোনও যোগাযোগও ছিল না আমার। রুমির দিকেও সে গড়িয়ে গিয়ে মেশার মতো কোনও সমতলই পেল না। দীপ নিজের জগৎ নিয়ে থাকত। সেই জগৎ সম্বন্ধে আমি ও রুমি নিরুৎসাহ ছিলাম।

রুমি ছুটিতে এসে যে-ঘরে থাকত দোতলায়, তার পাশের ঘরেই থাকত দীপ। দুটি ঘরের মধ্যে

www.BanglaBook.org

একটি বাথরুম ছিল। বাথরুমের দুটি দরজা। দুই ঘরেই খুলত। যে যখন বাথরুমে যেত, তখন ভিতর থেকে অন্য ঘরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিত। চান সেরে জামা-কাপড় পরে তারপর খুলে দিত সে দরজা।

একদিন, সেদিনটা রবিবার কি কোনও ছুটির দিন, আজ আর মনে নেই ; হঠাৎ রুমির প্রচণ্ড চিৎকারে চমকে গিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠলাম। রুমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেয়ে। কথা বললেও কিসফিস করে বলে।

কী হল, তা জানতে মামা, মামিমা, সেজমাসি প্রত্যেকেই যে যার ঘর থেকে দৌড়ে এলেন।

এক দৌড়ে দোতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ যখন আমি পৌঁছেছি তখন হঠাৎ দেখলাম দীপ রামকে ধাক্কা দিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে হুড়কো টেনে দিল বাইরে থেকে।

ততক্ষণে সকলে রুমির ঘরের বন্ধ দরজার সামনে জড়ো হয়েছেন।

মামিমা, সেজমাসি সকলেই বলছেন, রুমি কী হয়েছে ? দরজা খোল।

রুমি ওর ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দরজা খুলল। জল-ভেজা একটি অনাবৃত হাঁস-ফরসা বাহু দরজার পাল্লা ঠেলে দিল। মামিমা ও সেজমাসি ঘরে ঢুকে গেলেন।

বুঝলাম, রুমি চান করছিল। তখনও জামাকাপড় পুরো পরেনি।

আমি ও বড়মামা বোকার মতো ওর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দীপ অস্ফালন করে বলল, ব্যাপারটা কী আগে জানি তারপর মজা দেখাচ্ছি।

আমি ও মামাবাবু কিছুই না বুঝে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মামিমা একটু পরে রুমির ঘর থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত ও বিরক্ত গলায় বললেন, এ কী ? বাড়ির মধ্যে এসব কী ?

রাশভারী মামা বললেন, কী হয়েছে ?

ততক্ষণে রুমি সেজমাসির সঙ্গে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে বলল, বাবা এ-বাড়িতে একজন ভয়্যার আছে ! আ পারভার্ট। উ্য মাস্ট ফাইন্ড আউট হু হি ইজ।

দীপ অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, আমার ঘরে তাকে বন্দি করে রেখেছি। দরজার হুড়কো খোলো, দেখতে পাবে।

বড়মামা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে দরজার হুড়কো খুললেন, তারপরেই রামকে হাত ধরে টেনে বাইরে এনে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় লাগালেন।

তিনি আর কিছু করবার আগেই দীপ গিয়ে রামের ঘাড়ে পড়ে তাকে সমানে কিল চড় লাথি বৃষ্টি করে যেতে লাগল।

ব্যাপারটা কী যে ঘটেছে তখনও আমি পুরো বুঝিনি। সত্যি কথা বলতে কী, 'ভয়্যার' কথাটার মানেও জানতাম না তখন আমি। অথচ এমন কিছু ঘটেছে যা লজ্জাকর ও অত্যন্ত বিরক্তিকর। রুমির মুখ চোখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারছিলাম। সেই অবস্থায় দীপকে বাধা দিতে গেলে, আমি হয়তো অপরাধীকে প্রশ্রয় দিচ্ছি এমন কথা রুমির ও মামা-মামিমার মনে হতে পারত। তাছাড়া অপরাধটাও যে ঠিক কী তাও তখনও জানতে পারিনি।

রাম বারবার কী যেন বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু দীপ তাকে কিছুমাত্র বলতে না দিয়ে মারের চোটে মুখ বন্ধ করে তাকে ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামিয়ে আনার ফন্দি করছিল। এবং মার খেতে খেতে রাম হটে যাচ্ছিল।

রামকে মারতে মারতে ও ঠেলতে ঠেলতে দীপ রামের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নীচে নেমে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে রুমি দীপের ঘরে ঢুকল। ঢুকেই, দীপের ঘর থেকে যে বাথরুমে যাওয়ার দরজা আছে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কী যেন খুঁজতে লাগল।

আমরা সকলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ রুমি চেঁচিয়ে বলল, পেয়েছি।

মামাবাবু রুমিকে সরিয়ে দিয়ে নিচু হয়ে বসলেন, তারপর বললেন, রাসক্যাল।

ওঁরা সকলে দীপের ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমিও হাঁটু গেড়ে বসে রহস্যটা আবিষ্কার করলাম। সুন্দর কর্মা-টিকের পালিশ-করা দরজার মাঝামাঝি কেউ কোনও যন্ত্র দিয়ে একটা ফুটো করেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই ফুটোতে চোখ লাগলেই বাথরুমের পুরোটা দেখা যায়। বাথটাবটাও পুরো। রুমির ছাড়া জামা-কাপড় সব পড়ে আছে ডার্টি-লিনেন বক্সের উপর। বাথটাবে তখনও বাথসল্ট মেশানো ফেনাময় জল ভরা। রুমি তাড়াতাড়িতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসায় টাবের জল ছাড়েনি তখনও।

রুমি রাগে লাল হয়ে তুতলে বলল, বাবা ওই লোকটাকে, রামকে ঘাড় ধরে এক্ষুনি বার করে দাও।

মামিমা ওকে শান্ত করবার জন্যে বলছিলেন, তোর কোনও ক্ষতি তো করেনি, গরিব মানুষ, গ্রামের মানুষ ; তোর মতো সুন্দরী মেয়ে দেখেনি, তাই না-হয় একটু দেখেছে!

রুমি বলল, মা, ইউ হ্যাভ গান আউট অফ ইওর মাইন্ড! দেখবে মানে! আমি যখন ন্যুড হয়ে বাথটাবে শুয়ে রয়েছি তখন দরজা ফুটো করে দেখবে? বাথরুমে আমি কী করি না করি একজন লোক তার ডার্টি প্রাইং চোখ দিয়ে তা দেখবে? এর চেয়ে জঘন্য অপরাধ কী হতে পারে? হরিবল্! ভাবা যায় না। তোমরা...

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে শুনলাম রুমি স্বগতোক্তি করছে, সব পুরুষ মানুষ সমান। এরা কি সুস্থতা জানে না?

আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। ও যেন পরোক্ষে আমাকে এবং দীপকেও অপমান করল।

আমি একতলায় গিয়ে আমার ঘরে ঢুকলাম। দেখি, সেখানে রাম পা-ছড়িয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। এবং দীপ, যে কোনও দিনও আমার ঘরে ঢোকে না, সে সমানে আমারই চেয়ারে বসে রামকে শাসাচ্ছে।

আমি ঢুকতেই রামের কান্না উথলে উঠল। ও ভাবত, আমি ওকে ভালবাসি। ও বলল, দাদাবাবু, আমার মায়ের দিব্যি, ভগবানের দিব্যি করে বলছি, আমি কিছুই জানি না। আমি উপরের বারান্দায় ঝাড়-পোঁছ করছিলাম, হঠাৎ দিদিমণির চিৎকার শুনলাম ঘরের ভেতর থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে দীপবাবু আস্তে করে দরজাটা খুলে আমাকে ধরে ঢুকিয়েই দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছড়কো আটকে দিল। তারপর তো দেখছই তোমরা।

রামের কথা শুনে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। ঘাম হতে লাগল অস্বস্তিতে। কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে আমি দীপকে বললাম, দীপ, তুমি যে ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়েছ সেটা আমিও দেখেছি। কী ব্যাপার? কী হয়েছিল আসলে?

দীপ নার্ভাস হাতে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, ঋদ্ধি, যতটুকু তুমি দেখেছ ততটুকু ঠিকই দেখেছ ; কিন্তু তার আগের ব্যাপারটা দেখোনি। এই বাস্টার্ড এখন যা ইনভেন্ট করে বলছে...

একটু থেমে দীপ বলল, যা বলছি কেয়ারফুলি শোনো। আমি বারান্দাতেই ছিলাম, রাম ঘরের ভিতরে কাজ করছিল, হঠাৎ রুমির চিৎকার শুনে দেখি রাম ঘর থেকে দৌড়ে বেরুল। কিছু একটা অপকর্ম করেছে বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপরের ব্যাপার তো তুমি জানোই। ইউ ওয়্যার ভেরি মাচ দেয়ার।

রাম সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, বলল, ঈসস, দীপবাবু...! যদি রাম সত্যি হয়, যদি সীতা সতি হয়, তোমার বড় পাপ হবে। বড়ই...

আমি রামকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, দীপ, রাম কী বলছে? রামকে আমি প্রথম দিন থেকে জানি। তুমি ওকে জানো মাত্র দু বছর। রামের কথা একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না।

আমার কথা শেষ হবামাত্র দীপ এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে একটা মিলিয়ন-ডলার প্রশ্ন করল।

খুব আস্তে আস্তে, কেটে কেটে বলল, ঋদ্ধি, আর ইউ টকিং সেন্স? কী বলতে চাইছ তুমি? তুমি কার কথা বিশ্বাস করবে? কাকে বিশ্বাস করবে? তোমার ক্লাসের, তোমার স্ট্যাটাসের একজন মানুষ যা বলছে সেই কথাটাকে ফেলে দিয়ে তুমি একজন চাকরের কথা বিশ্বাস করবে? তুমি কি এই-ই বলতে চাও যে, তোমার কাছে রামই বেশি, আর আমি কেউই না?

www.BanglaBook.org

আমি চুপ করে রইলাম।

দীপ আবারও বলল, তোমার মনে আমি যা বলছি সে সম্বন্ধে যদি কোনও সন্দেহ থাকেও, তাহলেও বেনিফিট অব ডাউটটা তোমার আমাকেই দেওয়া উচিত নয় কি ? কারণ...

দীপ একটু থেমে ভেবে বলল, কারণ আমার স্টেকটা খুব বড়। তুমি যদি ভুল করো ? তুমি খুব ভাল করেই জানো যে, আমি কেমন এবং কতখানি ফেস-লুজ করব সকলের কাছে—হোয়ার্যাজ রাম হ্যাজ নাথিং টু লুজ। ওর এখান থেকে চাকরি গেলে হি উইল ফাইন্ড অ্যানাদার ইন নো টাইম। ইট ডাজন্ট মেক এনি ডিফারেন্স ফর হিম ; কারণ শালার ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

আমি তখনও চুপ করে রইলাম।

দীপ খুব ঘামছিল। একটু চুপ করে থেকে ও আবার আমাকে বলল, ভুলে যেয়ো না, ঋদ্ধি ; আমরা এক ক্লাসের, একই সমাজের লোক। তুমি রামকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে মারতে পারো না ! উ্য জাস্ট কান্ট অ্যাফোর্ড টু ডু ইট। আমার সঙ্গে রামকে ইকুয়েট কোরো না। প্লিজ ডোন্ট !

সেই মুহূর্তে, আমার উনিশ বছরের জীবনে প্রাপ্তবয়স্কতায় এবং প্রাপ্তমনস্কতায় আমি প্রথম তীব্রভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমি কত অসহায় অথবা আমি নিজে কতবড় ভণ্ড। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা গ্লানি শিরশির করে ঠাণ্ডা সাপের মতো উঠানামা করতে লাগল। সেই অবসন্ন মুহূর্তে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, রাম আমার বা আমাদের কেউই নয়। কারণ রাম আমার শ্রেণীর নয়। জানোয়ারের মতো, কীটপতঙ্গের মতো, মিথ্যে-শিক্ষায় শিক্ষিত, মিথ্যা অহমিকায় ন্যুব্জ কতগুলো ফালতু মানুষ আমরা, নিজের নিজের শ্রেণীভুক্ত হয়ে, শ্রেণীনির্ভর হয়ে, স্বশ্রেণীকে শক্তি জুগিয়ে, ভাল থাকা, ভাল-খাওয়ার মূলে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে অন্য শ্রেণীভুক্তদের কীভাবে ঝুলিয়ে দিই, কীভাবে পদদলিত করি। দীপের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই, আত্মিক যোগ নেই কোনও, কিন্তু তবুও বুঝতে পারলাম।

দীপ কোনও কুটিল, ফৌজদারি আদালতের উকিলের মতো বলল, দ্য চয়েস ইজ ইয়োরস ঋদ্ধি। তুমি যদি সকলের কাছে বলতে চাও যে, রাম সত্যবাদী এবং আমি মিথ্যেবাদী তবে তাই-ই বলো। ও কে। ফাইন। উ্য লেট মি ডাউন !

আমি কিছু ভাবা বা বলার আগে রাম বলল, দাদাবাবু ! বলেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। মারের চোটে ওর নাক মুখ ফুলে উঠেছিল, ঠোঁটের কোণা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।

ঠিক সেই সময় আমার ঘরের দরজা সশব্দে ধাক্কা দিয়ে খুলে সেজমাসির আয়া লক্ষ্মী এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে।

সুশ্রী, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ওর বয়স হবে উনিশ-কুড়ি। শুনেছি, জয়নগর-মজিলপুরে বাড়ি। সেজমাসি এখানে আসার পর থেকেই আছে ও। চিরদিনই ঠাণ্ডা ; মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। কখনও এর আগে চোখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত আমার দিকে। কোনও কারণে একদিনও আমার ঘরে ঢোকেনি। এই প্রথম এবং এমন স্পর্ধার সঙ্গে সশব্দে ও আমার ঘরে ঢোকাতে আমি চমকে উঠলাম।

লক্ষ্মী আমার দিকে চেয়ে বলল, দোষ নিওনি দাদাবাবু ! আমরা হলুম গিয়ে ছোটনোক।

তারপর দীপকে দেখিয়ে বলল, আর এনারা হলেন ভদ্দরনোক। আমি তোমাকে মা কালীর দিব্যি করে বইলতিচি, রামের কিন্তুক কোনওই দোষ লাই।

তারপরই দীপের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, কী গো ভদ্দরনোক, বলব তোমার গুণের কথা ! বলি ? আমরা ছোটনোক বলি কি মানসম্ভ্রম লাই গো ? তুমি ভেইবেছটা কী ? চাকরি লা-হয় ছেইড়েই দেব, আধপেইটা খেইয়ে বেঁইচে আছে ভাই-বোন, লা-হয় না-খেইয়েই তারা মরুক। তাই বলে এত বড় অল্যায় ! তোমার অল্যায়টা অল্যায় লয় ? রাম বিচারা সাতে লাই ; পাঁচে লাই।

লক্ষ্মী উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল। দম নিয়ে বলল, দরজা ফুটো কইর‍্যে মেইয়েছেলির ন্যাংটো দেখার দরকার কীসের ? বাপ-ঠাকুর্দারা তো ঘরে বইসে খাওয়ার তরে অনেকেই বেইখ্যে গেছেন—তা বাবু সোনাগাছি গেইলেই তো পারো ! সিখানি অনেক ন্যাংটো মেইয়েছিলি নাচ দেখাবিখন। মরতে, নিজের বোনের পোঁদি কেন ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লজ্জায় আমার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

আমি রামকে ডাকলাম, রাম, আয়।

কিন্তু আমি বেরুবার আগেই রুমি এবং তার পিছনে অন্য সকলে আমার ঘরে প্রশেসান করে ঢুকলেন।

রুমি দীপের দিকে আগুনের চোখে তাকিয়ে থাকল এক পলক, তারপর বড়মামাকে বলল, বাবা! লুক এট দিস পার্ভার্ট।

সেজমাসি কেঁদে উঠলেন, দাদা, আমার ছেলেকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ো না।

লক্ষ্মী সকলকে অবাক করে সেজমাসির মুখের উপর বলে উঠল, মিথ্যেটা কীসের মাসিমণি? তোমার ছেইলেব গুণপনা শুনবে? আমাদের হাইরাবার ভয়টা কী? মান সম্মানও তো হাইরে বইসেই আছি। বইলেই ফেলি সব তালে, শুইনবে? সাহস আছে সব শুইনবার?

বড়মামা লক্ষ্মীকে কোনও কথা বলতে না দিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, লক্ষ্মী, তুমি চুপ করো।

সেজমাসি বললেন, তুমি একটা চাকর আর ঝি-এর কথায় এমন নোংরা অপবাদ দেবে দাদা দীপের নামে?

বড়মামা স্তব্ধ গম্ভীর গলায় বললেন, অপবাদের কাজ করলে অপবাদ না দিয়ে কী করি?

সেজমাসি কেঁদে ফেললেন, বললেন, ভদ্রলোকের ছেলেকে এত বড় অপমান!

লক্ষ্মী ফুট কাটল, ভদ্দরনোক আর ছোটনোক কি গায়ে নেকা থাকে মাসিমা? তা হয় ব্যাভারে।

বড়মামা ধমক দিলেন, লক্ষ্মী!

রুমি রামকে নিয়ে গেল হাত ধরে উপরে। নিজে শুশ্রূষা করল ওর সামনে মেঝেতে বসে। নিজে হাতে ওকে গরম চা করে খাওয়াল।

রাম কথা বলছিল না কোনও। ঝর ঝর করে কাঁদছিল শুধু।

সেজমাসিমা তখনকার মতো একটি ট্রাঙ্ক নিয়ে দীপের সঙ্গে চলে গেলেন ওঁর এক দেওরের বাড়ি। যাবার আগে মামিমাকে বলে গেলেন, আমি কদিন ঘুরে আসব পুরী থেকে। কিন্তু এই মিথ্যা অপবাদ যেন এ বাড়িতেই চাপা থাকে। এই কথা দাও বউদি!

বড়মামা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, এ-কথাটা বড় মুখ করে সকলকে বলার নয় রানু। তুই আমার বোন, ভুলে যাস না। দীপ তোর ছেলে। নিজের না-হলেও, তোর দেওরের ছেলে। তোর পোষ্যপুত্র! লজ্জাটা আমারও কম নয়। ছিঃ ছিঃ। রাম সত্যি সত্যিই এ-কাজ করলে খুশি হতাম আমি।

ছোটলোকদের কাছেও মাথা উঁচু রইল না রে আর!

সেজমাসি বললেন, এই হতচ্ছাড়ি লক্ষ্মীকে এখুনি বিদেয় করব আমি।

বড়মামি বললেন, ও কী করল?

লক্ষ্মীকে তখনকার মতো রুমির দেখাশোনা করার জন্যে বড়মামিই রেখে দিলেন। চাকরিটা থাকল, মালকিন বদলাল।

সেজমাসি চলে গেলে দোতলার বারান্দায় বসে লক্ষ্মী বলল, ওই ছেলের জন্যে আবার এত্ত গুণকীর্তন, সব তো তাও ফাঁস করিনি।

রুমি রামের পরিচর্যা করতে করতে লক্ষ্মীকে বলল, তোমার কাছে কেউ শুনতেও চাচ্ছে না।

তারপর বলল, তুমি একটু রামের দেখাশোনা করো তো এবারে বক বক না করে।

লক্ষ্মী ফিক করে হাসল। বলল, হায়রে আমার রামরে। রাবণ তোমার কী দশাটাই না কইর‍্যে গেল। এমনিই হয় গো; এমনিই হয়। ঘোর কলি। এখন রাবণদেরই জয় জয়কার।

তারপরই বলল, এইসো দিকি রামবাবু, কুথায় কুথায় বাণ লাগল, তোমার দিকি?

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলাম একতলায়; রুমি আমায় ডাকল। বলল, এই ঋদ্ধি শোন।

আমি ল্যান্ডিং-এর সামনে দাঁড়ালাম।

রুমি এগিয়ে এল। লাল সাদা একটা তাঁতের ডুরে শাড়ি পরেছিল ও। একটা লাল ব্লাউজ। সিঁড়ির পাশের কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো এসে পড়েছিল ওর মুখে। আগুনের মতো ওর গায়ের রঙে,

www.BanglaBook.org

ওর উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখে ওকে অষ্টমীর দুর্গা প্রতিমার মতো দেখাচ্ছিল।

আমার ভয় করছিল, কেন জানি না।

রুমি এসে ওর সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, গরিবদের উপর তোরা বড় অত্যাচার করিস। মানুষ বলে মনে করিস না ওদের।

তারপরই হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, ভাবছি, আমি এদেশে থাকব না। চলে যাব। দেখিস, স্কলারশিপ না পেলেও যেমন করে হোক চলে যাব। দাদাকে লিখব, দেখিস।

আমি বললাম, দেশটা তো আমাদের। আমার, তোর, রামের সকলের। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবি কেন?

তারপর বললাম, পরে তোর সঙ্গে কথা বলব রুমি। তুই আজ বড় আপসেট হয়ে আছিস।

আমি আমার ঘরে এসে পুরো ব্যাপারটার আকস্মিকতা এবং আমার রিঅ্যাকশনটা খতিয়ে দেখছিলাম।

দীপের কাছে কেন আমি বলতে পারলাম না, যা আমার মন বলছিল? দীপ আমার নিজের শ্রেণীর বলেই কি দীপকে লেট-ডাউন করতে আমার ভয় করছিল? দ্বিধা হচ্ছিল? না কি এ সংস্কার? না অন্য কিছু? আমি কি রিঅ্যাকশনারি? রিঅ্যাকশনারি কাদের বলে?

অথচ লক্ষ্মী। পরের বাড়ি সামান্য টাকার বিনিময়ে আয়ার চাকরি করা একটি অল্পবয়সী মেয়ে। ও কেমন মাথা উঁচু করে যা বলার বলল। দীপের মুখোশ খুলে দিল।

লক্ষ্মীও কি রামের শ্রেণীর মানুষ বলেই রামের পাশে এসে দাঁড়াল?

৩

আমাদের রামের জামাকাপড়ের বিশেষত্ব ছিল। ও কখনও কেনা শার্ট বা অন্য কারও পুরনো শার্ট পরত না। ধুতিও কখনও পুরনো বা অন্য লোকের দেওয়া পরত না। শার্টের কাপড়টা লম্বা স্ট্রাইপের ছিট হওয়া চাই। ও গলির মোড়ের আনিস দর্জিকে দিয়ে হাফ-শার্ট বানাত এবং শার্টের হাতা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা অদ্ভুত কাজ করা থাকত ফিঙের লেজের মতো। ও ধুতি ও শার্ট ছাড়া কিছুই পরত না। সবসময় জামা-কাপড় পরে থাকত। বাড়ির সব কাজ শেষ হলে দুপুরে ও রাতে জামাকাপড় ছেড়ে গামছা পরত। চান করে খেয়ে ঘুমোত তারপর। দুপুরে ওর কাজ সারতে সারতে প্রায়ই দুটো-আড়াইটে হত। কাজ না থাকলেও ও কাজ বানিয়ে নিত। তারপর তাকে ছটার আগে আর কখনও দেখা যেত না। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও তখন রামকে কেউই পেত না। তখন রাম কুম্ভকর্ণ হয়ে যেত।

ঘুমোবার সময় ও হাতঘড়ি পরে ঘুমোত। বড়মামা ওকে একটা এইচ-এম-টি ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন। প্রথম এইচ-এম-টি ঘড়ি বেরুনোর পর। ভেবেছিলেন, ওর সময় জ্ঞান হবে। অথচ আমাদের কারও সামনেই ঘড়িটা পরতে ও লজ্জা পেত। কখনও দোকানে বাজারে গেলে তখন পরে যেত ঘড়িটা। পকেটে একটা আমার দেওয়া বল-পয়েন্ট পেনও সবসময় গোঁজা থাকত। দোকান থেকে ফিরেই গেটের কাছে এসে ঘড়িটা খুলে পকেটে পুরে ফেলত। ওর চটিজোড়াও হাতে নিত।

অনেক পুরুষের শিক্ষা বা সংস্কারে ও জেনেছিল যে বাবুদের সামনে, ওর গাঁয়ের জোতদার বা রাজার সামনে জুতো পরা বা বাবুয়ানি দেখানো গর্হিত অপরাধ। আমাদের সামনে জুতো পরার মধ্যে দোষ নেই কোনও, একথা ওকে বোঝাতে পারিনি কখনও কারণ ও বুঝতে চাইত না।

ওকে বহুদিন বুঝিয়েছিলাম আমি যে, ঘড়িটা সময় দেখারই জন্যে। ওটা লুকিয়ে রেখে আর ঘুমুবার সময় পরে থেকে লাভ কী?

ও কখনও উত্তরে কথা বলত না, লাজুক হাসি হাসত।

একদিন হঠাৎই আবিষ্কার করলাম যে, রাম ঘড়ি দেখতেই জানে না। ওর হাতঘড়ি তো নয়ই, টেবল ক্লক বা দেওয়ালের বড় গ্রাণ্ড-ফাদার ক্লক কোনওটারই কাঁটার কম্বিনেশন ওর মাথায় ঢুকত না। হাতঘড়িটা ও একটা গয়না হিসেবেই ব্যবহার করত।

www.BanglaBook.org

ও যখন সন্ধেবেলা ইস্ত্রি করত, আমার ঘরের পাশের ঘরে, যেখানে অনেক প্রয়োজনীয় পুরনো জিনিস গুদোম-করা ছিল, ও একটা ট্রানজিস্টর বাজিয়ে কটক স্টেশন ধরে গান শুনত। ট্রানজিস্টরটা মাসিমা দিয়েছিলেন ওকে। হাতে বানানো। ওই পাশের বাড়ির চাকর বিশুর কাছ থেকে খবর নিয়ে এসে, মাসিমার কাছে বায়না ধরেছিল। বিশুই কিনে এনে দিয়েছিল, দীপের দেওয়া টাকাতে। একশো দশ টাকায় কিনেছিল ওটা।

সন্ধেবেলায় ইস্ত্রি করতে করতে একটু গান শোনাই ছিল ওর দৈনন্দিন জীবনের একমাত্র আনন্দ বা রিক্রিয়েশন। এ ছাড়াও প্রতি মাসে একবার করে ও কালিঘাটে যেত। খেয়ে-দেয়েই বেরিয়ে পড়ত। ফিরত সেই সন্ধে করে। জিজ্ঞেস করলে বলত, এই এটা-সেটা কেনার ছিল তাই গেছিলাম।

রাম অবাধ্যতা করলে মাঝে মাঝে আমার কাছে চড় চাপড় খেত। আমিও হঠাৎ হঠাৎ রেগে যেতাম বলে নিজেকে সামলাতে পারতাম না। মা বলতেন, ছিঃ ছিঃ! লোকজনের গায়ে হাত তুলিস কেন? এ কী অভদ্রতা!

আমি বলতাম, তুমি জানো না, ওকে না মারলে ও ঠিক থাকে না।

কিন্তু মনে মনে জানতাম, ওটা আমার অন্যায়। কিন্তু রামের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়েছিল। যদি অন্য কারও সামনে ওকে গালাগালি করতাম তাহলে ও ভয়ানক অপমানিত বোধ করত। কিন্তু ঘরের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার যাই হোক না কেন তাতে আমাদের দুজনের কেউই কিছুই মনে করতাম না। রাম আমাকে কখনও মারেনি বটে, তবে ও গালাগালি করতে মোটেই ছাড়ত না। খুব রেগে গেলে তুই তুই করে বলত আমাকে। বলত, রইল তোর চাবি-তালা, রইল তোর ঘর দোর, দেখি কোন বউ এসে তোকে এমন করে দেখাশুনা করে!

আমার সঙ্গে ওর দাম্পত্য সম্পর্কের মতো একটা অবর্ণনীয় মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কের গভীরতা বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। বিয়ে করলে আমার মা যেমন আমাকে হারানোর মতো একটা বেদনাবোধ অনুভব করবেন বলে আমার ভয় ছিল, রামেরও একটা সেরকম অনুভূতি হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমার।

একটা সময় এসেছিল পরে, যখন মা যেখানেই কোনও অবিবাহিত মেয়ে দেখতেন, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বা পথে-ঘাটে তখনই তাকে তাঁর ছেলের বউ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগতেন। মা একবার কুণ্ডু স্পেশালে কেদারবদ্রি বেড়াতে গিয়ে ফিরে আসার পর আমাদের বাড়িতে অনূঢ়া কন্যা এবং তাঁদের মায়েদের ভিড় লেগে গেল। সেই সময় প্রাণের দায়ে আমি কদিন কলকাতার বাইরে কাটিয়ে এলাম। মা খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন।

ফিরে এসে রামের কাছে কোন মেয়ে কেমন, কে শঙ্খিনী, কে পদ্মিনী, কে হস্তিনী তার রিপোর্ট পেয়েছিলাম। একটি মেয়েকে রামের খুব পছন্দ হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তাকে আমি দেখিনি। রাম বলত, ওই দিদিমণিকে তোমার বউ হলে খুব মানাত। ভারী লক্ষ্মী, শান্ত চেহারা। তোমাকে ঠাণ্ডা করে রাখত। তুমি তো চণ্ডাল!

রাম আমার কাছে কখনও চড়-চাপড় খেলে পরদিন সকালেই দশটা বা কুড়িটা করে টাকা পেত। মা বলতেন, ওর টাকার দরকার হলেই ও ইচ্ছে করে এমন কিছু করে যাতে করে তোর সঙ্গে ওর লেগে যায়। একবার আমি টাকাটা দিতে ভুলে গেছিলাম। পরদিন যখন বাইরে যাচ্ছি রাম মুখ নিচু করে বলল, আমার টাকাটা দিলে ভাল হত।

আমি হেসে ফেলেছিলাম, বলেছিলাম—তোর লজ্জাও নেই, বাঁদর। তারপর টাকাটা দিয়েছিলাম। ও-ও হাসতে হাসতে টাকাটা দিয়েছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল, অনেক কষ্টের টাকা।

সেদিনই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে একজন মানুষের অভাব কতখানি হলে, তার টাকার প্রয়োজন কত তীব্র হলে সে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে চায় দশটা-বিশটা টাকার জন্যে। বুঝতে পারতাম যে, মানুষের সম্মানবোধটোধ সব ফালতু। টাকার মতো বড় আর কিছুই নেই এ-সংসারে।

বাড়িতে রামের সঙ্গে এই সমঝোতা ব্যাপারটা কেবল আমার সঙ্গেই ছিল। অন্য কেউই, এমনকী

www.BanglaBook.org

বড়মামা, এবং মাও ওকে তেমন বুঝতেন না। বড়মামা এমনিতে খুবই উদার লোক। কিন্তু মাঝে মাঝে উনি রামের সঙ্গে বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন।

রামের অসুখ হলে রাম মুখে কিছু না-দিয়ে তিন-চারদিন ওর ঘরে পড়ে থাকত। একবার রামের জ্বর খুব, সঙ্গে বমিও। সেদিন বড়মামার আদরের গ্রেট ডেন কুকুর ভিক্টরেরও শরীর খারাপ। বমি করছে, পাগল পাগল করছে।

আমি বাড়ি ফিরে দেখি তুলকালাম কাণ্ড! বড়মামা জেদ ধরেছেন যে, রামকেই এক্ষুনি ভিক্টরকে নিয়ে ভেট-এর কাছে যেতে হবে। ওর কিছুই হয়নি। সব পেজোমি। সকালে বড়মামা ওকে বলেছিলেন বলেই ইচ্ছে করে ও অসুখের ভান করে পড়ে আছে।

আমি রামের ঘরে গিয়ে দেখি ও প্রায় বেহুঁশ হয়ে রয়েছে। আমি নাম ধরে ডাকতে চোখ তুলে চাইল। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ভাল ঠেকল না। আমি বললাম, ওষুধ খেয়েছিস?

ও বলল, না।

কিছু খেয়েছিস সকাল থেকে?

ঠাকুর বলল, সকালে চা আর মুড়ি খেয়েছিল তারপর কিছু খায়নি।

তোমরা কিছু বানিয়ে দিলে না কেন, বালি-টালি?

ঠাকুর বলল, মা পিসিমা যদি ভাঁড়ার থেকে বের না করে দেন জিনিসপত্র তা হলে আমরা কী করে দেব? সকালে ওঁরা তারকেশ্বরে গেছেন এই-ই তো এলেন।

আমার খুব রাগ হল। বড়মামা না-হয় পুরুষমানুষ। মা এবং বড়মামিরও কি উচিত ছিল না বেহুঁশ ছেলেটা কী খেল না খেল তা দেখা? বাড়িসুদ্ধু সকলে ভিক্টরের শরীর খারাপ নিয়ে চিন্তিত এবং মনমরা হয়ে ছিলেন। যেন মানুষের চেয়ে কুকুর বড়!

বড়মামাকে গিয়ে বললাম, রামের খুব শরীর খারাপ। এখন ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার ভিক্টরকে ভেট দেখানোর আগে। আমি রামকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

বড়মামা রেগে বললেন, ঋদ্ধি! ভিক্টরের সঙ্গে রামের তুলনা করবি না। তুই আজকাল বড় বেশি বুঝছিস। তোর কথাবার্তা হাবভাব আজকাল সব কম্যুনিস্টের মতো হয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল, আমিই নিয়ে যাব ভিক্টরকে।

আমি বললাম, ড্রাইভার নাকি চলে গেছে।

কাকে বলে গেল? তোরাই কি এখন বাড়ির কর্তা হয়ে গেলি নাকি?

আমি চুপ করেই থাকলাম। বড়মামা রেগে গেলে অন্য কারও কথা না-বলাটাই নিয়ম। ছোটবেলা থেকেই এ নিয়ম মেনে চলে এ বাড়ির সকলে।

বড়মামা আবার বললেন, তোর বড় বাড় বেড়েছে। বলেই, আমাকে গাড়ি বের করার সুযোগ না-দিয়েই নিজেই গাড়ি বের করে মালিকে নিয়ে ভিক্টরকে সঙ্গে করে ভেট-এর কাছে গেলেন, যদিও উনি গত দশ বছর স্টিয়ারিং-এ হাত দেননি।

আমি মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে ডাক্তারকে ডেকে এনে রামকে দেখিয়ে প্রেসক্রিপশান নিয়ে আবার ওঁর সঙ্গে গেলাম। তারপর ওষুধপথ্য করালাম ওকে।

কিছুক্ষণ পর বড়মামা ভিক্টরকে ডাক্তার দেখিয়ে ফিরে এলেন।

ভ্যানকুইশড রামের খোঁজও নিলেন না।

৪

সরিৎমেসো অনেকদিন পরে এলেন। ছিপছিপে, উপোসী ছারপোকার মতো চেহারা। উনি আমার ছোটমেসো। পার্লামেন্টের মেম্বার। এ রাজ্য কি অন্য রাজ্য থেকে দাঁড়ান আমার ঠিক জানা নেই। কনস্টিট্যুয়েন্সি বাঁধা আছে। দেশের অন্যতম অনগ্রসর এলাকাই হবে। কী করে প্রথম সেখানে শিকড় গাড়লেন তাও আমার জানা ছিল না। মেসো প্রচুর সম্পত্তির মালিক। যদিও

www.BanglaBook.org

নিজের নামে কিছুই নেই। পার্লামেন্টের সেশান চলাকালীন দিল্লিতেই থাকেন।

সরিৎমেসোকে ভয় করে না এমন লোক নেই। ইনি কলমের খোঁচায় লোকের চাকরি খান, টেলিফোন তুলে সরকারি কর্মচারীদের বদলি করে দেন; ত্যাঙাই-ম্যাঙাই করলে যে-কোনও ব্যবসাদারের বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স কি কাস্টমস ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে রেইড করিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন।

মেসোমশায়ের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন মামাবাড়িতে ছোট মাসিমার বিশেষ কদর ছিল না, কিন্তু এখন ছোটমাসিমা এই বাড়িতে ভি-আই-পি।

আজ সন্ধে থেকে বাড়িতে হই হই। মেসো-মাসি খাবেন। পরদিন সকালেই মেসো দিল্লি যাবেন। এখানে কী সব মিটিং-টিটিং-এর জন্যে এসেছিলেন।

সকলে মিলে বসবার ঘরে বসে গল্প-গুজব হচ্ছে। বড়মামা বললেন, সরিৎ একটু হবে নাকি? ভাল স্কচ ছিল, অনেকদিন হল পড়েই আছে আলমারিতে। রিটায়ার করার পর আর এই সব বিলাসিতার সামর্থ্য আমার নেই।

সরিৎমেসো বললেন, মালের উপর ট্যাক্স বেড়ে যা অবস্থা হয়েছে তাতে তো দোকান থেকে কিনে স্কচ খাওয়াই যায় না।

বড়মামা বললেন, দোকান ছাড়া আর কোথায় পাব?

সরিৎমেসো বললেন, সে লোক আছে, বলো তো তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। কলকাতায় বাঘের দুধ পাওয়া যায় আর স্কচ! বাজারের ওয়ান-থার্ড দামে পাবে। এসব না খেলে তো আমাদের চলে না। এত স্ট্রেন। সারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা, জনগণের গুরুদায়িত্ব। মাথাটা শার্প থাকে এসব খেলে।

বড়মামা বললেন, বাইরে থেকে, মানে তো স্মাগলারদের কাছ থেকে। তা যে বড় রিস্কি শুনেছি। দাম কত পড়ে?

সরিৎমেসো বললেন, রিস্ক কীসের? আমি থাকতে?

বড়মামা হাসলেন, তুমি তাহলে তোমার স্মাগলার বন্ধুকে বলে দিয়ো। শীতকালে দু-একটা ব্রান্ডি-ট্র্যান্ডি আর বিশেষ অকেশানে দু-এক বোতল স্কচ।

সরিৎমেসো বললেন, নো প্রবলেম।

তারপর বললেন, একটু খেলে মোটা অবশ্য মন্দ হত না, বড় ঝামেলা গেছে সারাদিন। তবে এই হাটের মধ্যে বসে নয়। তোমরা বেডরুমে চলো দাদা। আমাদের একটা ইমেজের ব্যাপার আছে তো! শালার দেশসেবা কি কম ঝকমারির কাজ।

এমন সময় রুমি দোতলা থেকে চটি ফটফটিয়ে দ্রুত নীচে নেমে এসে মামিমাকে চোখ বড় বড় করে বলল, মা জানো, আমার হিরের আংটিটা পাচ্ছি না! কী হবে?

কোন আংটিটা?

তুমি যেটা দিয়েছিলে।

বড়মামা তাড়াতাড়ি মামিমাকে শুধোলেন, কোন আংটিটা?

মামিমা বললেন, সেই একটা ছাড়া আবার কটা হিরের আংটি বানিয়ে দিয়েছিলে তুমি আমায়? সকলেই যেন সরিৎ-এর মতো স্বামী।

তারপর মামিমা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, পাচ্ছিস না মানে? কোথায় রেখেছিলি?

রুমি বলল, মনে নেই। বোধহয় সাবান মাখার সময় বাথরুমেই খুলে রেখেছিলাম।

কখন বাথরুমে ঢুকেছিলি?

আধঘণ্টা আগে।

বেরিয়েছিলি কখন?

তা হবে, পনেরো মিনিট।

তোর চান করে বেরুবার পর আর কেউ ঢুকেছিল বাথরুমে?

লক্ষ্মী ঢুকেছিল বাথরুমে, পরিষ্কার করতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড়মামা বললেন, রাম ?

রামও গেছিল একবার উপরে।

বড়মামা বললেন, কোথায় যাবে তা হলে ? ওদের জিজ্ঞেস করেছিস ?

হ্যাঁ। ওরা বলল দেখেনি !

বড়মামা বললেন, দেখেনি মানে কী। আমরা তো কেউই নিইনি ! সেজ আর দীপ তো কলকাতাতেই নেই। আংটিটা ডানা গজিয়ে উড়ে গেল ? রাম আর লক্ষ্মীর মধ্যেই কেউ নিয়েছে তা হলে।

মামিমা দুঃখিত ও বিরক্ত গলায় বললেন, কেন আগেই সন্দেহ করছ ওদের ? ভাল করে খোঁজা যাক।

ছোটমাসি বললেন, তোমরা এই চাকরবাকরদের লাই দিয়ে দিয়েই মাথায় তুলেছ, ছোটলোকদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই !

সরিৎমেসো বললেন, ছোটলোক বোলো না। ও কী ?

ছোটমাসি বললেন, বলব না কেন ? তোমার ওদের হাতে রাখা দরকার ভোটের জন্যে। আমার কী ? ছোটলোককে ছোটলোক বলব না ?

মামিমা বললেন, দাঁড়া দাঁড়া, তোরা উত্তেজিত হচ্ছিস কেন এত ? আমি গিয়ে দেখি। বলেই, মামিমা উপরে চলে গেলেন।

বড়মামা সরিৎমেসোকে নিয়ে শোবার ঘরে গেলেন। ছোটমাসি আর আমি বসে থাকলাম বসবার ঘরে।

ছোটমাসি বললেন, খোকা, তোর পড়াশুনা কেমন চলছে ? মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করছিস তো ? তোর হাবুদা তো স্কুল ফাইনালই পাস করতে পারল না। এখন বাবার হয়ে দালালি করে খাচ্ছে ! রোজগার অনেক। কিন্তু যেদিন বাবার সিটটা কোনও কারণে যাবে সেদিনই সব রোজগার বন্ধ। এসব ফেরেলবাজ লাইন আমার পছন্দ নয়।

তারপর বললেন, কী করবি ঠিক করেছিস ? কোনওরকমে এম. এ-টা পাস কর তারপর তোর মেসো আছে। কোন কোম্পানিতে, কোন শহরে, কী চাকরি দরকার তা শুধু তোর ইচ্ছে। যা বলবি, তাই ই হবে। আমি বললেই তোর মেসো করে দেবে !

আমি বললাম, দেখি...

ছোটমাসি বললেন, কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসছিস নাকি ?

তারপর ঠোঁট উলটে বললেন, ও বাবাঃ। সে তো কঠিন পরীক্ষা। ভাল ছেলে হতে হয় তাতে। তা যদি পাসও করিস তাহলেও তো তোর ছোট মেসোর মতো এম-পি এম-এল-এদের তাঁবেদারিই করতে হবে। আগেকার দিনের মতো জাঁদরেল বাঘের বাচ্চা আই-সি-এসরা তো আজকাল নেই। জন্মায়ও না। দেখি তো তোর মেসোর কাছে কত কেষ্ট-বিষ্টু আসে রোজ তেল লাগাতে ! বদলি, ভাল পোস্টিং, সি-সি-রোল, উন্নতি, ডেপুটেশন এটা ওটা। তারা তো সারাদিন তেল মাখাচ্ছে ওদেরই।

আমার হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বললাম, দেশে বাঘ থাকলে তো বাঘের বাচ্চা পয়দা হবে ছোট মাসি ? চারদিকে তাই এত কেঁউ কেঁউ মিউ মিউ। বাঘ কোথায় আর যে হালুম-হালুম শুনবে ?

ছোটমাসি কিছুক্ষণ সোজা আমার চোখে তাকিয়ে থাকলেন ! বললেন, তুই কি তলে তলে নকশাল হয়েছিস নাকি ? তোর কথাবার্তাও ভাল ঠেকছে না ! মেলামেশা করিস নাকি ওদের সঙ্গে ?

এমন সময় মা এলেন রান্নাঘরের সব তদারকি সেরে।

ছোটমাসি বললেন, দিদি, তোমার ছেলেটাকে একটু দেখো। ওর ভালর জন্যে বলতে গেলাম যে, চাকরির দরকার হলে মেসোকে বলিস। তার উত্তরে যা বলছে তা শুনে আর তোমার কাজ নেই।

মা বললেন, খোকা ! তুমি এত অসভ্য হয়েছ ?

আমি হাসলাম, বললাম, বাঃ রে !

এমন সময় উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে বলতে মামিমা রামকে নিয়ে নীচে নেমে এলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোটমাসি বলল, পেলে দিদি আংটিটা ?

নাঃ। সব জায়গায় খুঁজলাম।

ছোটমাসি বলল, এখনও লোকগুলোকে ছেড়ে রেখেছ ? পুলিশ ডাকো। হাতে তুলে দাও। মারের চোখে সব বেরোবে।

বড়মামি বলল, দাঁড়া দাঁড়া ! অণু, তোর বড় মাথাগরম।

রুমি আমার ঘরে এল। বলল, এই দেশের লোকগুলো সব চোর।

আমি বললাম, ঠিক বলেছিস। তবে ছোট ছিঁচকে চোরগুলো কখনও কখনও ধরা পড়ে এবং শাস্তিও পায়। বড় বড় চোরগুলো জাঁক করে বেড়ায়।

রুমি বলল, তা আমি জানি না। বাট আই ডোন্নো হোয়াট টু ডু।

বড়মামার গলা শোনা গেল। ওঁরা এদিকে আসছেন।

ওঁদের মুখ-চোখ দেখেই বুঝলাম, সরিৎ মেসো আর বড়মামা কয়েকটি কুইক-ওয়ানস মেরে এসেছেন।

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী করা উচিত খোকা ?

উত্তেজিত না হলে বড়মামা আমাকে খোকা বলে ডাকেন। উত্তেজিত হলে বলেন, ঋদ্ধি।

আমি বললাম, কীসের কী ?

বড়মামা বললেন, মানে লক্ষ্মী ও রামকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করি ?

আমি বললাম, আংটিটা যে ওরাই নিয়েছে শিওর না হয়েই ?

সরিৎমেসো বললেন, শিওর হবে কী করে ? ওরা কি তোমাকে এসে বলবে আমি নিয়েছি !

ছোটমাসি বলল, দিদি, দুটোকেই চালপোড়া খাওয়াও।

বড়মামা বললেন, তুই এখনও বড় সেকেলে আছিস ছোট।

সরিৎমেসো বললেন, ফোন করব পুলিশ কমিশনারকে ?

ছোটমাসি বললেন, দাঁড়াও, খাওয়া-দাওয়াটা নির্বিঘ্নে চুকে যাক। তোমরা ডিনার কখন খাবে ?

সরিৎমেসো বললেন, দেশে এইরকম ক্রিমিনালদের ছাড়া রেখে কি স্বস্তিতে খাওয়া যায় ?

বড়মামা বললেন, তবে কী করবে ?

সরিৎমেসো বললেন, ডাকো ওদের।

রাম ও লক্ষ্মী দুজনেই এসে দাঁড়াল আলো ঝলমল বসার ঘরে।

সরিৎমেসো বললেন, ভালয় ভালয় তো এক্ষুনি আংটিটা বের করে দে। তোদের দুজনকেই বলছি।

রাম হাত জোড় করে বলল, আমি জানি না বাবু। আমি কি দিদির জিনিস নিতে পারি ? আমি নিইনি, দেখিনি আমি।

লক্ষ্মী ভুরু কুঁচকে সরিৎমেসোকে দেখছিল। সেজমাসির সঙ্গে লক্ষ্মী এ বাড়িতে এসেছে দু বছর আগে। বছরখানেকের মধ্যে ও এই লোকটিকে কখনও দেখেনি। তবে ছোটমাসিকে দেখেছে। বড় দেমাকি মেয়েমানুষ। ভাল লাগেনি কখনও লক্ষ্মীর।

এবার সরিৎমেসো লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বললেন, কী হে ভালমানুষের মেয়ে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানো না। বলো শিগগিরি আংটিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ?

লক্ষ্মী আরেকবার সরিৎমেসোকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, মুখ সাইমলে কতা কও বইলতেচি। বাপ তুলবেনি।

লক্ষ্মীর কথা শুনে বড়মামা, মামিমা এমনকী মাও ঘাবড়ে গেলেন। ছোটমাসি তো রাগে অজ্ঞান হয়ে যাবার জোগাড়।

বড়মামা বললেন, লক্ষ্মী ! উনি কে তুই জানিস না। তোর ভীষণ বিপদ হবে। তুই ভদ্রভাবে কথা বল।

লক্ষ্মী বলল, ছোটনোকে আবার ভদ্দরভাবে কতা কইতে জাইনবে কী করে ? ভদ্দরনোক নই, তো আমি ভদ্দরনোক হই কী করে ?

সরিৎমেসোর প্রেস্টিজ পাংচার করে দিল লক্ষ্মী সকলের সামনে।

www.BanglaBook.org

সরিৎমেসো কী করবেন ভেবে না পেয়ে, মারমূর্তি হয়ে উঠে গেলেন ওদের দিকে।

লক্ষ্মী বলল, সাবধান কইরতিছি বাবু। মেইয়েছেলের গায়ে যদি হাত তোলো তোমার ও হাত আমি বঁটি দিয়ে দুই ফাঁক কইর‍্যে দেব।

সরিৎমেসো মারমুখো হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, কী করে এখন নিজের সম্মান বাঁচাবেন বুঝে না-পেয়ে ঠাস করে রামের গালে এক থাপ্পড় কষালেন। গার্বেজ ডাম্প। বাবুরাম সাপুড়ের সাপ! ভয় কীসের তাকে?

রাম ঘুরে পড়ে গেল মেঝেতে।

তারপর স্তম্ভিত হয়ে, চার হাতে পায়ে উবু হয়ে বসে আমার, মায়ের, বড়মামা, মামিমা সকলের মুখের দিকে একবার নিজের মুখ তুলে তাকাল——। আমাদের সকলকেই ও বড় আপনার লোক বলে জানত। ওর দুচোখে অবিশ্বাস এবং ওর প্রতি আমাদের সকলের এই বিশ্বাসঘাতকতায় ও বাকরুদ্ধ হয়ে রইল। তারপরই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

লক্ষ্মী ওকে ধমকে বলল, আরে মরণ! তুই দেখি আচ্ছা মরদ? তোকে মাইরল বিনা কারণে তুই ফিইরে দে না দু ঘা। ভদ্দরনোকের ভদ্দরনোকি কোতায় যায় দেখি। নাকি কাঁইদতে বইসলি। তুতু থুতু ফেইল্যে ডুইব্যে মইরগে যা। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

হঠাৎ গ্রেট সরিৎমেসো বললেন, মুখ সামলে কথা বল মাগি।

আমরা সকলে এবং বড়মামাও চমকে উঠলেন ওই অশ্লীল সম্ভাষণে।

লক্ষ্মী একটুক্ষণ চুপ করে রইল অবাক চোখে। তারপর বড়মামির দিকে চেয়ে বলল, তোমার ছোট ননদটাকে এইকেবারে জইল্যে ফেইলেচো গো তোমরা। এ কোন রাবণ জুইটিয়েচো গো।

তারপরই সরিৎমেসোর দিকে লাল চোখে চেয়ে বলল, মাগি তো দেকেচো ঢের! তবু আমাকে দেইখ্যে ভুল কইরলে?

সরিৎমেসো লক্ষ্মীকে অগ্রাহ্য করে আমাকে বললেন, খোকা, এদের জামাকাপড় বিছানাপত্র কী আছে এখানে নিয়ে এসো। স্যুটকেস-ট্যুটকেসও।

আমি কিছু বলার আগেই ছোটমাসি এগিয়ে এলেন, বললেন, দাঁড়াও, আমি আনছি। বলেই দুদ্দাড় করে বাগানে দৌড়ে গেলেন, গ্যারাজের পাশে ওদের ঘরের দিকে। তারপর বাইধর ও গিদাইয়াকে দিয়ে এবং নিজে হাতে করে ওদের সব সম্পত্তি নিয়ে এলেন।

সম্পত্তির মধ্যে লক্ষ্মীর একটা ছোট্ট টিনের ট্রাঙ্ক। উপরে লাল গোলাপ ফুল আঁকা। আর সাদা রঙে তার উপর গোল করে লেখা "সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে।" আর রামেরও একটা ছোট্ট কালো টিনের স্যুটকেস।

সরিৎমেসো বললেন, চাবি কই?

বড়মামা, মামিমা দেখলেন তাঁদের বাড়ির ব্যাপার তাঁদেরই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওঁরা কী করবেন ভেবে উঠতে পাচ্ছিলেন না। সরিৎমেসোকে কিছু বললে যদি মেসো চটে যান? আফটার অল, এম পি ভগ্নিপতি। বড়মামা সমানে অস্ফুটে এবং অধৈর্য গলায় বলে যাচ্ছিলেন, সরিৎ; সরিৎ, সরিৎ।

কিন্তু তখন সরিৎমেসো অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। লক্ষ্মী এমন কেউই নয় যে, তাকে পার্লামেন্টে নিয়ে গিয়ে পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ কমিটির সামনে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেওয়াবেন। এ মুখফোঁড় মেয়েছেলে সেখানে গিয়েও কী করবে বিশ্বাস নেই।

সরিৎ মেসো রামকে বললেন, চাবি কই তোর ট্রাঙ্কের?

রাম বলল, চাবি নেই।

সরিৎমেসো আবার ঠাস করে চড় মারলেন আর একটা রামকে।

এমন সময় রুমি দৌড়ে এসে বলল, ছোটমেসো, উ্য আর ওভারডুয়িং ইট। লেটস বী শিওর হোয়েদার দে আর গিলটি অ্যাট অল। ল তুমি নিজের হাতে নিতে পারো না।

ছোটমেসো এদেশীয় রাজনীতিক। ডেঞ্জারাস সিচুয়েশান কাকে বলে তিনি তা জানেন। কোন মিটিং-এ বক্তৃতা দেওয়া নিরাপদ আর কোন মিটিং-এর কাছাকাছি গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে হয় তা

www.BanglaBook.org

তার ভালই জানা ছিল।

উনি ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে বাইধরকে বললেন, তালা ভেঙে ট্রাঙ্ক দুটো খোল।

রামের ট্রাঙ্কে তালা ছিল না। তাই-ই বোধহয় ও বলেছিল চাবি নেই। রামের ট্রাঙ্ক খুলে ওর নিজের জামাকাপড় বেরোল কটা। টুকিটাকি জিনিস। সস্তার আয়না একটা। প্লাস্টিকের সেফটি-রেজর এই-ই সব।

একেবারে নীচ থেকে আমার দুটো পুরনো চিরুনি ও কয়েকটা ব্যবহৃত টেনিসের বল বেরুল আর ওর ধুতি-জামা।

ও নিয়ে কেউ কিছু বলল না। কিন্তু তারও নীচে থেকে একটা শাড়ি বেরুল। শাড়িটা পুরনো, কিন্তু ছেঁড়া নয়। মাকে ওই শাড়ি পরতে দেখিনি। রঙিন তাঁতের শাড়ি।

মামিমা হাঁ করে শাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাড়িটা যে মামিমার, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

সরিৎমেসো বললেন, এই শাড়িটা কার ? কার শাড়ি চুরি করেছিস ?

রামের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমাদের সামনে লজ্জায়, অপমানে ও মুখ নিচু করে ফেলল।

এমন সময় হঠাৎ মামিমা বললেন, শাড়িটা আমারই সরিৎ। কিন্তু ওর মায়ের জন্যে আমিই ওটা ওকে দিয়েছিলাম। দেশে যাবার সময় নিয়ে যাবে বলে।

রাম এবারে চমকে উঠল। চমকে উঠেই, একমুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, ওই শাড়িটা...আমি...। আমিই চুরি করেছিলাম। কিন্তু আংটির কথা আমি জানি না।

সরিৎমেসো বললেন, আ থিফ ইজ আ থিফ। শাড়ি চোর আর আংটি চোরে তফাত নেই।

তারপরেই বড়মামাকে বললেন, দাদা, ফোনটা কোথায় ?

আমার বুক ফসকে বেরিয়ে গেছিল, আর ভোট-চোর ? যারা মিথ্যা কথা বলে, ভয় দেখিয়ে, গায়ের জোরে এমনকী রিগিং করে ভোট-চুরি করে, তারা ? তারা বুঝি চোর নয় !

খুব জোর সামলে নিলাম নিজেকে। সত্যি কথা বলা চুরি করার চেয়েও বড় পাপ।

বড়মামা বললেন, সরিৎ, থাক থাক, এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে আর থানা-পুলিশ করার দরকার নেই। তুমি বললে, ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নেবে, তা আমি জানি।

সরিৎমেসোর রাগটা লক্ষ্মীর উপর। বললেন, ফেমার এনাফ। তারপর লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বললেন, চাবি দে।

লক্ষ্মী তার ছিটের ব্লাউজে ঢাকা বুকের মাঝখান থেকে একটা কালো-কারে বাঁধা চাবি বের করে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, বাবু লাওগো ! আমার ছবি লাও।

লক্ষ্মীর ট্রাঙ্ক থেকে অন্য কারু জিনিসই বেরুল না। কিন্তু একটা জিনিসে সরিৎমেসোর চোখ আটকে গেল। একটি বটতলার কোকশাস্ত্রের বই। অন্য সকলে দেখেও না-দেখার ভান করলেন। আমি মুখ নিচু করে রইলাম গুরুজনদের সামনে।

মেসো হঠাৎ বললেন, সাধে কি মাগি বলেছিলাম তোকে। ভবকা ছুঁড়ি, বিয়ে-থা হয়নি, এই বই দিয়ে তুই কী করিস ?

ঘর-সুদ্ধ সকলে মেসোর এই কথায় অধোবদন হয়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্মী সকলকে চমকে দিয়ে বলল, তোমাদের মতো বাবুরা যখন সোহাগ কইর‍্যে কাছে আইসো তখন তাদেরকে দেখাই গো। কেন ? তোমাদের নিজের ঘরে বুঝি সায়েব মেমেদের অসভ্য ন্যাংটো ছবি লাই ? তোমাদের দীপবাবু আমাকে বুঝি উসব ছবি দেখায়নি ?

মা এবং মামিমা মুখ নিচু করেও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীকে ধমক দিলেন।

এবং বড়মামা সরিৎমেসোকে নিয়ে জোর করে বেডরুমের দিকে চলে গেলেন। যেতে যেতে বলতে লাগলেন, সরিৎ তুমি সত্যিই একটু ওভার-ডু করে ফেললে পুরো ব্যাপারটা।

সরিৎমেসো বললেন, নেহাত আপনারা ছিলেন, নইলে আমি মাগির বিষ দাঁত ভেঙে দিতাম।

আঃ সরিৎ। ল্যাঙ্গুয়েজ ! ল্যাঙ্গুয়েজ ! তুমি নিজে পার্লামেন্টারিয়ান হয়ে এমন আন-পার্লামেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছ ?

www.BanglaBook.org

লক্ষ্মী ও রাম যার যার লণ্ডভণ্ড স্যুটকেস তুলে নিয়ে নিজেদের ঘরে রাখতে চলে গেল।

আমি আমার ঘরে চলে এলাম। রুমিও পিছন পিছন আমার ঘরে এল। আমার খাটে বসল। তারপর বলল, দিস ছোটো-পিসে ইজ আ ভেরি ডার্টি-পার্সন। ভেরি ইনডিসেন্ট ইনডিড। ছোটোপিসি কী করে থাকে এর সঙ্গে।

আমি বললাম, দোষ তো তোরই। ওঁরা চলে গেলেই না-হয় আংটির কথাটা বলতিস। তুই যদি নিজে হারিয়ে না থাকিস, বা কোথাও ফেলে না এসে থাকিস তাহলে তোর আংটি এ বাড়িতেই আছে। কেউই চুরি করেনি। আংটি, তাও হিরের আংটি, চুরি করবার মতো সাহস ওদের নেই।

তারপর বললাম, আচ্ছা রুমি, তুই আজ কোথায় কোথায় গেছিলি মনে কর তো ?

কোথায় আবার ? আজ তো ক্লাবে যাইনি। রাইদের বাড়ি গেছিলাম। শুধু রাইদের বাড়ি...বলতে বলতেই ও বলল, দাঁড়া তো একবার ওকে ফোন করি আসি।

পাঁচ মিনিট পরে রুমি দৌড়তে দৌড়তে আমার ঘরে ঢুকল। ওর মুখ ফ্যাকাশে, খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল ও।

ও বলল, ঋদ্ধি ! হোয়াট আ শেম।

আমি আমার চেয়ারে বসে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কী ?

রুমি চোখ নামিয়ে নিল। তারপর বলল, আংটিটা রাই-এর স্টাডিতে ওর টেবিলের উপর আমি নিজেই খুলে রেখে এসেছিলাম। একদম মনে ছিল না। রাইও ফোন করেনি। বলল, কাল আমাকে সারপ্রাইজ দেবে ভেবেছিল।

এমন সময় রাম আমার ঘরে ঢুকল। ওর গালে সরিৎমেসোর পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছিল।

রাম বলল, দাদাবাবু, দিদিমণি, মা তোমাদের খেতে ডাকছেন।

রুমি হঠাৎ রামের কাছে গিয়ে বলল, রাম ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। প্লিজ, পার্ডন মি।

আমি দেখলাম, রাম এক মুহূর্ত অবাক হয়ে থেকেই রুমিকে হাত ধরে ওঠাল। রুমির চোখ ছলছল করছিল। আমি দেখলাম রামের চোখ ভেজা। কিন্তু একটু আগের কান্নার সঙ্গে এই কান্নার কোনও মিল ছিল না।

রাম বলছিল, ছিঃ ছিঃ, কী বলছ দিদিমণি ! ছিঃ ছিঃ, আমি ক্ষমা করব তোমাকে ? ছিঃ ছিঃ, কী যে বলো তুমি তার ঠিক নেই ! তোমরা আর আমি !

৫

আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছিলাম। রামকে বললাম, হলুদ প্যান্টটা দে ! তার সঙ্গে হলুদ জামা।

রাম আলমারি খুলে ছাই রঙা প্যান্টটা বের করে দিল।

আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, এত বছরে রঙও চিনলি না ?

রাম যে রঙ চেনে না আমি জানতাম। যে রঙ-কানা সে রঙ চেনে না, তবুও আমি রোজই আশা করতাম যে, ও একদিন রঙ চিনবে।

রাগ করে আমি নিজেই জামাপ্যান্ট বের করলাম।

তারপর বললাম, ডানদিকের ড্রয়ারে হলুদ মোজা আছে, দে।

রাম বাঁদিকের ড্রয়ার ধরে টান দিল।

আমি বললাম, ইডিয়ট।

ও বাঁদিকে দু-নম্বর ড্রয়ার খুলল।

আমি বললাম, জীবনেও তোর কিছু হবে না। তুই একটা আকাট। একটা অ্যালসাসিয়ান কুকুরকে ট্রেনিং দিলে তোর চেয়ে ভাল ট্রেনিং পেত। ভগবান তোর মাথায় গ্রে ম্যাটার বলতে কিছুই দেননি। গোবর, শুধুই গোবর।

রাম জানোয়ারের মতো নির্বাক নির্বোধ চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে।

আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যেদিন ও প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছিল, মামিমা বড়মামাকে

www.BanglaBook.org

বলেছিলেন যে, হাফ-উইট না হলে তোমার কাছে এই মায়নাতে কাজ করতে আসবে কেন ?

তবু রাগের সময় রাগ হয়। একজন মানুষের আই-কিউ এত কম কী করে হয় ভেবে পেতাম না আমি।

এমন সময় টেলিফোনটা বাজল।

আমি বললাম, ধর।

রাম টেলিফোন ধরেই চেঁচাল, হেল্লো। এমন জোরে ও ফোনে কথা বললে যেন মনে হয় নদীর এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। ওকে কখনও বুঝিয়ে পারা যায়নি।

তারপর বলল, আপনি ধরুন।

বলেই, এসে বলল, বিরামবাবুর ফোন।

বিরামবাবু বলে আমি কাউকে চিনি না। বললাম, কার ফোন ?

ও বলল, বললাম তো আপনার।

ফোন ধরতেই প্রদীপ বলল, তোর ইকনমিকসের নোটটা নিয়ে আসিস।

আমি ওর সঙ্গে কথা বলে ফোন রেখে রামের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, বিরামবাবু ? তোকে এক থাপ্পড় মারব। ফোন করল প্রদীপ আর বললি বিরাম। তুই, তুই, একটা আস্ত জন্তু।

রাম তবু নিজের কথার জেদ ধরে থেকে বলল, হুঁ, তখন বলল বিরাম আর এখন হয়ে গেল প্রদীপ।

ওর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে আমি বললাম, তাড়াতাড়ি একটা লাইন ডাক, আমার তাড়া আছে। চার ছয় শূন্য শূন্য দুই শূন্য।

ও আমাকে ধমকে বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও হড়বড় কোরো না।

ও কখনও নম্বর শুনে সোজা ডায়াল করতে পারত না। একটা কাগজ নিল, তাতে ওর ভাষায় নম্বরটা লিখল, তারপর কয়েকবার চেষ্টা করেই আমাকে দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বলল, ইংলিশ।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কে আবার ইংলিশে কথা বলছে ?

ফোন ধরে দেখলাম, কর্‌র্‌র্‌ করে ডায়াল টোন আসছে।

আমি রেগে ওর দিকে তাকালাম।

ও বলল, বললামই তো ইংলিশ। এখন লাইন মিলিব না।

আমি নিজে ডায়াল করে কথা বললাম। তারপর ফোন ছেড়ে বললাম, তোকে দিয়ে কোন কাজটা হয় বলতে পারিস ? কোন কাজটা পারিস তুই ? হতভাগা !

ও আমার উপর উল্টো ঝাঁঝ দেখিয়ে বলল, হুঁ। ইংলিশ হলে আমি কী করব ?

তখন বুঝলাম, ইংলিশ মানে এনগেজড্। ও কারও কাছে কথাটা শুনে নিজের স্বকীয়তায় ও দুর্মর ওরিজিনালিটিতে এনগেজডকে ইংলিশ করেছে। ও যা করেছে তাই-ই ও চিরদিন করবে এবং করে এসেছে। তর্ক করা বৃথা।

এই অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে অনেক বছর ঘর করলাম। একে না পারি ফেলতে, না পারি সইতে। মাঝে মাঝে মাথায় সত্যিই রক্ত চড়ে যায়।

ইংলিশ সম্বন্ধে ওকে কিছু বলার আগেই আমাকে তেড়ে বলল, যাও যাও আর দেরি কোরো না, মিনিবাসের লাইন লম্বা হয়ে যাবে।

যাবার সময় বললাম, বইয়ের আলমারিতে কীরকম ধুলো পড়েছে দেখেছিস ? কতদিন পরিষ্কার করিসনি ?

সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা কথা বলল ও, কালই তো করলাম। কলকাতা শহরে কী ধুলো তার কি জানবে তুমি ?

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বললেই মার খাবি। কাল তো দূরের কথা। গত পনেরো দিনেও এতে হাত লাগাসনি। আজ ভাল করে পরিষ্কার করে রাখবি।

ও বলল, হুঁ হুঁ, পরিষ্কার রোজই করি। তোমাকে বলতে হবে না। এখন যাও তো। আমার এখন মেলা কাজ। আমাকে জ্বালিয়ো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েই প্রদীপ বলল, চল, আমাদের বাড়ি চল।

আমি অবাক হলাম। বললাম, হঠাৎ ?

বাস থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে এসে গলির মধ্যে ওদের বাড়ি। ও থাকত বেকবাগানে।

প্রদীপই চিরদিন আমাদের বাড়ি এসেছে। একা এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্য আমাদের বাড়ি ওর ফেরার পথে পড়ে বলে। কিন্তু আমার মনে পড়ে না ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর প্রদীপ কখনও একদিনের জন্যেও আমাকে ওর বাড়ি যেতে বলেছে, বা নিয়ে গেছে জোর করে।

আবার বললাম, কী ব্যাপার রে ?

ও বলল, কোনও ব্যাপার নেই। চল না। গরিব বন্ধু বলে কি যেতে নেই ?

আমি বললাম, সচ্ছল মামাবাড়িতে থাকলেই যদি কেউ বড়লোক হয়ে যায় তাহলে তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দারোয়ানও বড়লোক !

দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে আঙুলে ব্যথা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে এসে দরজা খুলল। একটা ছেঁড়া, নোংরা খাকি প্যান্ট পরা। কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা প্যান্টটা। খালি গা। মেঝেতে পড়ে ঘুমোচ্ছিল।

প্রদীপ বলল, মেরে তোর দাঁত ভেঙে দেব। কাজের মধ্যে শুধু ঘুম। দরজা খুলতে এক ঘণ্টা লাগল ?

ছেলেটা কথা বলল না। ছেলেটার চোখ গর্তে-বসা, হাড় জিরজিরে গরুর মতো চেহারা, বড় বড় চোখের পাতা মেলে তাকিয়ে থাকল। কোনও জবাব দিল না।

প্রদীপ বলল, মা নেই ?

না। মামাবাড়ি গেছেন।

কাকিমা ?

সিনেমায়।

শিগগিরি চা কর দু কাপ আর মোড়ের দোকান থেকে আলুর চপ নিয়ে আয়। বলেই, একটা টাকা বের করে দিল ওকে।

আমাকে বলল, কিছু মনে করিস না। তোদেরও বাড়ি আর আমাদেরও বাড়ি। বাড়িতে কাউকে আনতেই লজ্জা করে।

তারপর বলল, তুই বোস, আমি উপর থেকে দুটো ফোন সেরে আসছি।

আমি ভাবছিলাম অবাক হয়ে, বন্ধুত্বের সঙ্গে বাড়ির অবস্থার সম্পর্ক কোথায় এবং কতটুকু। হঠাৎই আমার সহপাঠীকে আমার খারাপ লাগল ওই কথাটা বলার জন্যে।

ওদের বাইরের ঘরটা ছোট, শ্রীহীন। খুবই ছোট। দেওয়ালে একটি লাস্যময়ী মেয়ের ছবিওলা ক্যালেন্ডার। ঘরের কোণায় শতরঞ্চি পাতা তক্তপোষ। দুটো চেয়ার। কাঠের একটা টেবল। টেবলক্লথহীন। জলের গ্লাস ও চায়ের কাপ রাখার দাগে দাগে নোংরা। ওর কাছেই শুনেছিলাম, প্রদীপের বাবা সরকারি অফিসের ইউ-ডি-সি। ওর কাকার একটা ছিট কাপড়ের দোকান আছে কালীঘাটে না কোথায় যেন। হকার্স কর্নারে। কাকার ছেলেমেয়ে নেই।

প্রদীপ মা-বাবার একমাত্র সন্তান। প্রদীপ পড়াশুনায় সাদামাটা। ও এক বড় রাজনৈতিক দলের ছোট নেতা। দুনিয়ার মেহনতী মজদুরদের জন্যে ও কেঁদে কূল পেত না। দারুণ সুরেলা ও ঝাঁকিদেওয়া প্রফেশানাল গলায় ও বক্তৃতা দিত। মিছিলে ধ্বনি দিত, শ্রেণীশত্রু নিপাত যাও ; নিপাত যাও। মুঠি পাকিয়ে বলত, এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।

আমি ওর মুখেই শুনেছি যে, ওর বাবাও তাঁর অফিসের ইউনিয়নের চাঁই ছিলেন। এবং এখনও আছেন।

প্রদীপ আমাকে আলাপ হওয়ার পর থেকেই বুর্জোয়া বলত। বলত, তোরাই দেশের শত্রু। আমি হাসতাম। আমি মনে মনে জানতাম যে, আমি নিশ্চয়ই বুর্জোয়া। কিন্তু...

প্রদীপ ফিরে এল। বলল, তোকে বসিয়ে রাখলাম অনেকক্ষণ।

বললাম, ঠিক আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও বলল, তুই একটু বোস। বাবা এসে পড়বেন। তোর সঙ্গে বাবার কথা আছে।

আমি অবাক হলাম। বললাম, তোর বাবার সঙ্গে আমার কথা ? কী কথা ? এর আগে তো কখনও আলাপই করিয়ে দিলি না। আচ্ছা লোক তুই যা হোক।

ও বলল, এই-ই তো আলাপ হবে। কী কথা তা আমি জানি না। বাবা এসেই বলবেন। এসে পড়লেন বলে।

ছেলেটি আলুর চপ নিয়ে এল ঠোঙা করে। টেবিলের উপর ঠোঙাসুদ্ধ রেখে গেল।

প্রদীপ বলল, চা করে আন। এক্ষুনি।

ও অস্ফুটে বলল, আসছি।

আমি প্রদীপকে শুধোলাম, ওর নাম কী রে ?

প্রদীপ বলল, রাম।

আমি জানতাম যে ওর নামও রাম হবে। ওদের সকলের একই নাম।

আমার পাড়া প্রতিবেশী,আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের বাড়িতেই একজন বা একাধিক রাম আছে। ছোটবেলা থেকে এই রামদের দেখে আসছি। আর আমাদের নামও এক। আমরা রাবণ।

আমি বললাম, কত মাইনে পায় রে ছেলেটা ? ছেলেটা বেশ !

প্রদীপ বলল, বেশ ? পাজির পাঝাড়া।

তারপর বলল, মাইনে দশ টাকা। কিন্তু খাওয়া-পরা পায়।

পরাটা যে কেমন পায় তা আমি স্বচক্ষেই দেখলাম। খাওয়াটাও অনুমান করতে পারলাম সহজে।

একটু পরে প্রদীপের বাবা এলেন। ট্যাক্সি করে। গায়ে সাদা টেরিলিনের পাঞ্জাবি। সোনার বোতাম লাগানো, হাতে পলার আংটি, পকেট থেকে দামি সিগারেটের প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরালেন। আমাকে দেখিয়ে প্রদীপকে বললেন, ওকে কিছু খাইয়েছিস ?

এই তো ! বলে, আলুর চপের ঠোঙাটা দেখাল প্রদীপ।

প্রদীপের বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন, তুই কী রে ? আশুর দোকান থেকে ছানার জিলিপি আর ফুলকপির সিঙাড়া আনিয়ে দিলি না কেন ?

বলেই, পাঁচ টাকার নোট বের করলেন একটা। তারপর প্রদীপকেই বললেন, রাম নেই ? তো তুই-ই যা।

প্রদীপ বলল, রাম আছে, চা করছে।

আমার মনে হল, নিজে হাতে শালপাতার ঠোঙা করে দোকান থেকে মিষ্টি আনতে ওর সম্মানে লাগছে। কিন্তু ও গেল তবুও।

ও বেরিয়ে যেতেই রাম চা এনে দিল।

প্রদীপের বাবা চা মুখে দিয়েই বললেন, ইস্‌স্‌ চিনির শরবৎ। তোকে কতদিন বলেছি হারামজাদা এত চিনি দিবি না। চিনি কিনতে তো পয়সা লাগে না ? চিনি বুঝি তোমার বাবার সুগার মিল থেকে আসে ? তুমি কী বুঝবে মানিক কত প্যাডিতে কত রাইস ?

রাম মুখ নিচু করে থাকল। বলল, আরেক কাপ করে আনব ?

শিগগির নিয়ে আয়। পরে আবার করবি দাদাবাবু ফিরলে।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে উনি একটু চুপ করে থেকে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন। তারপর জরুরি গলায় বললেন, ঋদ্ধি, প্রদীপ আসার আগেই ব্যাপারটা বলে নিতে চাই।

আমি বললাম, বলুন।

ভাবতেই পারছিলাম না, কী এমন কথা থাকতে পারে প্রদীপের বাবার আমার সঙ্গে।

উনি বললেন, তোমাদের সঙ্গে পড়ে, মধুমিতাকে চেনো তুমি ?

মধুমিতা ? আমি চমকে উঠলাম। বললাম হ্যাঁ। চিনি। কেন বলুন তো।

মধুমিতার সঙ্গে প্রদীপের বন্ধুত্বের কথাটা জানো ?

www.BanglaBook.org

বিলক্ষণই জানতাম ; মধুমিতাকে আমরা মমি বলে ডাকতাম। এবং ওর সঙ্গে প্রদীপের বন্ধুত্বটা যে নিছক বন্ধুত্ব নয় তা আমার অজানা ছিল না।

আমি বললাম, হ্যাঁ। ও তো আমাদের সকলেরই বন্ধু।

ইচ্ছে করেই আসল কথাটা এড়িয়ে গেলাম আমি। উনি যদি প্রদীপের বিরুদ্ধে আমাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে চান আমি তাতে রাজি ছিলাম না।

কিন্তু উনি অন্য কথা বললেন। বললেন, মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল। তা ছাড়া রাজনীতিও করে। ওর বাবার অবস্থা খুবই ভাল। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা আছে। মধুমিতা বোধহয় ওর বাবাকে কিছু বলেছে এবং ওর বাবার বিশেষই আগ্রহ। আফটার অল আমরা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, নামকরা ফ্যামিলি কলকাতার। আর মধুমিতারা জাতে অত্যন্ত নিচু।

তারপর সিগারেটে আরেক টান দিয়ে বললেন, ওঁর নিজেরও পলিটিক্সে আসার খুব ইচ্ছে। অনেক টাকা বানিয়েছেন। গত বছর ইলেকশানের সময় আমার কাছে এসেও ছিলেন টিকিটের জন্যে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন আমাদের পার্টির ব্যাকিং নিয়ে। কিন্তু আমরা তো কমিটেড লোক ছাড়া কাউকেই দিই না ওসব। তুমি জানবে...।

প্রদীপের বাবা চায়ে আর এক চুমুক দিয়ে বললেন, উনি প্রদীপকে লেক গার্ডেনস-এ নতুন বাড়ি করে দেবেন। জমি কেনাই আছে। গাড়িও দেবেন। আমি আর প্রদীপের মা বুড়ো বয়সে ওখানে একটু আরামে থাকতে পারব। আমার ভাই আর ভাই-এর স্ত্রী এখানেই থেকে যাবে।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, বুঝলে হে, চিরদিন তো সংগ্রামই করলাম, শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে। ক্লাসলেস সোসাইটি গড়ার জন্যে...। শেষ বয়সটা একটু...।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, আমি কী করতে পারি বলুন?

উনি বললেন, সেই কথাতেই আসছি। মধুমিতার বাবা একটা স্টীল রোলিং মিলের লেটার অফ ইনটেন্ট-এর জন্যে এ্যাপ্লাই করেছেন। এই ব্যাপারে তোমার এম-পি মেসোমশাইকে বলে যদি দিল্লিতে ওঁর এই কাজটা করিয়ে দিতে পারো তুমি, তা হলে আমার হবু বেয়াইয়ের বড় উপকার হয়। টাকা খরচ করতেও ওঁরা রাজি আছেন। তুমি শুধু তোমার ছোটমেসোর সঙ্গে এখানে অথবা দিল্লিতে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পর ওঁরা যা করার করবেন। ওঁরা বোকা নন। জানেন যে টাকা না ঢাললে টাকা আসে না ঘরে।

আলুর চপটা খেয়েই অম্বল অম্বল লাগছিল আমার। এখন কেমন গা গুলোতে লাগল।

আমি এমব্যারাসড হয়ে বললাম, ছোটমেসো আমাকে বিশেষ পছন্দ করেন না। ছোটমাসিও নন। আমার সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ নেই ওঁদের। অনেকদিন আমি ওঁদের বাড়ি যাইওনি।

প্রদীপের বাবা অবাক হলেন। বললেন, কেন? তোমাকে পছন্দ না করার কারণ?

আমি বললাম, এটা আমাকে দিয়ে হবে না। আমার সত্যিই অসুবিধা। আপনাদের পার্টিরই কোনও এম-পি-কে ধরে করুন না।

উনি বুদ্ধিদীপ্ত দারুণ এক হাসি হাসলেন। বললেন, তুমি ছেলেটা ভাল, কিন্তু বড্ড বোকা।

তারপর বললেন, আমার নিজের পার্টির এম-পি-দের কাছে আমি কোন মুখে যাব। তাঁরা করে হয়তো দেবেন। পার্টি ফাণ্ড বা ফাণ্ডের নাম করে কিছু টাকা নেবেন হয়তো। কিন্তু আমি তো এক্সপোজড হয়ে যাব। আফটার অল আমার বেয়াই আমার শ্রেণীশত্রু তো বটেই। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ ; ওঁর কারখানায় স্ট্রাইক হয়েছিল, সেই সময়। না, না। তাই-ই যদি সম্ভব হত তাহলে আর আমি তোমাকে এত করে বলব কেন?

আমি বললাম, আমার যে ওই অসুবিধা।

উনি বললেন, তুমি কি তোমার বন্ধুর ভাল চাও না? তুমি কি চাও আমাদের মতো অভাবি কেরানি হয়েই প্রদীপও সারাজীবন কাটাক?

তারপরই উনি হঠাৎ বললেন, ঋদ্ধি, তুমি যদি কোনও কমিশন চাও এই কাজ করে দেওয়ার জন্যে, তাও পাবে। আমার বেয়াই বিজনেসম্যান। কাজ হলে উনি খরচে কার্পণ্য করবেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

বললাম, আমার ছোটমেসো সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু উঁচু নয়। আপনি এক কাজ করুন, আমি এক্ষুনি ছোটমাসিকে বলে দিচ্ছি। আপনি ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। উনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিশ্চয়ই করে দিতে পারবেন।

উনি বললেন, বাস। বাস। আর কিচ্ছুর দরকার নেই। এখুনি চলো, শোবার ঘরে আছে টেলিফোন।

ছোটমাসিকে পেয়েও গেলাম। প্রদীপের বাবার নাম করে বললাম ছোটমেসোর সঙ্গে এঁর বিশেষ দরকার। এতে ছোটমেসোরও লাভ হবে।

ছোটমাসি বললেন, তোর মেসোর লাভ নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না।

আমি বললাম, আমি ঘামাচ্ছি না, যিনি যাবেন তিনিই ঘামাচ্ছেন। তুমি শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে দিয়ো।

ছোটমাসি বললেন, কাল আমি সাউথ-এ যাচ্ছি। কোভালাম বীচটা দেখা হয়নি। তোর মেসো দিল্লি থেকে ওখানে আসবেন সোজা। তুই ভদ্রলোককে আজই পাঠা বিকেল ছটা নাগাদ।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তারপর বললাম, আমার নাম শুনে আবার তাড়িয়ে দিয়ো না যেন। তোমাদের পরিচয়টা তো বড় কম পরিচয় নয়। লোকে জানে তাই আমাকে ধরে। প্লিজ, যা পারো কোরো।

ছোটমাসি তারপর মায়ের, মামিমার, বড়মামা, রুমি সকলের খোঁজ নিলেন। তারপর বললেন, ছাড়ছি রে।

প্রদীপের বাবা আমাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বেঁচে থাকো বাবা।

আমরা নীচে নামতেই প্রদীপ এল ছানার জিলিপি ও সিঙ্গাড়া নিয়ে।

আমি বললাম, আমার শরীর গুলোচ্ছে কেন জানি না। আমি আর কিছু খাব না।

এমন সময় রাম চা নিয়ে এসেই প্রদীপের বাবাকে বলল, বাবু আমার বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে আমার মায়ের খুব অসুখ, মা বোধহয় আর বাঁচবে না। তিনদিন ছুটি চাই।

উনি খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, ছুটি চাইলেই ছুটি পাওয়া যায়? বদলিতে অন্য লোক দিয়ে যাও। তোমাদের মা-বাবারা ইচ্ছে মতো মরে, ইচ্ছে মতো বেঁচে ওঠে। আমার সঙ্গে চালাকি করিস না রাম। যদি বদলিতে কোনও বিশ্বাসী লোক দিয়ে যেতে পারিস তো যা। নইলে আর আসতে হবে না। পয়সা ফেললে লোকের অভাব হয় না। তোর মতো বহু লোক ফুটপাথে শুয়ে না-খেয়ে রয়েছে। বেশি জ্বালাস না আমাকে। জরুরি কথা বলছি। এখন ভাগ এখান থেকে।

রাম কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, আমার দাদা লিখেছে, মা কিন্তু আর সত্যিই বাঁচবে না বাবু। আজই বালিগঞ্জ স্টেশান থেকে ট্রেন ধরে চলে যেতাম রাতে—আপনাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে।

তুমি গেলি এখান থেকে। উনি ভীষণ রেগে বললেন।

রাম তখনও দাঁড়িয়ে থাকল।

প্রদীপ বলল, তোর সাহস তো কম নয়?

রাম ভয়ার্ত চোখে একবার প্রদীপের দিকে চেয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। উনি বললেন, একটাও ছানার জিলিপি খাবে না বাবা? বড় ভাল করে এরা।

আমি বললাম, আমার শরীর খারাপ লাগছে। আমি আজ উঠব।

বেশ! বেশ! আবার এসো বাবা।

প্রদীপ আমার সঙ্গে সঙ্গে এল।

বলল, বাবার সঙ্গে কী কথা হল রে?

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, তুই কিছু জানতিস না?

ও বলল, কিছুটা জানি। বাবাকে বলেছিলাম যে, তুই নিশ্চয়ই কাজটা করবি। মানে, করতে পারবি।

তারপরই বলল, কী হল? হল কিছু?

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলাম।

প্রদীপ পাশে যেতে যেতে বলল, কী রে ? কী হল তোর ?

বললাম, কিছু না। তারপর ওকে বললাম, তোর সবই হবে। লেক গার্ডেনস-এ বাড়ি, গাড়ি, ডিরেকটরশিপ, মনি ; সবই তোর হবে একদিন। খুশি ?

প্রদীপ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ওর হাতে আমার হাত চেপে ধরে কী যেন বলতে গেল, তারপর কিছুই বলল না।

আমি বললাম, চলি রে।

বলেই বাসে উঠে পড়লাম।

৬

সেদিন বাড়িতে ফিরেই দেখি রাম হাউ হাউ করে কাঁদছে, হাতে একটা টেলিগ্রাম। বড়মামা, মামিমা ও মা ঘিরে বসে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

মা বললেন, আহা ! বেচারার বাবা মারা গেছে !

বড় মামিমা ও মা ওকে টাকা দিলেন। আমিও যা পারলাম দিলাম। ও যখন ওর স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে রাত আটটার গাড়ি ধরবে বলে আমাদের সকলের কাছে বিদায় নিতে এল তখন মামিমা বললেন, কবে ফিরবি ?

বাবার কাজ হয়ে গেলেই ফিরে আসব।

মা বললেন, দেরি করিস না।

ও চলে যাবার পরদিন থেকেই ও যে কী কাজ করত, বাড়ির সকলে যে ওর ওপর কত নির্ভরশীল, ওর বিশ্বস্ততার উপরে কতখানি বিশ্বাসী তা প্রত্যেকেরই কাছে ভাস্বর হয়ে উঠল। ওর উপরে বাড়ি ছেড়ে সকলে চলে গেলেও কোনও চিন্তা ছিল না কারওই।

রুমি যেদিন চলে গেল সেদিন ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর ফ্লাইট মাত্র আট ঘণ্টা লেট ছিল। আমরা সকলেই গেছিলাম এয়ার পোর্টে ওকে ছাড়তে। আমরা ওকে সী-অফ্ করে যখন ফিরলাম তখন রাত তিনটে। রাম তখনও গেটের সামনে বসেছিল।

ওর একটা আশ্চর্য অভ্যেস ছিল। সব কাজ শেষ না হলে ও খেতে পারত না। খাওয়ার আগে বারো মাস এমনকী শীতেও স্নান করত। জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরত। তারপর খেয়েই ধরাশায়ী। খাওয়ার পর ও এক মুহূর্তও বসে থাকতে পারত না। ঠাকুর এবং অন্যান্য লোকজন কেউই ওর এই অভ্যাসের কারণে নিজেদের অসুবিধে ঘটাত না। আমাদের সকলের খাওয়া হয়ে গেলেই তারা যার যার মতো খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ত। রামের খাবার কলাই-করা থালায় বাড়া থাকত, সানকি-ঢাকা ওর ঘরের মেঝেতে। তেলাপোকা ও ইঁদুর এসে ঘোরাঘুরি করত থালার চারপাশে। তবুও কখনও ওকে সব কাজ শেষ হওয়ার আগে খাওয়ানো যায়নি।

বড়মামার যেবার হার্ট-এ্যাটাক হল, সেবার নার্সিংহোমে ওঁকে শিফট করানোর আগের চব্বিশ ঘণ্টা রাম এক গ্লাস জলও খায়নি। যেভাবে ও সমানে দৌড়াদৌড়ি করেছিল সারা রাত এবং সকাল দশটা পর্যন্ত তা আমি জানি। বড়মামাকে ও নিজের বাবার মতোই দেখত। সব ব্যাপারটাই, হিন্দুস্থান পার্কের এই বাড়ির সব দায়িত্ব যেন ওরই একার পিতৃদায় এমনভাবে ও সব কিছুর ভার নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছিল স্বেচ্ছায়। এই স্বেচ্ছারোপিত দায়িত্বের মধ্যেই ওর কাজের সমস্ত জব-স্যাটিসফ্যাকশান নিহিত ছিল।

বড়মামি একজন লোক এনে দিলেন। ওর বোনের বাড়ির চাকরকে বলে। সাত দিনের দিন সেই বিশেষ আই-কিউ সম্পন্ন চালাক চতুর ছেলেটি বড়মামার রোলেকস্ রিস্টওয়াচ, ট্রানজিস্টর, মামিমার পুজোর সোনার থালা, মায়ের একটা টেবল ক্লক এবং আমার টেপ রেকর্ডার নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। পুলিশে ডায়রি করা হল। কিন্তু কিছুই হল না।

কিছুই হয় না এখানে। যার যার মাল-জানের দায়িত্ব যার যার নিজের নিজের। শুধু ট্যাকস্টা

www.BanglaBook.org

ঠিকই দিতে হয়। শুধু বুকনি ও চোখরাঙানির শেষ নেই।

চোর যে ধরা পড়বে না তা আমরা জানতাম। আমরা কোনও মিনিস্টারকে চিনি না। সরিৎ মেসো থাকলে হয়তো কিছু হত। প্রদীপের বাবাকে বললেও হয়তো হত। কিন্তু...

ওই নতুন লোকটা চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার পর আর নতুন লোক রাখা হল না সাহস করে। প্রত্যেকের বড়ই অসুবিধে হতে লাগল। রাম বারো দিনের ছুটি নিয়ে গেছিল। পনেরো দিন হয়ে গেল।

আমার বইয়ের আলমারি ধুলোয় ভর্তি। গোছাতে গিয়ে দেখি যে সমস্ত বই লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে রাম। বাংলা বইয়ের মধ্যে ইংরিজি। কবিতার বইয়ের তাকে ইতিহাস। অর্ধেক বই উল্টো করে রাখা। বার্ট্রান্ড রাসেলের অটোবায়োগ্রাফির তিনটে ভল্যুম তিন জায়গায়। হেমিংওয়ের মেন উইদাউট উইমেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নীল নির্জনের পাশে। রমাপদ চৌধুরীর গল্প-সমগ্র, সাংখালার টাইগার এবং জিম করবেটের জ্যাংগল লোর-এর মধ্যিখানে। একেবারে হতাশ অবস্থা।

বইগুলো গোছাতে গোছাতে রামের উপর যেমন মনে মনে রাগ করছিলাম, তেমন ও যে নেই, ডাকলেই যে ও সাড়া দেবে না, ওকে যা মন চায় তাই বলে গালাগালি করতে পারব না; রাতে খাব না বললে যে ও আমার সম্ভাবনাহীন শাশুড়ির মতো আদর করে, জোর করে আমাকে খেতে বাধ্য করবে না ওই সব জানা মনকে বড় পীড়িতও করছিল। মনের এমনই অবস্থা যেন রাম মরেই গেছে।

জামা-কাপড় ডাইং-ক্লিনিং-এর দোকানে দিচ্ছিল গিদাইয়া। দশ দিনের বিল হল দেড়শো টাকা, সারা বাড়ির। বেড-কভার নোংরা, বড়মামার স্লিপিং স্যুটে গন্ধ, মশারিতে ঝুল, বসবার ঘরের কার্পেটে ভিক্টরের গায়ের লোম ও জিভের লালা। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা।

তিনদিন পর বড়মামি বড়মামার বেডরুমে এমার্জেন্সি মিটিং-এ ঠিক হল যে আমাকে সরেজমিনে তদন্তে যেতে হবে। এও আবিষ্কৃত হল যে রাম এ বাড়িতে দশ বছর কাজ করছে কিন্তু ছুটি নিয়েছে কুল্লে দু মাস। পঁয়ত্রিশ টাকায় ঢুকেছিল। দশ বছরে তার মাইনে বেড়ে হয়েছে পঞ্চাশ। টাকার দাম কমে গেছে যদিও বহুগুণ। কিন্তু তা বলে বড়মামার রোজগারও বাড়েনি। যদিও আমিও এখন চাকরি করছি। নেহাতই সাদামাটা একটা চাকরি। তবে ভবিষ্যৎ ভাল। যদি ভবিষ্যৎ বলে কিছু থেকে থাকে আমার।

মিটিং-এ স্থির হল, আমাকে কালই যেতে হবে রামের গ্রামে। রামকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ওকে এবার থেকে মাসে একশো টাকা করে দেওয়া হবে, যেটা রাম না এলে এক মাসে ধোপার যা হিসাব হত তার চার ভাগের এক ভাগ। অন্য সব ছেড়ে দিলেও। আমার অ্যাসাইনমেন্ট হল এই-ই যে, যেন-তেন প্রকারেণ ওকে সঙ্গে করে আমার নিয়েই আসতে হবে।

নতুন চাকরি। পুজোয় ছুটি নেব হয়তো কদিন। কোথাও যাবার জন্যে। তারপর আবার এই ঝামেলা। ভাবলাম শনি রবির সঙ্গে একদিন ছুটি নেব।

যাবার দিনে বড়মামা, রামের বিধবা মার হাতে দেওয়ার জন্যে আরও একশো টাকা দিলেন আমাকে আলাদা করে। পুরী এক্সপ্রেসে কটকের টিকিট কেটে শুক্রবার রাতে চেপে বসলাম।

রুমি থাকলে রুমিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ও রাফিং করতে খুব ভালবাসে। কিন্তু ও তো এই হতভাগা অন্ধকার দেশ ছেড়ে আলোর সন্ধানে মাইগ্রেটরি হাঁসের মতো উড়ে গেছে। বসন্ত শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের শেষ বেলাতে শীতে যদি ফেরে।

কটক ভোরে নেমে রিটায়ারিং রুমে চান করে রেস্টুরেন্টে চা-টা খেয়ে বাস ধরলাম। ঢেনকানল হয়ে অঙ্গুল হয়ে করত্পটা পেরিয়ে নুয়াকোট বলে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ও পাহাড় ঘেরা একটি ছোট্ট গ্রামের সামনে যখন বাস থেকে নামলাম তখন সন্ধে হব হব। গরু-বাছুর, ছাগল-মুরগি ফিরে আসছে যে যার ঘরে। প্রায় অর্ধনগ্ন একপাল ছেলেমেয়ে গ্রামের পথে যার যার খড়ের ঘরের সামনে চেঁচামেচি লাফালাফি করছে। এতটুকু গ্রাম! অথচ এত ছেলেমেয়ে! একেবারে পপুলেশান একসপ্লোশান!

কাঁধে ঝোলা নিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ম্লান পটভূমিতে আসন্ন সন্ধ্যায় একটি শহুরে পোশাকের

www.BanglaBook.org

মানুষকে গ্রামের পথে হেঁটে যেতে দেখে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ও মেয়েরা কৌতূহলী চোখে আমার দিকে চাইছে। নিজেদের ভাষায় কী সব বলাবলি করছে। এখানের মেয়েরা অদ্ভুতভাবে শাড়ি পরে। একটা ছোট মোটা শাড়ি আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে বুক এবং কোমরের কাছটা ঢাকে। হাঁটুর একটু নীচে পড়ে সে শাড়ি। অন্য কোনও রকম অন্তর্বাসই নেই।

একটু গিয়েই একজন পুরুষের সঙ্গে দেখা হল। সে পথের পাথর-বাঁধানো কালভার্টের উপরে বসে হাঁটুতে পাক দিয়ে দিয়ে মাছধরা খেপলা জাল বুনছিল।

তাকে বললাম, দশরথ সাইয়ের বাড়ি কোনটা ?

লোকটা জাল বোনা থামিয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, সিয়াড়ে।

আমি বললাম, দশরথ সাই তো মরে গেছে। তার ছেলে রাম সাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে ?

লোকটা অবাক হল। শুধোল, আমি কি পুলিশের লোক ?

আমি বললাম, না। রাম সাই কলকাতায় আমাদের বাড়িতে কাজ করে।

লোকটা একটা ঝাঁকি দিয়ে নামল কালভার্ট থেকে। তারপর বলল, ই বাটে আসন্তু।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে কিছুটা নিয়ে গিয়ে একটা খড়ের চালাঘরের সামনে আমাকে দাঁড় করাল ও। তারপর ডাকল রাম্ব ভাই ; রাম্ব ভাই।

ভিতর থেকে রামের গলা শোনা গেল। কার সঙ্গে উঁচু গলায় সে কথা বলছিল। মুরুব্বির মতো এমন স্বরে আমাদের বাড়িতে কখনও ওকে কথা বলতে শুনিনি। লোকটির ডাকে উত্তর দিয়ে রাম ছোট্ট কাঠের দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসে মাটির দাওয়ায় ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই আমাকে দেখে প্রথমে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। পরক্ষণেই নিচু হয়ে বসে দু হাত দিয়ে দু পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করল। আমাদের মতো শুধু ডান হাত দিয়ে প্রণাম করল না। ওর মুখ দেখে মনে হল বিস্ময় ভয় ও আনন্দ ওর চোখে মুখে মাখামাখি হয়ে আছে।

আমি বললাম, তোর বাবার কাজ হয়ে গেছে ? মাথা ন্যাড়া করিসনি ?

যে লোকটা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, সে হেসে উঠল অদ্ভুত শব্দ করে, তারপর বলল, মুই জীবি।

বলেই চলে গেল।

এমন সময় একজন বৃদ্ধ লোক, বেঁটেখাটো, মাথাভর্তি সাদা চুল ; কিন্তু শক্তসমর্থ চেহারা নিয়ে বাইরে এল।

রাম তার দিকে ফিরে বলল, বাপ্প, দাদাবাবু আস্থিলা !

সেই বৃদ্ধও আমাকে রামের মতো করে প্রণাম করতে এগিয়ে এল। আমি লজ্জায় পা সরিয়ে নিয়ে তার হাত ধরলাম।

রামের লজ্জিত মুখ দেখেই বুঝলাম যে ব্যাটাচ্ছেলে ডাহা মিথ্যা কথা বলেছে। এই-ই রামের বাবা দশরথ। মরা তো দূরের কথা তার কোনও অসুখ যে পনেরো দিনের মধ্যে হয়েছিল এমন কোনও লক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই তারা বাবা ছেলে দুজনে মিলে আমাকে হাত ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা ঘরে রান্না হচ্ছে। উনুনের আগুনের আঁচের লাল আভা নাচানাচি করছে ঘরের দেওয়ালে। মধ্যে একটা ছোট্ট উঠোন। গরু বাঁধা আছে একটা। সঙ্গে বাছুর। পিছন দিকে একটু বেড়া দেওয়া। সামান্য তরিতরকারি লাগানো হয়েছে বলে মনে হল। ভিতরের বারান্দায় একটা কুপী জ্বলছে। এ-ছাড়া আর কোনও আলোই নেই।

রাম ওর মাকে ডাকল। আর ছোট ভাই শত্রুঘ্নকে। মা এসে ঘোমটার আড়াল থেকে হাত জোড় করে নমস্কার করতেই রামের বাবা কী যেন বলে উঠল। তখুনি লজ্জিত হয়ে রামের মাও এসে আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। দু পা পিছিয়ে গেলাম আমি।

রামকে বললাম, কী রে ! আমার মা তোর মা হলে, তোর মা আমার মা নয় ?

www.BanglaBook.org

দশরথ অধোবদনে আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে বলল, তুমি হলে গিয়ে বাবু, মনিব। তোমরা আর আমরা কি এক হলাম।

কী বলব ভেবে পেলাম না।

তাড়াতাড়িতে একটা খাট খালি করা হল আমার জন্যে। নারকোল দড়ির চৌপাইয়ে রাম আমার ব্যাগ থেকে চাদর ও রবারের বালিশ বের করে বিছানা করল তাড়াতাড়ি। তার নীচে একটা পুরনো শাড়ি এনে পেতে দিল।

রাগের গলায় বলল, এখানে কি তোমার মতো ভদ্দরলোকে থাকতে পারে? আগে বললে ডাকবাংলোতে চৌকিদারকে বলে বন্দোবস্ত করতাম। কালই তাই করব। আজ রাতটা কষ্ট করে কাটাও কোনও মতে।

আমি বললাম, কাল তো চলেই যাব। এখানেই থাকব। তোর বাড়ি থাকতে ডাকবাংলোয় থাকব কোন দুঃখে?

ততক্ষণে রামের মা একটু মুড়কি এনে দিয়েছিল পিতলের একটা গোল বাটিতে। ঝকঝকে করে মাজা পিতলের ঘটিতে করে জলও।

এমন সময় বৃষ্টি নামল। ঝম ঝম করে নয়, ফিসফিস করে। রাম আর একটা কুপী জ্বালিয়ে নিয়ে ঘরে এল।

ছোট্ট ঘরের মধ্যে কাঁপা-কাঁপা আলোতে রামকে দেখছিলাম আমি। রামকে অনেক লম্বা শালপ্রাংশু বলে মনে হয়েছিল। এই রাম আমার চেনা নয়। ওর পরনে গেরুয়া রঙের খাটো ধুতি। খালি গা। কিন্তু হাতে রিস্টওয়াচটা ঠিকই বাঁধা। তাড়াতাড়িতে আমাকে দেখার পরও খোলার সময় পায়নি। হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে ও ওটা খুলে ফেলতে গেল। কিন্তু থমকে থামল।

মুড়কি খেতে খেতে বললাম, কী রে? মিথ্যেবাদী!

রাম মুখ নিচু করে থাকল। বলল, আর সাতদিন পরেই চলে যেতাম।

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বলে এলি কেন?

রাম বলল, মিথ্যা না বললে যে ছুটি পাওয়া যেত না। আমি এলে যে তোমাদের কত অসুবিধা হয় তা কি আমি জানি না?

আমি ভাবছিলাম, চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা কথা আমিও বলি রামের মতো। আমার অনেক সহকর্মী টি-এ বিল ইনফ্লেট করে, কেউ অন্যের গাড়িতে গিয়ে ট্রেনে যাতায়াতের বিল করে—অনেক তুচ্ছতর কারণে। রামের মিথ্যা বলার পিছনে যে যুক্তি ছিল সেটা তুচ্ছ নয়।

রাম চুপ করে তাকিয়ে ছিল আমার মুখের দিকে।

আমি বললাম, তোর আর ভাইয়েরা কোথায়?

রাম বলল, ভাইয়েরা এখানে থাকলে আর ভাবনা ছিল কি? মেজলা ভাই লক্ষ্মণ চৌদুয়ারের কাগজের কলে ভাল চাকরি করে। বোনাস পায়, কোয়ার্টার পেয়েছে। ওখানেই একজন সম্বলপুরী মেয়েকে বিয়ে করে থাকে। বাড়িতে আসেও না, টাকাও পাঠায় না। সম্পর্কই রাখেনি।

ভরত? লক্ষ্মণের পরের ভাই?

সে তো লেখাপড়া শিখেছিল। বাবা তাকেই একমাত্র লেখাপড়া শিখিয়েছিল। সে দশ ক্লাস অবধি পড়ে ফুলবনী পোস্ট অফিসে কাজ করে। সেও একটি আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করে ওখানেই ঘর-সংসার করছে। বাবা-মায়ের খোঁজও নেয় না।

আমি বললাম, তুই হঠাৎ বাবা-মরা টেলিগ্রাম দিয়ে এখানে এলি কেন?

রাম দু হাত নেড়ে বলল, একটা লোভে পড়ে। লাভের আশায়। এখানে একজন বড় কাঠের ঠিকাদার আছেন। এ বছর দেরি করে কাজ শুরু করাতে জঙ্গল থেকে কাঠ বের করতে সুবিধে হয়নি। অথচ বর্ষা ভাল করে নামার আগে আগে সব কাঠ বের না করতে পারলে জঙ্গলে কাটা কাঠ পচে যাবে। তাই উনি দিনে দশ টাকা করে রোজ দিচ্ছিলেন। এই খবর জেনেই মা আমাকে মিথ্যে টেলিগ্রাম করে আনাল। বাবা আর আমরা দু ভাই মিলে পনেরো দিন কাজ করলে সাড়ে চারশো টাকা কামাতে পারব। তাতে দুটো মোষ হয়ে যাবে। আর দুটো মোষ হলে বর্ষার পর চাষের জন্যে

www.BanglaBook.org

মোষ ভাড়া দিয়ে দু পয়সা হবে। বাবা-মা আর শত্রুঘ্নর একটু সুরাহা হবে। তাই কূপ-কাটার কাজের জন্যে এলাম। এ সবই মার চক্রান্ত। আমি কিছুই জানতাম না। বাবাও না।

কূপ কাটছিস তা হলে এখনও ? আমি বললাম।

ও বলল, কাটছি। কিন্তু এসব ছোটলোকি কাজ কি আমার পোষায় ? দেখো না, হাতের কী দশা হয়েছে। এসব কাজ আমার আসে না আর। এসব আমার জন্যে নয়। সারা হাতে ফোসকা উঠে, গলে ঘা হয়ে গেছে। আর দুদিনের মাত্র কাজ বাকি আছে। বৃষ্টিও নেমে গেছে। এই কাদায়, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে জ্বরও হয়ে গেছিল। এখানে তো আর মা পিসিমা নেই যে অসুখ হলেই ওষুধ খেলাম, আরামে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলাম। গরম গরম চা খেলাম। জরি-বুটি করেছি। শরীর এখনও দুর্বল।

আমি বললাম, এই নে, মামাবাবু তোকে একশো টাকা পাঠিয়েছেন, এখন তোর শ্রাদ্ধে লাগা একে।

ও এক দৌড়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল। বলল, এসব টাকার কথা এখানে বোলো না। মা শুনলেই নিয়ে নেবে। এ আমার টাকা। অনেক দিন ধরে একটা ভাল রেডিও কিনব ভাবছি। কলকাতায় গিয়ে পুরনো রেডিওটা বেচে একটা ভাল রেডিও কিনব। আমার মা বড় সেয়ানা মেয়েছেলে। এ টাকার কথা জানলেই নিয়ে নেবে।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোর বাবা-মা না খেয়ে থাকে, আর তোর এত বাবুয়ানির দরকার কী ?

ও বলল, মা-বাবার অভ্যেস হয়ে গেছে। তাছাড়া, অন্য ভাইরা একেবারেই দেখে না, আমি তো তাও দেখি। সংসারে যে করে তার ঘাড়েই সব বোঝা চাপে। ওসব ভালমানুষি প্রথম প্রথম অনেক করেছি। এখন আর নয়।

আমি আবার চুপ করে গেলাম।

তারপর বললাম, তোর বউ কোথায় ? দু বছর আগে যে বিয়ে করতে এলি সেটাও কি মিথ্যা ?

রাম বলল, ছিঃ ছিঃ সবই কি মিথ্যা ? বিয়ে করেছি। ছেলের বয়স হয়ে গেল চোদ্দো মাস। ছেলেকে তো এইবারই এসে প্রথম দেখলাম। কাল ওরা সব শ্বশুরবাড়ি গেছে। আগামিকালই ফিরে আসবে। শ্বশুরবাড়ি বিশেষ যেতে দিই না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

ও বলল, আমার শ্বশুরটা একটা ছোটলোক।

আমি বললাম, কেন ? ছোটলোক কেন ?

ধ্যুৎ ! আমার বিয়ের সময় বলেছিল আমাকে একটা সাইকেল দেবে আর বউকে রূপোর পায়জোর। আজ অবধি দিল না। ও সব চামারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না আমি।

আমি বললাম, তোর শ্বশুর বুঝি খুব বড়লোক ?

বড়লোক আবার কী ? এই আমার বাবার মতোই অবস্থা।

তবে ? যা বলেছিল না দিতে পেরেছে বলে শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবি না ? ক্ষমা করে দে !

ক্ষমা করার কী আছে ? পণ দেবে বলল, আর সেই পণের জন্যেই বিয়ে করলাম, নইলে আমার বউ-এর যা ছিরি। যেমন রূপ তেমন গুণ। তা ছাড়া বউ তো একটা গয়না। চার বছরে একবার দুদিনের দেখা হবে হয়তো। তার জন্যে কীসের ঝক্কি ঝামেলা ? ওর চেয়ে আমার লক্ষ্মীই ভাল। কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, সিনেমার গান জানত। আমাকে বলেও ছিল বিয়ে করতে—ওই তোমার মেসোমশায়ের সঙ্গে লেগে না গেলে তো বিয়েই করে ফেলতাম। তোমরা বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়েই দিলে, তার আর কী হবে ?

আমি ভাবছিলাম, রাম ওর নিজের বাড়িতে, নিজের পরিবেশে স্বচ্ছন্দে যে সব কথা আমাকে বলছে তা কলকাতায় কখনওই বলতে পারত না।

একটু পরে রাম বলল, দাদাবাবু, একটু বোসো। তোমার জন্যে চা করে আনি। এখানে তো ওসব খায় না। আমার কলকাতায় থেকে চায়ের নেশা হয়ে গেছে। তাই মা আমার জন্যে বাড়ি

www.BanglaBook.org

এলেই একটু চায়ের বন্দোবস্ত করে রাখে। যা চা ; ভদ্রলোকের খাওয়ার মতো নয়। একটু বেশি করে আদা দিয়ে নিয়ে আসছি। তুমি আরাম করো।

রাম চলে যাওয়ার পর ঘরটার চার পাশে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। শহরে দারিদ্র দেখেছি আমি। আমার আত্মীয়স্বজন চেনা জানার মধ্যেই অনেকে আছেন যাঁরা শহরের মাপকাঠিতে বেশ দরিদ্র। কিন্তু দারিদ্র্যের চেহারা যে কী তা এখানে না এলে বুঝি জানতাম না। মাটির ঘর, শনের ছাদ। বাখারিতে গোঁজা একটি গামছা, দা কুড়ুল। মাটির হাঁড়িকুঁড়ি। হাট থেকে কেনা ছোট্ট একটি আয়না। লাল প্লাস্টিকের চিরুনি একটা। নীল-রঙা সিল্কের রিবন। ছেঁড়া চটের মতো বিছানা—দুর্গন্ধ তাতে—এক কোণে মাটির উপর বাঁশের চাটাই পেতে রাখা আছে। একটা কাঁথা—শতচ্ছিন্ন। শীতের সঙ্গে লড়ার হাতিয়ার।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, রামের গ্রামে এসে তাকে তার পরিবেশে আবিষ্কার করে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মাবে, মমত্ব গাঢ়তর হবে। কিন্তু এখন দেখছি, না এলেই ভাল করতাম। আসলে রামও একজন বুর্জোয়া। আমার মতো, প্রদীপের মতো, দীপের মতো। ও কলকাতায় যেভাবে থাকে, আমাদের বাড়িতে থেকে থেকে ওর যে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে তাতে ও নিজের মা-বাবা-ভাইকে, ওর গ্রামের মানুষদের আর সমজাতীয় বলে মনে করে না। এমনকী তাদের প্রতি একটা অবিশ্বাস্য প্রচ্ছন্ন ঘৃণা ও অনুকম্পা পর্যন্ত গড়ে উঠেছে ওর। ওর গ্রামের আর দশটা লোকের তুলনায় ও অনেক ভাল থাকে, অনেক ভাল খায় এবং ও ওদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে অনবধানে, অবচেতনে। ওর বাবা-মা গ্রামভুতো আত্মীয়দের শ্রেণীভুক্ত আর নেই ও। ওর সঙ্গে ওদের সকলের একটা শ্রেণীগত বিভেদ গড়ে উঠেছে।

রাম ঘরে ঢুকল। বলল, চা নাও দাদাবাবু।

রামের বাবা দশরথ এল ঘরে। মানুষটা প্রথমে আমাকে যে আনন্দ ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল রামের খবরদারিতে সে মানুষটা ইতিমধ্যেই অনেক দূরে সরে গেছে দেখলাম। এখন আর ভালবাসা নয়, দশরথ ভয় এবং সম্ভ্রম মিশ্রিত দৃষ্টিতে আমাকে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তার ছোটবেলায় যেমন ইংরেজ শাসকদের দেখেছে, দেশীয় রাজ্যের রাজাদের দেখেছে, আর বড় হবার পর দেখেছে যেমন জোতদারদের, শহর থেকে বিদেশি গাড়ি অথবা হেলিকপ্টারে চড়ে বক্তৃতা করতে-আসা ভোট-কুড়োনো নেতাদের। তেমনি করে।

দশরথকে ডেকে কাছে বসালাম। কুপীর আলোটা দশরথের মুখে পড়েছিল। রোদে-পোড়া, জলে-ভেজা, বলিরেখাময় একটি মুখে অভাবি মুখ। যার চাওয়া অতি সামান্য এ জীবনে, অথচ সেইটুকুও পাওয়া হয়নি। এই না পাওয়ার সব ব্যর্থতার জন্যে সে দায়ী করেছে নিজেকে এবং ভগবানের কৃপণতাকে। ওকে কেউ বলেনি যে, ভগবান বলে কোনও দৈব রাজরূপের পুরুষ এসে হাত ধরে তাকে উদ্ধার করবেন না এই পঙ্ক থেকে। তার দুটো হাত, তার হাতের পেশী, তার মস্তিষ্কের শুভ ও সৎ বুদ্ধি এবং দু হাত ভরা সাহসই একমাত্র তাকে অন্য এক আলোর দেশে নিয়ে যেতে পারত হয়তো এ জীবনেই। কিন্তু তা হয়নি। সেই অজানাকে দশরথ জানেনি। শত্রুঘ্নও জানবে না। তার ছেলেও না। ওদের মধ্যে কেউ কেউ শহরে গিয়ে পাতি, নয় তস্যপাতি বুর্জোয়া হয়ে উঠবে। এক বুর্জোয়ার ঘাড়ের রক্ত চুষবে অন্য বুর্জোয়া। ডুবডুবা, বালি-হাঁস, পাতি-হাঁস। তারপর রাজ হাঁস। হাঁসে হাঁসে ছেয়ে গেছে দেশ। দশরথের মতো কাদাখোঁচারা যেমন কাদায় পড়ে ছিল, পড়ে আছে ; তেমনই থাকবে। এই সুন্দর বিরাট আশ্চর্য ঘুমন্ত দেশের গ্রামে গ্রামে।

দশরথের সঙ্গে কী কথা বলব ভেবে পেলাম না। অথচ খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। ভাষাটাও জানি না। কিন্তু মন যখন বাঙ্ময় হয় তখন ভাষাটা খুব বড় একটা প্রতিবন্ধক নয়।

ওকে বললাম, কূপ কাটছ তোমরা ?

ও জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

কত দূরের জঙ্গল ?

ও বলল, দেড় ক্রোশ। সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে রওয়ানা হয়ে যাব।

আমাকে নিয়ে যাবে কাল ?

www.BanglaBook.org

রামের খুব আপত্তি দেখা গেল। ও বলল, তুমি কি পাগল হলে ? সারাদিন খাওয়া-দাওয়া নেই, অত দূরের পথ, বর্ষাকাল, সাপকোপের ভয় ; তা ছাড়া এই চারপাশের জঙ্গলে নেই এমন জানোয়ার, হাতি থেকে খরগোশ অবধি।

যে-রামকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কলকাতায় ফেরত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলাম এখানে, সেই রামের চরিত্রের অন্য একটা দিক লক্ষ করার পরই ওকে আমার কেমন খারাপ লাগতে লাগল। ওর বাবা দশরথের পরিপ্রেক্ষিতে ওকে একটা খল, চতুর, শহুরে শিয়াল বলে মনে হচ্ছিল।

দশরথ বলল, তুই তো কাল সীতা আর লবকে আনতে যাবি শ্বশুরবাড়ি। তুই থাকবি না, বাবু একা এখানে কী করবেন ? তার চেয়ে জঙ্গল বেড়ানো হবে। আপত্তি করছিস কেন ? বাবু তো এসব কখনও দেখেনি।

রাম ওর বাবাকে একটা গালাগালি দিয়ে বলল, বেশি আর বোকো না। তুমি কী জানো ? দাদাবাবু কত যত্ন-আরামে থাকে, কেমনভাবে থাকে—তাদের বাড়ি আমাদের রাজার বাড়ির মতো—তুমি কেন দাদাবাবুকে নিয়ে টানাটানি করছ ? শেষে অসুখে পড়লে কে সামলাবে ? সব দোষ হবে আমার।

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছিল। আমি রামকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দশরথের দিকে চেয়ে বললাম, কাল আমি যাব দশরথ। তুমি সময়মতো আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ো।

ওদের বাড়িতে কোনও কুয়ো নেই। একটাই কুয়ো সারা গ্রামের মাঝখানে। সেখান থেকে শত্রুঘ্ন আমার জন্যে মাটির ঘড়া করে জল এনে এনে উঠোনের এক কোণে রাখা বড় মাটির জালাতে জল ভরে দিল।

চান করলাম। তারপর খেতে গেলাম। দশরথ আর রামের মা যে ঘরে থাকে সে ঘরেরই এক কোণায় দশরথের মা কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করেছিল। গরম গরম লাল চালের ভাত, কলাই-এর ডাল, আর আলু ভাজা। মেঝেতে হলুদ কাঠের পিঁড়ি পেতে বসে পিতলের থালায় খেলাম।

বুঝলাম যে, আমার জন্যে স্পেশ্যাল মেনু হয়েছে আজ। ভাতটা যে কী মিষ্টি তা কী বলব। ভালবাসার হাতে রাঁধা, অনেক সম্মান ও সম্ভ্রমের সঙ্গে পরিবেশিত সেই অতি সাধারণ খাবার খেতে খেতে আমার চোখ ছলছল করে উঠল।

বললাম, তোমরা কি রোজই রাতে ভাত খাও ?

দশরথ বলল, দু বেলা ভাত জোটেই না। একবেলা খাই। এখানের বেশির ভাগ লোক ভাতের সঙ্গে আফিং-এর গুঁড়ো সেদ্ধ করে খায়। তাতেই নেশা হয়। নেশার জোরে সারাদিন কাজ করে। দেখবে, দিনের বেলায় এখানের লোকজনের হাত-পাগুলো সরু-সরু—ওদের চোখগুলো হলুদ হলুদ। তিরিশেই ওরা প্রায় সকলে বুড়ো হয়ে যায়। বেশি দিন ওরা বাঁচা মানেই কষ্ট। যে-ক'দিন নেশার ঝোঁকে চলে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম আমি। শোওয়ার সময় রামকে বললাম, এখানে মাছ পাওয়া যায় ?

ও বলল, পাওয়া যায় ; আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামের টিকর পাড়ায়।

আমি ওকে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, কাল মাছ কিনে আনিস। তোর মা রাঁধবে। ভারী ভাল হাতের রান্না মায়ের।

রাম বলল, এতগুলো টাকা নষ্ট করবে কেন ? এরা এসবের মূল্য বুঝবে না।

রেগে বললাম, সে আমি বুঝব। তোকে যা বললাম, তাই-ই করবি।

এখন গ্রামে কোনও শব্দ নেই। যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। আগুন বা বাতি জ্বালাবার সঙ্গতি নেই, তাই সূর্যের সঙ্গে ওদের ঘড়ি বাঁধা। সূর্য ওঠার আগে ওরা ওঠে। সারাদিনের জন্যে তৈরি হয় আর সূর্য ডোবার এক ঘণ্টার মধ্যে কাজকর্ম শেষ করে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে।

কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে দূরে। বৃষ্টি-ভেজা গ্রামীণ প্রকৃতিতে সেই বাঁশির সুর পিছলে যাচ্ছে। উঠোনে বাঁধা গরু-বাছুরের গায়ের গন্ধ সোঁদা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে। গরুর গলার পিতলের ঘণ্টা বাজছে টুংটাং করে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। শনের চালে তার ফিসফিসানি শোনা

www.BanglaBook.org

যায়। রামের মা বাবাও ফিসফিস করে কথা বলছে ওদের ঘরে। দূরের কোনও বাড়ি থেকে নবজাত শিশুর কান্না ভেসে আসছে। একটা ভোট বাড়ল। কোন দলের কে জানে? কাঠের গরাদ দেওয়া জানালা দিয়ে বাঁশবন দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারে, বৃষ্টিতে মাখামাখি। জোনাকি জ্বলছে চাপ চাপ, নিঃশব্দে। উড়ছে বসছে ওরা। এক আশ্চর্য সুন্দর কিন্তু বড় দুঃখের এই জীবনযাত্রার এক রাতের শরিক আমি; মোহাবিষ্ট হয়ে গেছি।

দশরথ আমার গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙাল। রাম পিতলের গ্লাসে করে চা এনে দিল। দশরথের সঙ্গে ঘটি হাতে প্রাতঃকৃত্য সারতে চললাম ওদের উঠোনের বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে, জঙ্গলে। ঝিরঝির করে একটা নালা বয়ে গেছে জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে। পুবের আকাশে সবে অন্ধকার সরতে আরম্ভ করেছে। একটা সাদাটে ভাব ফুটেছে সেদিকের কালো আকাশে।

দশরথ বলল, বর্ষাকাল। সাপ আছে, বিছে আছে, জোঁকও আছে; সাবধানে যাবেন।

দু মুঠো মুড়ি খেয়ে দশরথের সঙ্গে আমি রওয়ানা হলাম। বেলা বাড়লে, বাস চললে, বাসে করে রাম যাবে টিকর পাড়া। ওর বউ সীতা আর ছেলে লবকে আনতে। এখানের লোকেরা পায়ে হেঁটেই যায়। ওদের হাঁটার অভ্যেস আছে, তা ছাড়া বাসে চড়ার পয়সাও নেই। শহরে থেকে রাম বাবু হয়ে গেছে। হাঁটতে পারে না। তা ছাড়া রাম বড়লোক। বাস থাকতেও বাসে না গেলে ওর সম্মানে লাগে।

একটু হেঁটেই আমরা গভীর জঙ্গলের শুঁড়িপথে এসে পড়লাম। সকাল হয়ে গেছে ততক্ষণে। আমাদের আগে পিছে একজন দুজন করে লোক চলেছে। পরনে ওইরকম খাটো গেরুয়া ধুতি। কারও পরনে শুধুই গামছা। কাঁধে টাঙ্গি। একজনকে দেখলাম দুটো মোষ নিয়ে চলেছে আগে আগে।

শুধোলাম, মোষ দিয়ে কী হবে? জঙ্গলের মধ্যে খেত আছে নাকি?

দশরথ হাসল। বলল, না। মোষ দিয়ে কাঠ টেনে আনবে জঙ্গল থেকে। তারপর ঠিকাদার নিয়ে যাবে সেই সব কাঠ ট্রাকে করে নানান জায়গায়।

জঙ্গলের মধ্যে ট্রাক যাবার পথ আছে বুঝি?

দশরথ বলল, প্রত্যেক বছর ঠিকাদারেরা নিজের নিজের জঙ্গলে রাস্তা বানিয়ে নেয়। পুজোর পর থেকে বর্ষার শুরু অবধি কাজ চলে।

কত যে পাখি ডাকছে চারধার থেকে। কী একটা জানোয়ার তীক্ষ্ণ স্বরে জঙ্গলের বুক চিরে কেঁয়া কেঁয়া করে ডাকছিল, থেকে থেকে।

চমকে উঠে বললাম, ওটা কী?

দশরথ অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে, বলল, ময়ূর। বর্ষাকাল তো! এখন ময়ূররা খুব ডাকাডাকি করে, পেখম ধরে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলতে একটুও ক্লান্তি লাগে না। বর্ষার দিগন্তবিস্তৃত নরম সবুজ বন-পাহাড়ের বুক চিরে চলে-যাওয়া জানোয়ার এবং মানুষের পায়ের দাগে গড়ে ওঠা পথ ধরে অনেকদূর চলে এলাম।

হঠাৎ আমাদের সামনে দিয়ে একদল চিতল হরিণ লাফাতে লাফাতে পথটাকে আড়াআড়ি পার হয়ে গেল। ভাল করে দেখার আগেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের দ্রুত ধাবমান শরীরের পরশে ঝোপঝাড় লতাপাতা থেকে টুপ-টাপ শব্দে বৃষ্টিতে জমা-জল ঝরে পড়তে লাগল নীচে।

দেড় ক্রোশ রাস্তা দেখতে দেখতে শেষ হল। এখানেই ঠিকাদারের ডেরা। জলের সুবিধার জন্যে একটা ছোট পাহাড়ি নদীর পাশে পাশাপাশি দাঁড় করানো ও লতা দিয়ে বাঁধা, মাটি দিয়ে লেপা কাঠের দেওয়াল ও শনের চালের বড় ঘর। মধ্যে বাঁশের মাচা। তার উপরে মুহুরী শোয়। মুহুরীর পরনে গাঢ় নীল রঙের লুঙি, সাদা ধবধবে হাতওয়ালা গেঞ্জি, পায়ে প্লাসটিকের পাম্পশু, হাতে স্টিলের ব্যান্ডে বাঁধা হাতঘড়ি। কাঁধে ঝোলানো ট্রানজিস্টর। স্ট্যাটাস্ সিম্বল।

মুহুরীর বয়স বেশি নয়। বাইশ তেইশ হবে। অষ্টম ফেল। অর্থাৎ, ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল। সেই-ই এখানে ঠিকাদারের প্রতিভূ। তার হাঁটা-চলা, কথাবার্তা উদ্ধত এবং কর্তৃত্বময়।

www.BanglaBook.org

কথায় কথায় সকলকে গালাগালি করছে সে! তার অধস্তন আরও দুজন কর্মচারীদের এবং কূপ-কাটতে-আসা সমবেত কুলিদের উপর খবরদারি করছে।

সেই ডেরারই পাশে অনেকগুলো সার সার শনের ঝুপড়ি—তাতে দূরাগত অনেক কুলি রাত কাটায়। তাদের ঝুপড়ির সামনে তিনটে করে পাথরের উপর বসানো আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া মাটির হাঁড়ি—। কারও ভাত রান্না হয়ে গেছে, কারও হয়নি। কারও কারও খাওয়াও শেষ। তখনও কাঠের ও ভাতের ধোঁয়া বেরুচ্ছে উনুন ও হাঁড়ি থেকে।

দশরথকে শুধোলাম, এরা কী দিয়ে ভাত খায়?

ও বলল, শুধু ভাতই খায়, কেউ কেউ নুন দিয়েও খায়। কখনও কিছু তরকারি পেলে তাও সেদ্ধ করে। কখনও শিকারি এলে বা মুহুরীরা শিকার করলে মাংস খায়। ন'মাসে ছ'মাসে একবার। অনেকে আফিং-এর গুঁড়ো সেদ্ধ করে খায় ভাতের সঙ্গে, কাল যেমন বলেছিলাম।

মুহুরী আমাকে বিশেষ খাতির যত্ন করল। লোকটা বিশেষ শ্রেণী-সচেতন। আমার দামি সিগারেটের প্যাকেট, গ্যাস লাইটার, পোশাক-আসাক দেখে আমি যে ওর মালিকদেরই শ্রেণীর সে বিষয়ে ও নিশ্চিন্ত হয়েছিল। আমাকে নারকোলের দড়ি দিয়ে বোনা একটা মোড়া মতো জিনিসে বসতে দিল ও। চা খাওয়াল এবং ভিমভাজা খাব কিনা জিজ্ঞাসা করল।

একটু পরে ও হঠাৎ আমার কাছে এসে সমারোহ সহকারে একটা সিগারেট চাইল। এবং সিগারেটটা নিয়ে তার টিনের তৈরি পেট্রলের লাইটার দিয়ে কুটুং করে আগুন ধরিয়ে, গাঁজার কল্কের মতো করে সিগারেটটা ধরে একটা বিষম টান দিয়ে ওর জ্বলন্ত প্রভুত্বের আগুন সকলকে দেখিয়ে তার নির্বিবাদ মালিকানা সম্বন্ধে গাছ-গাছালির নীচে বসে—দাঁড়িয়ে থাকা কাছে-দূরের মনুষ্যেতর মানুষগুলোকে নিঃসংশয় করল।

একটি লোক এসে ওকে বলল, আজ কি টাকা পাওয়া যাবে? দশ দিন হয়ে গেল, এখনও কেউই পেলাম না বাবু। বউ ছেলে মেয়ে না খেয়ে রয়েছে।

মুহুরী কিছুক্ষণ লোকটার দিকে তাকাল, তারপর সিগারেটের ছাইটা ওর প্রায় মুখের ওপরই ঝেড়ে ফেলে বলল, এ জঙ্গলে সব গাছই আছে। শুধু টাকার গাছ নেই। টাকা দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার কাজ তোদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। বাবুর পরশুই আসার কথা ছিল কিন্তু বাবুর বন্ধুরা এসেছেন ভুবনেশ্বর থেকে। তাঁদের নিয়ে লবঙ্গীর জঙ্গলে বাবু শিকারে গেছেন। সব ভারী ভারী বন্ধু। বড় বড় সরকারি অফিসার, ব্যবসাদার। তাঁদের তো তোদের কারণে ফেলে দিতে পারবেন না বাবু।

লোকটি একটু অন্যরকম। সে তেরিয়া হয়ে বলল, তা বাবু না আসতে পারলে কী হল? রোজ ট্রাক আসছে, ইচ্ছে করলে বাবু টাকাটা কি ড্রাইভারের হাতে পাঠাতে পারতেন না?

মুহুরী চটে গেল। বলল, বেশি কথা বলবি কি এক হাত খাবি। বলেই, ডাকল, কপিলা, এই কপিলা...

কপিলা নামক একটি বুড়ো লোক এগিয়ে এল।

মুহুরী বলল, তুমি তো এদের সর্দার। এদের বুঝিয়ে বলোনি? এরা কেন এসে আমাকে বিরক্ত করে? যা বলার তুমিই বলবে আমাকে এসে। এদের সকলের কথা শোনার আমার সময় নেই।

বুড়ো বলল, ঠিক ঠিক। ওই ছেলে-ছোকরাদের কথা শোনো কেন?

তারপরেই কপিলা আমার কাছে একটা সিগারেট চাইল।

ওকে সিগারেটটা দিয়ে আমি ধরিয়ে দিলাম।

হঠাৎ আমার তখন দশরথের কথা মনে পড়ল। বললাম, দশরথ তুমি কি সিগারেট খাও?

দশরথ মিষ্টি করে হাসল, বলল, আমি মাঝে মাঝে তামাকু খাই। ওই সব কোথায় পাব?

আমি বললাম, খাবে একটা?

দশরথ বলল, না না। এত ভাল জিনিস নষ্ট করবে কেন আমাকে দিয়ে। আমার ওসবে অভ্যেস নেই। জঙ্গল জায়গা, তোমার কম পড়ে গেলে অসুবিধে হবে।

কটক থেকে এক কার্টন সিগারেট কিনেছিলাম আমি। জানতাম যে, কম পড়বে না। জোর করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশরথকে দিলাম একটা।

দশরথ আপত্তি সহকারে নিল। তারপর যে ছেলেটি এগিয়ে এসে মুহুরীর সঙ্গে কথা বলেছিল তাকে আধখানা ছিঁড়ে দিল। তারপর আমার লাইটারের প্রত্যাশা না করে ভাত-ফোটানো একটা উনুনের কাছে গিয়ে গাছ থেকে সরু কাঠি ভেঙে আগুনে দিয়ে তা থেকে ধরিয়ে নিল।

মুহুরী কথা বলার সময় মধ্যে মধ্যে দু-একটা ইংরেজি শব্দ বলছিল। ও যে বিদ্বান তা দেখাবার জন্যে। ও বলল, ওদের বেশি লাই দেবেন না স্যার। ছোটলোকদের ছোটলোকের মতোই রাখতে হয়। দূরে দূরে। নইলেই ঘাড়ে চড়ে বসে। ট্রাবল্ দেয়।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোমার বাড়ি কোথায় ভাই ?

ও বলল, করত্পটা।

তারপর বলল, করত্পটা মানে জানেন ? করত্ মানে করাত ; স।

আমি বললাম, ও !

তারপর বললাম, আর ওদের বাড়ি ?

কাদের ?

ওই যে ছেলেটা এসেছিল টাকা চাইতে, কী নাম ওর ?

ওর নাম রামকৃষ্ণ। ওর বাড়িও করত্পটা। ও ছোট জাতের লোক। দশরথটার এত বয়সেও বুদ্ধি হল না। আপনার দেওয়া সিগারেট ও ওকে দিয়ে দিল আর্ধেক।

তারপর বলল, এরা আনএডুকেটেড। এ-বি-সি-ডিও জানে না। এদের সঙ্গে কুকুর বেড়ালের মতো ব্যবহার করলে তবে এরা ঠিক থাকে।

ওরা এবারে সকলে কাজে গেল। মোষগুলো আগেই গেছিল। যেখানে ওরা কাঠ কাটছে সে জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূর নয়। কাঠ কাটার শব্দ আসছে। লোকজনের গলার। কাঠ ঠেলে নামানো ও মোষের গাড়িতে বোঝাই করার সময় ওরা গলা মিলিয়ে গান গাইছে। গানগুলি গাইবার ধরন ও ওদের উল্লাস দেখে মনে হল গানগুলো অশ্লীল। অশ্লীলতাও আফিং-এর গুঁড়োর মতো ওদের আর একটা ঘুমপাড়ানি নেশা, যে নেশা দৃষ্টিকে, ভাবনাকে অস্বচ্ছ করে, আসল দ্রষ্টব্য থেকে চোখকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে।

কাল, বাসে আসতে আসতে নানা জায়গায় এবং এখানে হেঁটে আসবার সময় গভীর জঙ্গলের মধ্যে আরও যে-কটি এক-মুঠো গ্রাম দেখলাম, তা দেখে এই-ই মনে হয়েছে যে, জনসংখ্যাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। পপুলেশন এক্সপ্লোশন কথাটা কী তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই ভয়াবহতা অজানা থাকে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও দেশের সবচেয়ে প্রধান ও মূল সমস্যাটা নিয়ে কোনও দলই মাথা ঘামান না। দেশের ভাল করতে গিয়ে ভোটের ক্ষতি করার মতো মূর্খ রাজনীতিক এদেশে আজকে আর নেইই। বরঞ্চ প্রতি রাতে যদি নেতাদের নিজেদের বিনা চেষ্টাতেই ভারতের ধুলোতে, কাদাতে দারিদ্রে তাদের লক্ষ লক্ষ ভোটার বাড়ে তাতে তো তাদেরই মঙ্গল। এই দশরথকে রামকৃষ্ণকে রামকে, এমনকী নবীন মুহুরীকেও যত সহজে ভোট দেওয়ানো যায় কোনও মনোমতো বাক্সে, আমাকে দিয়ে তো তা হবে না। তাই, এই আশ্চর্য পরিহাসের গণতন্ত্রের পঙ্কে যত পদ্ম ফোটে রাজনৈতিক নেতাদের পদযুগল ততই পদ্মশোভিত হয়।

মুহুরী বলল, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করি ? মুরগি আছে। ডিম আছে। কী খাবেন বলুন স্যার ?

আমি বললাম, দশরথরা কী খাবে ?

ওদের কথা ছাড়ুন। ওরা যা খায়, খাবে ; তা কি আপনি খেতে পারবেন ? ওরা কি মানুষ নাকি ?

আমি হেসে বললাম, ওরা মানুষ নয় বুঝি ?

মুহুরী বলল, নাঃ। এই জঙ্গলে যেমন নানারকম জানোয়ার আছে। ঝিংক, গন্ধ, পে ওড়া, খুরান্টি, বরা ; ওরাও তেমনই। ফুল কুড়িয়ে, মূল খুঁড়ে হাঁচরে পাঁচিয়ে কোনওক্রমে বেঁচে থাকে। না কালচার, না এডুকেশান, না কিছু। ওদের আমি মানুষ বলে মনে করি না।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে, ক্ষুদ্রতম পাতিবুর্জোয়াগুলো রাজ বুর্জোয়াদের চেয়ে অনেক বেশি

www.BanglaBook.org

ভয়াবহ জীব। কাল রামকে দেখলাম এবং আজ নবীন মুহুরীকে।

মুহুরী বলল, বলুন বলুন কী খাবেন ?

তারপরই বলল, একটু ড্রিঙ্ক করবেন নাকি স্যার ?

আমি অবাক হলাম না। নবীন মুহুরীও, কলকাতার ক্লাবে পার্টিতে দেখা সুবেশ, সম্ভ্রান্ত অনেকানেক চরিত্রের মতো, নিজের শ্রেণীর ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েই অন্য উচ্চতর (?) শ্রেণীতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে।

আমি হাসিমুখে বললাম, ড্রিঙ্ক ? এখানে ? কী ড্রিঙ্ক ?

ও বলল, পাওয়া যায় অনেকরকম, কিন্তু এখন পানমৌরীই আছে শুধু। ফোরেন লিকার আমার কাছে নেই। আমার বাবু থাকলে খাওয়াতে পারতাম।

আমি বললাম, পানমৌরী ? সেটা কী জিনিস ?

মৌরী ফুলের থেকে হয়। জিনিস, ফার্স্ট ক্লাস। আপনি আজ রাতে থেকে যান না স্যার। আমার মালিক যদি না আসেন তা হলে এখানে টিপ-টিজ করে দেব আপনার জন্যে।

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না।

অবাক গলায় বললাম, টিপ-টিজ মানে ?

নবীন মুহুরী হাসল। বলল, আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন স্যার ? কলকাতার সাহেব আপনি আর টিপ-টিজ জানেন না ?

তারপর বলল, আমাদের ডেরা থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বিড়িপাতার জঙ্গল আছে। ওখানে ঠিকাদারের কাছে কামিনরাও কাজ করে। যদিও ওদের ক্যাম্প ভেঙে গেছে তবে কুলি-কামিনদের যেতে এখনও দু-একদিন বাকি। তিন-চারটে মেয়ে নিয়ে আসবে। আমার ট্রানজিস্টারে ঝিং-চাক গান বাজবে আর আমরা পানমৌরী খাব আর ওরা টিপ-টিজ করবে।

আমি চুপ করে থাকলাম।

নবীন মুহুরী বলল, কী হল স্যার ? রাগ করলেন ?

আমি বললাম, রাগ করব কেন ? ভাবছি, তুমি আমাকে এত খাতির-যত্ন করছ কেন ? তুমি তো আমাকে চেনোই না।

নবীন ওর ঘড়ি-পরা হাতটা হাঁটুর ওপরে চাপড়ে বলল, এই জঙ্গলে একা পড়ে থাকি এই জংলি জানোয়ারদের সঙ্গে—একেবারে বোর হয়ে গেলাম স্যার।

আমি বুঝলাম, এই বাক্যটি নিশ্চয়ই তার মালিকের কাছে শোনা। নইলে করতপটার অষ্টম-ফেল ছাত্রের পক্ষে 'বোরড় হয়ে গেলাম' এর মতো শহুরে অভিব্যক্তি জানবার কথা নয়।

ছেলেটি বেশ ইন্টারেস্টিং। মালিককে খুব ভাল অনুকরণ করেছে ও। একেবারে প্রোটোটাইপ্। মালিকরা এইরকম চাকরদেরই পছন্দ করে। এদেরই উন্নতি হয়। নবীন মুহুরী কখনও হয়তো এই জংলি ঠিকাদারির সামান্য অংশের অংশীদার হবে একদিন। এই একই প্রক্রিয়ায় বড় বড় কোম্পানিতে বোর্ডরুমে ঢোকেন এ-বি-সি-ডি শেখা সিগারমুখো, পাইপ-খেকো লোকেরা। প্রক্রিয়াটা একই। শুধু ক্ষেত্র ও পরিবেশ আলাদা।

দুপুরে দশরথের সঙ্গে বসেই খেলাম। একটা বড় তেঁতুল গাছের নীচে কালো চ্যাটালো পাথরের উপর। পাথরটার নাম দশরথই বলেছিল। ও গামছার ভিতরে কচি শালপাতার দোনায় মুড়ে গুলগুলো আর বিড়ি-বড়া এনেছিল। সঙ্গে ছিল নুন, কাঁচাকলা আর পেঁয়াজ।

চারদিকে ওরা সকলে এখনও কাজ করছিল। বুঝলাম যে, এখানে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি নেই। ওরা ভোরে খেয়ে কাজ শুরু করে আর সূর্যাস্ত অবধি কাজ করে। তারপর ঝুপড়িতে ফিরে আবার কিছু খায়।

আমার খাতিরেই আজ দশরথকে বুঝি ছুটি দিল মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে। নবীনের অধস্তন কর্মচারী এবং কাচের গ্লাসে চা বানিয়ে নবীন ওর লোক দিয়ে সেখানে পাঠিয়েও দিল।

দশরথ প্রায় কিছুই খাচ্ছিল না। বলল, আমি তো কোনও দিন কাজে এসে এ সময় খাই না বাবু, আমার অসুবিধে হবে কাজ করতে।

www.BanglaBook.org

তারপর বলল, আমাদের এখানে পোড়পিঠা বলে একরকম মিঠাই হয়, রামকে বলব, যখন যাবে আপনার ও বাড়ির সকলের জন্যে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

একটা বিড়ি-বড়া ও গুলগুলো খেয়েই দশরথ নদীতে আঁজলা ভরে জল খেয়ে আবার কাজে গেল।

বেশ লাগছিল জায়গাটা। মেঘলা দুপুরের ছায়াশীতল কাকলিমুখর জঙ্গল—মাঝে মাঝে শুধু মানুষের গলার আওয়াজ ও দূরের কাঠ কাটার আওয়াজে ছিদ্রিত হচ্ছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে পাথরটার উপরে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। নদীর ওপারে দূর থেকে কী যেন একটা জানোয়ার গম্ভীর বুক-কাঁপানো গমগমে এবং গা ছমছম ডাক ডাকছে থেকে থেকে।

দশরথ দৌড়ে এসে আমাকে বলল, বাঘ বেরিয়েছে বাবু, তুমি এখানে একলা আছ তাই দৌড়ে এলাম। চলো চলো, ডেরায় চলো। ওখানে পোড়ো আছে আর আগুন আছে, ওখানে ভয় নেই।

আমি বললাম, পোড়ো কী?

ও বলল, পোড়ো মানে মোষ।

আমরা বড় বড় পায়ে ডেরায় ফিরে এলাম। সেখানে দেখি সব লোক জমা হয়েছে। ভাবলাম, বাঘের ভয়ে।

দশরথ বলল, বাঘের ভয়ে ওরা সকলে এখানে জমা হয়নি। ওদের ভয়ের কাছে বাঘের ভয় কিছু না। তিন দিন ধরে মালিক আসবেন আসবেন করছেন। ওদের সকলের দশ দিনের মজুরি বাকি। কারওরই টাকা না পেলে অচল। তাই আজ মালিক না আসা অবধি ওরা অপেক্ষা করবে, তারপর হিসাবপত্র করে টাকা নিয়ে রাতটা, যারা এখানেই থাকে তাদের সঙ্গে কিছু মুখে দিয়ে ঝুপড়িতে শুয়েই কাটিয়ে দেবে। তা হলে কাল আবার কাজ-টাজ সেরে সন্ধেবেলায় যার যার গ্রামে ফিরে যেতে পারবে টাকা নিয়ে।

আমি বললাম, কিন্তু বাঘ বেরিয়েছে যে?

দশরথ হাসল। বলল, বাবু বলে বাঘ বেরোবে না তো শহরে বেরোবে? বাঘ বাঘের মতো থাকবে। ভেবেছিলাম, আমরা তোমার পথে চলে যাব দিনে দিনে। টাকার জন্যে থেকে তোমাকে তো অসুবিধেয় ফেললাম।

আমি বললাম, অসুবিধের কী? আমি তো একা নই। তুমিও তো আছ। তা ছাড়া আমার এখানে কাজটা কী?

নবীন বলল, মালিকের এতক্ষণে এসে যাওয়ার কথা। এ জঙ্গলে সন্ধ্যার পর হাতি বেরোয়। এক যদি হাতিতে পথ আটকে থাকে তো আলাদা কথা।

রামকৃষ্ণ বলে ছেলেটি হঠাৎ বলল, এটা অন্যায়। তিন দিন হল হপ্তা পুরেছে, রোজ ট্রাক আসছে, মাল গেদে নিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের টাকাটা বাবু পাঠাতে পারলেন না ড্রাইভারকে দিয়ে?

হঠাৎ, নবীন মুহুরী চিতার মতো এক লাফে ওর দিকে গিয়ে ঠাস করে এক চড় মারল ছেলেটিকে।

ছেলেটি, ভেবেছিলাম, হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, হয়তো এক ঝটকায় ওর টাঙ্গিটা তুলে নেবে, কিন্তু ছেলেটা কিছুই না করে মুখ নামিয়ে নিল।

বলল, আমার ছেলেটার খুব অসুখ। দরকার ছিল...বড়।

এমন সময় সেই বুড়োটা, যে কুলিদের সর্দার, কপিল, সে এগিয়ে এসে বলল, কী হল? আমি সর্দার এখানে থাকতে গোলমালটা কীসের?

তারপর বলল, দ্যাখো মুহুরীবাবু, এটা ভাল নয়।

নবীন তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, যা যা, আমাকে ভাল-মন্দ শেখাস না।

নবীনবাবু, আমরা তোমাকেই জানি, বাবুর সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? তুমি টাকাটা এই তিন

www.BanglaBook.org

দিনে আনাবার বন্দোবস্ত করলে না কেন ?

নবীন তার বয়স অনুপাতে অনেক বেশি সাহসী এবং ঠাণ্ডা মাথার লোক। ব্যবসাদাররা এবং তাদের অনুগত কর্মচারীরা সব সময়ই তাই-ই হয়।

অবস্থা বেগতিক দেখে হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ও বলল, বুড়োকেও দেখি ভীমরতিতে ধরল ! বাইরে বাঘ ডাকছে, মেঘও গুড়গুড় করছে, কোথায় একটু চা খাওয়ার কথা বলবে, একটু গান টান হবে, নাঃ। যত্তো সব...

তারপরই নবীন গলা চড়িয়ে ওর একজন অনুচরকে বলল, বড় হাঁড়িতে করে চায়ের জল বসা। আজ সকলকে চা খাওয়া রে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, আপনার কোনও চিন্তা নেই। যত রাতই হোক, সঙ্গে শিকারি আর টর্চ দিয়ে দশরথের সঙ্গে আমি আপনাকে জঙ্গল পার করিয়ে দেব। নিশ্চিন্তে থাকুন বাবু।

আমি বললাম, চিন্তা কীসের ? তুমি যখন আছ।

ওই বুড়োটাকে সকলেই এক সঙ্গে কপিলা কপিলা করে ডাকছিল। সব কুলিরাই দেখলাম টাকা না পাওয়ার কারণে বেশ উত্তেজিত।

নবীন চায়ের তদারকিতে ডেরার ভিতরে গেল। এমন সময় পুটুর পুটুর করে বৃষ্টি নামল আবার। পাতায় পাতায়, ঘাসে লতায় টুপুর টাপুর শুরু হল। হঠাৎ হাওয়া ছাড়ল বনে বনে। সেই হাওয়ার দমকে দমকে বৃষ্টির ছাঁট আসতে লাগল ডেরার বাইরের খোলা ঘরে।

আমি অবাক হয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম। অন্ধকারে দেখা যায় না বলেই জানতাম এতদিন, কিন্তু অন্ধকার নিজেও যে দেখার মতো এমন একটা বস্তু তা দশরথের সঙ্গে আজ জঙ্গলে না এলে জানতে পেতাম না। শহরে লালিত-পালিত আমি, আমার জীবনে ও স্মৃতিতে এই দিনটি ও রাতটির অভিজ্ঞতার মতো খুব বেশি কিছু থাকবে বলে মনে হচ্ছিল না।

এমন সময় বাঘটা আবার ডাকল। ভেজা বন-পাহাড়ে সে ডাক দিকে-দিগন্তরে ছড়িয়ে গেল। দশরথরা খুব একটা গ্রাহ্য করল না। কে যেন বলল, আগুনটা জোর করতে। মোষগুলো ডেরার বাইরে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। তারা বাঘের ডাক শোনামাত্র গোল হয়ে বিভিন্ন দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে।

বাঘটা ডাকতে ডাকতে দূরে চলে গেল। তার গম্ভীর ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে বন প্রান্তরে উড়ে গেল। বৃষ্টিটাও ধরে গেল, যেমন হঠাৎ এসেছিল...তেমনই।

কুলিরা সব বাইরে চলে গেল। কেউ ঝুপড়ির সামনে, কেউ ফেলে রাখা কাঠের গুঁড়িতে, কেউ পাথরে ফাঁকা জায়গা দেখে সবাই বসে পড়ল। ঝুপড়ির সামনে আগুনগুলো জোর করে নতুন করে ভাতের হাঁড়ি চাপাল ওরা। দশরথও ওদের সঙ্গে ডেরার বাইরে গেল।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। এমন সময় নবীন এল। সঙ্গের লোকটিকে বলল, যা, চায়ের হাঁড়ি নিয়ে গিয়ে সকলকে চা দে।

আমাকে গেলাসে করে চা এনে দিল অন্য একটি ছেলে।

নবীনকে একটা সিগারেট দিলাম। তারপর বললাম, তোমার বাবু যদি আজ না আসেন তা হলে কী হবে ? এরা কি খেপে উঠবে ?

নবীন হাসল। বলল, এরা খেপে-টেপে ওঠে না। তবে মালিকেরও কী আক্কেল বলুন তো ? লোকগুলো টাকার জন্যেই তো এই বর্ষায় এমন করে মেহনত করছে ? গরিব লোক, তাও দশ দিন হল, টাকার নাম নেই। অথচ কালই শেষ কাজের দিন। কী যে হবে জানি না।

আমি বললাম, ওদের মধ্যে অনেকেরই কিন্তু মুড ভাল না। যদি খেপে ওঠে ?

নবীনকে সামান্য চিন্তান্বিত দেখাল। তারপরই সে বলল, কিছুই হবে না। বলেই ডাকল, কপিলা, এই কপিলা।

বৃষ্টি ভেজা হাওয়ায় গা-শিরশির করছিল। নানারকম লতা-পাতা জংলি ফুল গাছ-গাছালির ও মাটির মিশ্র গন্ধ ভেসে আসছিল হাওয়ায়। তার সঙ্গে মোষগুলোর গায়ের গন্ধও। তার মধ্যে মিশেছিল কাঠের আগুনের গন্ধ এবং ফুটন্ত ভাতের গন্ধ। শেষ গন্ধটা বড় মিষ্টি। ভাতের গন্ধ যে

www.BanglaBook.org

এত মিষ্টি হয় তা এর আগে কখনও বুঝিনি। আমার খুব খিদে পেয়েছিল। জীবনে খিদে কাকে বলে তেমন করে জানিনি কখনও। খিদের পটভূমিতে ফোটাভাতের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হলাম আমি।

কপিলা বুড়ো ঘরে ঢুকল। ঢুকেই বলল, এই মহুরীবাবু, আজ কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত হবেই।

নবীন ওর কথাকে পাত্তা না দিয়েই বলল, কী হবে না হবে সে আমি বুঝব, তুই কী খাবি ?

কী খাব ?

বুড়ো অবাক চোখে তাকাল।

নবীন ইশারায় হাত দিয়ে দেখাল : তারপর বলল, পানমৌরি ?

কপিলার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, দে দে। কোথায় ? বৃষ্টিতে ভিজে এক্সা হয়ে গেছি। সোঁদা হাওয়ার গা সিরসিরানি কি শুধু চায়ে যায় ?

তারপরই বলল, সকলকে ডাকি, কী বল ?

নবীন তক্ষুনি বলল, সকলের কথা জানি না। আমি শুধু তোকে খাওয়াতে পারি। একা। সকলে আর তুই কি এক হলি ? তুই রাজা আর ওরা তোর প্রজা।

কপিলা এক সেকেন্ড যেন কী ভাবল। তারপর বলল, তা আন।

নবীন ভিতর থেকে এনে বোতল দিল কপিলাকে। কপিলা লোভীর মতো বোতলটা দু হাতে আঁকড়ে প্রথমেই কিছুটা ঢকঢক করে খেয়ে নিল, তারপর আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

নবীন আমাকে বলল, স্যার আপনার ড্রিঙ্কস ?

আমি বললাম, আমি বেশ আছি।

রাত যখন প্রায় নটা বাজতে চলল তখনও নবীন মুহুরীর খালিকের টিকি দেখা গেল না। আমার তখন দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। বাইরের লোকগুলো গোরগোল শুরু করছে। ওদের মধ্যে আমি আর দশরথ এবং শত্রুঘ্ন ছাড়া কেউই ফিরে যাবে না। ওরা বারংবার কথার খেলাপ হওয়াতে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কে যেন বাইরে থেকে ডাকল, কপিলা, এই সর্দার।

কপিলা বাইরে গিয়ে একবার দাঁড়াল। ওরা একসঙ্গে কী সব বলল ওকে। ও বলল, ঠিক ঠিক, তোমরা ঠিকই বলেছ।

ভিতর থেকে নবীন ডাকল, কপিলা।

লোকগুলো বলল, তুমি যা বলবে আমরা তাই-ই করব সর্দার।

কপিলা বলল, আমি জানি।

কে একজন ছোকরা চেঁচিয়ে বলল, আজ আমরা ছাড়ছি না মুহুরীবাবু। যা হবার তা হবে। কাল বিকেলেই আমরা সব চলে যাব। টাকার জন্যে এই বর্ষায় আর থাকব না জঙ্গলে পড়ে।

নবীন আবার ডাকল, কপিলা।

কপিলা ভিতরে ঢুকতেই কপিলার সঙ্গে সঙ্গে দশরথ এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল নবীনের সামনে, বলল, তুমি শিকারি শিব্বকে সঙ্গে দিলেও আমি এই বাবুকে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এতখানি পথ নিয়ে যেতে পারব না। আজ রাতের মতো বাবুর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ো মুহুরীবাবু আর খাওয়া-দাওয়ারও।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, বড় পাপ হল দাদাবাবু। আসলে তুমি এসেছ সেই জন্যেই আমার টাকাটার বড় দরকার ছিল। তোমাকে একটু খাতির যত্ন করতাম তা দিয়ে। কাল বিকেলে পেলে দেরিও হয়ে যাবে অনেক। তুমি তো কালই চলে যাবে বলছ। তাই আশায় আশায় ছিলাম যে, সন্ধের মুখে মুখে টাকাটা নিয়ে চলে যাব। এখন এই জঙ্গলে তোমাকে নিয়ে যাবার সাহস হয় না আমার। এ জঙ্গল বড় খারাপ। জানোয়াররা তো আছেই, তা ছাড়াও দেবতা ও ওনারাও আছেন।

তারপর আবার বলল, কী মুহুরীবাবু ?

নবীন, তার জ্যাঠার বয়সী দশরথকে, তার দিকে না তাকিয়েই বলল, ভাগ তো ছোঁড়া ! বাবুর দায়িত্ব আমার। তুই এখন পালা তো এখান থেকে।

www.BanglaBook.org

দশরথ থতমত খেয়ে চলে গেল।

নবীন কপিলাকে কাছে ডেকে বলল, কী ? আজকাল বুঝি পানমৌরি ভাল লাগে না তোমার ? খাচ্ছই না যে একেবারে ?

কপিলার চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছিল। জিভও জড়ানো। বলল, ভাল লাগে না ? কে বলল ?

নবীন আরও একটা বোতল এনে দিল কপিলার সামনে, বলল, খা খা বুড়ো, তাড়াতাড়ি খা। কখন বাবু এসে পড়বে আর খাওয়া হবে না তোর। বলেই, বুনো হাওয়ায় কান পেতে কাল্পনিক জিপের শব্দ শুনতে লাগল নবীন।

কপিলা চকচক করে কুকুরের মতো খেতে লাগল।

কপিলা হঠাৎ বলল, আর আছে ?

নবীন বলল, আছে এবং দেবও তোকে। তবে বদলে তোকে আমার একটা কাজ করতে হবে। আর একটা খেয়েই তোর ওই লোকগুলো একজোট হয়ে ফোঁস ফোঁস করছে যে, তা তোর গিয়ে বন্ধ করতে হবে। রামকৃষ্ণ বলছিল, টাকা না পেলে কাল ট্রাকের চাকার হাওয়া সব খুলে দেবে। বাবুর ড্রাইভার রামচরিত সিংকে ফেরত যেতে দেবে না কটকে। এসব কী কথা ?

কপিলা একটা হেঁচকি তুলে বলল, তাই-ই বলেছে ? এত্ত সাহস ? আমি থাকতে ? আমি না ওদের সর্দার। আমি, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

নবীন বলল, এখুনি না। একটু পরে। এইটা খেয়ে যা।

কপিলা হাসল, বলল, তুই বড় ভাল। তারপর বলল, আমার টাকাটা আমাকে দিয়ে দে, নইলে আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে।

নবীন বলল, তোর কত টাকা হয়েছে ?

আমার মেটে তিন দিনের বাকি। ওরা তো দশ দিনের পায়নি।

নবীন বলল, একটু দাঁড়া। একটু দাঁড়া বলেই ডেরার ভিতরে গিয়ে টাকা নিয়ে এল। কপিলাকে বলল, এই নে তোর তিন দিনের পনেরো করে পঁয়তাল্লিশ আর আরও দশ। তোর কমিশান।

তারপর বলল, আমার কাজটা ?

একদম... ! কপিলা বলল।

নবীন আমার দিকে ফিরে বলল, দেখুন স্যার, দশরথের টাকাটাও আমি দিয়ে দেব। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ও। দশরথের ব্যাপার আলাদা। কিন্তু কুড়িজনকে দশ টাকা করে রোজ দশ দিনের করে দেবার টাকা তো আমার কাছে নেই। আমার মালিক না এলে আমি কী করব ?

কপিলার নেশা পুরো হয়ে গেছিল। বলল, তোর কিছু করতে হবে না, যা করার আমি তো করবই।

নবীন সময় বুঝে কপিলাকে এক ঠেলা দিয়ে ঘর থেকে বাইরে বের করে দিল। তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। ওরা তখনও খায়নি—প্রত্যেকে ভীষণ উত্তেজিত অথচ কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

কপিলার পেছন পেছন আমিও বেরিয়ে এলাম ও কী করে দেখার জন্যে।

নবীন ডেরার ভিতরে মাচায় বসে রইল।

একটা বড় পাথরের উপর দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আবার ঠিকভাবে দাঁড়াল কপিলা। উঁচু জায়গায় না-দাঁড়ালে নেতারা বক্তৃতা করতে পারে না। ওর হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি। স্ট্যাটাস্ সিম্বল। সেই কঞ্চিটা শূন্যে নেড়ে নেড়ে ও বলতে লাগল, তোরা এত উতলা কেন ? বাড়িতে আমার বউ বাচ্চারাও কি খেয়েছে গত দশ দিন ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে একটা হেঁচকি তুলে বলল, আমার নিজের কি কোনও বুঝ আছে ? আছে আমার বুঝ এই-যে, আমি তোদের সর্দার। আমার নিজের চেয়ে তোদের ভালটা দেখি আগে। তোরা না খেলে আমারও খাওয়া হয় না !

খালি গায়ে, বৃষ্টি-ভেজা কুঁকড়ে-থাকা লোকগুলো এক সঙ্গে হইহই করে উঠল। বলল, আমরা কি

www.BanglaBook.org

বলেছি তোমাকে না খেয়ে থাকতে ?

কপিলা বলল, তাই-ই তো বলছিস। তোরা যেমন হই-হল্লা লাগিয়েছিস তাতে তো তাই-ই মনে হচ্ছে। যদি টাকা কালও না পাস তা হলেই বা কী ? আমি তো মরে যাইনি। তোদের টাকার জামিন আমি রইলাম। কাল কাজ শেষ হবার পরও যদি টাকা না পাস তো আমি তোদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে যার যার টাকা তাকে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। এই কথা দিলাম আমি। একটু ধার-ধোর করে চালিয়ে নে।

কে যেন বলল, আমাদের ধার দেবে কে ? গরিবকে কেউ ধার দেয় না। যার টাকা আছে তাকেই দেয়। ধার দিলে তো কথা ছিল না।

আবার কথা ! কপিলা চেঁচিয়ে উঠল কক্ষি নাড়িয়ে। নেতার উপর কথা !

তারপর বলল, আর কোনও কথা নয়। যা বলার আমি বলে দিয়েছি। শেষ কথা। আমি যা করি, বা বলি, সব তোদের ভালর জন্যে। তোদের জন্যেই আমার সব গেল। আর কেউ মুহুরীর কাছে গিয়ে ওকে বিরক্ত করবি না। যার যার মতন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। এই আমার আজ্ঞা।

কপিলার কথা শেষ হতে না হতে দেখি জঙ্গলের মধ্যে দুটো লাল আলো কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে। ও কী ? বাঘের চোখ ? বাঘের চোখ কি জঙ্গলে রাতের বেলায় এরকম দেখায় ? শহুরে-আমি এ বিষয়ে পড়েছি শুধু, অভিজ্ঞতা বলতে কিছুমাত্র নেই।

হঠাৎ কারা যেন কথা বলে উঠল। রাম। রামের গলা। লণ্ঠন হাতে দুটো লোক আর রাম এসে ডেরার সামনে গাছতলায় দাঁড়াল।

রাম ডাকল, বাপ্প এ বাপ্প।

দশরথ দৌড়ে এল। দশরথ সামনে আসতেই রাম যাচ্ছেতাই করে দশরথকে গালাগালি করল। বলল, তুমি বেজন্মা বুড়ো, মরলে মরো ; আমার বাবুকে তুমি কোন আক্কেলে এই জঙ্গলে নিয়ে এলে ? এলেই যদি, সময়মতো বাড়ি ফিরলে না কেন ? কতবার মানা করলাম।

দশরথ মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

নবীন মুহুরী বাইরে এসে বলল, তোমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে ?

বন্দুক কোথায় পাব ? টাঙ্গি নিয়ে এসেছিলাম। পথে ভালুকে তাড়া করেছিল। গ্রামের লোক দুটি বলল, রামের বাবুর কোনও ক্ষতি হলে রাম কলকাতায় ফিরে মুখ দেখাতে পারবে না, পুলিশ ধরবে ওকে। এই বুড়োটা কিছু বোঝে না।

দশরথ বলল, টাকা না নিয়ে গেলে দাদাবাবুকে আদর-যত্ন করতাম কীভাবে ? কাল তো শুধু কলাই-এর ডাল আর ভাত খাওয়ালাম। তাতে তোর লজ্জা করল না ?

সে আমি বুঝতাম। রাম ঝাঁঝের সঙ্গে বলল। বাবু আমার। তোমার নয়।

আমি বললাম, রাম, অনেক হয়েছে, এবারে চুপ কর। বাবার সঙ্গে এভাবে কথা বলে ?

রাম বলল, ছাড়ো তো ! এ যেন তোমাদের বাবা। এ ছোটলোক গেঁইয়া বাপ—কীসে কী হয় তা বোঝে না। টাইম জ্ঞান নেই।

নবীনকে বললাম, ওরা যখন তিনজনে এল তখন আমরা তিনজনে মিলে ছ'জন হব। চলে যাই আমরা।

নবীন বলল, মশাল জ্বালিয়ে যাবেন স্যার। হাতিগুলো বড় পাজি এখানের।

তারপর নবীন ডাকল আমাদের ডেরার ভিতরে।

দশরথ আর শত্রুঘ্নর টাকা মিটিয়ে দিল ও।

কপিলা এক কোণে বসে আর একটা বোতল নিয়ে খাচ্ছিল। আত্মত্যাগী, দেশহিতৈষী, জনগণের নেতা কপিলা। ওর মুখে লণ্ঠনের আলো পড়েছিল।

হঠাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল যে, ওর সঙ্গে সরিৎমেসো এবং প্রদীপের বাবার মুখের আশ্চর্য মিল আছে।

রওয়ানা হবার আগে রাম বলল, একটু জল খাব। যে ছেলেটা আমাকে দুপুরে চা দিয়েছিল পাথরের উপর, ছেঁড়া কাপড় পরা, হাড় জিরজিরে, পেটফুলো, তাকে জল আনতে বলল নবীন রামের

www.BanglaBook.org

জন্যে।

রাম শহরে থাকে, তার জামার কাপড়ের ছিট ও ছাঁট, তার চুলের কায়দা, হাতের হাতঘড়ি দেখে নবীন মুহূর্তের মধ্যে তাকে তার নিজের শ্রেণীর বলে চিনতে ভুল করেনি।

নবীন বলল, একটু চা হবে নাকি ?

রাম বলল, না না, আমার মা-বউ হাঁ করে বসে আছে। এতক্ষণে বাবু বাঘের পেটে গেছে কি হাতির পায়ের তলায় সেই ভেবে অবস্থা কাহিল, আর চা খেয়ে কাজ নেই।

ছেলেটা জল নিয়ে এল ঘটি করে, সঙ্গে গ্লাস।

রাম বলল, তোর জাত কী ?

ছেলেটা কী যেন বলল, ওদের ভাষায়, বুঝলাম না।

রাম একলাফে সরে গিয়ে বলল, ধ্যাৎ, তুই ছোট জাত, তোর হাতে জল খাব না।

আমার বড় রাগ হল। আমাদের বাড়িতে ও এতদিন আছে, দিদাইয়া বুধাই সকলেই আমাদের কাছে সমান, জাতের কথা মানলে রামও এমন কিছু শ্রেষ্ঠী নয়, কিন্তু ওর অন্য মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার !

ছেলেটার হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে আমি রামকে বললাম, আমার হাতে খাবি তো ? এই নে, খাঃ। বলে জল ঢালতে গেলাম।

রাম আবার বলল, ছিঃ ছিঃ। পাপ হবে। এ কী কথা !

তারপর নবীনকে বলল, একটু জল ঢেলে দাও তো ভাই।

যে ছেলেটা জল নিয়ে এসেছিল, সে রামের চেয়ে জাতে নিচু, আর আমি রামের মতে জাতে ওর চেয়ে উঁচু, কারণ আমি মালিকের জাত তাই রামের জল খাওয়াই হত না যদি নবীন না থাকত !

ফেরার সময় মশাল জ্বালিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে আমরা এগোচ্ছিলাম। দিনের বেলা যে জঙ্গল-পাহাড়কে একরকম দেখেছিলাম, রাতের বেলায় মশাল আর লণ্ঠনের আলোতে সেই জঙ্গল-পাহাড়কেই একেবারে অন্যরকম, অপার্থিব, রোমাঞ্চ বলে মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ পথের পাশে ঝনঝন আওয়াজ করে কী যেন একটা ছুটে গেল।

আমি বললাম, কী ? কী ওটা ?

দশরথ ঠাণ্ডা গলায় বলল, ও কিছু না, ঝিংক।

ঝিংক কী ? রামকে শুধোলাম আমি।

রাম বলল, ওই যে হয় না ? কাঁটাওয়ালা জানোয়ার, শুয়োরের মতো কিন্তু শুয়োর নয়।

আমি বললাম, শজারু ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, রাম বলল।

শাপগ্রস্তা অহল্যার মতো প্রস্তরীভূত, ভাগ্য-বিশ্বাসী একদল সৎ, সরল কিন্তু বিবস্ত্র, বুভুক্ষু নীরব নিঃশব্দ-পদসঞ্চার মানুষের পিছন পিছন আমি মশালের আলোয় আলোকিত বনের শুঁড়িপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম অনেক কথা ভাবতে ভাবতে !

ভাবছিলাম, এই আমার দেশবাসী ! এই আমার দেশ : সুন্দর মহৎ কিন্তু এক প্রাগৈতিহাসিক শ্লথ অজগরের মতো নিশ্চল, হতভাগ্য এই ভারতবর্ষ !

রাজা দশরথ আগে আগে চলেছিল। ন্যুব্জ হয়ে। পিছনে তার তালেবর শহরের আলোকপ্রাপ্ত ছেলে। অন্য ছেলে শিক্ষিত হওয়ায় তাকে ত্যাগ করেছে। আর একজন সচ্ছল হওয়ায়। এ দশরথ সে দশরথ নয়। এই রামও সেই রাম নয়। এ এক অন্য রামায়ণের রাজ্যে এসেছি আমি।

৭

মামিমা বললেন, খোকা তোর ফোন।

কে ? মামিমা ?

কে হতে পারে ?

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, রাই ?

মামিমা হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ।

আমি দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলাম। রাই ওর মা-বাবার সঙ্গে ভুবনেশ্বর পুরী আরও নানা জায়গায় গেছিল। নিশ্চয়ই ফিরেছে।

রাই রুমির বন্ধু। রুমির সঙ্গে এক স্কুলে পড়ত। তারপর রুমি দিল্লি চলে যায় আর ও এখানে। রুমি যখনই আসত রাই তখনই ঘনিষ্ঠ হত। তারপর রুমি দূরে চলে গেল ধীরে ধীরে, রাই আর আমি কাছাকাছি এলাম।

রাই বলল, কী খবর ? কেমন আছ ?

আমি বললাম, তুমি কেমন বেড়ালে বলো ?

ও বলল, আমার চিঠি পাওনি ?

পেয়েছিলাম।

উত্তর দিলে না যে বড়। ঠিকানা দিয়ে এত করে লিখলাম উত্তর দিতে।

কী লিখব আবার। এসেই তো গেছ তুমি।

তুমি ভীষণ আনরোমান্টিক।

আমি বললাম, ভাল চিঠি না লিখতে পারলে চিঠি লেখার কোনও মানে হয় না। মার কাছে শুনেছি অনেকবার, বাবার এক বন্ধু, উনিও আর্মির অফিসার ছিলেন, মাকে চিঠি লিখতেন :

রাণী তোমরা কেমন আছ ?

আমার খবর :

১ : এখানে গরম

২। ডানদিকের নীচের পাটির শেষ দাঁতে ব্যথা

৩। বইটা পড়া শেষ হয়নি

৪। রণেনকে রাগ না-করতে বোলো।

ওভার।

—সায়ন।

তারপর বললাম, তুমি কি এরকম চিঠি পেলে খুশি হতে ?

রিসিভারে রাই-এর চাপা হাসি ভেসে এল। বলল, তোমার মনেও থাকে সব পুরনো কথা। নয়তো বানিয়ে বানিয়ে বলছ। এত্তো ছেলেমানুষ না তুমি।

আমি বললাম, মেয়েদের কাছে ভালবাসার জন মাত্রই ছেলেমানুষ।

আহা রে ; কত শিওর নিজের সম্বন্ধে ! বেশি ওভার-কনফিডেন্ট হয়ো না, এখনও ব্যাক-আউট করে যেতে পারি।

গেলে পস্তাবে। আমি বললাম।

এজ ইফ তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার ? রাই বলল।

থাকবে না কেন ? তবে আমার মতো কেউই নেই। আমি যে আমিই।

ঈসস, কী প্রাউড !

আমি বললাম, গুণীরা একটু প্রাউড হয় ; কী করা যাবে ?

রাই হেসে ফেলল, বলল, গুণ তো রাখার জায়গা নেই। আলমারি কিনতে হবে রাখতে !

আমি বললাম, বিয়ের সময় তোমার বাবা কি একটা আলমারি পর্যন্ত দেবেন না যাতে আমার গুণগুলো তুমি যত্ন করে গুছিয়ে রাখতে পারো ?

ইয়ার্কি মেরো না। আমার বাবার বয়েই গেছে ! আমাকে তুমি কীসে রাখবে, কেমন করে রাখবে, তাই-ই ঠিক করো আগে, তারপর তোমার গুণ রাখার কথা হবে।

সে সব ঠিক করা আছে, মনে মনে। ভিডুয়ালাইজারের মতো আমি মনে মনে সব ছকে রেখেছি। কোথায় শোবে, কীরকম হবে তোমার নাইটির রঙ, কোথায় কোন বারান্দায় বসে আমার দিকে কুশ-আইল্যান্ডের কোনও কেলে-মেয়ের মতো প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে, তুমি সকালের প্রথম

www.BanglaBook.org

কাপ-ও থাকে— সব। আরও অনেক কিছুই ভেবেছি, যেমন...

থামো তুমি। শোনো, কাজের কথা আছে। এবারে পুজোয় দাদা বউদি আমাদের যেতে লিখছে ডুমিয়াতে।

কেন? তোমার দাদার বাড়িতে সেই সময় চাকর-ঝি থাকবে না বুঝি?

তুমি কোনও সিরিয়াস ব্যাপার সিরিয়াসলি নিতে জানো না।

ভাগ্যিস জানি না। জানলে যে আমার কী হত তাই ভাবি মাঝে মাঝে।

না, না। ইয়ার্কি নয়। শোনো, দাদাকে লিখতে হবে...

কেন? আগে থেকে এত চিঠিচিঠির কী দরকার? আমি কি কোসিগীন, না তুমি মার্গারেট থ্যাচার?

দ্যাখো, সব সময় এরকম করলে ভাল লাগে না। সামনে ক্যালেন্ডার আছে? কবে থেকে ছুটি নিতে পারবে একটু দেখে বলো।

না থাকলেই তো ভাল! তোমার সুন্দরী বউদি তো থাকবে। দাদা কবে থেকে কবে থাকবে না জানাও, আমি একাই চলে যাব।

আমি ফোন রেখে দিচ্ছি। রাই এবার সত্যিই রেগে বলল।

রাগ কোরো না। ধরো, ক্যালেন্ডার দেখি।

ও বলল, ধরে আছি। তাড়াতাড়ি দ্যাখো।

এবারে পুজো কত তারিখ থেকে আরম্ভ?

আঃ, তার কি আমিই জানি? সেপ্টেম্বরের শেষে হবে। দ্যাখো না, তিনটে কি চারটে লাল এক সঙ্গে সেপ্টেম্বরে, তার মানেই পুজো।

ক্যালেন্ডার দেখে বললাম, মহালয়ার দিন থেকে লক্ষ্মীপুজো অবধি। অতদিন তোমার দাদা খাওয়াতে রাজি থাকবে তো?

আমার দাদা তোমার মতো নয়। তা হলে ওকে লিখছি তারিখ। আজই লিখে দিচ্ছি কিন্তু। টিকিট কি তুমি কাটবে? না আমি বাবাকে বলব?

এয়ার-কন্ডিশানড ক্লাসে একটা ক্যুপে নিতে বোলো। ট্রেন ছাড়লেই তোমাকে...

এত অসভ্য!

আমি বললাম, আহা! যেন কত খারাপই লাগবে?

তুমি, তুমি সত্যিই একটা আটার্লি গ্রস, আনসিভিলাইজড...

আমি সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করলাম—প্রিন্স চার্মিং। তাই না?

তারপরই বললাম, শোনো, তোমার বাবাকে বোলো যে তুমি যখন হানিমুনে যাবে, তখন যেন অন্তত এ-সির ক্যুপের টিকিটই কেটে দেন। এখন আমিই কাটছি। টু-টায়ার।

টু-টায়ার। সেটা কী?

আমি বললাম, তুমি আমার নীচে শুতে চাও, না উপরে?

তার মানে?

মানে, কোন আসন?

কী, বলছ কী? বুঝতে পারছি না।

তুমি তো কোনারক বেড়িয়ে এলে।

আমি ফোন কিন্তু সত্যিই ছেড়ে দিচ্ছি। রাই বলল।

ছেড়ে দিলে তুমিই ঠকবে। শেষকালে জড়াজড়ি হয়ে যাবে। টিকিট কাটার আগে বলো।

আমি কখনও টু-টায়ারে চড়িনি।

আমি চড়তাম না কখনও, আমার বাবা রেলের সেলুন পেলে। কিন্তু আমার তো নিজের পয়সায় যাতায়াত করতে হয়—। আমি টু-টায়ারই কাটব। জনারণ্যে কী করে প্রেম করতে হয় তা তোমাকে শেখাব—তুমি এমন বড়লোকের নেকু-নেকু, পিয়ানো-বাজানো ইনসিপিড্ মেয়ে হয়ে থাকতে পারো না চিরদিন। বিদ্যাবুদ্ধিতে আমার তোমার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট লক্ষ লক্ষ মানুষ থ্রি টায়ার টু-টায়ারেই

www.BanglaBook.org

যাচ্ছেন ; তাতেই যেতে হবে। ওসব চালিয়াতি করলে আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। যেতে হবে না তোমার।

দ্যাখো ! গ্রেট কোরো না। রাই বলল।

তা হলে যেয়ো না।

রাই একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি কি সত্যিই স্লিপারে যাবে ?

সত্যিই যাব। কারণ এখন আমার যা যোগ্যতা, যা মাইনে তাতে তার চেয়ে বেশি এ্যাফোর্ড করতে পারি না। যৌবনে কষ্ট করলে তবে না বার্ধক্যে আরাম। তা ছাড়া তোমার তো আবার সোফিয়া লোরেনের মতো ঘর-ভর্তি ছেলেমেয়ে পছন্দ। তাদের জন্যে প্রভিশান করতে হবে না ? এ-সিতেও চড়ব, একগাদা বাচ্চার মাও হব—অত কী করে হবে ?

রাই বলল, উঃ। ইনকরিজিবল্।

বলেই, ফোন ছেড়ে দিল।

আমি মনে মনে হাসছিলাম। আসলে আমার মুড খুব ভাল ছিল। তিন মাস নতুন অফিসে জয়েন করেই জানতে পারলাম ভবিষ্যতের কথা। কাল এম-ডি ডেকেছিলেন। কভেনান্টেড গ্রেড পাবই আমি। কোথাকার ফ্ল্যাট পছন্দ উনি জিজ্ঞেস করলেন। আপাতত মে ফেয়ারে কোম্পানির একটা ফ্ল্যাট আছে। দু হাজার স্কোয়ার ফিটের। আলিপুরেও একটা। একতলায়। ও ফ্ল্যাটটা ছোট কিন্তু সঙ্গে এক চিলতে লন আছে। আর মে ফেয়ার রোডের ফ্ল্যাটটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ। গাড়িও পাব, উইথ শোফার। মেডিক্যাল বেনিফিট্স। বছরে একবার ছুটি এক মাসের। এয়ারকন্ডিশনড ক্লাসে অথবা প্লেনে ট্রাভল করার খরচ। ফ্রি-লাঞ্চ অফিসে।

এমনিতেই তো ফাইভডেজ উইক আমাদের। এক সঙ্গে দু'দিন ছুটি—অনেক কিছু করা যায়। দু'জন চাকরের মায়নাও পাব কোম্পানি থেকে। প্লাস আমার মাইনে হবে তখন সাড়ে তিন হাজার মতো। প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ট্যাক্স কেটে টেক-হোম অবশ্য হবে মাত্র দু হাজার। তবে এই গ্রেডে উঠে গেলে সপ্তাহে চারদিন অন্তত ডিনারের নেমন্তন্ন থাকে। মানি বিগেটস্ মানি। এ্যারিথমেটিক্যাল প্রগ্রেশানে স্ট্যাটাস বাড়লে জিওমেট্রিকাল প্রগ্রেশানে খরচ কমে। দুটো ক্লাবের মেম্বারশিপ ফ্রি। ভাবছি, স্যাটারডে ক্লাব এবং বেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার হব। যদিও আমি একেবারেই ক্লাব মাইন্ডেড নই। তবুও...ইট্স অল ইন দ্য গেম।

এম-ডি বললেন, তিন চার মাসের মধ্যেই কনট্রাক্ট সই করব তোমার সঙ্গে আমরা। তার আগে কোম্পানির জন্যে একটা স্পেশ্যাল কাজ তোমাকে করে দিতে হবে। তুমি ছাড়া আর কারও দ্বারা সে কাজটা হবে না।

গর্বে আমার বুক ফুলে গেছিল। বলেছিলাম, নিশ্চয়ই করে দেব স্যার।

রাই-এর মা বাবা আমার পুরনো চাকরির তৎকালীন অকৌলিন্য সত্ত্বেও আমার প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন। রাই-এর পাণিগ্রহণের কথাটা আনুষ্ঠানিকভাবে বলিনি যদিও তবু আমাদের বাড়িতে এবং ওদের বাড়িতে প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছিল যে আমাদের বিয়ে হবেই। আজ আর কাল। তাই আজই যখন না বলে কয়ে সন্ধেবেলা রাইদের বাড়িতে এই সুসংবাদটি দিতে যাব তখন রাই এবং রাই-এর মা বাবা খুব অবাক এবং খুশি হবেন।

মা কিন্তু খুশি হননি।

বলেছিলেন, এ কেমন উন্নতি যে, বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাটে উঠে যেতে হয় ?

মাকে বলেছিলাম, আজকালকার চাকরিতে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। পার্টি দিতে হয়, পার্টিতে যেতে হয়, নইলে উন্নতি হয় না, ব্যবসা হয় না ; জাতে ওঠা যায় না, পুরনো পারিবারিক পরিবেশে ঠিক মানায় না। তা ছাড়া সকলেরই আজকাল নিজের মত আছে। প্রত্যেক মেয়েই চায় যে, তার নিজের একটা আলাদা সংসার থাকুক, যে সংসারের সে নিজেই একা কর্ত্রী।

মা আমার ঘরের ইজিচেয়ারে আধাশুয়ে ছিলেন। মা সোজা হয়ে বসে বললেন, হয়তো তাই, সকলেই চায় ; শুধু আজকালকার মেয়ে কেন সবকালের মেয়েরাই তাই চেয়ে এসেছে। কিন্তু না-পেলেই কি জীবন অসার্থক হয় রে খোকা ? আমি তো পাইনি রে। তোর বাবা যখন মারা

www.BanglaBook.org

গেলেন তখন তুই আড়াই বছরের। মোটে পাঁচ বছর স্বামীর সঙ্গ পেয়েছিলাম। তারপর তো দাদার বাড়িতেই। তুই ছাড়া আমার কেউই ছিল না। তোকে বড় করে মানুষ করে তোলাই একমাত্র চাওয়া ছিল জীবনে। কখনও নিজের কথা ভাবিনি, নিজের দিকে তাকাইনি। ভেবেছিলাম শেষ জীবনে ছেলে-বউ নাতি-নাতনি নিয়ে যা সময় থাকতে পাইনি তার স্বাদ পাব, অনেক সাধ মেটাব।

আমি বললাম, মেটাবেই তো ? তুমি তো আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

মা বললেন, তা হয় না, সব মেয়েরাই সংসারের কর্ত্রী হতে চায়, তুই-ই বললি। সেখানে আমি থাকলে যদি তোর বউ-এর সঙ্গে কর্তৃত্ব নিয়ে ঝগড়া হয় ? সেটা খুব লজ্জার হবে।

আমি বললাম, রাইকে তো তুমি দেখেছ। রাই কি ওরকম মেয়ে ?

মা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার চোখে মার চোখ।

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। হঠাৎ আমার মনে হল অনেক বছর আমি মায়ের মুখের দিকে ভাল করে তাকাইনি। লেখাপড়া, খেলাধুলো, বন্ধু-বান্ধবী, ভবিষ্যৎ এই সব নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলাম যে, বহু বছর এই সংসারে আমার একমাত্র আপনজন আমার গর্ভধারিণী মায়ের মুখেও তাকাবার অবসর হয়নি একবারও।

মায়ের ফর্সা মুখে নীল শিরাগুলো ফুটে উঠেছে। বেশ রোগা হয়ে গেছেন মা। চোখের কোণে কালি পড়েছে, চুলগুলো পেকে গেছে অলকের কাছে পুরোপুরি। চশমার আড়ালে মায়ের চোখ দুখানিকে বড় ক্লান্ত, আশাভঙ্গ দেখাল। মায়ের লো-ব্লাডপ্রেসার ডায়াবেটিস্...

আমি আবারও বললাম, তুমি এমন কেন করছ মা ? রাই কি খারাপ মেয়ে ?

মা হাসলেন। বললেন, সবাই ভাল। রাই তো খুবই ভাল মেয়ে। নইলে তোর পছন্দ হবে কেন তাকে ? সে কথা নয়। কথাটা এই যে, আমি তোদের সঙ্গে থাকলে আমার যত-না অসুবিধে হবে, তোদের হবে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি মেয়ে হয়ে রাই-এর কথাটা যেমন বুঝছি তোর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হবে না। আমি যা বলছি সে তোদের সুখের জন্যেই। এখানে যখন তোরা থাকতে পারবি না, তখন আমিই এখানে...

আমি রাগ করে বললাম, তাহলে বলো চাকরি বাকরি ছেড়ে দিই। বিয়ে করারও দরকার নেই, সারাজীবন মামা-মামি এবং তোমার সেবাযত্ন করি ?

মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, খোকা, আমি তা বলিনি তোকে।

তারপর কী যেন বলতে গিয়ে বললেন, আসলে আমি...।

বলেই, মা উঠে চলে গেলেন।

আমার ভাল মুডটা খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু কী করব ? রাই এবং রাই-এর মা বাবা আমাকে এত ভালবাসেন। এ একটা দারুণ ভালবাসা। মা তো ছোটবেলা থেকেই আমার। মা তো আমারই। পুরনো মা। মায়েরা বড় অবুঝ হন। মুখে বলেন, তোমার ভালই আমার ভাল, তোমার বউ-এর ভালই আমার ভাল। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কী চান তা স্পষ্ট করে বললেই হয়।

আমি আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

চুল আঁচড়াচ্ছিলাম আমি। আমার চেহারাটা ভালই। প্রায় ছ' ফিটের মতো লম্বা শ্যামবর্ণ ; শার্প ফিচারস আমার। দশ বছর থেকে টেনিস খেলে খেলে ফিগারটা পাঞ্জাবিদের মতো—বাঙালিদের মতো ঢ্যাঁড়শ মার্কা নয়। আমি স্মার্ট। ভাল ইংরিজি বলতে পারি। আমার ম্যানারস্ ভাল। ইংরিজিটা লিখিও ভাল—লোকে বলে। অফিসিয়াল কনফারেন্সে আমি ডিসকাসনস্-এ প্রিডমিন্যান্ট ভূমিকা নিই। পার্টিতে স্পার্কলিং কনভার্সেশনিসট্ বলে আমার সুনাম আছে। আমার অফিসের সিনিয়র অফিসারদের স্ত্রীরা আমার চারপাশে ভিড় করে থাকেন যে কোনও পার্টিতে। রাই উইল হ্যাভ রীজনস টু বি প্রাউড এবাউট ইট। এন্ড আ লিটল জেলাস টু।

রাই-এর চেহারা এবং কথাবার্তাও একেবারে কেতাদুরস্ত। এ্যান আইডিয়াল ওয়াইফ অফ আ কনভেনাস্টেড অফিসার। আমরা এনগেজড্ হতে যাচ্ছি শুনে আমার ইমিডিয়েট বস্, আমাদের এস-ডি, সেলস ডিরেকটর আমাকে আর রাইকে ক্যালকাটা ক্লাবে একদিন ডিনারে ডেকেছিলেন।

www.BanglaBook.org

রাইকে দেখে এবং ওর সঙ্গে কথা বলে তো উনি প্রায় প্রেমে পড়ে যাবার জোগাড়। জানি না, আমার প্রোমোশান ত্বরান্বিত করার পিছনে রাই-এরও কোনও ভূমিকা ছিল কি না। পরের দিনই এস-ভি অফিসে আমাকে ডেকে বলেছিলেন, কনগ্রাচুলেসানস্ টু উ্য। উ্য আর ভেরি লাকি। তবে এরকম ফুল তাড়াতাড়ি তুলে তোমার ফুলদানি সাজাও। অন্য কেউ জানতে পেলে বিপদ তোমার।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম যে, রাইকে আমার ফুলদানিতেই আসতে হবে। সব দিক দিয়ে আমার মতো ছেলে রাই কোথায় পাবে? কত ছেলেকেই তো ও জানত। ভাবছিলাম, কাল যে উন্নতির কথা হল চাকরির, তার পিছনের কারণগুলো কী কী?

আমার চেহারাটা ভাল মানলাম। কিন্তু আমার আর আর যে গুণপনা, তার চেয়েও অনেক বেশি গুণপনাসম্পন্ন ছেলেদের আমি জানি।

যেমন সুবীরদা।

আমাকে বাড়িতে ম্যাথম্যাটিকস পড়াতেন যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। সেদিন দেখা হল অনেক বছর পর ড্যালহাউসিতে। হাতে ছাতা। শার্টের কলারের নীচে রুমাল দেওয়া, পাছে শার্ট একদিনেই ঘামে নষ্ট হয়ে যায়। একটা মার্চেন্ট ফার্মে কেরানির কাজ করেন। বি এস-সি পাশ করার পর আর পড়াশুনোই চালাতে পারেননি ওঁর বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায়। পাঁচজন ভাই-বোন ছিল। তাদের মানুষ করছেন। দু বোনের বিয়ে দিয়েছেন। নিজে বিয়ে করেননি। হয়তো আর করবেনও না। সময় পেরিয়ে গেছে। কী কাজ করেন শুধোতে বললেন, লেজার কীপার। খাতা লিখি। শিখে নিয়েছি।

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, অঙ্কের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র লেজার কীপার?

উনি বললেন, চাকরি তো আমার মতো হল না, আমাকেই চাকরির মতো হতে হল।

আমি পরমুহূর্তেই নিজেকে ধমকে বললাম, ফরগেট ইট। প্রত্যেক অসফল লোকেরই একটা করুণ ছুতো থাকে। এই কারণে, সেই হয়নি। যেন বাবা অসময়ে না মরলেই সুবীরদা একজন দারুণ কেউকেটা হতেন।

মা একদিন বললেন, পুজোর দিন কটা থেকে গেলে হত না?

আমি বললাম, না মা। কথা দিয়ে ফেলেছি।

পুজোর মধ্যে এখানে করার কী আছে? লাউডস্পিকারের চিৎকার, পথে-ঘাটে গ্রাম-গঞ্জের ঘেমো-গন্ধ লোকগুলো আদেখলার মতো ভিড় করে আসে। জানাশোনা বন্ধুবান্ধব সকলেই প্রায় বাইরে যাচ্ছে। কেউ গাড়িতে, কেউ ট্রেনে, কেউ প্লেনে। কোভালম, কুলু-মানালি, কাঠমাণ্ডু, গোয়া। বাড়িতে রুমিটা থাকলেও তাও হত। অল্পবয়সী কেউ নেই। বুড়ো-বুড়িদের উঃ আঃ। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, উপোস, গেঁটেবাত, ডায়াবিটিস্, সরবিট্রেট্, চ্যবনপ্রাস, সরবেকস-টি, ই-সি-জি, আকুপাংচার, ব্লাড সুগার, ক্লোরোস্টেরল... ইমপসিবল্।

শুকনো-কাশি, নাক-ভরভর, কান-কটকট, টি-ভি ম্যানিয়া, নয়নতারা ফুল-ভেজানো জল, করলার রস, প্রত্যহ প্রত্যূষে; শিবকালী ভট্টাচার্য—চিরঞ্জীব বনৌষধি—ভারতের সাধক এবং সাধিকা, কীর্তন-ভজন ইত্যাদি ইত্যাদি...

এখানে ছুটি কাটানোর চেয়ে কনসেনট্রেশান ক্যামপে থাকা ভাল।

তার উপর রাম। হতভাগা। এ-বি-সি-ডি না জানা আটারলি—আনএডুকেটেড, আটারলি স্পয়েল্ট ইরিটেবল্ ইরিটেটিং ওল্ড ফুল। হি রিয়্যালি টেলস্ অন মাই নার্ভস দিজ ডেইজ।

এই পরিবেশের মধ্যে রাইকে এনে ফেললে অচিরে সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাতে হবে। রামের সঙ্গে ওর কম্যুনিকেশান গ্যাপটা এতই বড় যে, অসম্ভব।

মা যাই-ই বলুন, সেন্টিমেন্টে যতই সুড়সুড়ি দিন, আমি রাইকে নিয়ে এখানে থাকতে পারব না। আফটার অল আই হ্যাভ ওনলি ওয়ান লাইফ টু লিভ। আগের জেনারেশানের ইডিয়টদের মতো আমরা মা-বাবার দেখাশোনা করে, তাদের ন্যাগিং সহ্য করে, তাদের যাবতীয় ইনকনসিডারেশানের শিকার হয়ে একটা মানডেন, বোরড্ ফানলেস কনস্ট্রেইনড জীবনযাপন করতে রাজি নই।

অন্যকে দুঃখ না দিলে নিজে সুখী হওয়া যায় না। অ্যাকাউন্ট্যান্টরা বলেন, এভরি ডেবিট হ্যাজ

www.BanglaBook.org

আ ক্রেডিট। অন্যর প্রতি কনসিডারেশানের জীবন হচ্ছে সিঙ্গল এনট্রির জীবন...আলটিমেটলি নো-এনট্রির, নন-এনটিটির জীবন।

ন্যাও। আই অ্যাম দ্য লাস্ট পার্সন টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। আমি এই প্রজন্মের ছেলে। আমরা স্বয়ম্ভু। আমাদের পূর্বপুরুষ ছিল কিন্তু তাদের প্রতি কোনও দায়িত্ব কর্তব্য মমত্ব আমাদের নেই। তারা না থাকলেও আমাদের ক্ষতি ছিল না। ক্ষতি হবে না ভবিষ্যতে। সেই সব প্রি-হিস্টরিক সিলি ভ্যালুজ ও ফিলিংস আমরা এই জেনারেশানের ছেলেমেয়েরা টোটালি ডিসকার্ড করেছি।

দে ওয়্যার আ ডিফারেন্ট ক্লাস অ্যান্ড উই আর ডিফারেন্ট। মামা, মামি ও মায়েদের সঙ্গে আমাদের অনেকগুলো জেনারেশানের গ্যাপ হয়ে গেছে।

একটা শ্রেণীগত বিভেদ।

৮

দেখতে দেখতে মহালয়া এসে গেল। মহালয়ার আগের দিন রাতে রাইদের গাড়ি এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল স্টেশনে।

টু-টায়ারের টিকিট কাটিনি। কেটেছিলাম ফার্স্ট ক্লাসেরই। ফার্স্ট ক্লাসের বাথরুম দেখেই রাই নাক সিঁটকাল। বলল, কোনও ডিসেন্ট লোকের পক্ষে এরকম বাথরুম ইউজ করা সম্ভব নয়। ঈসস্ কীরকম সব...আঁ!

আমি বুঝতে পারছিলাম যে, রাই অন্য গ্রহের লোক। এমন কোনও গ্রহ যা এখনও ভয়েজারের চোখেও ধরা পড়েনি। কিন্তু কী করব! আমি মানুষটাই অ্যাডভেঞ্চারাস। ভালবাসলামও যদি, তাও অন্য গ্রহের, অন্য শ্রেণীর মানুষকে।

আমরা দুজনে একা যাচ্ছি না। যেতে পারতাম। সঙ্গে তৃতীয়জনের আবির্ভাব রাইয়েরই ইচ্ছায় কি না জানি না। রাইয়ের সঙ্গে রাইয়ের এক ফার্স্ট কাজিন শ্রীও যাচ্ছে। লোরেটো হাউসে পড়ে। হাঁটুতে চামড়ার তালি লাগানো জিনস্। গায়ে একটা হলুদ গেঞ্জি। দুই স্তনের কাছে লাল অক্ষরে লেখা, বুবস, বী কেয়ারফুল বেইবী।

অহো! কী আনন্দের। দেশটা এক্কেবারে অ্যামেরিকা হয়ে যাচ্ছে। বাঙালি মেয়েরা শাড়ি পরতে ভুলে গেছে—যখন সারা পৃথিবীর মেয়েরা শাড়ির জন্যে পাগল।

রাইকে আমার এই জন্যে ভাল লাগে। আলট্রা মডার্ন হয়েও ও ওর বেঙ্গলিনেসটা কেয়ারফুলি প্রিসার্ভ করেছে। মাঝে মাঝেই শাড়ি পরে। আজ লো-কাটের অফ হোয়াইট ব্লাউজ। দুটি হলুদ স্ল্যাজেঞ্জার টেনিস বলের মতো তার পাথসাট আঁকসাট স্তন দুটির আভাস দেখা যাচ্ছে। কী মসৃণ; নম্রতাময় শক্ত; কী আঁখিলোভা! শান্ত শ্বেতা পাখির মতো সুন্দর পায়ের পাতা ঘিরে কালো নরম লেদারের চটি— ফলস্ লাগানো হালকা লাল শাড়ির কালো পাড় লুটিয়ে পড়েছে। রূপোর পায়জোর ঘিরে রয়েছে পায়ের গোড়ালি।

কম্পার্টমেন্টে আমরা তিনজন। শ্রী বলল, লেটস প্রে, যেন আর কেউ না ওঠে।

রাই বলল, আচ্ছা থার্ড ক্লাসগুলোকে সেকেন্ড ক্লাস করল কেন? আজকাল ট্রেনে তো আর থার্ড ক্লাস দেখি না।

আমি বললাম, তা তো তোমার বাবাকে জিগগেস করলেই পারতে। আসলে শ্রেণী ব্যবস্থা উঠে যাচ্ছে তো এ দেশ থেকে। ওঁরা একটা দাঁড়ি মুছে দিয়ে সহজে সকলকে সমান করে দিলেন। ক্লাসলেস সোসাইটি গড়লেন।

শ্রী বলল, ঋদ্ধিদা, উ্যা সাউন্ড কম্যুনিস্টিক। জ্যাঠা জানতে পারলে কিন্তু খুবই পারটার্বড় ফীল করবেন। হি কান্ট স্ট্যান্ড কম্যুনিস্টস।

আমি হাসলাম। বললাম, ভয় নেই। তোমারও নেই। তোমার জ্যাঠারও নেই। এদেশে কোনও সত্যিকারের কম্যুনিস্ট নেই। এদেশীয় কম্যুনিজম ভাবখাচোর কম্যুনিজম। মাভৈঃ! লেনিনের কথাতেই বলতে হয়...

www.BanglaBook.org

শ্রী ও রাই দুজনেই চোখ বড় বড় করে বলল, তুমি ওসব পড়ো নাকি ?

আমি হাসলাম, বললাম, কেন ? লেনিন কি পর্নোগ্রাফি লিখতেন ? পড়াও কি দোষের ?

তা নয়। তবে...

তবে কী ?

কিছু না। তার চেয়ে গান শোনো। বলেই, শ্রী ওর টেপ রেকর্ডারের বোতাম টিপল।

"লাভ ফর সেল।"

এ্যাডভার্টাইজিং ইয়াং লাভ ফর সেল...

লটস্ এন্ড লটস্ অফ ইয়াং লাভ ফর সেল...।"

আমি বললাম, কী গান এটা ?

ওরা দুজনেই অবাক হয়ে বলল, ওমা। শোনোনি ? বনি এম-এর গান। ফেমাস।

প্ল্যাটফর্মের উপরে একদল মানুষ বসেছিল পুঁটলি নিয়ে। পায়খানায় বসার মতো করে বসেছিল ওরা। থার্ড ক্লাস, স্যরি, সেকেন্ড ক্লাসের নন-রিজার্ভড কামরায় চড়বে এরা পরের ট্রেনে। ওদের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনের সব গাড়িতেই নন-রিজার্ভড সীটে ওদের আনাগোনা। প্রতিটি মুহূর্তেই ধস্তাধস্তি। বেঁচে থাকার জন্যে, একটু বসার জন্যে, একমুঠো খাওয়ার জন্যে।

বসে বসে গায়ে শক্তি সঞ্চয় করছিল ওরা। একটু পরই যুদ্ধ করে কোনওক্রমে ট্রেনে একটু বসার জায়গা করতে হবে ওদের। ওরা টিকিট কেটেছিল। শহুরে গরিবদের মতো ওরা ধাউড় হয়নি এখনও। হবেও না হয়তো কখনও। ক্ষুধাতুর বাচ্চারা কাঁদছিল। মায়ের শুকনো রুক্ষ শুষ্ক স্তন নিয়ে পথের কুকুরের বাচ্চাদের মতো কামড়া-কামড়ি করছিল। আমি রাই এবং শ্রীর বুকের দিকে তাকালাম। এয়ারকন্ডিশানড মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা নীল কাঁচ-ঢাকা লাক্সারি বুক ওদের। আর প্লাটফর্মের মেয়েটির বুক ?

থার্ড ক্লাস।

স্যরি, সেকেন্ড ক্লাস।

যার যেমন যোগ্যতা। ওই মেয়েটির স্বামী এ-বি-সি-ডি শেখেনি, গরিবের ঘরে জন্মেছিল। আমার মতো ইংরেজি বলতে পারে না, লিখতে পারে না, এমনকী নিজেকে নিয়ে নিজের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববে এমন অবকাশ এ জন্মেও ওর নেই। ওর বৌ প্লাটফর্মে বসে থুঃ থুঃ করে তামাক পাতা চিবিয়ে ফেলবে আর ওর বাচ্চারা তার স্তন কামড়া-কামড়ি তো করবেই। ওরা ত ঋদ্ধি মজুমদারের বৌ নয়, প্রদীপ ঘোষের বৌও নয়। ওরা অন-এডুকেটেড, এ-বি-সি-ডি না-জানা মানুষ, নবীন মুহুরীর ভাষায়।

আমাদের কম্পার্টমেন্টে কেউই আর ওঠেনি। ট্রেনটা ছেড়ে দিল। কণ্ডাক্টর গার্ডকে ঘুষ দিয়ে রেখেছিলাম আমি, পাছে পথে টাকা নিয়ে কাউকে ঢুকিয়ে দেয়।

ঘুষই একমাত্র ড্রাইভিং ফোর্স এখন।

ঘুষ দিতে ও নিতে এখন আর কোনও ভারতীয়ের হাত কাঁপে না। আমরা সব স্তরেই এখন এই ব্যাপারটাকে অমোঘ ও অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছি। বিবেকের কম্পার্টমেন্টটিকে কনভিনিয়েন্টলি এবং অ্যাজ আ ম্যাটার অফ নেসেসিটি সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে দিয়েছি মনের ট্রেইন থেকে।

শ্রী ও রাই ঘরের আলো নিবিয়ে আমাকে একটু বাইরে যেতে বলল—। ওরা নাইটি পরবে। খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের। ফ্লাস্কে করে চিকেন ক্র্যাব স্যুপ আর হটবক্সে চিকেনরোস্ট, ব্রেড-রোলস চীজ এবং ক্যারামেল পুডিং পাঠিয়েছিলেন রাইয়ের মা।

রাই বলছিল, আজকালকার দিশি চীজ মুখে দেওয়া যায় না। ক্র্যাফট চীজ, ড্যানিশ বা সুইস বা অস্ট্রেলিয়ান চীজ আজকাল পাওয়াই যায় না।

আমি করিডরে যখন দাঁড়িয়েছিলাম, দরজার কাছে, ট্রেনটা তখন একটা বস্তির সামনে থেমে ছিল।

এখনও হাওড়া থেকে বেশি দূরে আসিনি। ছেঁড়া শাড়ি পরা উদলা বুকের চুলখোলা একজন

www.BanglaBook.org

মেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে কাকে যেন আরও মারো বলছিল ; বলছিল, মাইর‍্যা ফেলাও আমারে মাইর‍্যা ফেলাও ! হাওয়াল মাইয়াগুলারেও বিষ খাওয়াও। এই কষ্ট—এই বাজার—এই কয়ডা টাহায় আমার দ্বারা তোমার সংসার চালান অইব না। আমি পারুম না ! আর পারি না !

যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে খালি গায়ে, অনুতপ্ত মুখে গোঁজ হয়ে বসেছিল। লোকটার মুখ খুব চেনা মনে হচ্ছিল। ওকে আমি চিনি মনে হল। খুব চিনি। কিন্তু ইচ্ছে করে মনে রাখি না। মনে রাখতে ভয় হয় বলে। পাছে ও আমার চোখের দিকে তাকায়।

আমি মুখ নামিয়ে নিলাম।

দরজা খুলে শ্রী বলল, এসো। আমি কম্পার্টমেন্টে ঢুকলাম। সুন্দর পারফ্যুমের গন্ধ। রাই মেখেছে। গন্ধটা আমার চেনা। ইন্টিমেট ? না, না, ইন্টিমেট বোধহয় আজকাল সকলেই মাখে। তার চেয়েও দামি কিছু।

শ্রী হাতে হ্যান্ড-লোশান মাখছিল শোবার আগে। রাই চুল আঁচড়াচ্ছিল। ওকে হালকা নীল-রঙা নাইটিতে হাত উঁচু করে চুল আঁচড়াতে দেখে আমার হঠাৎ ঝড় উঠল শরীরের ভিতর। রাই আমার। আমারই একার।

আমি জানতাম, আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না।

শ্রী বলল, ঋদ্ধিদা, তুমি কি বই পড়বে ? না, আলো নিভিয়ে দেব ?

রাই বলল, নীল আলোটা জ্বালিয়ে রাখো, নইলে রাতে বাথরুমে-টাথরুমে যেতে অসুবিধা হবে।

শ্রী আলো নেবাল। নীল আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াল।

আলো নেবানোর আগে রাই আমার দিকে চাইল চোখ তুলে।

আমি একটা ফ্লাইং কিস ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে নিঃশব্দে।

মুখে বললাম, গুড নাইট।

ওর মুখটা একটা চাপা হলুদ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়েই নীল আলোতে নীল হয়ে গেল।

ও অস্ফুটে বলল, গুড নাইট। হাত নাড়ল। নীল আলোতে ওর হাতের হিরের আংটিটা ঝিকমিক করে উঠল।

শ্রী বলল, গুটেন ন্যাকট্।

ও জার্মান শিখছে। মেয়েটা ভাল।

জার্মান ও খুব তাড়াতাড়ি শিখছে। ফ্রেঞ্চ তো জানেই। কিন্তু শ্রী রবীন্দ্রনাথ পড়েনি। মানিকবাবুর পদ্মানদীর মাঝি পড়েনি, বিভূতিবাবুর আরণ্যক পড়েনি, পড়েনি সুকান্ত। সংস্কৃত অক্ষর চেনে না। ওরাই অধুনা শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রতিভূ। ভাল মেয়ে। ও-ও আমারই মতো হলুদ ব্যাংলনের গেঞ্জি আর জিনস-পরা হ্যারলড রবিনস-এর ভক্ত একজন কভেনান্টেড অফিসারকে বিয়ে করবে। রবিবার স্বামীর সঙ্গে লাল গেঞ্জি পরে গলফ খেলতে যাবে। নয়তো ক্লাবে গিয়ে শ্যানডি খাবে। রামের বাবা দশরথ, রাম, রামকৃষ্ণ সকলকে ইংরেজ মেমসায়েবরা যেমন ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতেন ডার্টি নিগার, তেমন করেই শ্রীও বলবে ; তবে নিরুচ্চারে।

ভোরবেলা আমরা বড় স্টেশানে এসে পৌঁছলাম। রাইয়ের দাদা রূপদা, রূপ মুখার্জী, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে ধবধবে সাদা পোশাকের টুপি পরা ড্রাইভার এবং দুজন আর্দালি।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল রাই। রূপদা ঝুঁকে পড়ে হ্যান্ডশেক করলেন, বললেন নাইস মিটিং উ্য।

তারপর পাইপটা খোঁচাতে খোঁচাতে শ্রীকে বললেন, তোদের জন্যে আমার মর্নিং ওয়াক হয়ে গেল। আমি তো এ-সি কোচের সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। ওখানে না পেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এলাম। ভাগ্যিস সেকেন্ড ক্লাসে আসিসনি—কোম্পানির লোক এই ট্রেনে যাতায়াত করে। আমার বোনকে একগাদা ছোটলোকের সঙ্গে রাত জাগা নোংরা শাড়িতে প্ল্যাটফর্মে নামতে দেখলে একেবারে ইজ্জত ঢিলে হয়ে যেত।

আমার ধাক্কা লাগল একটা। সেই ভোরে মিষ্টি মিষ্টি পুজো পুজো ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিহারের এক স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমার হবু-স্ত্রীর দাদার কথা শুনে সেই প্রথম মনে হল আমার যে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোধহয় এখানে আসাটা অন্যায় হয়েছে। এও মনে হল যে, রাই-এর সঙ্গে সারা জীবনের সম্পর্ক পাতার আগে আমার আরও একটু ভাবা দরকার।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

বড়লোক আমি অনেক দেখেছি জীবনে—। বড়লোক বেষ্টিত হয়েই বড় হয়ে উঠেছি। কিন্তু বড়লোকদের মধ্যে বহু ভাল লোককেও দেখেছি যারা নিজেরা ভাগ্যবান বলেই ভাগ্যহীনদের কথাও ভাবেন। বড়লোক মাত্রই যে খারাপ এবং গরিবমাত্রই যে ভাল এমন ফালতু অন্য-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত স্লোগানে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু রাইয়ের দাদা বড়লোক নন। তাঁর গাড়ি, উর্দিপরা ড্রাইভার, তাঁর কোম্পানি সম্বন্ধে শ্বশুরমশাইসুলভ শ্রদ্ধাভক্তি, সেকেন্ড ক্লাস থেকে বোন নামলে বেইজ্জত হওয়া; এসবই তাঁর অহেতুক চাকুরেসুলভ মনোবৃত্তি। সত্যিকারের বড়লোকের দম্ভ সহ্য করা গেলেও বা যায়; কিন্তু বড়লোকের চাকরের দম্ভ সহ্য করা মুস্কিল।

শ্রী রূপদার কথায় হেসে উঠেছিল।

বলল, রূপদা এমন করে বোলো না। ঋদ্ধিদা মাইন্ড করবেন। ঋদ্ধিদা যে কম্যুনিস্ট।

আমি কিছু বলার আগেই রূপদা বললেন, নো-প্রবলেম। আমার কাজ লেবার নিয়েই। কম্যুনিস্ট ঠাণ্ডা করার কৌশল আমার জানা আছে। এবার চল এগোই।

আমি নিজেকে সপ্রতিভ বলেই জানতাম। কিন্তু খুব অপ্রতিভ হয়ে রইলাম। যেখানে আমার মর্যাদা বা মনুষ্যত্ব হোঁচট খায় সেখানে আমি আমার নিজ সত্তা থেকে সরে আসি। তখন আয়নায় নিজের মুখ দেখলেও কেমন বোকা বোকা লাগে। মুখে কথা সরে না, যদিও মনের মধ্যে ফুটন্ত ভাতের মতো কথা ফুটতে থাকে তখন।

ওভারব্রিজ পেরিয়ে এসে দেখলাম একটা ঝকঝকে কালো অ্যামবাসাডর গাড়ি— সাদা সীট-কভার লাগানো। তার পিছনে একটা জিপ—তাতে মালপত্র যাবে।

একজন বেয়ারা জিপ থেকে দুটো ফ্লাস্ক বের করে আনল। আরেকজন ট্রেতে গ্লাস ও কাপ সাজিয়ে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথম বেয়ারা একটা ফ্লাস্ক থেকে কমলালেবুর রস ঢেলে দিল দুটো গ্লাসে। আর অন্যটা থেকে চা ঢালল দুটো কাপে। তারপর চা দিল আমাকে আর রূপদাকে, ফলের রস দিল ওদের দুজনকে।

তারপরই প্রথম বেয়ারা ফিরে গিয়ে একটা ছোট্ট চীনামাটির বাটিতে করে যেন কী নিয়ে এল।

দেখলাম, দু কোয়া রসুন এবং দুমুঠো মুড়ি।

রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। একবার রাইকে আমি বলেছিলাম যে, সকালের প্রথম-কাপ চা, আমি দু মুঠো মুড়ি ও দুটো রসুন খেয়ে খাই।

রূপদা বললেন, ঋদ্ধি! আমার চাকরিটা আছে তো? এ্যাজ আ হোস্ট?

আমি বললাম, এসব কী? একদিন ব্যতিক্রম হলে কী হত? আমি কি ইন্দিরা গান্ধী না ইন্ডিয়ার অ্যামবাসাডর। ভাঁড়ের চা খেতে কী ভাল যে লাগত— ফর আ চেঞ্জ।

শ্রী হাসছিল ফলের রস সিপ করতে করতে।

আমাদের ওই সাতসকালে ইস্টিশানের চত্বরে দাঁড়িয়ে সেরিমনিয়াসলি ওসব খেতে দেখে কুলি, ভিখিরি, সাধারণ লোকদের এবং ঘেয়ো কুকুরের রীতিমতো ভিড় জমে গেল চার পাশে। শ্রী ও রাইয়ের সুন্দর চেহারা, পোশাক; এবং রূপদার পাইপ এবং উর্দিপরা লোকজনও ভিড় হওয়ার অন্য কারণ।

শ্রী হাসতে হাসতে বলল, ঋদ্ধিদা, তুমি কি মুড়ি খাও! আনথিংকেবল। প্রি-হিস্টরিক মুড়ি কোনও ভদ্রলোকে খায়? আমাদের বেয়ারা আর ঝি মুড়ি খায় দেখেছি ব্রেকফাস্টে। কখনও খেয়ে দেখিনি জীবনে। দাও তো একমুঠো খেয়ে দেখি।

আমি বললাম, নাও।

ও বলল, না: বাবা থাক। কী আনহাইজিনিক কন্ডিশানস-এ বানায় তা কে জানে? আমার বাবা একদম ইমিউনিটি নেই। নাই-ই বা খেলাম। মাম্মি জানলে ভীষণ রাগ করবে।

চা ও ফ্রুট জুস খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

www.BanglaBook.org

ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে, সামনে রূপদা। পিছনে আমরা তিনজন। ডানপাশে শ্রী, মধ্যে রাই, বাঁ-এর পাশে আমি। পিছনে পিছনে জিপ আসছে বেয়ারাদের নিয়ে। কখন কার কী দরকার হয়।

হু হু করে সুন্দর রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে। চতুর্দিকে পাহাড়, জঙ্গল; সূর্যটা সবে উঠছে। শিশির ভেজা জঙ্গল থেকে সুগন্ধি হাওয়া ভেসে আসছে।

রূপদা বললেন, বল রাই? তোদের জন্যে আর কী কী করব? একদিন রাখিয়াতে পিকনিক, ক্লাবে একদিন ডিসকো-নাইট, সুইমিং এন্ড টেনিস। স্যরি, গলফ নেই এখানে ঋদ্ধি। ইচ্ছে করলে অবশ্য খেলতে পারো, আমার বাংলোর লনেই একটা মিনি কোর্স, আছে। শিকার করতে চাইলে, তাও হবে। ওয়াইল্ড বোর, ভালুক, মুরগি, তিতির। বিটিং-এর বন্দোবস্ত করে রেখেছি। এন্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট মহুয়া খাওয়ার আর এবরিজিনালদের ডান্স—একেবারে ওদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে দেখাব।

আমার মনে পড়ে গেল নবীন মুহুরীর কথা। টিপ-টিজ দেখবেন স্যার?

আমি বললাম, শুনেছিলাম এখন সারা দেশেই শিকার করা বন্ধ।

হ্যাঁ। আইনে সেরকমই বলে। কিন্তু কোন আইনটা লোকে মানে এদেশে? শুধু শিকারের আইনটাই মানতে হবে তার কী মানে আছে? তাছাড়া, এ অঞ্চলের ডি-এফ-ও আমার বন্ধু—হি ওকেশানালি ড্রপস ইন দ্য ক্লাব ফর আ ড্রিঙ্ক অর টু। নাইস, ইয়াং চ্যাপ। নট ওয়ান অফ দোজ লং-ফেসেড, হাফ-উইট প্রোমোটীজ; যারা কেরানি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে উপরে। উঁহু নো।

বলে কাঁধ ঝাঁকালেন।

আমি বললাম, ও।

রূপদা আবার বললেন, তুমি সরকারি চাকুরেদের সঙ্গে যোগাযোগ কতটা রাখ জানি না, তবে সব সরকারি অফিসে অনেকগুলো ক্লাস আছে। ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফোর। ক্লাস ওয়ানের মধ্যে আবার দুটো ক্লাস, ডাইরেক্ট রিক্রুট; যারা কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতে পাশ করে আসে। আর প্রোমোটীজ। দু দলে একেবারেই মিল নেই। মন কষাকষি আছেই। গেজেটেড অফিসারদের জন্যে আলাদা ল্যাভাটরি, কেরানিদের জন্যে আলাদা।

আমি বললাম, যাঁরা নিচু থেকে কাজ শিখে উঠেছেন তাঁরা কাজ জানেন না কী রকম?

আরে অফিসার-লাইক কোয়ালিটিই নেই। কেরানি, চিরকাল কেরানিই থাকে। অফিসারের ব্রিডটাই আলাদা। শেটল্যান্ড পনির মতো; পিকিনিজ কুকুরের মতো; পেডিগ্রি বলে কথা।

আমি ঠিক বুঝলাম না। মায়ের পেট থেকে পড়েই লোকে অফিসার হয় কী করে? আর্মির ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টে অফিসারদের কী ট্রেনিং দেওয়া হয় তা আমি জানি— তাতে অফিসার সত্যিই অফিসারসুলভ গুণ নিয়ে এসে জয়েন করে। অনেক জওয়ানের জীবনের দায়িত্ব হাতে নিয়ে। তাদের তেমন করেই তৈরি করা হয়— কারণ জীবন-মৃত্যু নিয়ে তাদের কারবার। ফাইল নিয়ে নয়। কিন্তু অন্য সরকারি ডিপার্টমেন্টের সব জায়গায় আর্মির মতো ট্রেনিং হয় বলে শুনিনি। কিছু চাল-চালিয়াতি শেখানো হয়, বাত-বাতেলা; এক ধরনের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তৈরি করে নতুন এক বুর্জোয়া শ্রেণী তৈরি করা হয় বলেই ধারণা।

অলট্রা-মডার্ন বুর্জোয়া ব্যুরোক্রটস। যাদের কাজ দেশকে এ্যাডমিনিস্টার করা অথচ দেশের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে যাদের বেশির ভাগেরই কোনও সাযুজ্য নেই।

রূপদা বললেন, কী হল ঋদ্ধি? চুপচাপ কেন?

তারপর বললেন, রাই, একটা গান শোনা।

আরও কিছু!

এই চলন্ত গাড়িতে গান হয় না কি? রাই বলল।

টেপ শুনবে? শ্রী বলল।

রাম সিং, গাড়ি রোকো। রূপদা বললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়িটা দাঁড়াল।

এখানেও রাম সিং। লোকটার গোঁফ আছে। ধবধবে সাদা ইস্ত্রিকরা পোশাক এবং টুপি ছাড়া অন্য লোকটা কেমন দেখতে হতে পারে আমি অনুমান করছিলাম।

লোকটার নামও রাম।

হবেই, আমি জানতাম।

ও বিহারের লোক বলে সিং। ও কি বাড়িতে লুঙ্গি পরে, না ধুতি ? নাকি পাজামা পরে ? ওর কোয়ার্টারের সামনে এই লোকটাই খালি গায়ে চৌপাই-এর উপরে বসে রোদ পোয়ায়। ওর পায়ের কাছে ওর পোষা কুকুর শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কুঁক কুঁক করে বৃথাই নখ দিয়ে পিঠের আঠালি তোলার চেষ্টা করে। ওর পাশে ওর দু বছরের ছেলে বসে থাকে। মুঠো করে ওর বুকের চুল ধরে। নিমগাছে কাক ডাকে। ঘরের মধ্যে ওর বৌ আটা মাখে। আলুর চোকা, আমলার আচার আর রুটি বানাবে বোধহয় ওর বৌ।

কী নাম ওর বৌয়ের ? নিশ্চয়ই রাই নয়। না না, শ্রীও নয়। ফুলরসিয়া, না সুরাতীয়া ; না লছমী ? লক্ষ্মী ? হতে পারে। সীতাও হতে পারে। রাম সিং লোকটা ভাল। লোকটা আসলে যা নয়, ওকে তাই-ই সেজে ওর মালিকের চাকরি করতে হয় ; কারণ ওর মালিকও নিজে যা নয় তাই ই সেজে থাকতে ভালবাসে।

রাম সিং-এর কাঁধে একটা গামছা থাকলে ও একটু মুখটা মুছত। বাড়িতে নিশ্চয়ই সব সময়ই থাকে। এখন ঘাড় সোজা করে সামনে তাকিয়ে রয়েছে রাম সিং। যেন ওর স্পন্ডিলাইটিস হয়েছে। এইটেই নিয়ম। বড় সায়েবদের গাড়ি চালাবার সময় চোখে ঠুলি পরানো কানেকানা ; ঘাড়-সোজা জন্তুর মতো শক্ত হয়ে বসেই গাড়ি চালাতে হয়। ও-ও যে একটা মানুষ, ওর-ও যে কান চুলকাতে পারে, নাক সুড়-সুড় করতে পারে ; একটা বিড়ি খেতে ইচ্ছে করতে পারে এসব কথা কোম্পানি মানে না। তার সাদামাটা কালো-কালো চেহারাকে জবরজং পোশাক মুড়ে মালিক তার স্ট্যাটাসের প্রতীক করে দেখতে ভালবাসেন। যেমন ভালবাসেন মালিকের মালিক। মালিককে।

গাড়িটা থেমে ছিল। বাইরে পাখি ডাকছিল। নানারকম। গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছিল। তাছাড়া অনুভব করে মুগ্ধ হচ্ছিলাম যে জঙ্গলে নিঃশব্দতারও একটা আশ্চর্য সুরেলা শব্দ আছে। সে বড় ভরন্ত শব্দ।

জিপটাও দাঁড়িয়েছে পেছনে। বেয়ারা দৌড়ে এল চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে।

শ্রীর টেপ রেকর্ডারটা অতর্কিতে জোরে বেজে উঠল। "ইটস ওয়ান স্টেপ্ ফ্রম দ্য জাঙ্গল টু দ্য জু উ-উ—

ওয়াচ্ আউট !

আর দে গন্না গেট য়্যু টু-উ-উ।

গানটার কথাগুলো শুনে আমার মজা লাগল। এই জঙ্গল এবং জঙ্গলের পটভূমিতে রূপদা !

গানটাকে দারুণ অর্থবাহী মনে হল।

গাড়িটা আবার স্টার্ট করল রাম। স্যরি, রাম সিং।

শ্রী বাবল্‌গাম চিবুতে চিবুতে বলল, ইজিন্ট দ্যা সং লাভলি ?

রূপদা বললেন, লাভলি।

তারপর বললেন, তোর বৌদিকে একটু এ সবে ইন্টারেস্টেড করে তোল তো। একেবারে গাঁইয়া ভেতো বাঙালিই রয়ে গেল। নাচতে চায় না ক্লাবে গেলে, ড্রিংক করে না, আমার সোস্যাল লাইফ একেবারে হেল্ করে দিলে পাঁচ বছরে। এক রবীন্দ্রনাথ আর কতগুলো ওয়ার্থলেস মডার্ন বাঙালি লেখকের ট্র্যাশ বই ছাড়া কিছুই পড়বে না। গান শুনবে, তাও অ্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ আর অতুলপ্রসাদ। যত ন্যাকা কান্না সব গান। আমার তো শুনলে হুইস্কির নেশাই ছুটে যায়।

গাড়িটা চলতে লাগল। টেপ রেকর্ডার বাজতে লাগল।

রাই বলল, এখানে তো এখনই বেশ মিষ্টি ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। তাই না দাদা ?

সেই জন্যেই তো আসতে বললাম এখন। শীতে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে, তোদের কষ্ট

www.BanglaBook.org

হত। বড় বেশি শীত তখন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর দূরে কারখানাটা দেখা গেল অনেক মাইল এলাকা জুড়ে।

এখন যেখান দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছে তার দু পাশে দারুণ কতগুলো বাংলো।

শ্রী বলল, এগুলো কাদের বাংলো ?

রূপদা বললেন, এটা জোনাথন ব্লক। বড় সাহেবদের বাংলো সব এখানে। টম জোনাথন বলে এক সাহেব এসে এই কারখানার গোড়াপত্তন করেছিলেন আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। সেই সময় থেকে বড় সাহেবদের ব্লককে জোনাথন ব্লকই বলে।

এর পরই পড়বে আমাদের ব্লক। রোজমেরী ব্লক। তার পরে সিয়েরা ব্লক, আমাদের নীচে যে সব অফিসার আছে, সেখানে তাদের কোয়ার্টার্স। তারপর দাদাচাঁদজি ব্লক। তারপর নানক সিং ব্লক আর দয়াময়ী ব্লক,—কারখানার কাছাকাছি ক্লাস-ফোর ক্লাস-ফাইভের এমপ্লয়ীদের জন্যে। কুলিদের ও অন্যান্য নন-ডেসক্রিপ্ট লোকেদের জন্যে এদিকে ওদিকে পাকা বস্তি আছে।

শ্রী বলল, কারখানার কাছে তোমরা থাকো না কেন ?

মাথা খারাপ। গরমের সময় যা গরম হয় না কারখানার কাছে সে আর বলার নয়। তাছাড়া অনেক সময় কারখানায় অ্যাকসিডেন্ট হয় ছোটখাটো, বিশেষ করে গরমের সময়। দূরে থাকাই ভাল।

শ্রী বলল, তোমাদের বাংলোগুলো এয়ারকণ্ডিশানড্ নয় বুঝি ?

রূপদা বললেন না, স্যার। তবে দুটো করে বেডরুমে এয়ারকন্ডিশানার লাগিয়ে দিয়েছে কোম্পানি। বড় সাহেবদের পুরো বাংলোই, মানে লিভিং, ডাইনিং এবং বেডরুমগুলো সব সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশানড।

শ্রী বলল, তুমি কবে জোনাথন ব্লকে যাবে ?

রূপদা হাসলেন। বললেন, সে কি আমার হাত ? রোজমেরী ব্লকের প্রত্যেক অফিসারই তাকিয়ে থাকে জোনাথন ব্লকের দিকে। কবে সেখানে যাবে। তবে এখানে যা খেয়োখেয়ি তেলাতেলি পলিটিকস্, কার কখন প্রমোশন হয় কেউই জানে না।

রাই বলল, তাহলে সিয়েরা ব্লকের লোকেরা চেয়ে থাকে রোজমেরী ব্লকের দিকে ?

হ্যাঁ। আর দাদাচাঁদজি ব্লকের লোকেরা সিয়েরা ব্লকের দিকে, নানক সিং ব্লকের লোকেরা দাদাচাঁদজি ব্লকের দিকে। এবং দয়াময়ী ব্লকের লোকেরা নানক্ সিং ব্লকের দিকে। রূপদা বললেন।

রাম সিং একটা সুন্দর বাংলোর গেটে গাড়ি ঘুরিয়ে, হর্ন দিল। লনের দু দিক থেকে দুজন মালি দৌড়ে এসে দুদিকের গেট খুলল। একটা এ্যালসেসিয়ান কুকুর ভাক্ ভাক্ করে ডাকতে ডাকতে লনে লাফালাফি করতে লাগল। আমি শুনলাম, ভাগ্ ভাগ্।

গাড়িটা নুড়ি-বিছানো ড্রাইভ দিয়ে কিরকির শব্দ করে এগিয়ে গিয়ে পোর্টিকোর নীচে দাঁড়াল।

একজন মহিলা, হলুদ তাঁতের শাড়ি পরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন।

আমরা আসতেই আপ্যায়ন করে বললেন, আসুন আসুন। আয় রাই, এসো শ্রী। বাবাঃ এলে শেষকালে ? এতদিনে সময় হল তোদের ?

রূপদা আলাপ করিয়ে দিলেন, এই যে সুপর্ণা— আমার স্ত্রী। এই ঋদ্ধি।

ভদ্রমহিলাকে রাই-এর সমবয়সী বলেই মনে হল। রাই-এর দাদার সঙ্গে বৌদির বেশ তফাত বয়সের।

রাই বলল, অ্যাই সুপা, আমরা তো তোর ঘরের লোক— আমাদের দেখাশোনা করতে হবে না তোর। তুই এই বাইরের লোককে নিয়ে গিয়ে ঘর দেখিয়ে দে। রাত জেগে এসেছে— আরাম করুক।

উনি হাসলেন, বললেন, ভাগ্যিস বলনি, নইলে বাইরের লোককে বাইরেই বসিয়ে রাখতাম।

সুপা মানে রূপদার স্ত্রী আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন। একজন বেয়ারা আমার স্যুটকেসটা ঘরে পৌঁছিয়ে দিল। বৌদি বললেন, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি ঘরে। এক ঘণ্টায় তৈরি হয়ে

www.BanglaBook.org

নিন, তারপর সকলে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব।

বেয়ারা থার্মোস-এ করে খাওয়ার জল দিয়ে গেল। বাথরুমে তোয়ালে সাবান চেক করল।

আমি বললাম, তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়?

ও হাসল। বলল, রামখেলাওন। বাড়ি হাজারিবাগের কাছে সীমারীয়ায়।

আমি বললাম, বাড়িতে কে কে আছে?

ও বলল, বাবা নেই; মা, ছোট ভাইরা।

রামখেলাওন জাস্ট একজন বেয়ারা। রূপদা ওকে বেয়ারা বলে ডাকেন। বেয়ারারও যে বাড়ি থাকে, বাড়িতে লোক থাকে এবং একটা নামও থাকে এসব রামখেলাওন নিজেও বুঝি ভুলে গেছিল। কেউ জিগগেসও করে না কোনওদিন ওকে।

মানুষ রামখেলাওন খুব খুশি হল আমার সঙ্গে কথা বলে।

ও চলে গেল।

রামখেলাওন। আসলে রাম।

আমি জানতাম, ওর নামও রাম হবে।

৯

এখানে কয়েকদিন হল।

আমার একদম ভাল লাগছে না। ভাগ্যিস সুপা ছিল।

জঙ্গলের পথে সকাল বিকেল একা একা হাঁটি। রাই কমই যায়। হাঁটা ওর অভ্যেস নেই। হাঁটলে গোড়ালি ব্যথা করে। শ্রী প্রথম দিন গেছিল, তারপর থেকে যায় না। ক্লাবে ওর সঙ্গে একটি পাঞ্জাবি ছেলের আলাপ হয়েছে। সে নাকি জোনাথন ব্লকে এক-পা দিয়েই আছে। এই বয়সেই এত উন্নতি করেছে যে সকলেই জানে, কালে ও কোম্পানির বোর্ডে চলে যাবেই।

শ্রী ওর সঙ্গে নাচছে ক্লাবে রোজই। গত শনিবার দুপুরে লাঞ্চে ও খেতে গেছিল ছেলেটির একা-বাড়িতে।

রাইকে দেখেও এখানের অনেক এলিজিবল ব্যাচেলররা ইন্টারেস্টেড। অনেকেরই হার্টথ্রব হয়েছে ও। দুজনের সঙ্গে নেচেছিল রাই। দেখা গেল দেখতে। এখানে এসে রাই-এর প্রকৃতির অন্য একটা দিক হঠাৎ আবিষ্কার করলাম। এই আবিষ্কারের জন্যে তৈরি ছিলাম না মনে মনে।

আমি নাচতে পারি না। মুখে গরম আলু পড়লে অবশ্য নাচি, বাধ্য হয়ে। তাছাড়া, কেন জানি, দিশি ছেলেমেয়েদের ইংরিজি গানের সঙ্গে ইংরিজি নাচ আমার চোখে কেমন বিজাতীয় ঠেকে। হয়তো আমি ব্যাক-ডেটেড। হয়তো আনস্মার্ট। রাই খুশি হত আমিও নাচতে পারলে। ওরা কোথায় যে এসব নাচানাচি শিখল তা ওরাই জানে। শ্রী তো তাও লরেটোতে পড়েছে, কিন্তু রাই? সেও তো নাচে কম যায় না!

রাই-এর পীড়াপীড়িতে এবং সুপার মৌন সম্মতি থাকাতে আমি রূপদার স্ত্রীকে নাম ধরেই ডাকছি। এবং তুমি বলে। এখানে এসে জানলাম যে, রাই আর সুপা একই বয়সী, ওরা একই বছরে পাশ করেছে, একই ইউনিভার্সিটি থেকে, সুপাদের বাড়ি হাজারিবাগে। পাটনাতে ছোটবেলায় পড়াশুনা করে তারপর শুধু ইউনিভার্সিটি স্টেজে কলকাতায় মামাবাড়িতে থেকে পড়ে ও। হাজারিবাগ সেশানস্ কোর্টে সাধারণ কাজ করতেন ওর বাবা। ওখানেই রিটায়ার করেন। তারপর হাজারিবাগেই ছোট্ট দু কামরার বাড়ি তৈরি করে সেটল্ করেন।

এখানের সবই চমৎকার। তবুও গৃহকর্তার রুক্ষ, গর্বিত অস্তিত্ব আমাকে স্বচ্ছন্দ হতে দিচ্ছিল না। ভদ্রলোককে কেন যেন প্রথম দর্শন থেকেই পছন্দ হয়নি আমার। তারপর থেকে যতই দেখছি, ততই বিরক্তি বাড়ছে। রূপ মুখার্জির সঙ্গে তার স্ত্রী সুপার কোনওরকম মিলই নেই। আসলে সুপা যে কী করে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘর করে আমার তা ভাবতেই অবাক লাগছে। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে। ছেলেমেয়ে হয়নি ওদের।

www.BanglaBook.org

রাই-এর দাদা রূপ-এর কাছে জীবনের একমাত্র গন্তব্য জোনাথন ব্লক, যেন-তেন-প্রকারেণ। জোনাথন ব্লক-এ যে ক্লাব আছে তাতে রোজমেরী ব্লকের বড়সাহেবদেরও প্রবেশ নিষেধ। এবং ঠিক সিয়েরা ব্লকের বড় সাহেবদেরও রোজমেরী ব্লকের ক্লাবের চত্বরে যাওয়া মানা।

হাজার হাজার একই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রায় একইরকম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একই শুভাশুভ বোধ, একই সুখ-দুঃখের ভাগীদার মানুষকে মাইনে ও পদমর্যাদার বেড়া দিয়ে আলাদা করা হয়েছে এখানে। এইটেই আশ্চর্য লাগছে যে, এই মানুষগুলো যার যার বেড়ার মধ্যে পায়ে দড়ি-বাঁধা জানোয়ারের মতো ঘাস ও রুজি খুঁটে খাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে। এবং বেঁচে আছে এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে যে, কে কখন অন্যের মাথায় খুরের চাঁটি মেরে তার ঘাড় টপকে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে পাহাড়তলির আরও একটু উঁচু জমির অন্য বেড়া-ঘেরা চত্বরে গিয়ে পড়বে ; কখন পড়বে, কী করে পড়বে।

সুপা কোনওদিনও ক্লাবে যায়নি। রোজই বলেছে যে, অতিথি এসেছে বাড়িতে, খাওয়া দাওয়া না দেখলে কী করে হবে ? আমি তো আছিই, থাকিই এখানে ; তোমরা যাও।

বাংলোতে বাবুর্চি আছে। বিহারি মুসলমান। গভর্নরের বাবুর্চি ছিল রে বাবা। ইংরিজি রান্না দারুণ জানে। কিন্তু দেশি রান্না ভাল জানে না। দই-মাছ, শাক-কড়াইশুঁটি, পটলপোস্ত, কড়াইশুঁটির কচুরি, এই সব সুপা নিজে হাতে করত। শুধু রান্নাই যে করত তাই-ই নয়, এমন করে সামনে বসে খাওয়াত যে তা বলার নয়। ওর বয়সী কোনও আধুনিক মেয়েকে আমি এমন দেখিনি।

সেদিন সুপাকে বললাম, তুমি না গেলে আমিও যাব না ক্লাবে। আজ নবমীর দিন। বাবুর্চিখানায় তোমাকে থাকতে দেব না।

তখন বারান্দায় কেউই ছিল না। রূপদা অফিসে। শ্রী ও রাই কাল অনেক রাত অবধি যাত্রা দেখেছে পূজা-মণ্ডপে। দুপুরে খেয়ে ঘুম লাগিয়েছিল ওরা। আমি আর সুপা বারান্দায় বসে বিকেলের চা খাচ্ছিলাম।

আমার কথা শুনে সুপা বলল, ঈসস্, আমাকে এমন করে আমার বর যদি কখনও বলত !

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, যার অনেক গুণ থাকে তার কিছু কিছু দোষও থাকে। আমার সঙ্গে তোমার বরের তুলনা করে হাসিও না। কোথায় আমি আর কোথায় রূপদা ?

সুপা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। উজ্জ্বল সোনালি সর্ষের তেলের মতো গায়ের রঙ ওর। কাটা কাটা মুখ চোখ, সুন্দর মাথাভর্তা টান টান চুল, থুতনিতে তিল ! সে-কারণে ভারী সুন্দর দেখায়।

ও বলল, একজন পুরুষের কাছে একজন মেয়ে কী সবচেয়ে বেশি করে চায় জানো ? বলতে পারো ?

আমি বললাম, আমি কী করে জানব ! তুমিই বলো।

ও বলল, বিয়ে করতে যাচ্ছো, তোমার জানা দরকার, মানে আবিষ্কার করা দরকার। একথা কেউ কাউকে বলে দেয় না, বলা সম্ভবও নয় ; কারণ প্রত্যেক মেয়ে প্রত্যেক পুরুষই আলাদা। তুমি রাইকে এখানে কাছ থেকে জানবার সুযোগ পাচ্ছো, এমন এক সঙ্গে, এত কাছাকাছি তো থাকোনি আগে। চোখ খুলে সমস্ত মন দিয়ে ওকে বোঝার চেষ্টা কোরো— নইলে তোমাদের সুখ হবে না ! সুখ কেউই কাউকে দিতে পারে না। বিবাহিত জীবনের সুখ দুজনে মিলে গড়ে নিতে হয় নিজের নিজের অনেকখানিকে অন্যের কাছে বাঁধা দিয়ে।

আমি বললাম, তুমি তো অনেক জানো, অনেক জেনেছ। তুমি কি সুখী হয়েছ সুপা ?

সুপা আমার চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর, চোখ নামিয়ে নিল।

বলল, তোমার জেনে লাভ কী ? যদি আমি সুখী না হয়ে থাকি তা হলেও আমার সমস্যার সমাধান কি তোমার হাতে আছে ?

আমি চমকে উঠলাম।

সুপা আবার বলল, তুমি বড় ছেলেমানুষ। একজন অনাত্মীয়া মেয়েকে কেউ এমন করে এমন মারাত্মক প্রশ্ন করে ?

তারপর একটু পরে বলল, রাইয়ের দাদা আর আমি— মানে, আমরা দুজন, বিলঙ টু টু ওয়াইডলি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিফারেন্ট ক্লাসেস। আমাদের ক্লাসই আলাদা। জোনাথন ব্লকের সঙ্গে দয়াময়ী ব্লকের কি কখনও বিয়ে হতে পারে ? বিয়ে হলেও সুখ কি তারা পায় ?

এমন সময় একটা লাল-রঙা ইম্পোর্টেড ভোকস্‌ওয়াগন গাড়ি এসে ঢুকল গেটের মধ্যে। গাড়ির দু-দিকের দরজা খুলে দুটি ছেলে নামল। একজন আমার সমবয়সী, অন্যজন শ্রীর ডান্সিং পার্টনার কিংকি মালহোত্রা।

ওরা বলল, হাই।

আমি ও সুপা উঠে দাঁড়ালাম।

মালহোত্রার সঙ্গের লোকটিকে দেখে সুপা একটু অবাক এবং সন্ত্রস্ত হল ; সসম্মানে বলল, ওহ ! হোয়াট আ সারপ্রাইজ মিঃ ধাওয়ান। হোয়েন ডিড উ্য কাম ব্যাক ?

মিঃ ধাওয়ান বললেন, লাস্ট ইভনিং।

সুপা বলল, রূপ ইজনট হোম।

উই নো। ধাওয়ান বলল।

কিংকি বলল, উই ড্রপড ইন অ্যাট দ্য অফিস অন দ্য ওয়ে। হি ইজ ইন দ্য মিডস্ট অফ আ কনফারেন্স। হি উইল বী হোম ইন নো টাইম।

ওদের নিয়ে সুপা বসবার ঘরে গেল। আমি আবার বসে পড়লাম। আমি ছুটি কাটাতে এসেছি ; জাস্ট রিল্যাক্স করতে— আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই ওদের প্রতি। বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে অলরেডি পলিউটেড লাইফকে আরও বেশি পলিউটেড করার ইচ্ছা নেই আমার।

আমি বসে বসে আফ্রিকান মিথোলজির উপর লারুসের সিরিজের একটি বই পড়ছিলাম। ছোট্টবেলায় বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় পড়ার পর থেকেই আফ্রিকা আমাকে হাতছানি দেয়। সময় পেলেই পড়াশুনা করি। তারপর বড় হয়ে পড়েছি হেমিংওয়ে এবং আরও নানা লোকের লেখা বই। মিশরের উপর অনেক বই। সেরেঙ্গেটি, কিলিমাঞ্জারো, গুরু—গুরু ক্রাটরা জন্তু জানোয়ার, ভূত প্রেত, ভারতবর্ষের সঙ্গে এই মহাদেশের অনেক দিকের মিল। একবার আফ্রিকায় যাবার বড় শখ আমার।

রাই আর শ্রী এসেছে মনে হল ড্রইংরুমে। ওদের সবে ঘুম-ভাঙা উঃ আঃ লাস্যময় তুখোড় উচ্চারণের সেক্সঅ্যাপীলিং ইংরেজি শুনতে পাচ্ছি। বাইরে শালগাছের উপর দিয়ে টিয়ার দল ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। কারখানায় ভোঁ বাজল— পাঁচটার।

শীতের বেলা পড়ে গেল। ভাঙল সুখমেলা।

সুপা এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

আমি বললাম, ধাওয়ান কে ?

সুপার মুখটা কালো দেখাল। বলল, ধাওয়ান জোনাথন ব্লকে থাকে। রাইয়ের দাদার ইমিডিয়েট বস। কোনওদিনও আসেনি এ বাড়িতে। হঠাৎ ? আজ ?

তারপরই আমার কাছে এসে নিচু গলায় বলল, জানো, আমার মন ভাল লাগছে না। ওদের কথাবার্তা দেখে মনে হচ্ছে যাত্রা দেখতে গিয়ে কাল রাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ধাওয়ানের। রাই-এর জন্যেই এসেছে, কারণ শ্রীর প্রতি ইন্টারেস্টেড কিংকি মালহোত্রা।

আমি হাসলাম। বললাম, মন খারাপের কী আছে ? তোমার ননদিনী যে মোহিনী এই জানাতে তো তোমার গর্ব হওয়াই উচিত।

তা নয়। ধাওয়ান লোকটা সুবিধের নয়। যদিও এখানে মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর ও। মাস তিনেকের মধ্যে ডিরেক্টর হয়ে যাবে কোম্পানির। যে কোনও মেয়েই ওকে বিয়ে করতে চায়—। কিন্তু লোকটা পাজি।

পাজি মানে ?

মানে, মেয়েদের ব্যাপারে পাজি।

আমি ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্যে বললাম, ওর মতো এলিজিবল ব্যাচেলর হলে আমিও হয়তো একটু পাজি হতাম। অন্যেরা পেজোমি করতে দিলেই না কেউ পাজি হতে পারে। এক হাতে তো

www.BanglaBook.org

তালি বাজে না। পুরুষদেরই বুঝি দোষ সব ?

সুপা বলল, তুমি বুঝছ না ব্যাপারটা। হি ইজ আ ভেরি স্মুথ টকার। দেখতেও হ্যান্ডসাম। একজন মেয়ে উপরে উপরে যা চাইতে পারে তার সবই দেওয়ার ক্ষমতা আছে ওর। কিন্তু ও নোটোরিয়াস প্লে-বয়। সুন্দরী মেয়ে পেলেই হল। বিয়ে-টিয়ের দিকে ও যাবেই না।

আমি বললাম, তা হলে তো আমি সেফ।

তুমি যাও না ড্রইংরুমে। রাইকে ওর কাছে একা ছেড়ে দেওয়া তোমার ঠিক হচ্ছে না।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, রাই কি হরিণশিশু আর ও কি বাঘ ! তোমার ননদিনী তো বাচ্চা মেয়ে নয়, তার যদি কারও সঙ্গে কথা বলেই বিপজ্জনকভাবে তাকে ভাল লেগে যায়, তো বুঝতে হবে আমার প্রতি ভাল লাগাটা তার যথেষ্ট খাঁটি এবং গভীর নয়।

সুপা বলল, ঋদ্ধি ! তুমি বড় অবুঝ ছেলেমানুষ ! তুমি আমার কথা শোনো, যাও। ভরু গরু শক্ত হাতে সামলে রাখতে হয়। জানো না ?

এমন সময় রূপদা ফিরলেন অফিস থেকে। দৌড়তে দৌড়তে সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতে উঠতে বললেন, এসে গেছে ? কতক্ষণ ? কী খাওয়াচ্ছ ? হুইস্কি দিয়েছ ?

রূপদার এই অবস্থা দেখে আমার ওয়েটিং ফর গোদোর কথা মনে হল। সত্যিই তো ! রূপদার কাছে ধাওয়ানই ভগবান !

সুপা ঠাণ্ডা বিরক্তির গলায় বলল, এখনও তো আকাশে সূর্য আছে। হুইস্কি ? সান ডাউনের আগেই ?

রূপদা উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না, দৌড়ে ড্রইংরুমে ঢুকে গেলেন।

এমন সময় রাই বারান্দায় এল, আমাকে চাপা ধমক দিয়ে বলল, তুমি কীরকম ? একবার এসো। মিঃ ধাওয়ান দাদার বস। একেবারেই ম্যানার্স জানো না তুমি।

আমি বই বন্ধ করে বললাম, আমি তো উনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই মিট এবং গ্রিট করেছি। তোমরা তো গল্প করছই। আমার সঙ্গে গল্প করতে তো আর ওঁরা আসেননি।

আমার কথার খোঁচাটাকে ভ্রূক্ষেপ না করে রাই বলল, না, তা আসেননি। তা হলেও তোমার একবার যাওয়া উচিত। ওঁদের বাড়িতে কাল আমাদের ডিনারে ডাকছেন। আমাদের অনারে আরও কয়েকজনকে। তোমাকে ফর্ম্যালি বলতে চান মিঃ ধাওয়ান।

আমি উঠলাম। আলোকোজ্জ্বল ড্রইংরুমে ঢুকতেই ধাওয়ান মোরগ লড়াই-এর ঘাড়ের লোম ফুলোনো লাল মোরগের মতো আমার দিকে তাকাল— প্রতিপক্ষকে সাইজ আপ করার দৃষ্টিতে।

আমি ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ প্রেমময় চোখে ওর দিকে তাকালাম। আমার ভাষায় ছিল যে, ধাওয়ান তোমার সঙ্গে আমার কোনও প্রতিযোগিতা নেই।

ধাওয়ান বলল, ইউ মাস্ট কাম মিঃ মজুমদার। ইটস বীইং এরেঞ্জড অল ফর ইওর অনার।

আমি বললাম, আই অ্যাম ইলেটেড। বাট আই অ্যাম রানিং আ টেম্পারেচার। ইফ আই ফিল ওকে টু-মরো, আই শ্যাল সার্টেনলি মেক ইট। থ্যাঙ্ক উ্য ভেরি মাচ ইনডিড।

বলেই, আমি চলে এলাম ওদের কাছে বিদায় নিয়ে। রূপ মুখার্জির অবস্থা দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। ধাওয়ানকে কী করে খুশি করবে, কী খাওয়াবে, কোথায় বসাবে ভেবে পাচ্ছিল না। রাই এবং শ্রী এখানে প্রথমবার এসেই যে তাঁর জীবনে এত বড় একটা সুখবহ ঘটনা ঘটাবে তা রূপদার কল্পনারও বাইরে ছিল। এত আনন্দ ও উত্তেজনা রূপদা কোথায় যে রাখবেন !

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছিল। প্যাঁক প্যাঁক করে সাইকেল রিকসা যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে গাড়ি ; হুসস হুসস করে হেডলাইট জ্বেলে। দুটো একটা।

ড্রইংরুমে হাসি আর কথার তুবড়ি ছুটছে। ওরা তন্ময়। আমার কথা ভুলেই গেছে। আমার অস্তিত্বও। রাই পর্যন্ত।

একটা অলিভ গ্রিন রঙা প্যান্ট ও ওই রঙের হাফ-হাতা সোয়েটার পরে টর্চটা হাতে নিয়ে আমি হেঁটে আসতে গেলাম বাইরে। হাঁটতে-হাঁটতে কারখানার দিকে অনেক দূরে চলে গেলাম। চওড়া রাস্তার দু ধারে বড় বড় কৃষ্ণচূড়া ও অন্যান্য কেসিয়াভ্যারাইটির গাছ। কলকাতায় কোনও রাস্তায়

www.BanglaBook.org

আর হাঁটা যায় না। কই মাছের মতো মানুষ খলখল করে আওয়াজ, ধুঁয়ো, জল, গাড়ি—বাস। এখানে কী শান্তি! হাঁটতে ভারী ভাল লাগে।

এক একটা ব্লকের বাড়ি এক একরকম। মানুষ জন, তাদের পোশাক-আশাক গল্পার স্বর, আদব-কায়দা সব আলাদা আলাদা। একটা কারখানাতে কতরকম কত জোর-করে বানানো শ্রেণী।

খাকি প্যান্ট আর শার্ট পরে একজন বুড়ো লোক কারখানার একেবারে গেটের কাছ থেকে হেঁটে আসছিল। দারোয়ান কি গার্ড হবে বোধহয়। পথের আলোর নীচে আমার সঙ্গে মুখোমুখি হতেই লোকটা থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই আমাকে স্যালুট করল মিলিটারি কায়দায়।

আমিও ক্যাবলার মতো স্যালুট করলাম। ভাবলাম, জোনাথন ব্লক বা রোজমেরী ব্লকের লোকেরা বোধহয় এই সম্মান পেয়ে থাকেন।

লোকটি বলল, মেরী কসুর মাপ কিজিয়েগা সাব্, আপকি শুভ নাম ?

আমি অবাক হয়ে নাম বললাম।

লোকটি বলল, আপকা পিতাজি ক্যা ফৌজমে থেঁ ? উনকা শুভ নাম ?

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, বহুত সাল পয়লে। প্লেন ক্র্যাশমে উনোনে...

আর বলতে হল না। লোকটির দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমার একেবারে কাছে এগিয়ে এসে বলল, উস ওয়াক্ত আপকি উমর কিতনা থা সাহাব ?

আমি বললাম, ঢাই সাল।

লোকটি আমার দু হাত চেপে ধরল প্রথমে। তারপর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

ঠিক সেই সময় একটা গাড়ির হেডলাইট এসে পড়ল আমাদের উপরে। জোরে আসছিল গাড়িটা। গাড়িটা সামনে এসেই ব্রেক করে থেমে গেল। দেখলাম, সেই লাল ভোকসওয়াগনটা।

কিংকি মালহোত্রা এক লাফে নেমে দৌড়ে এল। বল্লব এনি ট্রাবল মিঃ মজুমদার ?

মালহোত্রার পিছনে পিছনে রূপদাও নেমে এলেন।

লোকটা ওদের গাড়ি দেখে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল ওদের।

আমি মালহোত্রাকে বললাম, নো ট্রাবল্। উই আর ওল্ড প্যলস। ইট অ্যাপীয়ারস টু বী আ হ্যাপী রি-ইউনিয়ন।

গাড়ির পিছন থেকে রাই আর শ্রীর গলাও পেলাম। শ্রী বলল, এই ঋদ্ধিদা উঠে এসো— উ্য আর ওয়েলকাম। আমরা জঙ্গলের মধ্যে লং-ড্রাইভে যাচ্ছি। হরিণ দেখব !

রূপদা বললেন, সঙ্গে এবার হুইস্কি আছে, মেয়েদের জন্যে জিন কোল্ড বিফ হ্যাম। ওখানে ফুলটং বলে একটা পাহাড়ের মাথায় একটা ফরেস্ট বাংলো আছে—তার চওড়া বারান্দা থেকে ইজি চেয়ারে বসে যা ভিউ না— যাবে নাকি ঋদ্ধি ? গাড়ি অবশ্য প্যাকড্।

আমি বললাম, সুপা ? একা আছে বাড়িতে ?

ও একাই থাকে। কুনো দ্য গ্রেট। তুমি যাবে তো বলো।

আমি বললাম, গাড়িতে তো আটবে না। আপনারাই ঘুরে আসুন।

আচ্ছা। বলে রূপদা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। কিংকি গাড়িতে উঠল। ধাওয়ান গাড়ি থেকে নামেই নি। রাই ও শ্রীর সঙ্গে পিছনে বসেছে ও। দুজনের মধ্যে।

শ্রী চেঁচিয়ে বলল, কী হল ?

রাই কিছুই বলল না।

আমি হাসলাম। বললাম, হ্যাভ আ নাইস টাইম।

রূপদা বলল, আমাদের দেরি হলে তোমরা খেয়ে নিয়ো। ডোন্ট ওয়ারি।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

রাই ও শ্রী টা-টা করল আমাকে। গাড়িটা আবার ধ্বক ধ্বক করে এগিয়ে গেল। ভোকসওয়াগন গাড়িগুলোর এঞ্জিন পেছনে থাকে।

অনেকের মনের এঞ্জিনের মতো।

গাড়িটা চলে গেলে অ্যাটেনশান পজিশন থেকে এট-ইজ পজিশনে এসে লোকটি বলল যে, ও

www.BanglaBook.org

আমার বাবার অরডারলি ছিল। বাবা প্লেন ক্র্যাশে মারা যাওয়ার দিনও ও বাবার জামা-কাপড় গুছিয়ে দিয়েছে। মা ওকে খুব ভাল করে চিনতেন। এখন আমার মনে পড়ল, মায়ের কাছে ওর গল্পও শুনেছি অনেক। রামবাহাদুর ওর নাম। আসলে রাম।

আমি জানতাম, ওর নামও রাম হবে। আর্মি থেকে রিটায়ার করার পর ও এখানে সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে জয়েন করেছে।

আমি বললাম, চলো চলো, তোমার বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে রাম।

ও বলল, এমনি করে নয়, তুমি কোথায় উঠেছ বলো। আমি গিয়ে তোমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসব। দশেরার দিন। মানে কালকে। আমার ওখানে খাবে তুমি। রাতে।

আমি অভিভূত হয়ে গেছিলাম। বললাম, আমাকে তুমি চিনলে কী করে?

বাবার মৃত্যুর সময় আমি তো আড়াই বছরের ছিলাম।

রাম বলল, সেইভাবে চিনিনি, তুমি অলিভ গ্রিন রঙের পোশাকে হেঁটে আসছিলে, আমি হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলাম। ভাবলাম, পঁচিশ বছর পরে আমার মেজর সাব কোথা থেকে ফিরে এলেন!

তারপর আমার হাতে হাত রেখে রামবাহাদুর বলল, এক্কেবারে এক চেহারা। এমন কী হাঁটার ভঙ্গিটাও একরকম। এত মিল, ভাবা যায় না।

আমি বললাম, 'বাপ কা বেটা, সিপাহীকো ঘোড়া। কুছ নেহী তো থোড়া থোড়া।'

ও হাসল। বলল, সাহী বাত।

তারপর বলল, খোকাবাবু আমরা ফৌজি লোক। ফৌজি লোকদের চাল আলাদা, শ্রেণী আলাদা, ওখানে জেনারেল সাহাব ভি জওয়ানের খোঁজ রাখেন। মওতের মধ্যেই আমাদের জিন্দগী। এই সব কারখানা-ফারখানার অফিসারদের মতো কামীনা নয় ফৌজি অফসাররা। ওখানে প্রেম আছে। ছোট বড়কে মানে বটে, উঠতে বসতে স্যালুট ঠোকে ঠিকই, কিন্তু বড়ও মনে মনে ইজ্জৎ করে ছোটকে। এখানের মতো নয়।

যখন ফিরলাম তখন দেখি বারান্দা অন্ধকার, শুধু বাবুর্চিখানায় একটা বাতি জ্বলছে। নুড়ি-ঢালা পথে হেঁটে এসে যখন বারান্দায় উঠেছি তখন অন্ধকার থেকে সুপা বলে উঠল, ফিরলে?

আমি বেতের চেয়ার টেনে ওর পাশে বসলাম। বললাম, তুমি গেলে না?

ও উত্তর না দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করল, আর তুমি?

আমি চুপ করে থাকলাম।

সুপা হঠাৎ বলল, আজ শেষ পুজোর দিন, সকাল থেকে একবারও প্রতিমা দেখলাম না। আমাকে নিয়ে যাবে?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই।

সুপা বলল, আমি চান করে, শাড়িটা পালটে আসছি। পাঁচ মিনিট বোসো।

বাংলোর পিছন থেকে ঢাকের শব্দ আসছিল। পিছনে প্রকাণ্ড মাঠ। এখানে সব ব্লক মিলিয়ে বারোয়ারী পুজো হয়। জোনাথন, রোজমেরী, সিয়েরা ইত্যাদি ব্লকের বাসিন্দারা গাড়ি করে কখনও এসে প্রতিমাকে ধন্য করে যান। ওখানে ভিড় করেন অন্যান্য ব্লকের বাসিন্দারা। সাহেবরা পুজো-পুজোর দিন বোরড হয়ে যাবার ভয়ে ক্লাবে কাটান, বাড়িতে বিয়ার পার্টি করেন, মণ্ডপে যান না। রাতে যাত্রা ইত্যাদি ফাংশন হলে সারি সারি চেয়ার পাতা হয়। ব্লক হিসাবে বসবার বন্দোবস্ত। পুজো-মণ্ডপেও বড় অফিসাররা এবং তাঁদের পরিবারের লোকেরা সামনের সারিগুলোতে বসেন, যদি আসেন। কাল রাই এবং ধাওয়ান নিশ্চয়ই সামনের সারিতে বসে যাত্রা দেখেছে, শ্রী, কিংকি এবং রূপদার সঙ্গে।

একটু পর সুপা এল। একটা নতুন শাড়ি পরেছে, গাও ধুয়েছে। কিন্তু কপালে টিপ পরেনি। পারফ্যুমের হাল্কা গন্ধ। লম্বা চুলটা খোঁপা করে বেঁধেছে। এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ওকে ওর শাড়ির মতো ঘিরে ছিল।

আমি বললাম, পুজোর দিনে অন্ধকার বারান্দায় বসেছিলে কেন একা? গেলে না কেন ওদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে ?

সুপা উত্তর না দিয়ে বলল, চলো।

বড় বড় সেগুন গাছ এদিকে। নীচে নীচে আলো ছায়ার জাফরি-কাটা পায়ে-চলা পথ। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা, পুটুসের ঝোপ-ঝাড়, খোয়াই ; একটা নদী বয়ে গেছে— সামান্য জল চলছে তিরতির করে। এদিকে ওদিকে খোলা টাঁড় দূরের জঙ্গলে আর পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। ডিড উ্য ডু ইট, পাখি ডাকছে দূরের অন্ধকার দিগন্তে ঘুরে ঘুরে। কে কী করেছে কে জানে ? কার কাছে যে জবাবদিহি চায় পাখিগুলো তা ওরাই জানে।

সুপা আমার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছিল। ওর সবে চান করে ওঠা শরীরের সাবানের গন্ধ, পারফ্যুমের গন্ধ, নতুন তাঁতের শাড়ির মিষ্টি গন্ধ আর এই খোলা বিহারি প্রকৃতির শরত-রাতের গন্ধ মিলেমিশে গেছিল। আমার খুব ভাল লাগছিল। রাই এমন হঠাৎ ওর বাইরের খোলসটা বা মুখোশটা বদলে ফেলায় বুকের মধ্যে যে নিদারুণ একটা কষ্ট বোধ করছিলাম দুপুর থেকে, সেই কষ্টের সমস্তটুকু মুছে নিল সুপার সান্নিধ্যর সুখ। রাই যে এত জিন খায়, আমি জানতাম না। এমন কী শ্রীও খায়। অতটুকু মেয়ে ?

নবমীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। সেগুন পাতায় পিছলে যাচ্ছে নির্মেঘ সুনীল আকাশ থেকে নেমে আসা সেই চাঁদের আলো।

সুপা প্রতিমার একেবারে সামনে চলে গেল। আমি ডানপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন আরতি হচ্ছিল, সুপা করজোড়ে প্রণাম করল প্রতিমাকে। আরতির ঢাকের ও কাঁসরের শব্দে, ধুনোর গন্ধে, বাচ্চাদের গলার চিকন চিৎকারের মধ্যে সুপা যখন ঠাকুর প্রণাম করছিল তখন ওকে বড় কাছের, খুব আপন বলে মনে হচ্ছিল আমার।

আমি বললাম, মনে মনে, সুপা ! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ? কোথায় হারিয়ে গেছিলে তুমি। এই বিস্তৃত পৃথিবীতে কাছের লোকেরা যে কত দূরে, ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ! কারও কারও সঙ্গে কোনও দৈব দুর্ঘটনায় দেখা হয়ে যায়, কারও সঙ্গে বা দেখাই হয় না কখনও। তোমার সঙ্গে দেখা হল যদি তো আগে হল না কেন ?

প্রতিমার সামনে দাঁড়ানো সুপাকে পাশ থেকে অনেকটা আমার ছোটবেলার মায়ের মতো দেখাচ্ছিল। সুপা আমার ক্লাসের মানুষ, রাই নয়। রাই যে নয়, তা রাই আর শ্রী মালহোত্রা আর ধাওয়ানকে নিয়ে যা করছে তাতেই প্রমাণিত হয়। আমাকে এখানে এনে এমনভাবে অপমান নাও করতে পারত রাই। ভালবাসা ও-ই আমাকে প্রথমে জানিয়েছিল, আমি অগ্রণী হয়ে যাইনি ওর মনের কাছে। শরীরের কাছে তো নয়ই।

আসলে, আজ বুঝতে পারছি, রাইও আমাদের দেশের রাজনীতিকদের মতো নিজের স্বার্থে, নিজের উন্নতির কারণে যখন-তখন দল-বদল করে, শ্রেণী বদল করে। ওয়েস্টার্ন ছবির হিরোরা তাদের ঘোড়ার গায়ে গুলি লেগে গেলেই বিশ্বস্ত বাহনকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে দু হাতে পিস্তল নিয়ে ব্যাং ব্যাং করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে আরও তেজী এবং জীবন্ত অন্য কোনও ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে ওঠে। যাদের জীবনে জাগতিক উন্নতি এবং দৌড়ে যাওয়াটাই একমাত্র উদ্দেশ্য, সে দৌড়ের কোনও গন্তব্য থাক আর নাই-ই থাক ; তাদের মৃত ঘোড়ার বা শ্লথ ঘোড়ার জন্যে শোক করলে চলে না। রাই আমাকে কিছুদিনের জন্যে তার বাহন করেছিল ; আমাকে ভালবাসেনি। যে মুহূর্তে আমার চেয়ে ভাল ঘোড়ার খোঁজ পেয়েছে তখুনি বিনা দ্বিধায় আমাকে ফেলে দিতে ওর একবারও বিবেকে বাধেনি।

আমি ভাবছিলাম, পাঞ্জাবি ছোঁড়া দুটো কী ভাবল। বাঙালি মেয়েরা তু-তু করলেই দৌড়ে যায়। ভাল খাওয়া, ভাল থাকা, ভাল বাংলো, ভাল বাবুর্চি, এইই সব। জীবনে চাওয়ার আর কি কিছুই নেই ? ছিঃ ছিঃ, বড় লজ্জার।

আমরা ফিরে আসছিলাম। অন্ধকারে একটা নিচু জায়গাতে হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেয়ে সুপা পড়ে যাচ্ছিল। আমি ওকে না ধরলে পড়েই যেত। ওকে ধরতে যেতেই ও হুমড়ি খেয়ে আমার বুকে এসে পড়ল। একমুহূর্ত থেমে থাকল ওর শরীরটা আমার বুকে। আমি ডান হাতে ওর বাঁ হাত

www.BanglaBook.org

ধরেছিলাম। সামনে নিল ও পরক্ষণে। আমি হাত ছেড়ে দিলাম।

ও একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর ও নিজেই ওর বাঁ হাতটা দিয়ে আমার ডান হাতটা ধরল। বলল, তোমার হাতটা এত নরম কেন ? মেয়েদের মতো !

আমি হাসলাম। বললাম, কী জানি ? হয়তো মনটাও আমার নরম বলে !

ও বলল, মেয়ে বা ছেলে কারওই বেশি নরম হওয়া ভাল না। নরম হলে বড় কষ্ট সইতে হয়।

আমি ওর হাতে চাপ দিলাম আমার হাত দিয়ে। বললাম, জানি। তারপর বললাম, তোমাকে একটা ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করব ? রাগ করবে না ?

সুপা বলল, আমাকে দেখে কি মনে হয় রাগ করব ? রাগ যে আমি করতে জানি না। রাগ করতে পারলে কি আমার এই দশা হয় ?

আমি বললাম, তোমরা বাচ্চা চাও না ? তোমাদের বাচ্চা নেই কেন ?

সুপা আমার দিকে তাকাল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, যা চাওয়া যায় তার সবটাই তো নিজের আয়ত্তের মধ্যে নয়।

একটু পরে বলল, আমার দোষ নয়। আমার দোষ নেই কোনও। ডাক্তার বলেছেন, অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে ; বলেছেন বেশি মদ খেয়ে ও...

আমি চুপ করে থাকলাম।

তারপর সুপা বলল, তোমাকে সাধে কি ছেলেমানুষ বলি ? এই প্রশ্নটাও কি কোনও অনাত্মীয়া মহিলাকে করে ?

আমি বললাম, আমি তো অনাত্মীয়া ভেবে করিনি। আত্মীয় কে ? যে আত্মার কাছে থাকে সে কি আত্মীয় নয় ?

সুপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জানি না।

দেখতে দেখতে আমরা বাংলোর কাছে চলে এলাম।

আমি বললাম, ওরা কি এসে গেছে এতক্ষণে ?

পাগল ! ওরা যেখানে গেছে সেখানে যেতেই লাগবে দু ঘণ্টা। বিয়ের পর পর এখানে প্রথম এসেই একবার গেছিলাম। বন-জঙ্গলের পথ, গাড়ি খারাপ হলে সারা রাতও থাকতে হতে পারে।

আমি বললাম, ও···।

বারান্দায় এসে আবার আমরা বসলাম পাশাপাশি। বাগানে হাসনুহানা ফুটেছে, গন্ধে ম ম করছে বাগান, চারধার নবমীর আবছা চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে আছে।

সুপা বলল, তুমি কি চা খাবে ?

আমি বললাম, তুমি খেলে খাব।

খাব ! ও অস্ফুটে বলল।

তারপর বলল, তুমি বোসো, আমি চা নিয়ে আসি।

আমি বললাম, না। তুমি চলে গেলে খাব না। কাউকে ডাক দিয়ে বলো, দিয়ে যাবে।

ও উঠতে গেল, আমি ওর আঁচল চেপে ধরলাম।

ও হেসে উঠল। চাপা হাসি। বলল, ছেলেমানুষি কোরো না। এক সেকেন্ড বোসো।

ও ফিরে এল। পিছনে পিছনে ট্রেতে বসিয়ে চায়ের পট নিয়ে এল রাম। তারপর নামিয়ে রেখে ফিরে গেল।

টিপট থেকে চা-টা ঢালতে ঢালতে হঠাৎ সুপা বলল, জানো, আমার না খুব ভাল লাগছে। অনেকদিন এত ভাল লাগেনি।

তারপরই বলল, রাইকে তুমি খুব ভালবাসো—না ?

আমি বললাম, আজকের আগে অবধি তো তাইই জানতাম। আসলে নিজেকে তেমন করে শুধোইনি। সংশয়ের কারণ ঘটেনি কোনও এর আগে।

রাই-এর ব্যবহারে তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ, না ? বেচারা ! রাই যে কেন তোমাকে এমন করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাল রাতে তোমার ওদের সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। ওদের একা ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি।

সুপা বলল, নিজের চাকরির উন্নতির জন্যে রূপ সব করতে পারে। নিজের বোনকে অন্যের বিছানাতেও ঠেলে পাঠাতে পারে।

আমি বললাম, কাল আমাকে তো ওরা যেতে বলেনি। আমি শুয়ে পড়ার পর রূপদার সঙ্গে ওরা গেছে। তা ছাড়া রাই তো আমার সম্পত্তি নয়। সে কোথায় যাবে, কার সঙ্গে মিশবে তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিবাহিতা স্ত্রী হলেও তবু একটা কথা ছিল। ও তো আমার কেউই নয়। ওকে পাহারা দিয়ে বেড়ালে সেটা কি আমার পক্ষে সম্মানের হত, না ওর পক্ষেই ?

তা ঠিক ! সুপা বলল। তারপর বলল, এর মধ্যে রূপের প্ররোচনা আছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

তোমাকে ? তুমি কী করেছ ?

না ! সে তো আমার স্বামী !

ওঃ। আমি বললাম।

সুপা বলল, জানো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক ব্যাপারে খুব মিল। আমরা একই রকম, একই শ্রেণীর মানুষ। আর রাই, রূপ ওরা সব অন্য ধরনের ; অন্য জগতের। আমার সঙ্গে কোথায় যেন মেলে না ! মিলল না একদিনও।

আমি বললাম, তাতে দুঃখিত হবার কী আছে ?

সুপা বলল, আমার তো এখন দুঃখিত হওয়া এবং দুঃখিত হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

নেই কেন ?

আমি গরিবের মেয়ে, চেহারা সুন্দর বলে বড়লোক শ্বশুর শাশুড়ি জোর করে বিয়ে দিয়ে এনেছিলেন। আমার আর কী গুণ আছে ? আমার কি ইকনমিক ফ্রিডম আছে ? আমি কি স্বাবলম্বী ? স্বামী খাওয়াচ্ছে বলেই তো খেয়ে-পরে আছি, নইলে খেতাম কী, কী পরতাম ? আমার মতো সাধারণ বি-এ পাশ লক্ষ-লক্ষ মেয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় রোজ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ইকনমিক ফ্রিডম না থাকলে দাসী হয়েই থাকতে হয় ; হবে।

আমি বললাম, এটা ঠিক বললে না। আমিও তো সাধারণ এম-এ। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। জেদ থাকলেই মানুষ বড় হয় ; ওপেনিং পাবে।

আমি আশ্চর্য হলাম নিজের ভণ্ডামি দেখে। সুপাকে আমি বলতে পারলাম না যে, মুরুব্বি না থাকলে আমারও চাকরি হত না। কভেনান্টেড পোস্টে উন্নতি তো দূরস্থান। কিন্তু যে-উন্নতির গর্বে আমি বেঁকে ছিলাম—এখন দেখছি ধাওয়ান ছেলেটির এই বয়সের উন্নত-অবস্থার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্ভাব্য উন্নতির কোনও তুলনাই হয় না। ধাওয়ান এখনই যেভাবে থাকে, যা মাইনা পায়, তা আমি শেষ জীবনে গিয়েও পাব কি-না সন্দেহ। হঠাৎ মনে হল, সমস্ত জাগতিক উন্নতিই আপেক্ষিক। সমস্ত প্রাপ্তিই তাই।

আমরা দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে। ভাবনা তো কাউকে দেখানো যায় না।

পথ দিয়ে একদল ছেলে মেয়ে, কলেজে পড়ে বোধ হয় ; 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো, ...ফুলের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভালো' গাইতে গাইতে চলে গেল। অনেক দূর চলে যাওয়া পর্যন্ত ওদের গান শোনা যাচ্ছিল।

সুপা বলল, এই বয়সটাই দারুণ, না ? যখন জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু কল্পনা করার থাকে, অথচ জীবন সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা থাকে না...

আমি বললাম, সত্যি।

তারপর বললাম, একটা গান শোনাও। সেদিন তুমি চান করতে করতে গান গাইছিলে, আমি ড্রয়িংরুমে বসে শুনেছি। গান জানো না বললে শুনছি না।

সুপা কোনও ন্যাকামি করল না। ও বলল, একটা গান শোনাচ্ছি ; আগমনী গান, শিলঙের রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো-মণ্ডপে একটি ছেলে গেয়েছিল। ছোট্টবেলায় শোনা, এখনও দু লাইন মনে

www.BanglaBook.org

আছে। বলেই গাইল, "সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিঠুর নবমী এল, এ নিশি পোহায়ো না, আমার উমা মা যে যাবে চলে।"

ভারী সুন্দর সুরে-বসা গলা, দরদে ভরপুর। যে গান কথা এবং সুরের সিঁড়ি বেয়ে অন্তরের অঙ্গিনায় অবলীলায় পৌঁছয় তাকেই তো গান বলে। সুপার পাশে বসে, আমার জীবনের একটি বিশেষ পুরনো আশাভঙ্গতার এবং একটি নতুন আশা-রোপণের সন্ধেতে এক ক্ষমাময় উদার এমনকী আশাবাদী মানসিকতায় আমি নতুন করে ভরে উঠতে লাগলাম। বাইরের গাছের পাতায়, পথে প্রান্তরে দূরের উজ্জ্বল চাঁদের আলো দ্রুত স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল।

১০

অফিসে বেরোচ্ছিলাম। গেট থেকে বাইরে বেরিয়েই গোলমাল শুনলাম।

রমুকাকার বাড়ির সামনে তিন-চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে। রমুকাকা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে হাত নাড়িয়ে কী যেন বলছেন ওদের, আর ওরা সমানে তর্ক করে যাচ্ছে।

বাড়িটা নতুন রং করেছেন। স্নোসেম রং। পুরো বাড়ি রং করতে প্রায় হাজার দশেক টাকা খরচ। হাইকোর্টের জাজ ছিলেন তিনি অন্য রাজ্যে। রিটায়ার করে বঙ্গসংস্কৃতির কাছাকাছি থাকবেন বলে রমুকাকা কলকাতায় জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন। বাংলার বায়ু বাংলার জলে শরীর মন স্নিগ্ধ করার জন্যে। একতলা ভাড়া দিয়েছেন। সেই ভাড়া এবং পেনশানের টাকা ; এই-ই রোজগার। তা থেকেই রং করার খরচ জুটিয়েছেন। কুড়ি বছর পরে বাড়ি রং করছেন।

আলকাতরা দিয়ে হালকা গোলাপি রংয়ের দেওয়ালের উপর বড় বড় করে লেখা 'শ্রেনীহীন সমাজ গড়ে তুলুন।"

আমি গেট খুলে বাইরে বেরোতেই শুনলাম, ছেলে তিনটি বলছে, টেংরি খুলে নেব। একেবারে চুপচাপ থাকুন। আপনারা শ্রেণীশত্রু।

রমুকাকার গায়ে বুক-খোলা ফতুয়া, পরনে লুঙ্গি ও চটি, বুক-ভর্তি সাদা-চুল, মাথাভরা টাক। পাকা বেল খাচ্ছিলেন, বুকের চুলে হলুদ একটু জেল লেগে ছিল।

উনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, শ্রেণীশত্রু ? আমি শ্রেণীশত্রু ? সারা জীবন কত গরিবের ছেলেকে মানুষ করেছি জানো ছোকরারা ? আমি নিজে কীভাবে লেখাপড়া শিখেছি জানো ?

ছেলেগুলো বলল, জানবার দরকার নেই। আপনি, আপনারা এ পাড়ার সবাই শ্রেণীশত্রু। আপনাদের একদিন খতম করে দেব।

রমুকাকা হঠাৎ দেওয়ালের লেখাটার দিকে ভাল করে তাকালেন ; তারপর বললেন, তা কোরো, সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ, যা-কিছু ভাল সবই যখন খতম হয়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে অনেকের চেষ্টায়, তখন না-হয় আমাকেও খতম কোরো। সেটা কিছু বড় কথা নয়। তার আগে, বানানটা ঠিক করো। আমার বাড়ির দেওয়ালে ভুল বানান আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ বরদাস্ত করব না।

কী ভুল বানান ?

ছেলেগুলো ঘাবড়ে গেল।

শ্রেণী বানান কী ? শ্রেণীহীন সমাজ গড়ছ তোমরা আর শ্রেণী বানানটা পর্যন্ত জানো না ?

কী ? কোথায় ?

বলে, ছেলে তিনটি মাথা চুলকোতে লাগল।

রমুকাকা বললেন, দন্ত স নয়, তালব্য শ। বুঝেছ।

হলুদ গেঞ্জি-পরা সুন্দর মতো ছেলেটি বলল, এই নরেশ, শিগগিরি ঠিক করে দে বানান, শ্যামলদা দেখতে পেলে পিঠের ছাল তুলে দেবে, বলবে, পার্টির ইমেজ নষ্ট করেছি। লোকে ভাববে, আমরাও বুঝি অন্য পার্টির ছেলেদের মতোই অশিক্ষিত।

তখনকার মতো রমুকাকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ওরা মনোযোগ সহকারে বানান শুধরাতে লাগল।

www.BanglaBook.org

রমুকাকা আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, এই যে খোকা ! দেখেছ ? কারবার দেখো। এর চেয়ে মিলিটারি রুল, এমনকী এমার্জেন্সিও ভাল ছিল। অন্তত ডিসিপ্লিন ছিল ! তখন কারও সাহস ছিল না অন্যের বাড়ির নতুন রং-করা দেওয়ালে যা খুশি তাই লেখে। মগের মুলুক পেয়েছে ! আমি কি কারও বাপের পয়সায় বাড়ি রং করেছি ? না ব্ল্যাকমার্কেট করি আমি ? কী অন্যায় দেখো তো।

আর্মিকে সব দিয়ে দাও। নিয়মে আসুক। সরকারি অফিসে, কাচারিতে ; ব্যাঙ্কে লোকে কাজ করুক। তা নয়, খালি বুকনি আর বক্তৃতা ! মেজাজ কি ?

আরে ভয় আমাকে কে দেখাবি ? সব বিপ্লবী এসেছেন ! ব্রিটিশের সময় ঢের ঢের বিপ্লবী দেখেছি—অনেক দুঃসাহসী, ন্যায়পরায়ণ আত্মত্যাগী সব মানুষ ! ভয় যারা পায়, তাদের কাছে যাও। ভয় পায় না এমন অনেক মানুষ এখনও দেশে আছে, এই পোড়া দেশে !

তারপর একটু চুপ করে থেকে টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, এরা ভেবেছে কী বলো তো ? আমার নতুন রং-করা দেওয়ালে আলকাতরার কালো রং লাগালেই কি সমাজ শ্রেণীহীন হয়ে যাবে ?

আমি বললাম, চলি, রমুকাকা। অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

উনি বললেন, যাও যাও। সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই কাজে পৌঁছিয়ো। যে জাতের ডিসিপ্লিন নেই, যে জাত কাজ করে না, সে-জাত জাত নয় ! ফ্লাইওভার আর পাতাল রেল বানালেই জাত বড় হয় না, মানুষ যদি না থাকে সে দেশে ! এই তিরিশ বছরে হিউম্যান মেটিরিয়ালের যা অবনতি ঘটে গেল এ দেশে, সে ক্ষতি আর পূরণ হবার নয়। ভাবা যায় না, সত্যিই ভাবা যায় না…

আমি পা বাড়ালাম। রিটায়ার্ড লোককে বেশি কথা বলতে দেওয়াটা বিপজ্জনক। অফুরন্ত সময় ওঁর হাতে। লেট হয়ে যাবে আমার।

অফিসে গিয়েই দেখি তুলকালাম কাণ্ড। রমেন বলে নতুন ছেলেটি ভুল করে কভেনান্টেড অফিসারদের জন্যে নির্দিষ্ট ল্যাভাটরিতে ঢুকে পড়েছিল। তাই নিয়ে তার চাকরি যাবার উপক্রম। ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখোমুখি পড়ে গেছিল।

বড়বাবু বললেন, তোমার আগের সরকারি অফিসেও কি দেখোনি ? বাথরুম ফর গেজেটেড অফিসরস ওনলি ? তুমি এমন বোকামি করলে চাকরিতে ঢুকতে না ঢুকতেই ?

রমেন ছেলেটি এমনিতে চুপচাপ, ভীতু, কিন্তু হঠাৎ বড়বাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো হিসিই করি ল্যাভাটরিতে, আর ওঁরা কি ওডিকোলোন বেরোয়, সুগন্ধি ?

বড়বাবু ধমকে বললেন, চুপ করো, চুপ করো। হ্যাঁ ! হয়তো তাইই বেরোয় ; আমি কি আর দেখতে গেছি। ভগবানদের ব্যাপারই আলাদা।

অফিস ছুটি হওয়ার পনেরো মিনিট আগে ইনটারকমে এম-ডির অপারেটর মিস বিয়ান্দকার নাকি নাকি আদুরে স্বরে বললেন, মিঃ মজুমদার, এম-ডি ওয়ান্টস টু সী ইউ রাইট নাউ।

ভুমিয়া থেকে ফিরে আসার পর আমার উন্নতি সম্বন্ধে সমস্ত আগ্রহই চলে গেছে। মায়ের শরীরটা একেবারেই ভাল যাচ্ছিল না। মা বড়মামা-মামিমার সঙ্গে কালই বেনারস চলে গেছেন। বড়মামা এক স্টিভেডর বন্ধুর বাড়িতে উঠবেন। বড়মামার শরীরও ভাল নেই। মাসখানেকের জন্যে গেছেন।

আমার কোনও অসুবিধা হবে না। বাড়িতে আমার বউ, রাম আছে। প্রত্যেকেই ভাল কি মন্দ স্ত্রীর সঙ্গে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং কিছুদিন পর তাকে ছাড়া আর চলে না। আমার কাছে রামের ব্যাপারটাও তাই। আমার প্রতি ওর যা আন্তরিকতা তা আমার ভবিষ্যতের বিবাহিত স্ত্রীর মধ্যেও পাব কি-না সন্দেহ।

এম-ডির ঘরটা বিরাট। ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট। ঘরের বাইরে সেক্রেটারিদের ঘর। তাদের ঘর পেরিয়ে ঢুকতে হয়।

সেক্রেটারিদের ঘরে ঢুকতেই মিস বিয়ান্দকার বললেন, প্লিজ গো ইন।

দরজা খুলে ঢুকতেই এম-ডি বললেন, গুড আফটারনুন ঋদ্ধি। হ্যাড আ নাইস হলিডে ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

www.BanglaBook.org

আমাদের এম-ডির দেশ কোথায় জানি না। এম-ডি-দের দেশ কোথায় ? আঞ্চলিক ভাষা কী ? এসব অবান্তর। রামদের মতো এম-ডি-রাও একটা আলাদা শ্রেণী। আ ক্লাস বাই দেমসেলভস। ওঁরা ইংরিজি ছাড়া কথা বলেন না। প্রথম তিন মিনিট অক্সোনিয়ান অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বলেন, কাঁধ শ্রাগ করেন, পাইপ কি সিগার নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। পরক্ষণেই হরিয়ানা, রাজস্থান, মুজাফফরপুর কি বাঁকুড়া ঢুকে পড়ে তাঁদের বহু-চেষ্টা-লব্ধ অক্সোনিয়ান উচ্চারণে। এঁরা অনেকেই সকালে গলফ খেলেন, দুপুরে ক্লাবে অথবা বাড়িতে লাঞ্চে আসেন। প্রতি রাতে পার্টিতে যান।

এঁদের মুখ দেখা যায় না প্রায়শই। এঁদের এয়ার-কন্ডিশানড গাড়ির পেছন থেকে ফুল-হাতা শার্টের ডান হাত এবং হাতের কাফ-লিংকসটুকু দেখা যায় শুধু। ওঁদের আড়ম্বর, ওঁদের কার্পেটেড চেম্বার এবং ওঁদের টুপি-পরা ভাবলেশহীন ড্রাইভার বেয়ারাদের দ্বারা ওঁরা পরিবৃত না থাকলে ওঁদের অন্য যে-কোনও সাধারণ মানুষ বলে ভুল হতে পারে। সেইজন্যেই সর্বক্ষণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকেন ওঁরা।

আসলে, রামদের সঙ্গে ওঁদের খুব একটা তফাত নেই। রামেরও যে-কটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, ওঁদেরও তাই। তফাতটা এই-ই যে ওঁদের বৈভব ছিল এবং আছে। রামের নেই। ওঁরা এ বি সি ডি শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ভাল স্কুলে। বিদেশে গিয়ে, কাটা-পাঁঠার পশ্চাৎদেশে যেমন করপোরেশানের ছাপ থাকে, তেমন নিজেদের পশ্চাৎদেশে কিছু ছাপও মারিয়ে এসেছিলেন।

এম-ডি ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাভ আ গ্রাস।

এই সৌজন্যের মধ্যে ভদ্রতা যতটা না ছিল, ধন্য করার মনোবৃত্তি ছিল তার চেয়ে বেশি।

ওঁর পেছনেই একটা ছোট্ট সেলার। আজ শুক্রবার। উনি নিশ্চয়ই কোনও পার্টিতে যাবেন মেমসাহেবকে নিয়ে, তাই এখন কিছু খাচ্ছেন না। তা না-হলে সন্ধ্যার দিকে অফিসে থাকলে উনি হুইস্কি সিপ করেন একটু একটু করে। জনিওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল ছাড়া কিছুই খান না উনি। শুনেছি, রয়্যাল স্যালুট দিলেও প্রত্যাখ্যান করেন। এও আরেকরকম বিশেষ শ্রেণী-সচেতনতা। উনি যে অন্য এম-ডিদের মতো নন, এম-ডিদের ক্লাসেও উনি যে অলটুগেদার এক ডিফারেন্ট ক্লাসের তা তাঁর ছোট-বড় ব্যবহারে, ম্যানারিজমে এবং জীবনযাত্রায় প্রাঞ্জলভাবে প্রতিভাত হয়। উনি হচ্ছেন আ কিং এমংগস্ট এম-ডিজ।

আমার ইমিডিয়েট বস এস-ডি, মার্কেটিং সেলস ডিরেক্টরও ঘরে বসেছিলেন। উনি স্কুল ফাইন্যাল অবধি পড়েছিলেন। ওঁর স্কুলের নামটা কেউ জানে না, কারণ স্কুলটার কৌলীন্য ছিল না। হি ওজ ওয়ান অফ দোজ গাইজ হু গ্রু উইথ দা অরগানাইজেশন। ব্যবহারিক জগতে প্রয়োজনীয়তার অনেকানেক গুণ ছিল এস-ডির। তার মধ্যে সঠিক ছিদ্রে সঠিক তৈল সিঞ্চন করার দেবদুর্লভ ক্ষমতা অন্যতম। মবিলের ফুটোয় পেট্রল ঢালার ভুল তিনি কখনও করেননি।

এম-ডি আবার বললেন, কী খাবে ঋজি ? কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক ?

আমি বললাম, নো স্যার ! নাথিং। থ্যাঙ্ক উ।

আমি এখনও খাওয়ানের ক্লাসে উঠতে পারিনি। হয়তো পারব ; সময় নেবে। ওঠা উচিত আমার। যারা মাউন্টেনিয়ার, তারা প্রথমেই চুড়োর দিকে তাকায় না। তাকালে ওঠাই যায় না। পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে ওঠে তারা। অ্যাণ্ড দে ফাইন্ড দেমসেলভস অ্যাট দ্য পীক ইন ওয়ান ফাইন মর্নিং। অ্যান্ড হোয়াট আ ফাইন মর্নিং ইট মাস্ট বী !

এম-ডির জ্যাকেটটা হ্যাঙারে ঝোলানো আছে। গোলাপি আর সাদা স্ট্রাইপের একটি শার্ট। গোলাপি পাথরের কাফ-লিংকস আর সাদা ব্রড টাই। জ্যাকেটের পকেটে ম্যাচ করা সাদা রুমাল মাথা উঁচু করে আছে, গায়ে ব্রুটের গন্ধ। অ্যামেরিকান পারফ্যুম 'ব্রুট ফর মেন'। অনেকেই ব্রুট, পারফ্যুম ব্যতিরেকেই ?

এম-ডি উঁচু, ব্রাউন, রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে এস-ডির দিকে ঘুরলেন। অমিতাভ বচ্চনের মতো হাসলেন একটু।

এম-ডির চেহারাটা ভাল। অনেকটা লম্বা, কাঁচা-পাকা পুরুষ্টু সাইডবার্নস। গলফ খেলে খেলে ও স্কটল্যান্ডের জল খেয়ে খেয়ে স্যানট্যানড লালটু চেহারা ; রামের মতো রাস্টিক এবং কুৎসিত নয়।

www.BanglaBook.org

এস-ডিকে বললেন, হু উইল বেল দা ক্যাট, দিলু ?

এস-ডিও হাসলেন, ডিসআর্মিং স্মাইল। আমার দিকে ফিরলেন। তারপর কাঁধ শ্রাগ করে বললেন, নাউ টু বিজনেস।

দারুণ শ্রাগ করেন এস-ডি। আয়নার সামনে অনেক প্র্যাকটিস করেছেন।

আমি উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলাম।

এম-ডি ডানদিকের ড্রয়ার থেকে তিন কপি টাইপড কনট্রাকট ফর্ম, ফিল-আপ করা, আমার দিকে এগিয়ে দিলেন ; বললেন, তুমি সই করো, আমিও সই করছি, ভাল করে দেখে নিয়ো। সেদিন যা যা কথা হয়েছিল, সেরকমই করা হয়েছে।

আমি সই করে ওটা ওঁকে দিলাম, উনি টেবিলের ডানদিকে রাখলেন।

তারপর কেউ কোনও কথা বললেন না। সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশানিং-এর ডাক্ট থেকে ফিসফিস করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল।

এস-ডি অনেকক্ষণ পর বললেন, ঋদ্ধি, তোমার মেসোমশাই এম-পি, তাই না ?

আমি চমকে উঠলাম। ভীষণ চমকে উঠলাম।

বললাম, হ্যাঁ। তারপর বললাম, কিন্তু কেন ?

তাঁর কাছে আমাদের একটা কাজ আছে। খুবই জরুরি কাজ। ঠিক তাঁর কাছে নয়, তবে যাঁর কাছে তিনি তোমার মেসোমশাইয়ের কথা ফেলতে পারবেন না। এম-ডি বললেন।

ওঃ। আমি বললাম।

এম-ডি ড্রয়ার থেকে একটা প্লেনের টিকিট টেবিলে রেখে কাচের উপর দিয়ে ঠেলে দিলেন আমার দিকে। বললেন, পাঁচ তারিখের টিকিট। এয়ার-বাসের। ভেরেয় ইন্টারকন্টিনেন্টালে বুকিং করা আছে। তোমার মেসোমশাই উইল বি ইন দা ক্যাপিটাল অন দ্য ফিফথ। উই হ্যাভ অলরেডি চেকড অন দ্যাট।

তারপর একটা মোটা খাম বের করলেন ড্রয়ার থেকে। বললেন : এর মধ্যে দশ হাজার টাকা আছে। আশিটা একশো টাকার নোট। বাকিটা পঞ্চাশ টাকার আর দুশো টাকা স্মলার ডিনোমিনেশানে। দিস ইজ ফর ইওর স্পেন্ডিং।

বলেই, ইন্টারকম তুলে ফিনান্স ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বললেন, পালিত, থ্যাঙ্ক উ্য ফর দ্য এনভেলাপ। ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ উইদ সামহাউ। আই ওন্ট অ্যাকাউন্ট ফর ইট ! ওকে ?

তারপর এম-ডি আমাকে বললেন, এর হিসেব চাইব না আমরা। এটা শুধু তোমার মেসোকে গুড-হিউমারে রাখার জন্যে। যাঁর সঙ্গে আমাদের কাজ, তিনি এ্যাক্টনমিতে বিশ্বাস করেন। এই খামে সে কাজ হবে না। তাঁকে আমরাই হ্যান্ডল করব। তুমি শুধু তোমার মেসোমশাইকে দিয়ে তাঁকে একটু বলিয়ে দেবে এবং নেকসট উইকে আমার জন্যে একটা ফার্ম-এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম এম-ডির দিকে।

উনি বললেন, তুমি ব্যবসার জগতে নতুন। তোমার একটু ব্রিফিং দরকার।

তারপর একটু চুপ করে থেকে সিগারেটটা কাটগ্লাসের এ্যাসট্রেতে গুঁজে বললেন, ঋদ্ধি ! এই দেশটার নাম ভারতবর্ষ। এখানে যা কিছু ঘটে, সবই জনগণের ভালর জন্যে। ব্যাঙ্ক ন্যাশানেলাইজেশন, কলিয়ারি ন্যাশানেলাইজেশন থেকে তোমার মেসোমশাইয়ের এম-পি হওয়া ; আমাদের কোম্পানিতে তোমার জয়েন করা সবই···

চেয়ারটা বক করতে করতে এম-ডি বললেন, যা আমরা করছি তাও জনগণের ভালরই জন্যে। এইভাবে চালালেই এখন এদেশে ব্যবসা চলে ; না চালালে চলে না। আমাদের কোনও চয়েস নেই ; আমাদের এমপ্লয়মেন্টে সাড়ে চার হাজার লোক আছে। ব্যবসা না চালালে তারা বেকার হবে। আমরাও হব। তুমি জানো যে, আমরা প্রফেশনাল ম্যানেজারস। কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার আমরা নই !

তারপর বললেন, যেভাবে এদেশে অন্য সকলে, আমাদের কমপিটিটাররা ব্যবসা চালাচ্ছে ; সেভাবেই আমাদেরও চালাতে হবে টিকে থাকতে হলে।

www.BanglaBook.org

আমি চুপ করে মুখ নিচু করে বসে থাকলাম।

এম-ডি বললেন, লুক! ঋদ্ধি! টুই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কোম্পানি বন্ধ হলে এমপ্লয়ীরা না খেয়ে থাকবে। গভর্নমেন্ট সিক ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে এই কোম্পনি নিয়ে নিলে তাদের অবশ্য ভালই। কাজ না করেই মাইনে পাবে। কিন্তু তোমার-আমার এবং এদেশের হাজার হাজার লোকের দেওয়া ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা এক একটা সিক ইন্ডাস্ট্রির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে। প্রতি দিনই যাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে। আমরা যা করছি, তা গ্রেটার গুড অফ দ্য কোম্পানির জন্যে, দেশের জন্যে। দেশে যতটুকু জেনারেশান অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে, সেভিংস হচ্ছে, তা প্রাইভেট সেকটরেই হচ্ছে। বিশ্বাস করো, আমরা নিরুপায়। আমাদের সত্যিই কোনওই চয়েস নেই। আমাদের এই কাজটা তোমাকে করতেই হবে ঋদ্ধি!

কিন্তু; আমি বললাম।

তারপর কী বলব ভেবে না পেয়ে আবার বললাম, আমার মেসোর সঙ্গে আমার টার্মস একেবারেই ভাল না!

এম-ডি বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হাসলেন। বললেন, ডোন্ট বি চাইল্ডীশ! পার্সোন্যাল টার্মস ইজ ইমমেটিরিয়াল। টাকার চেয়ে বড় আত্মীয় সংসারে আর কেউই নেই। আসক হিম ওপেনলি। আমাদের খবর যে, তোমার মেসোমশাই, তোমার মাসিমার ভাবায় দ্য ল্যাম্ব। ইফ হি ওয়ান্টস মানি উই উইল পে ইট! ইফ হি ওয়ান্টস উইমেন, উই উইল এ্যারেঞ্জ ফর ইট অ্যাজ ওয়েল। নো প্রবলেম। উই হ্যান্ড টু ডু ইট বিফোর।

ওয়েল—বেগারস অর নো চুজারস।

তারপর বললেন, বাট আই অ্যাম শিওর দ্যাট ইফ হি টেকস মানি, হি উইল ওয়ান্ট ইট ইন ক্যাশ অ্যান্ড ইন আন-অ্যাকাউন্টেড ফর ক্যাশ। এভ দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন ইট। ইফ দ্য জব ইজ ডান, ফেয়ার এনাফ। উই ওন্ট গ্রাজ।

এস-ডি বললেন, ঋদ্ধি, তোমার এগ্রিমেন্টটা রেডি হয়ে আছে। তুমি দিল্লি থেকে ফিরে এসেই সেটা হাতে পাবে—এম-ডি সই করে দেবেন। ইটস আ ডিল।

তারপর নিজের আঙুলের মধ্যে ক্রস-এর কলমটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে আমার দিকে চেয়ে লজ্জিত মুখে বললেন, উই কুডনট কেয়ার লেস। আমাদের ব্যবসা করে খেতে হয়।

আমি বললাম, আপনারা বোধহয় মিসইনফর্মড হয়েছেন। আমার সঙ্গে আমার মেসোর ঝগড়া।

ওঁরা দুজনে আকাশ থেকে পড়লেন।

বললেন, বলো কী? স্ট্রেঞ্জ!

তারপর এস-ডি রুক্ষগলায় বললেন, তাহলে মিথ্যে কথা বলে তোমার চাকরিতে ঢোকা উচিত ছিল না!

আমি একটা ধাক্কা খেলাম। বললাম, মিথ্যে কথা? আমি?

এস-ডি বললেন, তোমার জানা দরকার যে, তোমার মামা এবং মা মিস্টার মুখার্জিকে দিয়ে এম-ডিকে বলিয়েছিলেন। তোমাকে আমরা দিল্লির লিয়াজোঁ কাজের জন্যেই নিয়েছি। অ্যাপয়েন্টমেন্টের রিয়্যাল নেচারটাকে ক্যামোফ্লেজ করে রাখতে হয়েছিল। যাতে ব্যাপারটা অন্যান্যদের কাছে অ্যাপারেন্ট না হয়। ইউ আর ওয়ান অফ দ্য ফিউ হুম উই হ্যাভ টেকন ইনটু কনফিডেন্স। উই হোপ, উ্য ওন্ট লেট আজ ডাউন। কী হে? আমাদের ডুবিয়ো না। উই আর ইন দ্য সেম বোট ব্রাদার! ইফ উ্য রক দ্য ওয়ান এন্ড, উ্য আর গোয়িং টু রক দ্য আদার।

আমি তবু চুপ করে আছি দেখে, হঠাৎ কলমটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে এস-ডি বললেন, ব্যাপারটা ভেরি সিম্পল ঋদ্ধি! সোজা কথা সোজা করে বলা ভাল। তোমার মত লক্ষ লক্ষ অর্ডিনারি এম-এ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। হোয়াট ডু উ্য থিংক ইওর কোয়ালিফিকেশনস আর? ইওর মেসো এ্যাপার্ট?

ওই ঠাণ্ডা ঘরেও বসে ঘেমে উঠলাম। নতুন চাকরি পেয়ে কেনা ভাল জামা, গলায় টাইট করে বাঁধা চওড়া ক্রিজলেস টাই; দামি চাকরের পোশাক পরে দম বন্ধ লাগছিল আমার।

www.BanglaBook.org

মুখ নিচু করে রইলাম আমি।

বললাম, মিস্টার মুখার্জি কে ?

এস-ডি বাংলায় বললেন, ন্যাকামি কোরো না। তোমার ফিয়াসে রাই-এর বাবা !

এম-ডি বললেন, দিলু, ডোন্ট বি রুড টু হিম। ডোন্ট আপসেট ঋদ্ধি ! হি ইজ আ নাইস বয়। হি মে অ্যাজ ওয়েল বি ইন্নোসেন্ট।

বলেই বললেন, ঋদ্ধি, আমরা বুঝতে পারছি যে, তুমি এসবের কিছুই জানতে না, কিন্তু তুমি আমাদের কাজটা ইচ্ছে করলেই করে দিতে পারো, এবং ভবিষ্যতেও করতে পারবে, এবং তার বদলে তুমি তোমার সারাজীবনের ক্যারিয়ার পাচ্ছ। ইটস আ স্কোয়ার ডীল। এভরি ডেবিট হ্যাজ আ ক্রেডিট। ইন দিজ ডেজ উ্য মাস্ট নো এলিমেন্টারি অ্যাকাউন্টেসি। বিকজ অ্যাকাউন্টেসি গোজ টু দ্য ভেরি রুট অফ আওয়ার লাইভস। ডেবিট হলেই ক্রেডিট হবে। হতে বাধ্য।

এস-ডি বললেন, কী ভাবছ তুমি ঋদ্ধি ?

আমি বললাম, আমাকে একটু সময় দিন। একটু ভেবে দেখতে দিন।

এম-ডি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার কাছে এলেন। বললেন, ফেয়ার এনাফ। তুমি আজকের দিনটা ভেবে দ্যাখো। কালকে তুমি সাড়ে আটটার সময় আমার সঙ্গে দেখা কোরো। নো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইজ নীডেড। বাড়িতে। ঠিকানাটা লিখে নাও, উডল্যান্ডস নার্সিং হোমের রাস্তাটা, ন্যাশনাল লাইব্রেরির পরে। হ্যাভ ব্রেকফাস্ট উইথ মি।

তারপর বললেন, ওকে ? এখন উ্য আর ফ্রী টু গো।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। বেরিয়েই তক্ষুনি মিনিবাস না ধরে একটু হাঁটতে লাগলাম, ভিড়ে গা মিশিয়ে। একটু ভাবা দরকার। মাথাটা বড় ভারী হয়ে আছে। কান দুটো গরম।

বড় অপমান। জ্বালা করছে সারা শরীর। সরিৎমেসো, রাই, মা, বড়মামা !

না, আমার কিছু বলার নেই ! আমার লজ্জাও নেই। একজন অর্ডিনারি এম-এ। চাকরি তাহলে হতই না।

কারও সঙ্গে যে পরামর্শ করব এমন কেউই নেই আমার এই মুহূর্তে। রাই ফিরেছে কিনা জানি না। ফিরলেও আমি আর কোনও যোগাযোগ রাখতে চাই না ওর সঙ্গে। সবকিছুরই সীমা থাকে। ও সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছিল। বুধবার দিন রাতে সে ধাওয়ানের বাড়িই থেকে গেল। নবমীর দিনও ফিরল রাত দুটোয়, ড্রাঙ্ক হয়ে। ডেড ড্রাঙ্ক।

একটা বড় স্টেশনারি দোকান পড়ল পথে। মদও আছে দেখলাম ! হঠাৎই ঢুকলাম। জিগ্যেস করলাম, জনি-ওয়াকার ব্ল্যাক-লেবেল আছে ?

দোকানি আমার দিকে তাকাল।

বললাম, কত দাম ?

সাড়ে পাঁচশো ! সেলস ট্যাক্স চেপেছে নতুন !

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থেমে ঘাড় সমান লম্বা চুলওয়ালা একটি সুখী সুখী দামড়া ছেলে তার নেকু-নেকু গার্ল ফ্রেন্ডকে চকোলেট কিনে দিচ্ছিল। ছেলেটির কানের কাছে মুখ নিয়ে মেয়েটি কী যেন বলল ফিস ফিস করে।

ছেলেটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বেইবী, ডোন্ট বি ক্রেইজি !

সাড়ে পাঁচশো ?

ক্রেইজি !

বেরিয়ে এলাম। আমারও সাধ হয়েছিল হুইস্কি খেয়ে আমি ধাওয়ান কি আমার এম-ডির পর্যায়ে উঠি। হল না। সামর্থ নেই। ভাবলাম, হেঁটে পার্ক স্ট্রিট অবধি যাই। সেখানে অলিম্পিয়াতে বসে খাব। খেলে কী হয় দেখব। ব্রেইন খুলে যাবে ? সাহস বেড়ে যাবে ? ভয় চলে যাবে ? সরিৎমেসোকে খুন করতে পারব ? রাইকে রেপ করতে পারব ?

মদ খেলে কী কী করতে পারব তা আমি দেখতে চাই।

পার্ক স্ট্রিটে হাঁটতে ভারী ভাল লাগে ! মনেই হয় না ভারতবর্ষে আছি। বিশ্বাস হয় না যে, যে-সব

www.BanglaBook.org

দামড়ারা সঙ্গে নেকু পুষু মুনু মেয়েদের নিয়ে এখানে ঘোরাঘুরি করে তারা এবং আমার চেনা রাম, দশরথ, রামকৃষ্ণ, নবীন মুহুরী, রাম সিং ড্রাইভার, রাম-বেয়ারা, রামবাহাদুর ফৌজি, সব একই দেশের লোক !

আমার হঠাৎ সুপার কথা মনে পড়ল। আজকে সুপা কাছে থাকলে ওর সঙ্গে পরামর্শ করতাম। কিন্তু পরামর্শর কিছু কি আছে ? এটা বেঁচে থাকা না-থাকার প্রশ্ন। বেঁচে থাকা মানে, দশরথের মতো বেঁচে থাকা নয়, ছোটবেলা থেকে আমি যে ন্যূনতম আরামে অভ্যস্ত আছি (সেটা কিছু বাড়াবাড়ি রকমের নয়, আমার মতে), সেইরকমভাবে বেঁচে থাকা। উন্নতি হবে না। হয়তো চাকরিটাও চলে যাবে। কোম্পানির দিল্লির কাজটা না করতে পারলে ওই অসম্মানের মধ্যে ওখানে কাজ করাও সম্ভব হবে না।

ইয়েস ! আমি একজন অর্ডিনারি এম-এ। এস-ডি যা বলেছেন তা ঠিক। মুরুব্বি না থাকলে আমিও হয়তো জামার কলারের নীচে রুমাল গুঁজে মুখ নিচু করে সুবীরদার মতো এখন তিনশো টাকার লেজার-কীপারের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতাম। এখন আমার পরনে ভাল কাপড়ের ফ্রেয়ার, টেরি-কটের সাদা-ছাই স্ট্রাইপের শার্ট আর ছাই-রঙা টাই। একজন শানদার খাবসুরৎ চাকর আমি। হস্তিনী শেঠানীর প্রিয় যুবক গৃহভৃত্যের মতো।

পর পর যানবাহন চলে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। প্রাইভেট গাড়ি, ইম্পোর্টেড, এয়ারকন্ডিশানড।

ক্লাস ওয়ান, গ্রেড ওয়ান।

প্রাইভেট গাড়ি ; সাধারণ।

ক্লাস ওয়ান, গ্রেড টু।

পুরো ট্যাক্সি—একজন লোক একা বসে আছেন পিছনের সীটে, বাঁ-হাতটা জানলায় রেখে, গর্বিত ভঙ্গিতে স্টপেজে-দাঁড়ানো হাজার হাজার লোকেদের দিকে অনুকম্পার চোখে চেয়ে : ক্লাস টু, ডাইরেক্ট রিক্রুট।

শেয়ার ট্যাক্সি। গাদাগাদি করে ঘর্মাক্ত পাঁচজন বসেছেন। ড্রাইভারকে নিয়ে ছ'জন। এক টাকা পঞ্চাশ—অফিস থেকে বাড়ি। ক্লাস টু, গ্রেড টু।

মিনিবাস ? আশি পয়সা ? ক্লাস থ্রী।

লিমিটেড স্টপেজ—এল নাইন—আলো জ্বলা বাস ? ক্লাস ফোর।

তারপরই জনগণের বড় অংশ। ডিজেলের ধোঁয়া আর বিষে পৃথিবী অন্ধকার করা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো আর্তনাদ করতে করতে আধুনিক ভারতীয়র মতো ন্যুব্জ-হয়ে-এগোনো স্টেট বাস ; প্রাইভেট বাস। আর শ্লথগতি, কেরানি-ঘুম-পাড়ানো-দোল-দোলানো-ট্রাম। ক্লাস ফাইভ।

আজ রমুকাকার বাড়ির দেওয়ালে ছেলেগুলো সকালে লিখেছিল : শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলুন।

গড়বে ? যদি পারো তো গড়ো না ভাই ! পারলে তো সকলের মঙ্গলই হয়। সত্যিই গড়তে চাও ? না শুধু ভোটই চাও ?

কিন্তু পারবে কি ?

প্রথমে আনাড়ির মতো ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়ে, শেষে অনেকক্ষণই অলিম্পিয়ায় বসেছিলাম। যখন বাড়িতে পৌঁছলাম ট্যাক্সি করে—তখন রাত দশটা। শরীর অপ্রকৃতিস্থ ; মস্তিষ্ক অবশ।

বাড়ির গেটে রাম বসেছিল।

আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, এত দেরি করলে কেন ? বাড়িতে কেউ নেই। তোমার জন্যেই বসে আছি—তোমার সব চিন্তা এখন আমার। দেরি হবে, তা একটা ফোন করলে না কেন ?

আমি কথা না বলে ঘরে গেলাম, জামা-টাই খুললাম। টাইয়ের নটটা অলিম্পিয়াতেই আলগা করেছিলাম। দাসত্বের ফাঁস লাগছে।

হুইস্কি খেলে মাথা খোলে, ব্রেইন শার্প হয়। ধাওয়ান, আমার এম-ডি আরও কত সব বিখ্যাত বিখ্যাত সাকসেসফুল লোকেরা রোজ হুইস্কি খান। ভাবছি, এবার থেকে খাব মাঝে মধ্যে।

রাম আমার জামাটা তুলে রাখতে গিয়ে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে বলল, কীসের গন্ধ পাচ্ছি ? একটা খারাপ গন্ধ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপরই আমার মুখের দিকে এবং চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, হায় আমার কপাল ! এই গুণ হল শেষকালে ! হায় রাম ! আমি কী করব ? তারপর কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, আমাকে তুমি ছুটি দিয়ে দাও, আমি চলে যাব। চোখের সামনে এভাবে নষ্ট হতে দেখতে পারব না তোমাকে।

আমি মনে মনে বললাম, কে আর নষ্ট হতে চায় রে স্বেচ্ছায় রাম ? নষ্ট হওয়া বড় কষ্টের। শক্তি চাটুজ্যের লাইন ? এখন মনে পড়ছে না ; কিছুই মনে পড়ছে না। চারদিকে রাবণের ভিড়। রাবণেরা রামদের তো নষ্ট করবেই !

রাম বলল, শিগগিরি চান করে নাও, আমি ঠাকুরকে বলে খাবার ঠিক করছি। উপরে এসো, খাবার ঘরে।

আমি বললাম, আমার ঘরেই খাবার আন। আমি উপরে যাব না।

রাম দাঁড়িয়ে থাকল।

আমার কিছু ভাল লাগছে না। কাউকে দেখতে ভাল লাগে না। লোকজন, গোলমাল, প্লেট-চামচের শব্দ, আদর-আপ্যায়ন কিছুই ভাল লাগে না। আমি কারও মুখ দেখতে চাই না, কারওকে আমার মুখ দেখাতেও চাই না।

রামকে বললাম, আজ থেকে মেঝেতে এখানেই খাব আমি।

রাম বলল, হুঁ, তুমি কি আমাদের মতো ছোটলোক যে, মাটিতে বসে খাবে ?

আমি বললাম, বেশি কথা বলবি না। বেশি কথা বললে থাপ্পড় খাবি। যা বলছি তাই-ই কর। তাই-ই করবি এখন থেকে।

মনে মনে বললাম, আমার মনিবরা কিন্তু কখনও থাপ্পড় মারবে না রে আমাকে। ঠাণ্ডা ঘরে বসে, ঠাণ্ডা হাসি হেসে, ওরা আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেবে। আমাকে আত্মসম্মানজ্ঞানহীন করে দেবে। ভাল ফ্ল্যাট দেবে ; নতুন গাড়ি, টুপি-পরা ড্রাইভার। আমাকে ইচ্ছে মতো তুলবে নিজেদের প্রয়োজনে আবার ইচ্ছে মতো ফেলবে প্রয়োজন ফুরোলে।

রাম থাপ্পড় খায়, তবুও কাজ করে ; কারণ কাজ না করলে খেতে পাবে না। সীতা ও লব না খেয়ে থাকবে, তার বৃদ্ধ বাবা দশরথ না খেয়ে থাকবে।

অপমান সয়ে, অসম্মান বয়ে আমিও কাজ করব। কারণ মোটামুটি ভাল-থাকা, ভাল খাওয়া এবং সমাজের একজন এনটিটি হবার উচ্চাশা আছে আমার। আফটার অল আমি তো রামের মতো করে বাঁচতে পারি না। আমি আমার মতো।

BanglaBook.org

১১

সকালবেলা চোখ চাইতেই দেখি রাম দাঁড়িয়ে দরজার সামনে। আমার গায়ে বেশ জ্বর। তাকাতে পারছি না।

বললাম, কী হল ?

ও বলল, একটা চিঠি আছে। আর কাল সন্ধেবেলা রিণা দিদিমণি ফোন করেছিল।

আমি বললাম, রিণা দিদিমণি কে ?

রাম বলল, গুমানি থেকে এসেছে, রিণা দিদিমণি।

তখনই আমার সন্দেহ হল। হয়তো রাই। ডুমিয়াকে গুমানি করে ফেলাটা ওর পক্ষে স্বাভাবিক। এতদিনে ওর ইডিয়সীর প্যাটার্নটা মোটামুটি ধরে ফেলেছি। মীন, মিডিয়ান ও মোড কষে কাছাকাছি চলে যেতে পারি।

চা খেতে খেতে আমি বললাম, নম্বরটা ডাক।

কত নম্বর ?

ওকে নম্বরটা বললাম।

ও কিছুক্ষণ ফোনটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করে বলল, নাঃ ! ইংলিশ চালিচি।

আমি রিসিভার তুলে দেখলাম, পরিষ্কার ডায়াল টোন আসছে।

www.BanglaBook.org

ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আমি ডায়াল করলাম।

রাই-ই ধরল।

বিরক্তির গলায় বলল, কী ব্যাপার ?

কেন ? আমি গম্ভীর গলায় বললাম।

ও বলল, ওরকম না বলে-কয়ে চলে আসার মানে ? সুপা বলছিল, দশেরার রাতেও তুমি বারান্দায় বসে ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলে। কাউকে না বলে-কয়ে ওভাবে স্টান্ট দিয়ে, পরদিন সাত-সকালে চলে না-আসলেই হত না ? তুমি যে এরকম কনসার্ভেটিভ তা আমার জানা ছিল না।

আমি বললাম, যাদের কনসার্ভ করার কিছুমাত্র থাকে তারাই কম-বেশি কনসার্ভেটিভ হয় রাই ! তুমি বুঝবে না।

ও বলল, বিন্না, একটা ইয়ং ইনোসেন্ট ছেলে ; সে তোমাকে দেখে স্তম্ভিত !

বিন্না কে ? আমি বললাম।

ও বলল, বিন্না ; ধাওয়ানের ফারসট নেম !

ও ! আমি বললাম।

রাই বলল, লজ্জায় মাথা কাটা যায়। শ্রীও বা কী ভাবল।

আমি বললাম, লজ্জা তোমার আছে তাহলে ?

তারপর বললাম, তোমাদের এনগেজমেন্ট কি হয়ে গেছে ?

রাই একটু চুপ করে থাকল।

তারপর ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, না হলেও হবে শিগগিরি। তোমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। শ্রী আর কিকির এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে।

খুব আনন্দের কথা। আমি বললাম। তারপর বললাম, আর কিছু বলবে ?

ও বলল, না ! শুধু এইটুকুই বলব যে, তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ভুল করেছিলাম। ইউ ডু নট বিলঙ টু মাই ক্লাস।

আমি বললাম, ঠিকই বলেছ। অ্যাণ্ড···ইউ ডু নট বিলঙ টু মাই ক্লাস আইদার।

বলেই, টকাস করে রিসিভার রেখে দিলাম।

রাম একটু পরে এসে বলল, একটা চিঠি এসেছিল কাল। কাল তো যে অবস্থায় এলে, চিঠি পড়বে কি !

চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিলাম। লেখাটা অপরিচিত। তবে মেয়েলি লেখা। খামটা হালকা। খুলছি, রাম বলল, কাল আমারও চিঠি এসেছে দেশ থেকে, বাবা সীতা আর লবকে নিয়ে আসছে কাল ভোরে।

কেন ? কী হয়েছে ? আমি শুধোলাম।

ও বলল, লবের আর সীতার কী অসুখ হয়েছে। ওখানের ডাক্তার বলেছে শহরে নিয়ে দেখাতে।

আমি বললাম, এ বাড়িটা কি আমার ? মামা নেই, মামি নেই, ওরা না বলে-কয়ে চলে আসছে কীরকম ?

তাই-ই তো কথা ! আমি তো সেই কথাই ভাবছি। ছোটলোক, সব ছোটলোক ! কোনও আক্কেল আছে ওদের ! মোর বাপটার ?

চিঠিটা খুলতেই দেখি সুপার লেখা চিঠি। পাঁচদিন আগের তারিখ দেওয়া। "শুক্রবার সকালে কলকাতায় পৌঁছব। মামাবাড়িতে ফোন নেই। পাশের বাড়ি থেকে তোমাকে সন্ধ্যাবেলায় ফোন করব। শনিবার কী করছ ? মামাবাড়ির ঠিকানা নীচে দিলাম। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।

আমি একাই যাচ্ছি।

রামকে বললাম, চিঠিটা কবে এসেছে ?

এই তো কাল আসল।

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, পাঁচদিন আগের চিঠি, কাল হতেই পারে না। তারপর খামের উপরের তারিখ দেখলাম, পরশুদিনের ছাপ আমাদের পোস্ট অফিসের। তাহলে পরশুদিন, নয়তো কাল সকালে এসেছে নিশ্চয়ই। ইডিয়টটা কোথায় ফেলে রেখেছিল।

আমি বললাম, থাপ্পড় খাবি মিথ্যুক। তারপর ভাবলাম, মিছিমিছি নিজেরই মুখ ব্যথা। ওর গণ্ডারের চামড়া। কিছুতেই কিছু হবার নয়।

ঈসস, ঠিক সুপাই ফোন করেছিল। রাই নয়। ছিঃ ছিঃ, রাই কী ভাবল। ভাবল আমি গায়ে পড়ে ফোন করলাম ওকে। কোথায় সুপা আর কোথায় রাই!

এই জন্তুটাকে নিয়ে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

এমন সময় ফোন বাজল। রাম ধরল। বলল, হেল্লো। ...হেল্লো...

যে ফোন করেছিল তার শনিবারের সকালের বারোটা বেজে গেল। কানের পর্দাও আস্ত থাকার কথা নয়।

রাম এসে বলল, যা তা গালাগালি দিচ্ছে ইংরিজিতে। কিছুই বুঝলাম না।

তাড়াতাড়ি ঘড়িতে তাকিয়েই দেখি ঠিক সাড়ে আটটা। নিশ্চয়ই এম-ডি।

আমি রামকে বললাম, তুই গিয়ে বলে দে, রং নাম্বার।

বলেই, রিসিভারটা টেবিলে নামিয়ে রাখ।

রাম গিয়ে বলল, রং নাম্বার ইসটুপিড।

তারপরই শুনি বলছে, কী বললেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাদাবাবুই তো বলতে বলল।

রামও রিসিভারটা টেবলের উপর নামাল ঠক করে, আমার চাঁটিটাও পড়ল ওর মাথায়। অসহ্য। অসহ্য। আমার ঘাড় থেকে নামবেও না, মরবেও না এবং আমাকেও মেরে ফেলবে এই আকাটটা।

রাম উত্তেজিত হয়ে বলল, এ কী? তুমিই বললে বললে রং নাম্বার—আবার তুমিই চাঁটা মারছ—তোমাকে বাবা বোঝা আমার সাধ্য নেই।

ঘন্টাখানেক পরে রিসিভারটা তুলে রাখলাম জায়গামতো। যদি সুপা ফোন করে। আমার শরীরের এমন অবস্থা নেই যে, আমি বাড়ি থেকে বেরোই। বেশ জ্বর এসেছে। গায়ে অসহ্য ব্যথা। ভাবলাম, কাল নেশার ঝোঁকে সমস্ত জানালা দরজা খুলে শুয়েছিলাম। ভাল ঠাণ্ডা পড়েছে হঠাৎ কালীপুজোর পর। আমার অসুখ বিসুখ করে না। কিন্তু করলে আটানব্বুই জ্বরেও বড় কাবু করে।

সুপা কী ভাবছে? অথচ রামকে যে ঠিকানা দিয়ে কোথাও পাঠাব তারও উপায় নেই কোনও। নিজেই হারিয়ে যাবে। গত কুড়ি বছর ও আমাদের বাড়ির বাইরে এক পোস্টাপিস, কালীঘাট আর পানের দোকান ছাড়া আর কোথাও যায়ইনি।

একটা চিঠি লিখে রামকে বললাম, গিদাইয়া এলে এই ঠিকানাতে ওকে পাঠাবি। আমার কাছ থেকে শুনে যেন যায়।

কিন্তু দশটার পর থেকে আমার জ্বর হু হু করে বাড়তে লাগল। রাম দৌড়ে গেল আমার বন্ধু-ডাক্তারকে ডাকতে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে মাথাটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার এসে বলল, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়নি। এ অন্য জ্বর। রক্ত পরীক্ষা করতে পাঠাল। রামকে বলল, থার্মোমিটার দিতে তিন ঘণ্টা অন্তর।

রামের পক্ষে ওসব সম্ভব ছিল না। গিদাইয়া সন্ধ্যাবেলা ফিরে না আসা অবধি জ্বর নেওয়া গেল না। আমার নিজের শক্তি ছিল না যে, থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর দেখি। মাথাটায় করাত চিরছে কারা যেন। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

সকালের দিকে জ্বর একটু কমল। কিন্তু বড় দুর্বল।

রামের এক গ্রামের লোকের সঙ্গে দশরথ, সীতা ও লব এল সকালে পুঁটুলি হাতে নিয়ে। লোকটি আমাদের বাড়ির কাছেই অন্য এক বাড়িতে কাজ করে। সে চলে গেল ওদের পৌঁছে দিয়েই।

দশরথ ঘরে এল। বলল, দাদাবাবু তোমার জন্যে পোড়পিঠা এনেছিলাম। খাবে না?

কী বলব? জ্বরাচ্ছন্ন চোখে দশরথের সৎ পবিত্র অপাপবিদ্ধ মুখে তাকিয়ে ভাল-লাগায়, কৃতজ্ঞতায়

www.BanglaBook.org

আমার মন ভরে গেল।

বললাম, ভাল হলেই খাব। তোমরা আরাম করো।

সীতা—রামের বৌ, আরও বেঁটে হয়ে গেছে মনে হল। এমনিতে চার ফিট চার-পাঁচ ইঞ্চি উঁচু হবে ও। কালোও হয়েছে, সেবারে যেমন দেখেছিলাম, তার চেয়ে। লব, রামের ছোট্ট ছেলে, একটা ধাড়ি শ্রীহীন ইঁদুরের মতো। অভুক্ত ; অশক্ত।

সকালে যখন ডাক্তার এল, বলল, ভোগাবে। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া—খুব ভাল শুশ্রূষার দরকার!

তারপর ঠাকুরকে বলল, মা আর মামিমাকে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। ঠিকানাটা আমাকে দাও বেনারসের!

আমি ডাক্তারের হাত চেপে ধরলাম। বললাম, একদম নয়। ওঁদের শরীর ভাল নেই। অনেক অসুবিধা করে সকলে গেছেন। আমি ঠিক হয়ে যাব ; তুমি তো আছ। এরা আছে।

ও বলল, আমি কি বলছি তুমি ভাল হবে না? কিন্তু শুশ্রূষা ছাড়াও সময়মতো ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়া চব্বিশ ঘণ্টা, পথ্য খাওয়া ঠিক সময়ে, এসব দরকার—এসব করার লোক কোথায়? ওষুধ বুঝে নেবে কে? নানারকম ওষুধ। ইনজেকশন না হয় আমিই দিয়ে যাব। কিন্তু···

আমি বললাম, গিদাইয়া বুঝে নেবে। ও দুপুরে এলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। বুঝিয়ে দিয়ো ওকে। প্লিজ।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে উঠে গেল। বলল, এরকম অবুঝের মতো করলে মুশকিল হবে। আবার জ্বর বাড়লেই বুঝবে—এ সাধারণ অসুখ নয়। শরীর এবং ব্রেইনের মহা ক্ষতি করে।

আমি হাসলাম। বললাম, ব্রেইন থাকলে তো ক্ষতি করবে।

সীতাকে দেখে ডাক্তার বলল, অ্যাকিউট ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি, অ্যানিমিয়া অ্যান্ড হোয়াট নট। ওকে ভাল করে মাগুর মাছ খাওয়াও। ওষুধ লিখে দিচ্ছি। লবকে দেখে বলল, এরও সেই অবস্থা। তার উপরে এর তো দেখছি জন্ডিসও রয়েছে।

আমি বললাম, চমৎকার। হবেই। ওরা যে বেঁচে আছে এই-ই তো যথেষ্ট। বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য। যা হোক, ওষুধ পথ্য লিখে দাও।

রামকে বললাম, ড্রয়ার খুলে টাকা নিয়ে যা, ওদের ওষুধপত্র আনা এবং ডাক্তারবাবু যেমন বলেন, খাওয়া নিয়মমতো।

পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই গিদাইয়াকে আমার কাছে রেখে রাম তার গ্রাম্য ও ছোটলোক বাবাকে এবং ছোটলোক শ্বশুরের মেয়েকে নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনতে গেল। আমিই জোর করে পাঠালাম। লবকেও সঙ্গে নিয়েছে সীতা! কার কাছে রেখে যাবে?

যাবার সময় রাম বলল, তুমি একা থাকবে?

বললাম, গিদাইয়া তো আছে। তুই যা না! দেরি করছিস কেন?

ও বলল, হুঁ।

ও গররাজি হল বটে, কিন্তু গেল।

আমাকে ও অন্য কারও হাতে ছাড়তে রাজি নয়। ও একাই আমার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটাতে চায়।

বেলা বারোটার পর থেকেই জ্বরটা বাড়তে লাগল হু হু করে। দুটো নাগাদ একেবারেই অসহ্য হল মাথার যন্ত্রণা। ছটফট করতে লাগলাম আমি। গিদাইয়া কখনও আমার কাজ করেনি। ও জানে না, কী করে কী করতে হয়। আমার সাংকেতিক ভাষায় রাম অভ্যস্ত। এখন কথাও আর বলতে পারছি না। চোখ মেলতে পারছিলাম না আমি। চোখে কিছু দেখতেও পাচ্ছিলাম না। আস্তে আস্তে হুঁশ চলে গেল মনে হল। মাথাটা কিছু আর ভাবতে পারছে না। চোখে বড়ই ভার। সারা গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আমি কি মরে যাব? মরে যাবার আগে বোধহয় মানুষ চেতন আর অবচেতনের মধ্যে এমন করেই ভাসে, উদ্দেশ্যহীন, সময়-জ্ঞানহীন, ভাবশূন্যহীন হয়ে! কত ঘণ্টা হয়ে গেল কে জানে? কোথায় আমি?

আমার কানের কাছে কারা যেন কথা বলছিল। আমি কোথায়? তোমরা কারা? কে? রাম?

www.BanglaBook.org

এ্যাই রাম ?

আমি বললাম, রাম ! দ্যাখ তো, আমি মরে গেছি না কি ?

রাম বলল, কই ? এই তো নিশ্বাস পড়ছে নাক দিয়ে ।

আমি বললাম, গাধা ! শুধুই নিশ্বাস ফেলা আর প্রশ্বাস নেওয়া আর বেঁচে থাকার মধ্যে অনেক তফাত রে ! অনেক তফাত !

দশরথ জঙ্গলের পথে হাঁটতে হাঁটতে আমাকে বলেছিল, ওদের গাঁয়ের আদ্ধেক লোকই জামা-কাপড় পরতে পায় না । একটা গামছা কিনে দু-ভাগ করে কেটে আধখানা গায়ে দেয়, আর অন্য আধখানা গায়ে জড়ায় । শীতের দিনে আগুনের সামনে বুক ও পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে ওদের বুক পিঠের চামড়া ঝলসে যায় । চৈত্র বৈশাখ মাসে এক এক পরত চামড়া উঠে যায় নাকি সাপের খোলসের মতো ওদের বুক পিঠ থেকে । যে দেশের রাজধানী ফোয়ারা-ফোটা আলো-ঝলমল চোখ-ধাঁধানো দিল্লি, সেই দেশের মানুষ এরকম গরিব ! হতেই পারে না । ব্যাটা মিথ্যুক । ছোটলোকগুলো সব মিথ্যুক । বিশ্বাস করি না ওইসব বানানো গল্প ।

এই স্যুটটা কোন দোকান থেকে বানিয়েছেন স্যার ।

এম-ডি হাসলেন । বললেন, বার্লিংটনস অফ ক্যালকাটা । এক্সক্লুসিভ । থ্রি থাউজেন্ড ।

সরিৎমেসো কেমন আছ ? ভাল ? আমি কিন্তু তোমার কাছে যাচ্ছি না । কোনওমতেই না । তাতে আমার চাকরি থাকুক আর না-ই থাকুক—

রুমি বলেছিল, দিস সরিৎমেসো ইজ আ ডার্টি পার্সন । ভেরি ইনডিসেন্ট ইনডিড । শী ওয়জ রাইট । অ্যাবসলুটলি ।

কে ? দশরথ !

আমি জানতাম যে, ও রাস্তা পেরুতে পারবে না কলকাতায় । দোতলা স্টেট বাসের আওয়াজ আর ধোঁয়ায় ও চমকে উঠে ভয় পাবে । আমি যেমন ওদের জঙ্গলে বাঘের ডাকে পেয়েছিলাম ।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে অজ্ঞানতা ।

অজ্ঞানতা থেকেই সব ভয়ের জন্ম । অজ্ঞানতার কারণেই সরিৎমেসোদের সকলে ভয় করে ।

রমুকাকা ? কী বলছ তুমি ? কী বলছ ?

দ্যাখো, বেশি ভয় দেখিয়ো না । ভয় আরও বেশি দেখালে ভয় ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে যাবে তোমাদেরই বুকে : ভয়ের বাসা বাঁধবে ঘরে । ঢিল পড়বে দুমদাম । ভুলে যেয়ো না তোমরা ।

"সব কিছুরই একটা কোথাও করতে হয় তার শেষ ।"—ক্ষণিকা ।

শ্রী, তুমি ক্ষণিকা পড়োনি ? না ?

তোমাকে অনুকম্পা ।

কোথায় হাঁটছি ? পার্ক স্ট্রিট : আঃ, কী আরাম—অ্যামেরিকা নাকি ?

তুমি কে ? শ্রী ? শ্রী-ই তো ! কোথায় এসেছিলে ?

রাতে ককটেল আছে ? এ-এন জন-এ চুল ঠিক করতে এসেছিলে ?

এখন কোথায় যাবে ? পা পরিষ্কার করতে ? পেডিকিওর ! বাঃ বাঃ করো ! তোমাদের সুন্দর সুন্দর পা । তোমাদের সবকিছুই সুন্দর ! সুগন্ধি, নরম, কোমল ; স্বপ্ন-স্বপ্ন ।

স্যার ! আপনি স্যার ? এখানে ?

এস-ডি : সেলস ডিরেক্টর !

আমি ? এই এসেছিলুম জাপানি কনট্রাসেপটিভ কিনতে আর বিলিতি সিগারেট । লুক ঋদ্ধি ! উ্য হ্যাভ গট টু ডু ইট ! ডু ইট ; অর গো টু হেল ।

ডু অর ডাই । কে বলেছিলেন ? গান্ধীজি !

রাই ? তুমি ? ভাল আছ ? আমার সোনা ! আমার প্রথম প্রেম : ভুল-করা প্রেম । ওয়াক্—থুঃ ।

প্রেম বলে কি কিছু আছে সংসারে, রাই ?

কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

www.BanglaBook.org

ও ! ধাওয়ান এসেছে বুঝি ? পার্ক হোটেলে ? রাতটা থাকবে ? বাঃ বাঃ। জোনাথন ব্লক। শাবাশ !

আমি টেনিস খেলে পাঞ্জাবির মতো শক্ত ফিগার করেছিলাম, কিন্তু মেকি-পাঞ্জাবি বলে জেনুইন-পাঞ্জাবি ধাওয়ানের কাছে হেরে গেলাম। জেনুইনদের কাছে মেকিরা চিরদিনই হারে ; ওরিজিনালদের কাছে প্রোটোটাইপরা।

মিস্টার রূপ মুখার্জি, তেলে-বাঁশের বাঁদর, তোমার উরু-সন্ধি চিরে গিয়ে তোমার শরীর ফাঁক হয়ে যাবে একদিন। এক পা থাকবে জোনাথন ব্লকে, তোমার অন্য পা রোজমেরী ব্লকে।

আঃ, মাথায় বড় ব্যথা।

তুই কে রে ব্যাটা ? ওঃ কপিলা। মজদুরদের নেতা ! এ-বি-সি-ডি জানলে এদেশে তুই বড় ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হতিস। নবীন মুহুরির ডেরাতে পানমৌরি খেয়ে সকলকে ডোবালি তুই-ই ! নিজে টাকা নিয়ে পকেট ভরলি, রামকৃষ্ণদের জন্যে কিছুই করলি না। তোর বিচার একদিন রামকৃষ্ণরা করবে ! দেখিস, দেরি নেই।

কী করতে এসেছিলি, কপিলা ?

মিটিং-এ যোগ দিতে ? যারা রাজনীতি করে না তাদের কঙ্কি হাতে ভয় দেখাতে ?

কী বললি ? বিনা-টিকিটে ট্রেনে চড়ে কলকাতা দেখে গেলি ? টাকাও পেলি !

বেশ ! বেশ !

দীপ ? দীপ তুমি কেমন আছ ? ব্যবসা করছ ? ভাল ব্যবসা ? বাঃ ! আই বেগ ইওর পার্ডন ? ব্যবসা ঠিক নয় ; দালালি ; কনম্যানের কাজ ?

ফার্স্ট ক্লাস ! নো ক্যাপিটাল রিকুয়ার্ড !

কী বলছ ? তার চেয়ে ভাল হবে চালাক-চতুর সরকারি কর্মচারি হয়ে যাবে বিশেষ চাকরি দেখে ? নো খাটা-খাটনি, নো লেবার, নো ক্যাপিটাল ; নীট মুনাফা ! কেউ মুনাফাবাজও বলবে না ! তোফকা। বাঃ বাঃ।

ঋদ্ধি ! ক্যান ভ্য অ্যাফোর্ড টু লেট মি ডাউন ? তুমি রামকে ডোবাবে ? না আমাকে ডোবাবে ? উই বিলঙ টু দ্য সেম ক্লাস ! আমরা একই শ্রেণির।

রাইট ভ্য ওয়্যর দীপ। তুমি ঠিকই বলেছিলে।

দাদা, এলগাইন কোথায় পাব ? নিজেই পক্কে প্রাইভেট বাস ?

মশাই, পার্ক স্ট্রিটে বাস যায় না। এখানে শুধু গ্রেড ওয়ান ক্লাস ওয়ান, গ্রেড ওয়ান ক্লাস-টু, ক্লাস টু ক্লাস-ওয়ান। ওসব ক্লাস-ফোর, ক্লাস-ফাইভ এখানে নয়।

রামকৃষ্ণ ? হতভাগা। ওটা কী রে তোর হাতে ? নবীন মুহুরির সঙ্গে ঝগড়া মেটেনি ? আরে ? ওটা কী ? বেলুন ? ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ফুলিয়ে বলের মতো করেছিস ? সামনেটা ওরকম কেন ?

দূর গাধা ! এ জিনিস কখনও দেখিসইনি ? জানিসই না ? সে কী রে ? তোদের জন্যেই তো এত সব ক্রিয়া-কাণ্ড। ইংরিজি কাগজে বিজ্ঞাপন, সুখী পরিবার ছোট পরিবার—লাল ত্রিকোণ—আর তোরাই জানিস না- বেলুন ভেবে হাতে নিয়ে খেলছিস ! ওরে ইডিয়ট রে…

কী বললি ?

গ্রামের মেলায় দেখেছিলি ? ভেবেছিলি একরকমের বেলুন। যাঃ যাঃ !

তুমি কে ? আমার মাথায় কার হাত ?

মা ? মা গো ! কখন এলে তুমি ? কোথায় চলে গেছিলে। কবে গেছিলে ? কালীফস সিকস একস-এর সঙ্গে একটু গরম জল, টেপিড ; মিশিয়ে আমাকে দাও, আমি ভাল হয়ে যাব। মনে আছে ? পরীক্ষা দিতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়তাম আমি, তখন পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলে তুমি দিতে। দাও না ! মা !

মা তো নও ! তুমি কে গো ? আমার মায়ের মতোই নরম হাত তোমার। বড় স্নিগ্ধ হাত !

কে ? এ কী ? এগুলো কী দিচ্ছ কপালে ? ওডিকোলন ? পটি ? তুমি কে ? বড় আপনজনের মতো ভালবাসার আঙুল তোমার। তোমার নাম কী গো ? সুপা ?

www.BanglaBook.org

সুপা ? তুমি এসেছ ! এতদিনে এলে ? এলোমেলো পৃথিবীতে মনের মানুষ হারিয়ে গেলে খুঁজে কি আর পাওয়া যায় ? কোথায় যে লুকিয়ে ছিলে তুমি !

নাম কী গো ? সুপা ?

একা, একা ! বড় কষ্ট, বড় কষ্ট ! যে জানে, সেই-ই জানে। আমার বড় কষ্ট সুপা। অনেকরকম কষ্ট !

এসেছ যখন ; তখন থাকো ; লক্ষ্মীটি। চলে যেয়ো না। আমার মাথার কাছে বসে থাকো ; তোমার পাটভাঙা তাঁদের শাড়ির বাঙালি বাঙালি গন্ধ পাচ্ছি আমি। তুমি আমার কাছে থাকো, আমি ভাল হয়ে যাব ; দেখো। মনে প্রাণে আমি বড্ড বাঙালি। এই আমার দোষ। তুমিও তাই। তোমার মস্ত গুণ।

ধাক্কা লাগল ? কার সঙ্গে ?

কে আমাকে ইতর বলল ? বলল, আমার পা মাড়ালি ? বলল, জানিস, আমি জাতে বামুন ?

সরি, সরি, অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি কেমন বামুন গো ? নাম্বুদ্রি না কাশ্মীরি না মৈথিলি না বারেন্দ্র ?

তুমি কী নেহরুদের কেউ হও নাকি ? আমি মজুমদার। কায়েত। জাতে ছোট।

ভাগ্যিস, রাম তোমার পা মাড়ায়নি। ও আমার চেয়েও জাতে ছোট ! আর যে-ছেলেটা নবীন মুহুরির ডেরায় রামকে জল দিয়েছিল কিন্তু রাম যার হাতে জল খায়নি ; সেই ছেলেটা রামের চেয়েও ছোট জাতের !

ওহে বামুন, বলো দেখি, তোমার চেয়েও জাতে কে বড় ?

তোমার মনিব। আর তোমার গ্রামের রাজনৈতিক নেতা।

তারাই এখন শ্রেষ্ঠ।

ছোট মাসি, তোমার কী জাত ? সরিৎমেসো না হয় বজ্জাত জানি। তুমি কী ? লালন ফকির বলেছিল 'যদি ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কী হয় বিধান ?' জানো ?

এই যে ! আরে নবীন। নবীন মুহুরি ? কী করছ এখানে ? নীল লুঙ্গিটা কোথায় ফেললে ? ওঃ, তুমিও সাফারি-স্যুট পরেছ ? কী বললে ? ধিয়ার খেতে এসেছিলে ? বাঃ বাঃ, কে বলে গ্রামের লোকের অবস্থা ফেরেনি ? মালিকের পার্টিসিপেশিপে এক আনা শেয়ারও পেয়েছ ? আমি তো জানতামই !

কারা উন্নতি করবে আমি চেহারা দেখেই বলতে পারি।

প্রদীপ ? কী রে ? এত্ত মোটা হয়ে গেছিস। তোর সেই খদ্দরের পাঞ্জাবি আর কাঁধের ঝোলাটা কখন ফেলে দিলি ? কবে ? চেনাই যে যায় না রে তোকে ! সঙ্গে কে ? মমি ?

মমি ! তোমার নিজের ভুরুটা কী হল ?

—আজকাল এই-ই স্টাইল। আই ব্রো পেন্সিল লাগাই।

বাঃ দারুণ দেখাচ্ছে ! প্রদীপ, কোথায় আছিস রে এখন ? ওঃ ভুলেই তো গেছিলাম। যোধপুর পার্কে। ডিরেক্টর হয়েছিস ? গলফ খেলিস ?

তুই খেলিস না ?

ময়দানের বোওলিং গ্রিনে, বোওলিং-এ মমি গতবারে লেডিজ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ?

আরে পার্টি দে, পার্টি দে একদিন। সেলিব্রেট কর।

মিস বিয়ান্দকার স্পিকিং। মিঃ মজুমদার ! এম-ডি ওয়ান্টস টু স্পিক টু উ্য ! আই অ্যাম পুটিং হিম অন টু উ্য···

হ্যালো, হ্যালো, একজাসপোরেটিং।

আই ডোন্নো হোয়াটস রং মিঃ মজুমদার, বাট আই কান্ট কানেক্ট উ্য উইথ হিম। দেয়ারস নো কম্যুনিকেশান।

মিস বিয়ান্দকার, আই নিউ, দ্যাট উ্য কুডনট। উই বিলঙ টু টু ডিফারেন্ট ক্লাসেস—উই কান্ট বি এভার কানেক্টেড। ইউ নো, কম্যুনিকেশান ইজ দ্য বেসিক প্রবলেম।

www.BanglaBook.org

দশরথ কী বলছে রে ?

বলছে, কলকাতার চিড়িয়াখানার জানোয়ারগুলো সব শুকনো, মনমরা, রোগা ; হাড়-জিরজিরে।

দুসস।

আরে, এখানের সব বাঘ গলায় বকলেস পরানো পোষা বাঘ। টুপি-পরা ড্রাইভার তাদের গাড়ি চালায়। তাদের মাইনে আর পারকুইজিটের মোটা গরাদ দিয়ে তাদের বাঘত্বর দফারফা করে দিয়েছে। নখ নেই ওদের, কারও দাঁত নেই, হালুম-হুলুম করে না। মামাবাড়ির কুকুর, ঘাড়ে-গর্দানে-ভিকটরের মতো খালি খায় দায় আর জাঁক করে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, আর মালিকের দালালি করে।

এক কাজ কর রাম। চিড়িয়াখানা ভাল লাগেনি তো, দশরথকে তা হলে ড্যালহাউসি স্কোয়ারে নিয়ে যা। সেখানে ভরদুপুরে এমন এমন সব সাংঘাতিক জানয়ার দেখবে না ও যে, ওর দাঁতকপাটি লেগে যাবে। ও ভেবেই পাবে না এমন সব সাংঘাতিক জানোয়ারেরা ছাড়া থাকে কী করে ! তাতেও যদি মন না ভরে, তাহলে শহিদ মিনারের নীচে নিয়ে যা। ওর মন ভরে যাবে। ম্যাজিক দেখবে। শুনবে, অসংখ্য অ্যামপ্লিফায়ারের আওয়াজ হচ্ছে গাঁক গাঁক করে, কিন্তু বলা হচ্ছে না কিছুই। প্রতিশ্রুতির বন্যা বইছে প্রতি মুহূর্তে, কিন্তু রাখা হচ্ছে না একটাও। ডুবডুবারা বালি-হাঁস হওয়ার জন্যে সংগ্রাম করছে সেখানে। তোদের মতো কাদাখোঁচাদের কথা তো ভাবার সময় নেই কারও। কারওরই নেই রে !

সীতা ?

কী করছে ?

এই রাম ! সীতা কী করছে রে ?

চিড়িয়াখানার ঘাসের ওপর বসে পড়েছে ?

পড়বেই তো ! অ্যানিমিক। বেচারি ! এত কি হাঁটতে পারে ?

দশরথ ! ওকে মাগুর মাছ খাওয়া রে ! ডাক্তার বলেছে।

মাগুর মাছ ?

আঠারো টাকা কেজি ! এ কী গাজনের রসিকতা করছেন বাবু ?

আরে ! ছেলেটা কোথায় গেল ? লর্ড ? প্রিন্স অব ওয়েলস ! রামচন্দ্রের ছেলে ? মহান গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নাগরিক !

ন্যাংটো ব্যাটা ওরাং ওটাং-এর খাঁচার সামনে হলুদ ঘাসে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে ?

কী রে সীতা ? কী কামড়াল তোকে ? পিঁপড়ে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই শহরে অনেক পিঁপড়ে আছে। ছোট ছোট, গসিপিং ; পরশ্রীকাতর পিঁপড়ে। এখানের পিঁপড়েগুলো সর্বভুক ! উচ্ছেও খায় এরা ! বোধহয় ডায়োবেটিক পিঁপড়ে !

মিঃ মজুমদার, এম-ডি ওয়ান্টস টু স্পিক টু ড্য।

আই অ্যাম ওয়েটিং ফর হিম অ্যাট দিস এন্ড। হোয়াই কান্ট হি কাম ?

আই ডোন্নো, হি ইজ ট্রাইং ফ্র্যান্টিক্যালি টু রীচ ড্য।

আই টোল্ড ড্য মিস বিয়ন্দকার। হি কান্ট রীচ মি। উই বিলঙ টু টু ওয়াইডলি ডিফারেন্ট ক্লাসেস।

সুপা ! তুমি অর্ডিনারি বি-এ। আমিও অর্ডিনারি এম-এ। আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ বি-এ এম-এ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। আমরা একই শ্রেণীর লোক। তুমি কাছে থাকো, যেয়ো না। তোমাকে আমার দরকার। তোমার আমাকে।

এই ব্যাটা দশরথ ! রূপ মুখার্জি ! সবাই সাবধান। সাবধান। খাঁচার অত কাছে যাস না। জঙ্গলের কাছেও যাস না।

আরে ! তুমি !

হলুদ গেঞ্জি পরা সেই সুন্দর মতো ছেলেটা। যে রমুকাকার দেওয়ালে লিখেছিল, শ্রেনীহীন সমাজ গড়ে তুলুন। দিকে দিকে।

www.BanglaBook.org

কী ভাই ?

দন্ত্য স নয় তালিব্য শ ! বুঝেছেন ?

বুঝেছি।

রাম। এই রাম ! হতভাগা। কোথায় গেলি। একটু জল দে। জল। বড় পিপাসা।

রাম। রাম রে।

হেল্লো···

তুই যে নদীর ওপারে। আমি যাব কী করে নদী পেরিয়ে তোর কাছে ? তুই বরং আয় ! আমি শহুরে লোক। সাঁতার জানি না। আমার হাত ধর রে রাম। এই রাম ! আয়, আমরা হাতে-হাত ধরে চলি। আয়, আমরা এক ক্লাসের পোড়ো হয়ে দুজনেই পড়া বলতে না-পেরে কান ধরে এক বেঞ্চিতে দাঁড়াই। পাশাপাশি। আয়।

হ্যাল্লো, হ্যাল্লো রাম। শুনতে পাচ্ছিস ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তুই ?

ওঃ ! ভয় করছে আমার। নদীটাতে বড় স্রোত রে। কত বড় বড় পাথর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নদীটা।

কী বললি ? নদীটা কোথা থেকে আসছে ?

এর উৎসমুখ হিমালয়ে ! তারপর আসমুদ্র হিমাচলের সব কটি রাজ্যের আনাচে কানাচে ঘুরে নদীটা গিয়ে পড়েছে কন্যাকুমারিকার কাছে সমুদ্রে।

রাম, তুই তো গাঁয়ের ছেলে ! সাঁতার জানিস তো ভাল। আয় না, আয় ; পেরিয়ে এসে আমার হাতে হাত রাখ !

কী বললি ? পারছিস না ? বড্ড স্রোত ? ভেসে যাবি তুই ?

হেল্লো···

হ্যালো ! কে ? রাম ? রাম ! শুনতে পারছিস ?

হেল্লো,···হেল্লো,···ইংলিশ চালিচি···

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও য়া ই কি কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হনলুলু

লস এঞ্জেলেস্ এয়ারপোর্ট থেকে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের প্লেনটা যখন এক চক্কর ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের ওপরে মেঘ ফুঁড়ে উঠছিল তখন হাওয়াইতে সত্যি সত্যিই যাওয়া হয়ে উঠল ভেবে বেশ খুশি হয়ে উঠলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্র মেঘের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্লেন এখন চল্লিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে চলেছে : উপরে নীল অসীম ব্রহ্মাণ্ড, নীচে মেঘের গালিচা। ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে যেতে। দূরত্ব তিন হাজার মাইল।

পৃথিবীতে যত এয়ারলাইনস আছে তার মধ্যে দেশীয় কোম্পানি হিসেবে ইউ এস এ-র ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের তুলনা হয় না। যেমন যত্ন, তেমনই খাওয়া-দাওয়ার ধুম। ইকনমি ক্লাসেও পানীয় নিখরচায় পাওয়া যায়। প্লেন ছাড়তে না ছাড়তেই এত বড় একটা পটাটো চিপ্‌সের প্যাকেট দিয়ে গেল এয়ার হোস্টেস যে ঘাবড়েই গেলাম : সঙ্গে ক্যানেস্তার। তবু দেখতে দেখতে চিপ্‌স শেষ হয়ে গেল। তার পর লাঞ্চ সার্ভ করার আগে আবার খাদ্য পানীয়ের ছড়াছড়ি। বিনিপয়সায় পাওয়া যাচ্ছে, তাই একটু শ্যাম্পেন খেয়ে বড়লোকি করে নিলাম।

যখন দূর থেকে নীল জলজ দিগন্তে সীমাহীন দ্বীপপুঞ্জ দেখা গেল সবুজে সবুজ তখন বহুদিন দেশ-ছাড়া সবুজ-পিয়াসী চোখটা আনন্দে নেচে উঠল। বেলা তখন চারটে। প্লেনটা এসে ওআহু (Oahu) দ্বীপের হনলুলুতে নামল। হনলুলু সমস্ত হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী।

এই দ্বীপপুঞ্জে বিদেশিদের এদেশীয় ভাষায় বলা হয় হাওলস্। ইংরিজি বানানটা Haoles। প্রথম হাওলস্ ইংরেজরা। তারপর ফরাসি, অ্যামেরিকান, রুশান ইত্যাদি বহু বিদেশি এই সবুজ স্বর্গে পা রেখেছিলেন। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিয়েছিল রাজদণ্ডরূপে।

আজকে আরেক অনামা অখ্যাত হাওলস্ প্লেন থেকে নামবে।

অতিকায় অ্যালবাট্রস পাখির মতো ডি সি টেন প্লেনটা ট্যাক্সিং করে এগিয়ে চলল টার্মিনালের দিকে, ডানায় হাওয়া কাটার সোঁ সোঁ আর গলা-টিপে-ধরা এঞ্জিনের ক্ষুব্ধ গুঞ্জরনের সঙ্গে।

হাওয়াইন ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিদেশিরা প্রায় গত দুশো বছর ধরেই কর্তৃত্বের বীজ পুঁতে আসছিলেন ওই দ্বীপপুঞ্জে। প্রথম বিদেশি ইংরেজ ক্যাপ্টেন টমাস কুক, ইংল্যান্ডের প্লাইমাউথ থেকে সতেরোশো ছিয়াত্তরে সমুদ্র যাত্রা করে কেপ অফ গুড হোপ ঘুরে, ভারত মহাসাগর পেরিয়ে এসে টাসমানিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ফ্রেন্ডলি আইল্যান্ডস ছুঁয়ে তাহিতিতে এসে পৌঁছান।

তারপর তাহিতি থেকে কুক উত্তরে ভেসে এলেন তাঁর দুটি পালতোলা জাহাজে। সতেরোশো আটাত্তরের এক জানুয়ারির সকালে, তারিখটা আঠারোই ; ডাঙা দেখা গেল প্রথম। আর কী সে ডাঙা : ফুলে ফলে, লতায়-পাতায়, ঝর্নায়-পাহাড়ে, প্রজাপতি আর নারীতে সে এক বর্ণ-গন্ধের উৎস দেশ।

সে সব অনেক কথা অনেক দিনের কথা। মনে করতে গিয়েও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

অনেকেরই ধারণা, হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই সমীচীন ছিল— হাওয়াইনদের কারণেই। কিন্তু উনিশশো আটান্ন সনে যখন আলাস্কা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল তখন

www.BanglaBook.org

যাঁরা হাওয়াইকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছিলেন তাঁদের লবি আরও জোরদার হল। অবশেষে উনিশশো পঞ্চান্নর এগারোই মার্চ, সেনেট অলাস্কার অন্তর্ভুক্তির বিলের হুবহু এক বিল পাস করলেন হাওয়াইকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে।

হনলুলু এয়ারপোর্টটি অতি আধুনিক। এবং বিশাল। হাওয়াই-এর চতুর্দিক থেকে এত লোক এখানে আসেন যাঁর যে এয়ারপোর্টের বিশালত্ব সহজেই অনুমেয়। প্লেন থেকে নামার পর বাসে করে আমাকে নিয়ে এসে বাইরের টার্মিনাল বিল্ডিং-এ পৌঁছে দিল। হনলুলু ছাড়া একমাত্র ন্যু-ইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টেই এমন দেখেছি। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বললাম, ওয়াইকিকি বীচ-এ চলো।

টার্মিনাল বিল্ডিং-এ বাস থেকে নামতেই অনেক হাওয়াইন মেয়েরা আমাদের ঘিরে ধরে হাইবিসকাস ফুলের রঙ-বেরঙের মালা পরিয়ে দিয়ে স্বাগত জানাল। আসলে আমি ফালতু। কোনও এক ডেলিগেশানের মেম্বাররা সেই প্লেন থেকে নেমেছিলেন। মেয়েরা আমাকেও তাঁদের একজন বলে ভুল করে মালা পরাল। ভুল করে হলেও মালা কে না পরতে চায়? মেয়েরা হাসিমুখে কলরোলে বলল, 'আলোহা!' এক চালাক-চতুর সঙ্গী তার উত্তরে বললেন, 'মাহালো!'

ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে শুনলাম যে, আমি না-জেনেই হাওয়াই-এর সব চেয়ে উৎসব-মুখর সপ্তাহে এসে হাজির হয়েছি। অক্টোবরের শেষে হনলুলুতে আলোহা সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। হাওয়াইন ভাষায় আলোহা মানে স্বাগতম, ভালবাসা, শুভেচ্ছা সব কিছু। আর মাহালো মানে, ধন্যবাদ।

ট্যাক্সিটা চলেছে হু হু করে। দুপাশে দোকান আর হোটেল। এর জেনেছিলাম যে, হাওয়াইতে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় শপিং-কমপ্লেক্স রয়েছে। এত হোটেলও বোধ হয় পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই আছে। দেখতে দেখতে ওয়াইকিকি বীচের পাশে সমুদ্রের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথে এসে পড়লাম। পথের এ-পাশে হোটেল, ও-পাশেও হোটেল। ডানদিকের হোটেলশ্রেণীর ফাঁক-ফোঁক দিয়ে চোখে পড়ছে ওয়াইকিকি বীচের বালি আর নীল জল। আশ্চর্য! আমাদের দেশের সমুদ্রের পারের হাওয়াতে যেমন এক আর্দ্রতা ও নোনা গা-চিটচিটে ভাব থাকে, প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জের হাওয়াতে তেমন দেখলাম না। কারণটা আমার জানা নেই।

হলিডে ইন-এর লবিতে কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকেছি। পোর্টার স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়েছে। এমন সময় মেয়েলি গলায় কে যেন বলে উঠল, হাই!

চারধারে তাকিয়ে দেখলাম, এখানে আমার চেনা লোক কে থাকতে পারে? কে ডাকল বুঝতে না পেরে ভাবলাম অন্য কাউকে কেউ ডেকেছে। পোর্টারের পিছন পিছন এগিয়ে গেলাম। তখন পেছন থেকে হলুদ আর কালো প্রিন্টের ড্রেস পরে একটি মেয়ে দৌড়ে এসে বলল, হাই! তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না? কী খারাপ তুমি!

চিনতে, হঠাৎ দেখে, সত্যিই পারিনি। মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। পোশাক একেবারে অন্য ছিল। সত্যিই লারাকে চিনতে পারিনি।

লারা বলল, হাউ নাইস টু হ্যাভ মেট উ্য হিয়ার। আলোহা! বলেই ওর হাতের একটা গান্ধা গোব্দা পেপার-ব্যাক বই দেখিয়ে বলল, একা একা বই পড়ে পড়ে বোরড্ হয়ে গেলাম। তুমি এলে ভালই হল।

পরক্ষণেই বলল, তোমার ঘরের নাম্বার কত?

আমি বললাম, জানি না। তারপর বললাম, তোমার কত?

ও ওর ঘরের নাম্বার বলল। তারপর বলল, ফ্রেশ হয়ে আমার ঘরে চলে এসো। একসঙ্গে চা খাব।

থ্যাঙ্ক উ্য, বলে আমি এগোলাম।

মনে মনে খুবই খুশি হলাম। সত্যি কথা বলতে কী কানাডার মনট্রিয়ালে এক রাতে লারার সঙ্গে যখন আলাপ হয় সেই রাতের পর থেকে ওর কথা অনেকবার মনে হয়েছে। টরেন্টো ও মনট্রিয়ালে আমি যে বন্ধুর হেপাজতে ছিলাম তাকে ওর সম্বন্ধে লিখেওছি বিভিন্ন জায়গা থেকে।

এমন হয় না? মাঝে মাঝে হঠাৎ কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তখন মনে হয় যেন যুগ-যুগান্ত ধরে

www.BanglaBook.org

তার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলাম। যেন তাকে দেখা হওয়ার আগেও কতবার স্বপ্নে দেখেছি। এখনও এই ভীষণ ব্যস্ত, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু পৃথিবীতে কত না কত আশ্চর্য সুন্দর দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

লিফট দিয়ে উঠতে উঠতে লারার কথা ভেবে এবং এখানে ওকে দেখে মনটা আমার খুশিতে ভরে উঠল। আমি মনে মনে বললাম, মাহালো।

লারা

আমার ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে সমুদ্র ও তটভূমি দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার বাতিগুলো এক এক করে জ্বলে উঠেছে। সমুদ্রতটে বিকিনি আর স্যুইম স্যুট পরে তখনও জোড়ায় জোড়ায় মানুষ বসে আছে, চান করছে। দূরে সার্ফ-রাইডিং শেষ করে ফিরে আসছে নারী-পুরুষ। রবারের রঙ-বেরঙের ইনফ্লেটেড নৌকোয় ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের মা-বাবারা তাদের তীরে ফিরে আসতে বলছেন অন্ধকার হয়ে গেছে বলে।

ইয়োরোপে, অ্যামেরিকায়, জাপানে এবং কানাডাতে যেখানেই গেছি চারদিকে জোড়ায় জোড়ায় মানুষ দেখে কেবলই মনে হয়েছে মানুষ, সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই কি এই সব দেশে যুগলেই জন্মায়? সকলেই এমন সঙ্গী পায় কী করে? সঙ্গীমাত্রই কি মনোমতো? না মন্দের ভাল না কি ওরা একা থাকার আনন্দকে ভুলে গেছে? ভয় পায় কি ওরা মুহূর্তের একাকিত্বেও? ওদের কাউকেই, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, একা দেখা যায় না।

এসব দেশে একা একা ঘুরে বেড়ালে বড় হীনমন্য লাগে। হাওয়াই-এর মতো আলোর দেশে, রঙের দেশে, একা একা কাউকে ঘুরতে দেখলে লোকে ভাবে পুলিশের এজেন্ট, হাই-জ্যাকার বা টেররিস্ট কিংবা ক্রিমিনাল। সকলেই সন্দেহের চোখে তাকায়। তাও ভাল। কিন্তু অনেকে সম্পূর্ণ ইগনোর করে। অগ্রাহ্য করাটা অসহ্য।

বাইরের প্রশান্ত মহাসাগরের উপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে কত যে রঙের খেলা। গোলাপি হয়ে আছে সমস্ত আকাশ। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ওই আকাশ আর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের জন্মের গল্প। এ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, রূপকথার গল্প।

হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ আটটি দ্বীপ নিয়ে। সব চেয়ে বড় দ্বীপ হাওয়াই। তারপর মাউই। কাউয়াই, ওআহু, মোলোকাই, নিহাউ আর লানাই। হাওয়াই আর মাউই-এর মধ্যে আরও একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে।

এই প্রত্যেকটি দ্বীপই ভগবানদের সন্তান। পলিনেশিয়ানদের ভগবানদের মা এবং ওদের আলোর দেবতা আকাশে বসবাস করতেন। তাঁদের মিলনের প্রথম সন্তান হাওয়াই দ্বীপ আকাশ থেকে ঝপাং করে জলে পড়ে। মানে, ভূমিষ্ঠ না হয়ে জলস্থ হয়। তারপর আরও দুবার গর্ভবতী হন ভগবানের মা এবং একই ভাবে মাউই ও কাহুলায়ে দ্বীপের জন্ম হয়।

ওই তিনটি সন্তান জন্ম দেবার পর ভগবানের মা তাহিতিতে ফিরে যান। আলোর ভগবান আকাশেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু সঙ্গিনী তাহিতিতে যেতে না যেতেই আকাশের ভগবান অন্য একজন নারীর সঙ্গে সহবাস করেন। সেই সহবাসে লানাই দ্বীপের জন্ম হয়। এবং আরেক জন রমণীর সঙ্গে সহবাসে মোলোকাই দ্বীপের জন্ম হয়। কিন্তু অচিরে আলোর ভগবানের এই দুশ্চরিত্রতার কথা জানতে পেরে ভগবানদের মা তাহিতি থেকে ফিরে আসেন এবং তাঁর প্রেমিককে শাস্তি দেওয়ার জন্যে নিজেও একজন পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হন।

আকাশে বিছানা পাতা যেত কিনা জানা নেই। ভগবানদের পক্ষে সবই সম্ভব। হয়তো উড়তে উড়তেই মিলিত হতেন তাঁরা। যে দৈবিক প্রক্রিয়াতেই তাঁরা মিলিত হন না কেন, পরপুরুষের সঙ্গে মিলনের ফলে ওআহু দ্বীপের জন্ম হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এর পর ভগবানদের মা ও আলোর দেবতার পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের পরই ভগবানদের মা অন্তঃসত্ত্বা হন। কাউয়াই দ্বীপের জন্ম হয়। তারপর একাদিক্রমে নিহাউ, কাউলা ইত্যাদি দ্বীপের জন্মের পর মা বন্ধ্যা হয়ে যান। হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি সমাপ্ত হয়।

অবশ্য ভূতত্ত্ববিদরা যা বলেন তার সঙ্গে এই মিষ্টি রোম্যান্টিক জন্ম ইতিহাস মেলে না। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদদের তত্ত্ব নিয়ে এখন নাই-ই বা ব্যস্ত হলাম, তার চেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিয়ে লারার ঘরে যাওয়া যাক! লারা কবে এসেছে কে জানে? যবেই আসুক। এসেছে যে, তাতেই আমি ভীষণ খুশি।

লারার ঘরের সামনের বেল টিপলাম। ভিতর থেকে লারার চাপা গলা শোনা গেল, কাম-ইন প্লিজ। আমি দরজার নব ঘোরাবার আগেই ও নিজে এসে দরজা খুলল। বলল, কাম অন ইন।

সাধারণ অ্যামেরিকানরা ও কানাডিয়ানরা প্রচুর ভুল-ভাল ইংরিজি বলে। ইংরেজরাও বলে। ভারতীয় স্বল্প-শিক্ষিত মানুষেরও বোধ হয় ইংরিজিজ্ঞান ওদেশের অনেকের চেয়ে ভাল। তবে লারা স্বল্পশিক্ষিতা নয়, রীতিমতো উচ্চশিক্ষিতা। কিন্তু অন্য সকলেই ভুল বলে তাই চালু হয়ে গেছে অনেক ভুল কথা। আমার যদি টাকা থাকত তবে প্রত্যেক অ্যামেরিকান ও কানাডিয়ানদের নিজের পয়সায় আমি নেসফিল্ড সাহেবের গ্রামারের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান চ্যাপ্টার ফোটো-কপি করে প্রেজেন্ট করতাম।

নিছক অ্যামেরিকান বলে প্রতিপন্ন করার জন্যে অ্যামেরিকানরা এতদিনের ঐতিহ্যময় ইংরিজি ভাষাটার সর্বনাশ করেছে, জাতীয় পোশাক বা খাবার অন্য হতে আপত্তি দেখি না কিন্তু জোর করে একটা ভাষাকে বদলে নিজেদের জাতীয় ভাষা করে নেওয়ার মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা কাজ করে বলেই মনে হয়।

জানালার পাশের সোফায় আমাকে বসাল লারা। ওর ঘরটা আমার ঘরের চেয়ে অনেক বড়। দু-পাশে দুটো খাট। অ্যাটাচড বাথ, ড্রেসিং টেবল, একটা সোফাসেট। পুরোপুরি কার্পেটে মোড়া। কালারড মালটি-চ্যানেল টি ভি। প্রত্যেক ঘরেই।

রুম-সার্ভিসে টেলিফোন করে চা আনতে দিল ও। বলল, কী খাবে আর?

আমি বললাম কিচ্ছু না। ইউনাইটেড এয়ার লাইনস যা ফাঁসির খাওয়া খাইয়েছে তা বলার নয়।

লারা হাসল।

মনট্রিয়ালে আমি যখন লারার সঙ্গে পরিচিত হই, তখন লারার একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ছেলেটি ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনালের কুইন এলিজাবেথ হোটেলে কাজ করত তখন।

লারার সামনে বসে ভাবছিলাম। ও একটা কালো ফুল-হাতা ম্যাক্সি পরে ছিল সেই প্রথম দেখার রাতে। কালো বনেট মাথায় দিয়ে, গভীর রাতে লাল গোলাপ ফুল বিক্রি করছিল ও মনট্রিয়ালের ডাউন-টাউনের বারে বারে। ইংলিশ লিটারেচারে মেজর করছিল তখন ও ইউনিভার্সিটিতে। জাজ-ব্যালের ক্লাস, এবং ওখানকার একটা অ্যামেচার ড্রামা গ্রুপে থিয়েটারও করত। একই সঙ্গে। ওর ব্যক্তিত্বের শালীন, ভদ্র সম্ভ্রান্ততা আমাকে প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ করেছিল। সৌন্দর্য তো করেই ছিল।

এমন ওই সব দেশেই সম্ভব। ইউনিভার্সিটিতে মেজর-করা পরমাসুন্দরী যুবতী মেয়ে রাত বারোটায় ডাউন-টাউনের বারে বারে ফুল ফিরি করে পড়াশোনার খরচ তুলছে। অথচ তবু কুৎসা রটছে না, আমাদের দেশের আদেখলাদের মতো সুন্দরী মেয়ে দেখেই মান-সম্মান রহিত হয়ে মাছি পড়ার মতো তার উপর হামড়ে পড়ছে না ধেড়ে মদ্দ পুরুষগুলো। কারণ ও-দেশের পুরুষরা সেক্স-স্টার্ভড নয়।

ওই প্রথম দেখার পরও আরও দুবার দেখা হয়েছিল লারার সঙ্গে। একবার মনট্রিয়ালেই, একটি বারে। আরেকবার টরেন্টোতে যখন ও উইক-এন্ডে এসেছিল, গো-গো ডান্স দেখতে গিয়ে।

ওয়েটার চা এনে দিল টি-কোজিতে মুড়ে; ট্রেতে সাজিয়ে।

সুগার-কিউব হাতে তুলে নিয়ে লারা বলল, হাউ মেনি?

আমি বললাম, ওয়ান, থ্যাঙ্ক উ।

www.BanglaBook.org

লারা হাসল। বলল, থ্যাঙ্ক উ্যা নয়। বলো, মাহালো। তারপর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ছোট্ট প্যাকেটটা খুলে দুধ ঢালল আমার কাপে। লেবুর স্লাইস নিল নিজের কাপে।

আমি বললাম, হঠাৎ ? হাওয়াইতে এলে ?

বাঃ আমার ছুটি যে। তাছাড়া তুমি বোধ হয় জানো না ছোটবেলায় আমি আমার মায়ের সঙ্গে এখানে ছিলাম ছ'বছর। তখন হনলুলু অন্য রকম ছিল। আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী, মানে আমার সৎ বাবার আনারসের ব্যবসা ছিল ওআহুতে। আমার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি ছড়ানো এখানে।

আমি বললাম, খুব ভাল হল। তুমি তা হলে আমার লোকাল গার্জেন হয়ে যাও। হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখী, আমি যে পথ জানি না।

লারা হেসে উঠল গানটির ইংরিজি তর্জমা শুনে। বলল, তোমাকে এবং মনট্রিয়ালে অন্যান্য ভারতীয়দের দেখে খুব ভাল লাগে আমার। তোমাদের দেশে যাব একবার।

আমি বললাম, এনি টাইম। এবং যদি আসো, বি মাই গেস্ট। আমি তখন তোমার লোকাল গার্জেন হব।

লারা চা শেষ করে বলল, ঘরে বসে কী করবে ? চলো ওয়াইকিকির রাস্তা ধরে হেঁটে আসি। ভাল লাগবে। ওয়াইকিকিতেই ইনটারন্যাশানাল মার্কেট সেন্টার আছে একটা বিরাট গাছের তলায়। ওরিয়েন্টাল ট্রি। তুমি নাম জানবে হয়তো। চলো।

আমি উঠলাম। তারপর দুজনে করিডোর দিয়ে লিফটে নেমে, লবি পেরিয়ে এসে পথে পড়লাম।

সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছে কিন্তু হাওয়াটা আমাদের সমুদ্রতীরের হাওয়ার মতো অত জোর ও বিরক্তিকর নয়। বালি ওড়ে না। পাঞ্জাবির সঙ্গে পায়জামা লেপ্টে যায় না, শাড়ি উড়ে হাঁটু বেরিয়ে পড়ে না। না ! ও সব জ্বালাতন নেই। তাই-ই বোধ হয় ওয়াইকিকি পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত সমুদ্রতট—। চান করার, সার্ফ-রাইডিং-এর, ওয়াটার স্কীয়িং-এর এমন জায়গা কমই আছে সারা দুনিয়ায়।

লারা আর আমি পাশাপাশি হাঁটছিলাম। কত আলো, কত লোকজন। আমাদের দেশের মতো নারকেল গাছ, পামগাছ, বটগাছ। খুব ভাল লাগছিল অনেক দিন পর এসব গাছ দেখে। সমুদ্রের দিকের ফুটপাথে দেবকন্যার মতো দেখতে একটি পনেরো-ষোলো বছরের অ্যামেরিকান মেয়েকে একটি অল্পবয়সী হাওয়াইন ছেলে বটগাছ চেনাচ্ছিল, বলছিল, লুক দিস ইজ আ ব্যানীয়ান ট্রি।

মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে বটের ঝুরি ধরে টানাটানি করছিল।

ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এবং হাওয়াইন ছেলেটির চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখে ফিক করে হেসে উঠলাম আমি।

মানে, হাসি চাপতে পারলাম না।

লারা অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

বলল, হাসলে কেন তুমি ?

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম। আমাদের দিকে অনেকে তাকাল। লারা লজ্জা পেল।

বলল, বলোই না কেন হাসলে ?

আমি বললাম, বাংলায় একটা মজার গল্প আছে। এই ছেলেটি মেয়েটিকে যেমন করে বটগাছ দেখাচ্ছিল তাতে আমার সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল।

কী গল্প বলো না ? লারা আমার হাতে হাত ছুঁইয়ে বলল।

আমি বললাম, চাঁদ দেখার গল্প। ছেলেটি মেয়েটিকে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখাচ্ছিল, বলছিল, আহা ! দেখো কী সুন্দর চাঁদ, কী চাঁদের আলো, আহা !

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বলে উঠেছিল, বুঝছি বুঝছি ; তুমি আমারে চুমু খাবা। চাঁদের বিকল্প বটগাছ।

এবার লারার হাসির পালা। শব্দ বেশি করছিল না কিন্তু ওর সারা শরীর দুলে উঠছিল হাসির দমকে। এবারও অনেকে তাকিয়ে দেখল আমাদের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুদূর গিয়ে আমরা রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের ফুটপাথে উঠলাম। একটা বিরাট বটগাছে নানা রকম আলো দিয়ে সাজিয়েছে। তার ছায়ায় ছায়ায় কত যে দোকান। পোস্টাফিস, রেস্টুরেন্ট, জামা-কাপড় স্যুভিনির খেলনা, পাগো-পাগো, মু-মু, হাওয়াইন রঙিন প্রিন্টেড শার্ট। দোকানে দোকানে ছয়লাপ। কী সুন্দর করে যে সাজানো আলোয় আলোয় সমস্ত জায়গাটা তা বলার নয়। ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁ ও বারও আছে।

হনলুলু শহরটা বট, নারকেল, খেজুর বঙ্গন করবী হেনা আর চাঁপা গাছে ভরা। এই সব ট্রপিকাল ফুল-ফলের গাছ পশ্চিমিদের চোখে এক বিস্ময়। যারা এশিয়াতে এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে আসেনি কখনও, তাদের এই ওরিয়েন্টাল হাওয়াই-এর গন্ধ বর্ণের তীব্র আমেজ মাতাল করে ফেলে।

আমি বললাম, তুমি তো হাওয়াই-এ আগে ছিলে। এই আলোহা উইক কি এক সপ্তাহই ? সারা বছরে ?

লারা বলল, না, প্রায় মাসখানেক। প্রত্যেক বছর একই সময় হয় না। একটু এদিক ওদিক হয়। পাঁচটা প্রধান দ্বীপে এক এক সপ্তাহ করে হয় তাই সবশুদ্ধ পাঁচ সপ্তাহ হয়েই যায়। এই আলোহা ফেস্টিভ্যালের ইতিহাস আছে। প্রাচীনকালে এখানে 'মাকাহিকি' উৎসব হত প্রতি বছর। হাওয়াই-এর সর্দাররা, যাঁদের ভূমিকা ছিল রাজার পরেই ; ওই সময় সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন দেবতা 'লোনা'র নাম করে। কর-টর আদায় হয়ে গেলে কর-আদায়কারী সর্দাররা এবং সাধারণ করদাতারা সবাই একসঙ্গে মিলে উৎসবে মাততেন দেবতা লোনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে। তখন ওই উৎসবকে থ্যাঙ্কস-গিভিং উৎসব বলত লোকে। 'মাহালো' উৎসব।

তারপরই লারা বলল, তুমি থাকবে ক'দিন ?

বললাম, কতদিন আর। ছুটি তো বছরে পনেরো দিনের। তার মধ্যে সাতদিন তো ওয়েস্ট-কোস্ট এই কাটিয়ে এলাম।

লারা বলল, তা হলে আজ রাতে বসে তোমার জন্যে একটা প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেলি। আমিও তো মাত্র কালই এসেছি। কেনেথের আসবার কথা ছিল আজকে। ফ্লাইট নাম্বার জানায়নি বলে এয়ারপোর্টে যেতে পারলাম না। এত জায়গা থেকে এত ফ্লাইট আসে হনলুলুতে যে আন্দাজে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।

আমি বললাম, কেনেথ মানে ? কেনেথ হচ্নার ? যার কথা তুমি বলেছিলে ? তোমার মনট্রিয়ালের বয়-ফ্রেন্ড ?

হ্যাঁ ! লারা বলল।

তারপর বলল, আজও যদি ও আসে কেনেথ তা হলে রাতে ফোন করবে হয়তো। ও যদি আসে তা হলে তোমাকে আমার পক্ষে বেশি সঙ্গ দেওয়া সম্ভব হবে না।

আমি হাসলাম। বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ও এলে, আমি যে এখানে এসেছি তা তোমাকে বুঝতেই দেব না, তোমাদের নির্জনতায় কোনও বিঘ্ন ঘটাব না আমি।

লারা মুখ ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে। নানা রঙা আলোয় ওর হলুদ আর কালো ফুল ফুল ড্রেসে ওকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। কাঁধ অবধি কালো চুল নেমে এসেছে। ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি যেন। ওর সুন্দর দাঁতের সারি, ওর হাসিতে টোল-পড়া গাল, ওর গায়ের হালকা পারফ্যুমের গন্ধ সব মিলে মিশে আমার নেশা লাগছিল।

লারা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বলল, তুমি রাগ করলে ?

আমি হাসলাম। কিন্তু সত্যি বলতে কী হাসতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। বললাম, তুমি আমার কে ? তোমার উপর রাগ করার অধিকার কোথায় আমার ?

ও চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে আমার হাতে হাত রেখে বলল, পৃথিবীতে কোনও অধিকারই কেউ নিয়ে জন্মায় না। অধিকার সৃষ্টি করে নিতে হয়। তুমি বড় বোকা আর সেন্টিমেন্টাল। আজকের দিনের কোনও মানুষের সেন্টিমেন্ট আছে নাকি ?

আমি বললাম, নেই বলেই মনে হয়। কিন্তু থাকলে আমি খুব খুশি হতাম। সেন্টিমেন্ট না থাকলে মানুষ কি মানুষ থাকে ? পশুদের তো সেন্টিমেন্ট নেই। তা হলে পশুদের সঙ্গে মানুষের

www.BanglaBook.org

তফাত কোথায় ?

লারা মুখ ফেরাল আমার দিকে। বলল, জানি না। তবে কথাটা ভাবার মতো। ভাবব এ নিয়ে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে আমরা ফিরলাম।

আমরা স্বীকার করি আর নাই-ই করি জেট প্লেনে ওড়া-উড়ি করলে শরীরের উপর তার এফেক্ট কিছু নিশ্চয়ই হয়। মানুষ মাধ্যাকর্ষণে বন্দি স্থলচর জীব ; সে যদি হঠাৎ চল্লিশ হাজার ফিট উঁচুতে উঠে ঘণ্টায় প্রায় হাজার মাইল বেগে একটা প্রেসারাইজড এয়ারকন্ডিশানড বাক্সে বসে হাজার হাজার মাইল ছোটাছুটি করে তবে তার শরীরে সেই উড়ুন তুবড়ির যাত্রার কী ফল হয় না হয়, তা এখনও বোধ হয় পুরোপুরি নিরূপিত হয়নি। লম্বা প্লেনজার্নির পর আমার ঘাড়ের কাছে ব্যথা করে, গা ম্যাজম্যাজ করে।

হোটেলের কাছে এসে লারা বলল, কী করবে এখন ?

আমি বললাম, বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে থাকব পনেরো মিনিট।

লারা বলল, আমিও। ঘেমে গেছি একেবারে।

তারপর তুমি কী করবে ? আমি বললাম।

লারা বলল, একটু কাচাকাচি করতে হবে। আন্ডার গার্মেন্টস। তারপর তুমিও চান করে আমার ঘরে চলে এসো।

আমি বললাম, তুমিই এসো না কেন আমার ঘরে। তোমার ঘর তো কেনেথের পায়ের শব্দের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে। আমার ঘরেই এসো।

লারা অদ্ভুত চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর দুষ্টমির হাসি হাসল।

বলল, ঠিক আছে। আমিই আসব।

হোটেলে ঢুকে লারা ওর ঘরে গেল।

হোটেলের নীচেই একটা স্টেশনারি-কাম-ড্রাগ-স্টোর-কাম-পোস্টাফিস আছে। অনেকদিন পর গোল্ড-ব্লক টোব্যাকো পেলাম এই দোকানে। ক্লিনস্ পাইপ ক্লিনার। ঘরে এসে টি-ভিটা খুলে দিয়ে, জানালার তাকে দু-পা তুলে দিয়ে বসে পাইপ খেলাম কিছুক্ষণ।

তারপর শাওয়ার খুলে দিয়ে খুব ভাল করে চান করলাম। চান-টান সেরে খালি গায়ে একটা হাওয়াইন শার্ট পরে ট্রাউজার গলিয়ে বসে বসে টি-ভি দেখতে লাগলাম।

ওয়াল্ট-ডিজনির একটা ছবি দেখাচ্ছিল। ইয়ালোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের পটভূমিতে।

ছবিটাতে বুঁদ হয়ে গেছি এমন সময় ফোনটা বাজল।

ভারী, খসখসে গলায় একজন পুরুষ বললেন, মে আই স্পীক টু লারা প্লিজ ?

আমি বললাম, লারা তো এখানে নেই ?

এখানেই তো থাকার কথা। উনি বললেন, বিদ্রূপের গলায়।

তারপর অভব্যভাবে ভদ্রলোক বললেন, ওঁকে বলুন বিছানা ছেড়ে এসে ফোনটা ধরতে। ফোন ধরতে জামা-কাপড় পরার দরকার নেই।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না।

বললাম, আপনি কে বলছেন ?

ভদ্রলোক বললেন, প্লিজ টেল হার ইটস্ কেনেথ ফ্রম টরেন্টো।

ইতিমধ্যে আমার ঘরের ডোর-বেলটা বাজল।

আমি বললাম, আপনি একটু ধরবেন ফোনটা ?

উনি বললেন, না ! ধরতে পারা সম্ভব নয়। লারাকে বলে দেবেন যে আমি ফোন করেছিলাম। বলেই, রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে দরজা খুলে লারাকে বললাম যে, কেনেথ ফোন করেছিল।

লারার চোখ-মুখ খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠল। ও ফোনের কাছে দৌড়ে এল। এসেই বলল, কই ? ছেড়ে দিয়েছে !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লারা হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, আমার ঘর থেকে তোমার ঘরে আসতে গিয়ে লিফটে আমার এক ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা। লিফটটা নীচেই নামছিল, ওর সঙ্গে নীচে নেমে গেলাম লবিতে। সেখানে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট গল্প করে সোজা তোমার ঘরে আসছি।

আমি বললাম, আমার ঘরের নাম্বার কী করে পেল কেনেথ ?

তাই-ই তো ? অবাক হল লারা।

লারা বলল, ও আমাকে বলেছিল যদি ফোন করে তবে রাত দশটার পর করবে।

লারার দিকে চেয়ে আমার কষ্ট হল।

আমি টেলিফোনের কাছে উঠে গিয়ে হোটেলের অপারেটরকে চাইলাম। বললাম, আমার ঘরে একটু আগে টরেন্টো থেকে যে কল এসেছিল সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছু জানেন কি না ?

মেয়েটি সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল যে, জানে।

বলল, একটু আগে টরেন্টো থেকে কেউ ফোন করেন হোটেলের রিসেপশানে। বলেন, মিস লারা ডস এই হোটেলে উঠেছেন কি না। ওঁরা বলেন যে, উঠেছেন। এবং লারার ঘরে কানেকট্ করে দেন ওঁকে। সেখানে নো-রিপ্লাই হয়। তখন রিসেপশানের মেয়েটি আমার ঘরে কলটি দিয়ে, ও বলে যে, আমাদের দু জনকে একই সঙ্গে বাইরে যেতে দেখেছে তাই লারা ওঁর ঘরে না থাকলে হয়তো আমার ঘরেও থাকতে পারে।

ফোন নামিয়ে রেখে আমি লারাকে বললাম, অপারেটর যা বলল। কিন্তু কেনেথ আমাকে যেসব কথা বলেছিল তা আর ওকে বললাম না। বলতে খারাপ লাগল।

লারা কথা না বলে ওর ব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট অ্যাড্রেস বই বের করে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল চিন্তান্বিত মুখে। এরিয়া কোড তারপর নাম্বার।

তারপরই কেনেথের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কিন্তু কী বলছিল তা বুঝতে পারছিলাম না আমি। কারণ ও ফ্রেঞ্চে কথা বলছিল। তবে ও যে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারছিলাম।

মনট্রিয়ালে যারা থাকে, তাদের ফ্রেঞ্চ না জেনে উপায় নেই। ফরাসি দেশীয় লোকের আধিপত্য সেখানে। কানাডায় যখন কুইন এলিজাবেথ এসেছিলেন তখন মনট্রিয়ালে তাঁকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেনি মনট্রিয়ালের লোকেরা। মনট্রিয়াল পুরোপুরি ফ্রেঞ্চ ডমিনেটেড, মনট্রিয়ালের আরেক নাম, প্যারিস অব কানাডা।

কথা বলতে বলতে, দেখতে দেখতে লারার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। লারার চোখ জলে ভরে গেল। লারা দুবার তিনবার রাগত স্বরে বলল, পাঁর্দো ? পাঁর্দো ? পাঁর্দো ?

তারপর নিজের হাতের মুঠি পাকিয়ে নিজের হাঁটুতেই ঘুষি মারতে লাগল।

আমি মিথ্যা অছিলায় বাথরুমে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। জল খেলাম বেসিন থেকে এক গ্লাস। হঠাৎ যখন ঠক করে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ পেলাম তখন বাথরুম থেকে ঘরে এসে দেখি লারা আমার দিকে পিছন ফিরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিয়ে আমিও অনেকক্ষণ চুপ করে ওর পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আস্তে ডাকলাম, লারা।

লারা উত্তর দিল না।

আমি এগিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম, দু চোখের জলে ওর সুন্দর গোলাপি পোশাকটা ভিজে যাচ্ছে।

আমি বললাম, কোন কুক্ষণে যে এসে তোমার এত বড় সর্বনাশ করলাম।

আমি বললাম, লারা আমাকে ক্ষমা করো। আমার খুবই খারাপ লাগছে।

লারা কথা বলল না।

লারা চেয়ারে বসে পড়ল। বসে, আমার দিকে জলভরা চোখে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর লারা প্রথম কথা বলল।

বলল, কেনেথ যেসব অপমানকর কথা বলেছিল তার জবাবে তুমি কিছু বললে না কেন ওকে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে ও অপমান করতে পারে, আমি এক সময় ওর প্রেমিকা ছিলাম সেই অপরাধে, কিন্তু তোমাকে কোন সাহসে অপমান করল ও ?

আমি বললাম, আমি তো কিছু মনে করিনি। তাছাড়া একজন অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে ফোনে ঝগড়া করার মানে কী হত ? তাছাড়া তুমি যাকে ভালবাসো, যে তোমার বন্ধু, তার সঙ্গে আমি কোন নির্বুদ্ধিতায় ঝগড়া করব ? আমার কথা তুমি একেবারেই ভেবো না। সে আমাকে দেখেইনি কখনও, আমিও দেখিনি তাকে ; তাই মান-অপমানের কথাই ওঠে না।

লারা বলল, আই পিটি হিম। ওকে ভালবেসেছিলাম বলে আমি অনুতপ্ত, লজ্জিত, দুঃখিত। ও এত ভীরু যে সোজা কথাটা সোজা করে বলতে পারল না। বলতে পারল না যে, ও ক্রিস্টিনের খপ্পরে পড়েছে। আমি কি ওকে জোর করে আটকে রাখতাম ? জোর করে কি কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে, না কারও ভালবাসা পেতে পারে ?

আমি শুধোলাম, ক্রিস্টিন কে ?

লারা বলল, ওদের কোম্পানিতেই কাজ করে। টরেন্টো যাওয়ার পর থেকেই ও ক্রিস্টিনের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক উইক-এন্ডে ওর অ্যাপার্টমেন্টেই থাকে ; বেড়াতে যায়। কী করব। ভালবেসেছিলাম বলে দুঃখ পেতেই হবে।

আমি বললাম, লারা শান্ত হও। তুমি ভাল মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে। তোমার কষ্ট দেখে আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে।

লারা চোখ তুলে বলল, কেন ? আমি তোমার কে ? আমার কষ্ট দেখে তোমার কষ্ট হওয়া ভুল, মিথ্যা। আমার কষ্ট আমি একাই বইতে পারি। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আই ডোন্ট নিড ইওর সিমপ্যাথি। ফর দ্যাট মাটার আই ডোন্ট নিড এনিবডিজ সিমপ্যাথি।

আমি চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম, লারা আমি তোমাকে কীই বা দিতে পারি ? তুমি আমার কেউ নও। কেউ হবে না কোনওদিন। আমিও হব না তোমার। আর এক বছর পরই ফিরে যাব আমি আমার দেশে পড়াশোনা শেষ করে। আমি তোমাকে স্থায়ী কিছুই দিতে পারব না। কিন্তু তা বলে, যা দিতে পারি, একজন মানুষ অন্যজনকে যা দিতে পারে, ভাল ব্যবহার, ভালবাসা, সমবেদনা, সাহচর্য তাই-ই বা দেব না কেন ? আর দিতে গেলে তুমি ফিরিয়েই বা তা দেবে কেন ?

কিন্তু আমি মুখে কিছুই বললাম না। চুপ করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুধু বললাম, লারা আমি সত্যিই বড় দুঃখিত। আমি তোমার সর্বনাশ হয়ে এলাম এই হাওয়াইতে। এ বড় লজ্জার।

লারা বলল, তুমি আমার ভাল করবারই বা কে আর সর্বনাশ করবারই কে ? তুমি নিজের ইমপর্ট্যান্স বড় বেশি দিচ্ছ।

তারপরই আমাকে ধমক দেবার মতো করে বলল হঠাৎ, ওয়াচ আউট ! অর উই উইল হিট দ্যা সীলিং !

একটুক্ষণ পরে চুপ করে বসে থেকে লারা উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করার আওয়াজ হল কটাং করে। দরজার আওয়াজের সঙ্গে ছিটকে এল, গুড নাইট।

পশ্চিমের মানুষেরা বড় বেশি আত্মনির্ভরশীল। একটু কম হলে বোধহয় ভাল হত। নিজের সব শোক, দুঃখ অসুবিধা, সব ওরা একা একা নিজেরাই বইতে চায়। অন্য কেউ তার হয়ে তা বইতে গেলে অপমানিত বোধ করে। এমন কী পথচলা ক্রাচে ভরকরা পুরুষকে সাহায্য করতে গেলেও সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। এদের চরিত্র আর আমাদের চরিত্র অন্যরকম। পশ্চিমে বেশ কিছুদিন থেকে বুঝতে পাই এটা।

আমি অবসন্ন ও বিষণ্ণ বোধ করছিলাম। লারা যদি পুরুষ হত তবে আমি ওর ঘরে গিয়ে থাকতাম আজ রাতে। ওকে ওর এই মানসিক বিপর্যয়ের সময় সাহায্য করতাম। ওকে হাসাতাম, ওকে নিয়ে বাইরে বেরোতাম, সারা রাত কোথাও কোনও রেস্টুরেন্টে কি নাইট ক্লাবে গিয়ে হই হই করে ওর মনের দুঃখ ভুলিয়ে দিতাম। কিন্তু চাঁদে যখন মানুষ পা দিচ্ছে, পৃথিবী যখন ভীষণ ভীষণ ভীষণ আধুনিকতার অভিঘাতে ন্যুব্জ হয়ে রয়েছে ঠিক তখনই যেহেতু বিধাতা লারার শরীর আর আমার

www.BanglaBook.org

শরীর বিভিন্নভাবে গড়েছেন এই অপরাধে এই মুহূর্তে ওর জন্যে আমার কিছুই করার নেই।

আমার ঘরে কেনেথের কলটা দেওয়াতে বোধহয় ওদের সম্পর্ক যেটুকু ছিল, সেটুকুও নষ্ট হয়ে গেল। এ-কথাটা ভেবে আমি এমন স্তম্ভিত হয়েছিলাম যে তা বলার নয়।

আমি একবার উঠে, আবার টি-ভিটা চালিয়ে দিলাম। তারপর জুতোটা খুলে পা দুটো তুলে খাটের উপরে পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বসলাম। সেই ছবিটা আবার শুরু হল, ডগ-ফীড, ক্যাট-ফীডের বিজ্ঞাপনের পর। যে জগৎ আমার নিজের, যে জগতে গেলে আমি বড় শান্তি পাই, যেখানে মানুষ নেই, নারী পুরুষের শরীর মনের কোনও রকম বিভ্রাট নেই সেই আদিম অরণ্যের জগতে ফিরে গেলাম ওয়াল্ট-ডিজনির ছবি দেখতে দেখতে।

পুরনো হাওয়াই

কে যেন আমার মাথার কাছে কথা বলছিল, কারা যেন কথা বলছিল। গরমের সময় স্কুল ছুটি হল। আমি বন্ধুদের সঙ্গে বই-খাতা শ্লেট হাতে নিয়ে গ্রামের লাল মাটির পথ বেয়ে ধুলো উড়িয়ে ছায়া ঢাকা আমের বোলের গন্ধে ভরা ঘুঘু ডাকা, ফড়িং-ওড়া মন্থর দুপুরে বাড়ির দিকে ফিরে আসছিলাম।

এমন সময় আমার পিছনে, পাশে সামনে কারা যেন কথা বলে উঠল।

টুং-টুং-টাং-টুং করে দরজার বেলটা বাজল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি যে অবস্থায় কাল বালিশে পিঠ দিয়ে টি-ভি দেখছিলাম সেই অবস্থাতেই শুয়ে আছি। খালি পায়েই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললাম। টি-ভিটা তখনও চলছিল।

দরজা খুলতেই দেখি লারা দাঁড়িয়ে।

চান করেছে। একটা সমুদ্রের গায়ের রঙের মতো নীল গাউন। প্রসাধন করেছে। ওর সারা শরীর থেকে পারফ্যুমের গন্ধ উড়ছে। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লারা। বেশ লম্বা ও। ওর মাথাটা আমার বুকের কাছে।

লারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ও ঘরে ঢুকেই টি-ভিটা চলছে দেখল, আমার বিছানা দেখল, পোশাক দেখল, তারপর কথা না বলে সুইচ টিপে টি-ভিটা বন্ধ করে দিল। জানলার কাছে গিয়ে পর্দা সরাল পুরোটা। এ-ঘরে পুবের রোদ আসে না, পশ্চিমের আসে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ওর বাঁ হাতের ঘড়ির ওপর ডান হাতের তর্জনী রেখে বলল, কটা বেজেছে জানো?

কটা? আমি বাচ্চাছেলের মতো বললাম।

লারা বলল, নটা।

তারপর ও চেয়ারে বসে বলল, কাল সারারাত কী করেছ? ঘুমোওনি? জামাকাপড়ও তো ছাড়োনি, টি ভিটাও চলছিল।

একটু থেমে বলল, কেন? ঘুমোওনি কেন?

আমি বললাম, নাঃ, ঘুমিয়েছিলাম তো। দেখছ না বেশিই ঘুমিয়েছিলাম। দেশ দেখতে এসে কেউ ইচ্ছে করে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করে?

কাল রাতে কী খেয়েছ? লারা শুধোল।

আমি বললাম, মনে নেই।

তুমি খাওনি। লারা বড়দির মতো স্নেহ-মাখা গলায় ধমক দিল।

তারপর বিড়বিড় করে নিজের মনে বকল, ইউ সিলি ফুল। ইটস আনবিলিভেবল।

আমি দাঁড়িয়ে সুটকেসটা খুলে জামা-কাপড়ের চেঞ্জ বের করছিলাম, এমন সময় লারা চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এক দৌড়ে চলে এল, এসে দুটি হাত আমার দু কাঁধে ছুঁড়ে দিয়ে ওর মুখটা আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুকে রেখে কী সব বিড়বিড় করে বলতে লাগল। সে সব আমার সম্বন্ধে এত ভাল ভাল কথা যে আমার লিখতেও লজ্জা করছে।

আমি শুধু বললাম, দাঁত মাজিনি, মুখে গন্ধ ; দাড়ি কামাইনি আমি।

লারাকে প্রথম দিন দেখেই ভালবেসেছিলাম। ভালবাসার অনেকানেক রকম আছে। সে এক অন্যরকম ভালবাসা। যে কেউ কাউকে ভালবেসেছে কখনও সেই-ই জানে যে, ভালবাসার জন যদি দৌড়ে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন শরীর ও মস্তিষ্ক অবশ হয়ে যায়। তখন ভাল লাগা যা করিয়ে নেয়, তাই-ই করে মানুষ। পুরুষ কি নারী।

লারা শান্ত হয়ে ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসল। বলল, এখন শুধুই মুখ-টুখ ধুয়ে দাড়িটা কামিয়ে নাও। চলো, লেটস গো ফর আ সুইম। ওয়াইকিকিতে এসে সুইম না করে চলে যাবে তা হবে না।

আমি বললাম, সুইম স্যুট নেই আমার।

লারা বলল, কিনে দেব আমি তোমায়। নীচের দোকানেই পাওয়া যায়।

আমি বললাম, বেশি বড়লোক হয়েছ না ? তার চেয়ে চলো তুমি সাঁতার কাটবে আমি বীচে লাল-নীল ছাতার নীচে বসে বিয়ার খেতে খেতে তোমাকে দেখব। আমিও কাটব সাঁতার, কল্পনায় ; তোমার পাশে পাশে।

বলেই বললাম, তুমি পাঁচ মিনিট বসো। আমি চান সেরে আসছি।

চান-টান করে নিয়ে আমি আর লারা ডাইনিং রুমে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। ফ্রুট-জ্যুস, স্ক্রাম্বলড্ এগস্, উইথ ব্যাকন্। টোস্ট ও কফি।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম বীচে।

চারদিকে কত আনন্দ, কত খুশি, কত রঙ-বেরঙের স্নানের পোশাক। মোটা-মোটা অ্যামেরিকান মেয়ে-পুরুষ সাঁতরাগাছির ওলের মতো জলে ভাসছে, রোদ পোয়াচ্ছে। নৈনিতাল আলুর মতো গোল-গাল জাপানিরাও কম নেই। চেঁচামেচি, জলের মধ্যে উল্টো-পাল্টি, পপ-কর্ন, নানা রঙা ক্যান্ডি, হট-ডগ ; কোকাকোলা ও বিয়ারের মোচ্ছব লেগেছে।

হঠাৎ হঠাৎ রসভঙ্গ করে মাইক্রোফোনে হোটেল থেকে চিৎকার করছে, মিস্টার সো এন্ড সো, কল ফর ইউ ফ্রম ন্যু-ইয়র্ক, অথবা টোকিও।

সাহেব প্রশান্ত মহাসাগরের জল থেকে উঠে প্রাগৈতিহাসিক কচ্ছপের মতো থপথপ করে দৌড়ে গেলেন হোটেলে ফোন ধরতে। এদের মিনিটে দশ হাজার ডলার রোজগার বোধ হয়। কাজ আর ছুটিকে টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীরা কখনও আলাদা করতে জানে না—যারা বড় ব্যবসায়ী। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম দেখিনি কোনও।

লারা আর আমি মুখোমুখি বসেছিলাম চেয়ারে। আমাদের চতুর্দিকে নীল সমুদ্র রোদে চিকচিক, সাদা ফেনা, ভেজা-গায়ের ছেলে-মেয়ে যুবতীরা। সানগ্লাসে বড়দের সকলেরই চোখ ঢাকা। এরা কে কোন দিকে চেয়ে আছে এবং কে কী ভাবছে তা বোঝার উপায় নেই। চতুর্দিকে নড়েচড়ে বেড়ানো মানুষগুলোকে ঠুলিপড়া মনহীন অতিকায় কিল্‌বিলে পোকা বলে মনে হচ্ছে।

ওয়াকিকি বীচে বসে, লারার কথাই ভাবছিলাম। পশ্চিমের মেয়েরা শুধু আদর খেতে জানে যে, তাই-ই নয়, আদর করতেও জানে। আমি কোনও বাঙালি মেয়েকে জানি না যে লারার মতো প্রিয়জনকে দৌড়ে এসে এমন করে জমজমিয়ে চুমু খায়। আসলে আমাদের মেয়েরা বড় সংস্কারাবদ্ধ। প্রেমের মধ্যে শরীরের মধ্যে যে লুকোবার কিছু নেই, মনের মতোই তার বহিঃপ্রকাশ যে বিচিত্র ও মধুর তারা যেন জেনেও জানে না। এতে তারা তো ঠকেই কিন্তু তারা অন্যজনকে যে কতখানি ঠকায় তা তারা নিজেরা কখনও জানতেও পারে না। বহু বিবাহিত বাঙালি পুরুষ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে শুনেছি যে, তাঁদের কোণারক ও খাজুরাহোর দেশের স্ত্রীরা তাঁদের সামান্যতম আবদারের জবাবে বলেন, "আমার দ্বারা হবে না, অন্য মেয়ের কাছে যাও।" সত্যি সত্যিই যে তাঁরা যান না, এটা তাঁদের স্ত্রীদের যে কত বড় সৌভাগ্য তা স্ত্রীরা জানেন না। এবং এ-বাবদে বাঙালি স্ত্রীদের একতার তুলনা নেই। পুরো জাতটাকে জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিসংবাদী ক্ষেত্রে একঘেয়েমি ও প্রাণহীনতার শিকার করে রেখেছেন তাঁরা তাঁদের সংস্কারাচ্ছন্ন অনুদার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনোভাবে।

আশা করব বাঙালি স্বামী মাত্রই তাঁদের পক্ষ নিয়ে আমার এই সাহস প্রদর্শন সমর্থন করবেন এবং আমাকে স্ত্রীকুলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন।

আমি বললাম, বলো লারা তুমি কী খাবে ?

লারা বলল, কোক।

আমি বললাম, যখন আমি কানাডাতে গেছিলাম তখন তোমাকে একদিনও সফট্ ড্রিঙ্কস নিতে দেখিনি। আজ হঠাৎ ?

লারা হাসল। নীল গাউনটাতে ওকে লাল-নীল-হলুদ ছাতার নীচে প্রতিসরিত আলোতে এত ভাল দেখাচ্ছিল যে কী বলব।

বলল, তখন আমার চারধারে সব হার্ড পুরুষেরা ভিড় করেছিল। তোমার মতো সফট্ পুরুষ আমি দেখিনি। যে একজন স্বল্প পরিচিত মানুষের দুঃখে না খেয়ে থাকে— এতখানি ইনভলভ্ড্ হয়।

তারপর হেসে বলল, আমি সফট্ ড্রিঙ্কসই নেব।

আমি বললাম, আমিও তা হলে কোকই নেব। এই সবে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এলাম।

লারার দিকে তাকিয়ে মনে হল সত্যিই আমি হয়তো ওর কাল রাতের দুঃখের অনেকটাই শুষে নিয়েছি। আজ এই আলো-হাওয়া। চারধারের এত আনন্দের মধ্যে কাল রাতের মন খারাপের কথা বোধ হয় ও ভুলেই গেছে।

দেখতে দেখতে ওর চোখে কী সব ভাবনা ভিড় করে এল। মুখটা হাসি হাসি হয়ে উঠল, চোখ দুটো ভাবালু।

আমি ওর দিকে চেয়ে হাসলাম। বললাম, কোথায় চলে গেলে তুমি ? কত দূরে ?

ও বলল, জানো, ভাবছিলাম, আজ এখানে কত হই হই, বাড়ির পর বাড়ি, কংক্রিটের রাস্তা, বিজলি আলো—। এই সমুদ্রতটের আজকের চেহারা দেখে পুরনো হাওয়াই-এর জীবনযাত্রার কথা মনে আনতেও বুঝি রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়। তাই না ?

তারপর বলল, যে জীবনের কথা আমি বলছি ও ভাবছি সে জীবন অবশ্য আমার চোখে দেখা নয়, বইয়ে পড়া। তখন রাজা প্রথম কামেহামেহা পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হননি। আমি ভাবছি, ক্যাপ্টেন টমাস কুক যে হাওয়াইকে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই ঘুমন্ত, সুন্দর, ফুলে-ফলে, পাখি, প্রজাপতিতে ঘেরা প্রাকৃত হাওয়াই-এর কথা।

একটি মেয়ে গলায় নরম আপেলের বাকলস্ আঁটা রাজহাঁসের মতো একটা পাখিকে নিয়ে বীচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

আমি বললাম, কী পাখি ওটা ? কখনও তো দেখিনি ?

লারা বলল, নেনে। তুমি জানো না ?

আমি শুধোলাম, নেনে পাখি কী পাখি ? তুমি তো এখানকার অনেক খবর রাখো।

লারা অবাক হল, বললে, "নেনে" এখানকার ন্যাশনাল বার্ড। নেনে কিন্তু প্রাণীতত্ত্বের এক উজ্জ্বল আবিষ্কার ও বিস্ময়। এরা আসলে রাজহাঁস ছিল। কিন্তু এই আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত শক্ত লাভার দেশে বসবাস করার জন্যে এরা এদের পায়ের জোড়া পাতাকে বদলে নখের মতো করে ফেলেছে। বড় বড় রাজহাঁসসুলভ ডানাগুলো স্বল্প দূরত্ব সহজে উড়ে বেড়ানোর জন্যে ছোটও করে নিয়েছে। কতদিনের সচেতন চেষ্টায় এই পাখিরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তা এরাই জানে। তবে প্রকৃতির মধ্যেই সম্ভবকে অসম্ভব করার মন্ত্র খুঁজে পেয়েছে এরা। নেনেই হাওয়াই-এর সব চেয়ে বড় স্থলচর পাখি। এখন সমস্ত হাওয়াই-এ সাড়ে তিনশো মতো নেনে আছে। তবে ওআহু দ্বীপে নেই। শিকারি আর জংলি জানোয়ারদের দৌরাত্ম্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল ওরা। উনিশশো উনপঞ্চাশ সনে আইন করে নেনেকে রক্ষা করতে হয়। হাওয়াই-এর মোউনা-লোআ পাহাড়ের ঢালে হুয়ালালাইতে আর হালে আকালা ক্রেটারে এদের জন্যে অভয়াবাস করা হয়েছে। পোষা পাখিদের বাচ্চা হলেও সেই নেনের বাচ্চাদের এই সব অভয়াবাসে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়।

আমি উঠে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে আমাদের দুজনের জন্যে দুটো কোক নিয়ে এলাম। লারার

www.BanglaBook.org

কোকটা দিয়ে বললাম, এবার বলো যা বলছিলে। পুরনো হাওয়াই-এর কথা। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমার হাওয়াই বেড়ানো বিফল হত। কিছুই জানতে-শুনতেই পারতাম না জায়গাটা সম্বন্ধে। কী বলো ?

লারা বলল, কেন ? ফিরেও জানতে পারতে। বই পড়লেই জানা যায়। জানতে বাহাদুরি কী ?

শুধু বই পড়লে এক রকম জানা হয় আর নিজের চোখে দেখলে অন্য রকম।

তা ঠিক। লারা বলল।

আমি বললাম, কথায় কথায় কথা ঘুরে যাচ্ছে। বলো, শিগগিরি বলো।

লারা ওর কোকে একটা চুমুক দিয়ে বলল, আমরা যেখানে বসে আছি সমুদ্রের ঢেউ আগে এখান অবধি আছড়ে পড়ত। ওয়াইকিকি সমুদ্রতট কিন্তু মানুষের তৈরি, তা জানো তো। সাঁতার কাটার, স্কিয়িং-এর সুবিধার জন্যে সানসেট বীচ থেকে ড্রেজারে করে বালি কেটে বার্জ-এ করে অনেক বছর ধরে সে বালি বয়ে এনে এনে এখানের সমুদ্রকে ভরাট করে ওয়াইকিকি তৈরি হয়েছে।

আমি বললাম, তাই ই বলো। এসে অবধি মনে হচ্ছিল কী নেই, কী যেন পাচ্ছি না। খোদার উপর খোদকারি। এই জন্যেই সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছিলাম না এর মধ্যে। আমাদের দেশের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্তারা যেমন প্রকৃতিকে সুন্দরতর করতে সিমেন্ট দিয়ে পাথর দিয়ে লাল, নীল রঙ দিয়ে বনপাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সর্বনাশ করেন এরাও দেখছি তাই-ই করেছে। ছিঃ ছিঃ। ঘেন্না হয়ে গেল ওয়াইকিকির উপর।

লারা বলল, তুমি রাগছ কেন ? তুমি তো আর সাঁতার কাটছ না। ছেলেমেয়ে পরিবার সকলকে নিয়ে সাতার কাটার জন্যে সেফ অ্যান্ড সাউন্ড করে দেওয়া হয়েছে বীচটাকে অগভীর করে। খারাপ কী ?

আমি বললাম, যাই-ই হোক। আমি এই মডার্ন ওয়াইকিকির কথা শুনতে চাই না ; তুমি পুরনো হাওয়াই-এর কথা বলো।

একটু চুপ করে থেকে লারা বলতে লাগল, মনে করো, ওই যেখানে কিঅস্ক কফি-বারটা আছে ওখানে একটা খড়ের ঘর। মনে করো, সমুদ্রের ধারের প্রথম ঘর। সকালের সমুদ্র দিগন্ত অবধি রোদে চিকচিক করছে। চারিদিকে কী নির্জনতা, কোলাহলহীন শান্তি। হু হু করে নারকোল খেজুর পামের মাথায় দোল লাগিয়ে হাওয়া আসছে সমুদ্র থেকে। মেয়েরা ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একটি ছোট মেয়ে আধমাইল হেঁটে গেছিল জঙ্গলের ভিতরের ঝর্নাতে কাঠের পাত্রে জল বয়ে আনতে। ঘরের কাছের ঠাণ্ডা হাওয়াতে তার মা হয়তো পেপার-মালবেরীর ঝোপের ছাল বাকড় কাঠের উপর ধোপ দিচ্ছে। "কাপা" কাপড় তৈরি করবে সে। ছালের ফালিগুলোকে জলে ভিজোনো হয়েছে, শুকনো হয়েছে রোদে এবং কোটা হয়েছে আগে। এখন শেষবারের মতো ধোপ দেওয়া হচ্ছে ওগুলোকে। একটা চার ফলাওয়ালা কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে ধোপ দিচ্ছে সে। প্রত্যেকবার আছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই চারফালার প্রত্যেক ফলায় যে জ্যামিতিক প্যাটার্ন খোদাই করা আছে সেগুলোর ছাপ পড়ছে কাপাতে। মেয়েটির মা কাপা কাপড় ফাঁপা একটা কাঠের উপর কাঠের একটা ডাণ্ডা দিয়ে বাড়ি মারছে।

তার সেই বাড়িমারার ধর ধর শব্দের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকের উজ্জ্বল সবুজ নিরবচ্ছিন্ন ট্রপিক্যাল বনে-পাতায়। সমুদ্রের হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিধ্বনির টুকরোগুলিকে, মিশিয়ে দিচ্ছে পাথরে পাথরে ছিটকে ওঠা সমুদ্রের ফেনিল জলবিন্দু আর হাওয়ার সঙ্গে।

পুরোপুরি ধোপ দেওয়া ও কোটা হয়ে গেলে "কাপা" কাপড়টি মেলে দেওয়া হবে রোদে শুকোবার জন্যে। আর যদি সময় থাকে তা হলে ওর উপরে নানা রঙের নক্সাও কাটা হবে।

উলঙ্গ ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা গ্রামের পথে উঠোনে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। কুস্তি লড়ছে একে অন্যের সঙ্গে। কেউ কেউ সগর্বে তার বাবা কি দাদাকে অনুকরণ করছে। পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে কার নিশানা ভাল তাব পরখ করছে। বাঁশের চোঁচকে বর্শা মনে করে নিয়ে খেলার লড়াই লড়ছে একে অন্যের সঙ্গে।

একটু থেমে আরেক চোক কোক খেয়ে লারা বলল, হাওয়াইন ছেলে মেয়েরা তখন যখনই হাঁটতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিখত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রে যেত। জল কি স্থল দুইই তাদের কাছে সমতুল ছিল। চারিদিকে প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টিত এই দ্বীপগুলোর বাসিন্দারা তখন সত্যি সত্যিই উভচর ছিল বলতে গেলে। জল ও স্থলে ছিল তাদের সমান আয়াস।

মেয়েরা কাজেকর্মে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাঝে মাঝে যাতায়াতের পথে তারা ছেলেমেয়েদের কাউকে বকে-ঝকে, কাউকে খেপিয়ে চলে যাচ্ছিল। শিশুরা তখন একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল না। তারা আনন্দের বাহক, আনন্দের মধ্যে সৃষ্ট এবং আনন্দের পরিপূরক ছিল।

ওদিকে বিকেলের ভরা রোদে বড় ছেলেরা তাদের ক্যানোটাকে সমুদ্র থেকে তীরে টেনে তুলে একটা নারকোলকুঞ্জের নীচে রাখল বালিতে। তারপর বাড়ির দিকে মুখ করে সকলে একসঙ্গে দৌড়ে আসতে লাগল দুড়দাড় করে। দৌড়বার কারণও ছিল। অনেক মাছ ধরা পড়েছিল। অথচ বছরের ঠিক এই সময়ে বেশি মাছ পাওয়ার কথা নয়। তাই ওদের আনন্দ। ওদের পারিবারিক ভগবানের কৃপা ছাড়া এত মাছ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

এর পর, ওই যে বড় হোটেলটা দেখছ, ওইখানে সবুজ বনের মধ্যে যে সুঁড়িপথ ছিল তখন সেই পথ দিয়ে বাবা আর একটি বড় ছেলে খেত থেকে টারো আর যাম নিয়ে ফিরল। এত খাওয়ার যে রীতিমতো ভোজ লাগানো যায়। পুরুষেরা, বাবা ফেরা মাত্র তক্ষুনি 'ইমু' ঠিক করতে লেগে গেল। উনুনকে ওরা ইমু বলত। যখন কাঠগুলো উজ্জ্বল লাল কয়লা হয়ে উঠল পুড়ে তখন মাছ, যাম আর টারো সবটাই পাতায় মুড়ে পাথরের উপরের টকটকে লাল আগুনে দিয়ে দেওয়া হল ভাপে সেদ্ধ হওয়ার জন্যে। একটা মাছকে কিন্তু ইমুতে দেওয়া হল না। সে মাছটা পুরুষরা সকলে মিলে কাঁচা খেল মজা করে। মাথা-ল্যাজা, নাড়িভুঁড়ি, পিত্তি সবসমেত। ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে বা একাসনে খাওয়ায় মেয়েদের "কাপু" ছিল। ছেলেদের খাওয়া হয়ে যাবার পরই শুধু মেয়েরা খেতে পারত।

আমি বললাম, আগে আমাদের দেশের মেয়েরাও তাই-ই করত। কাপু মানে কী ?

লারা বলল, কাপু মানে মানা, নিষেধ ; ট্যাবু। তখন হাওয়াইন সমাজে হাজার হাজার কাপু ছিল। আড়াআড়ি করে লাঠি রেখে দিত এখানে সেখানে পুরুতরা। সেখানে যাওয়া কাপু ছিল সকলের। কত রকম যে কাপু ছিল তার ইয়ত্তা নেই।

আমি বললাম, এখন ভাগ্যিস কাপু নেই। থাকলে তুমি আমার সঙ্গে বসে এখানে কোক খেতে পারতে না।

যা বলেছ। হেসে বলল লারা।

তারপর একটু কোক খেয়ে আবার শুরু করল লারা।

এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ওকে সেই পুরনো হাওয়াই যেন হাতছানি দিচ্ছে। প্রথমে শোনার আগ্রহ আমার যত ছিল এখন বলার আগ্রহ ওর তার চেয়ে বেশি।

রান্না হতে হতে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে সমুদ্রের উপর পশ্চিম দিগন্তে নিভে গেল। আকাশে যদিও লালের ছোপ তখনও কিন্তু গ্রামের বাড়িগুলোতে প্রায় অন্ধকার নেমে এল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ঘুমোবার ঘরে সকলে যে যার মাদুরের উপর বসে বা শুয়ে পড়ল। মেয়েরা কাপা কাপড় টেনে নিল কাঁধের উপর রাতের শীতের ভয়ে। মেঝের মাঝখানে একটা শিসতোলা প্রদীপ জ্বলতে লাগল। কিন্তু মোমের তৈরি প্রদীপ নয়। পাথরের থালার উপরে এক ছড়া কুকুই বাদামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া প্রদীপ। এই প্রদীপ থেকে এক আবছা কাঁপা কাঁপা আলো ঘরময় ছড়িয়ে গিয়ে নাচানাচি করছিল। দেওয়ালে নিজেদের নৃত্যরত ছায়া দেখে চমকে উঠছিল ছেলেমেয়েরা। প্রদীপ থেকে ওঠা ধুঁয়োয় পাতায় ছাওয়া ছাদ আর পাতার দেওয়ালের খাঁজ-খোঁজ ভরে উঠল।

যখন আবহাওয়াটা ঠিক গল্প শোনার মতো হয়ে উঠল তখন ছোটরা বয়োজ্যেষ্ঠকে ধরত, গল্প বল। উমির গল্প বলো।

এই অবধি বলে, লারা কোকের গ্লাস শেষ করে ফেলল। ফেলেই বলল, আর না।

আমি বললাম, প্লিজ বলো। তোমার গল্প শুনতে শুনতে আমি যেন কোথায় চলে গেছিলাম। সে হাওয়াইই দেখলাম না ! আর আজ কি এই অ্যামেরিকান হাওয়াই দেখতে এলাম আমি !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলো, লক্ষ্মীটি, বলো, বলে আমি লারাকে অনুরোধ করলাম।

লারা হেসে বলল, আমি কি তোমার ঠাকুরদাদা যে তোমাকে উমির গল্প শোনাব ?

আমি হেসে বললাম, শুধু ঠাকুরদা কেন ? তুমি আমার সব ; লক্ষ্মীটি।

লারা ব্যাগ থেকে বের করে ওর সানগ্লাসটা পরে নিল। বলল, চোখে বড় চমক লাগছে। রোদটা লক্ষ লক্ষ পায়ে সমুদ্রের উপর এমন করে নাচছে না !

আমি বললাম, নাচলে নাচুক, তুমি সানগ্লাসটা খোলো তো। তোমার অমন চোখ দুটো না দেখা গেলে তোমার গল্পের মানেই বুঝতে পারব না আমি।

লারা হাসল। বলল, তুমি লোককে কমপ্লিমেন্ট দিতে জানো বটে।

আমি হাসলাম না। বললাম, আমরা চোখের দেশের লোক। আমাদের অভিধানে চলতি ভাষায় তোমাদের মতো থ্যাঙ্ক উ্য, প্লিজ-এর ছড়াছড়ি নেই। আমরা কাউকে কখনও মুখে বলি না, আই লাভ উ্য। মেক লাভ টু মি তো বলার প্রশ্নই ওঠে না।

লারা চোখ থেকে সানগ্লাসটা নামাতে নামাতে অবাক গলায় বলল, তা হলে কী করে ওই সব বলো তোমরা ?

আমি বললাম, সবই বলি। কিন্তু চোখ দিয়ে বলি। তোমাদের চেয়ে অনেক মিষ্টি করে অনেক লাজুক, নরম, সৌন্দর্যের সঙ্গে বলি। আমরা চোখ দিয়ে কথা বলি। মুখ দিয়ে নয়। চোখের ভিতর দিয়ে কথা শুনিও। তাই আমার সামনে কখনও চোখ ঢেকো না তুমি।

লারা আমার চোখের দিকে চাইল। এই প্রথম ও আমার চোখের দিকে এমন করে চাইল। মুখে অস্ফুটে বলল, ফ্যানটাস্টিক। ইট জাস্ট ডিড নট স্ট্রাইক মি। তোমার চোখ দুটো কী সুন্দর ; কী এক্সপ্রেসিভ !

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, এবার আমি সানগ্লাস পরে ফেলব কিন্তু।

তারপর বললাম, আমার চোখ জেলি-ফিশের চোখের মতো জানি আমি। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের চোখ ভারী সুন্দর। তুমি এসো আমাদের দেশে, তোমাকে দেখাব।

লারা বলল, যদিও হিংসে হচ্ছে তবে যাব হয়তো কখনও। একদিন সকালে দরজা খুলে দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে।

আমি বললাম, সেই সকালের জন্যে সব রাতে স্বপ্ন দেখব। সত্যিই এসো কিন্তু।

লারা বলল, আমিও সাহিত্যের ছাত্রী কিন্তু কথায় আমি তোমার ধারে কাছে যেতে পারব না।

আমি বললাম, তোমার কোনও দুঃখ। কবি সাহিত্যিকদের নিজেদের কথা নেই বলেই তারা পরের কথা লিখে মরে। তুমিই তো কবিতা। সাহিত্যের অনুপ্রেরণা। তুমি বা তোমরা আছ বলেই তো লেখকরা তোমাদের নিয়ে লিখতে পারেন। এই দুঃখেই তো কখনও লেখক হবার বাসনা নেই। লেখকরা নায়ক-নায়িকার কথাই লেখেন, নিজেরা জীবনে কখনও নায়ক হতে পারেন না।

লারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেলল। নিজের প্রশংসাটা ওর ভাল লেগেছিল। কার না লাগে ?

বলল, তোমার মতো অন্যকে ফ্লাশ করতে আমি কাউকে দেখিনি।

আমি বললাম, ফ্লাশ করবার মতো এমন কাউকে আমিও তো দেখিনি আগে।

লারা হাসতে হাসতেই বলল, প্লিজ, প্লিজ ; তুমি এমন করে বললে কোন দুর্বল মুহূর্তে বিশ্বাস করে ফেলব এসব কথা।

আমি বললাম, অ্যাই ! কথায় কথায় অন্য কথায় চলে যাচ্ছি কিন্তু আমরা। তুমি উমির গল্পটা বলবে, না বলবে না ?

বলছি, বলছি। বলে লারা শুরু করল।

বলল, বলছি শোনো।

অনেক অনেকদিন আগে সমস্ত হাওয়াই-এর রাজা ছিলেন একজন ভারী শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁর নাম লিওলা। একদিন তিনি হামাকুয়া জেলার এক গ্রাম্য বুনো জায়গা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। মেয়েটি তার পীরিয়ডস্ শেষ হওয়ার পর ঝর্নায় স্নান করছিল। সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। তার নাম আকাহি।

www.BanglaBook.org

আমি এই জায়গায় ফুট্ কেটে বললাম, ইতিহাসে কি এই রকম অশ্লীল খুঁটিনাটিও লেখা ছিল ? না তুমি বানিয়ে বললে ?

লারা লজ্জা পেল।

বলল, বানালে আর ইতিহাস হবে কী করে ? তোমার বিশ্বাস না হয়, হনলুলুর লাইব্রেরিতে চলে যাও। সত্য মিথ্যা জানতে পাবে। হুবহু যা পড়েছি তাই-ই বলছি তোমাকে।

আমি বললাম, সরি, বলো, বলো, থেমো না।

ঝর্নার পাশে দাঁড়ানো নিরাবরণ আকাহি হঠাৎ রাজাকে ওর দিকে আসতে দেখে বড় ভয় পেয়ে গেল। ভাবল সে নিশ্চয়ই কোনও কাপু ভেঙেছে এবং শাস্তি হিসেবে হয়তো বা তার প্রাণদণ্ডই হবে।

রাজাকে দেখামাত্রই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে না পড়লেই কাপু ভাঙা হত তখন। কিন্তু লিওলার আকাহিকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। রাজা সেই ইলিমা ফুলের মতো পেলব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। তাই তিনি আকাহির ভয় ভেঙে দিলেন।

রাজাকে দেখে আকাহিরও বড় ভাল লেগেছিল। আর রাজা তো সেই সুন্দরীকে দেখা মাত্রই কামাতুর হয়ে উঠেছিলেন। সেই ঝর্নারই ধারে পাখির ডাকের মধ্যে ফুলের গন্ধের মধ্যে রাজা লিওলা আকাহির সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের অশান্ত কামজ্বরতপ্ত শরীরকে শান্ত করলেন।

পূর্ণ মিলনের পর লিওলা আকাহিকে বললেন যে, তার গর্ভে রাজার সন্তান আসতে পারে। বললেন, যদি মেয়ে হয়, তা হলে তার আসল বাবার পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। আর যদি ছেলে হয়, তা হলে রাজার পরিচয় সে পাবে।

এই বলে রাজা তাঁর পরিধেয়র কিছু কিছু অংশ ও মুকুটের অংশ দিয়ে গেলেন আকাহিকে পুরস্কার ও তাঁর মিলনের স্মারক স্বরূপ।

যথাসময়ে আকাহির সন্তান নিশ্চয়ই হল। এবং ছেলে হল। আকাহি ছেলের নাম রাখল উমি। আকাহির স্বামী, অনেকানেক বেচারি স্বামীর মতোই উমিকে নিজের ছেলে ভেবে তার মতো করেই মানুষ করতে লাগল। সাধারণ মানুষের ঘরে ছেলেকে যেমন করে মানুষ করা হত তেমন করেই।

আকাহির স্বামী উমিকে প্রায়ই মারধর করত। একদিন উমি যখন বেধড়ক মার খাচ্ছে তখন আকাহি দৌড়ে এসে তার স্বামীকে বলল যে, উমি তোমার ছেলে নয়, ও রাজা লিওলার ছেলে। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আকাহির স্বামী বেচারির তো প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল। পাছে তার স্বামী আকাহির কথা অবিশ্বাস করে, তাই আকাহি রাজা লিওলার দেওয়া স্মারকগুলো এনে তার স্বামীকে দেখাল।

স্বামী বেচারির অবস্থা আরও শোচনীয় হল।

গল্পের এইখানে আমি হেসে উঠলাম।

লারা বলল, তুমি হাসলে কেন ?

আমি বললাম, এবার থেকে বিবাহিত বন্ধুদের বলব যেন সাবধান হয়ে ছেলেমেয়েদের মারধর করে। রমণী জাতকে বিশ্বাস নেই।

লারা বলল, তা তো বলবেই ! সব দোষ মেয়েদেরই। তোমরা তো সব সাধুসন্ত। ঝামেলা বাধিয়ে দিয়ে তোমরা ঝাড়া হাত-পায়ে ঘুরে বেড়াও। দোষের ভাগী হয় মেয়েরা ; বোঝাও বয়ে বেড়ায়।

আমি বললাম, ঝগড়া কোরো না, গল্প বলো !

তার কিছুদিন পর, অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে উমির সঙ্গে তার বাবা রাজা লিওলার মিলন হল।

উমি পরে বিভিন্নরকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রাজা হলেন এবং তার উত্তরপুরুষকে উচ্চবংশমর্যাদা দেবার জন্যে লিওলার এক মেয়েকেই, মানে উমির সৎ-বোনকে বিয়ে করলেন।

উমি রাজা হয়েও নিজে হাতে সাধারণ লোকদের সঙ্গে কাজ করতেন। চাষার কাজ। জেলের কাজ। হাওয়াই-এর ইতিহাসে মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে উমি এবং উমির রাজত্বকাল নানাকারণে।

অন্যান্য রাজারা তাদের সবচেয়ে প্রিয় মেয়েদের নিয়ে আসতেন উমির কাছে উমির স্ত্রী হিসেবে

www.BanglaBook.org

দান করতে। উমি রানি এবং অরানি কতজনের সঙ্গে যে সহবাস করেছিলেন তার লেখাজোখা নেই। উমির এতই ছেলেমেয়ে হয়েছিল যে পরবর্তী কালে যদি কোনও সাধারণ লোক বলত যে উমি-আ-লিওলা তাঁর পূর্বপুরুষ নন, তবে অন্য লোকে তাকে পাগল অথবা নিরেট-বুদ্ধি বলে ঠাওরাত।

উমি রূপকথার নয়, সত্যিকারেরই একজন বড়, বিখ্যাত এবং দয়ালু রাজা ছিলেন। হাওয়াইতে তাঁর এবং তাঁর রাজত্বকালের গল্প প্রায় রূপকথাতেই দাঁড়িয়ে গেছে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে। ইংল্যান্ডের কিং আর্থার এবং তাঁর নাইটস্ অফ দ্যা রাউন্ড টেবলের গল্পের মতো।

আমি যেন তখনও ঘোরের মধ্যে ছিলাম। লারার গল্প শুনতে শুনতে কোথায় কত শত বছর পিছনে চলে গেছিলাম!

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। অতীত থেকে ফিরে আসতে ইচ্ছা করছিল না।

লারাও চুপ করে ছিল। হাওয়ায় ওর চুলগুলো কপালে এসে পড়ছিল।

তারপর লারাকে বললাম, তুমি পার্ল হারবার দেখেছ?

লারা হাসল। বলল, নিশ্চয়ই! তুমিও দেখে যেয়ো।

তারপরই বলল, চলো কোথাও ছায়াতে গিয়ে বসি। রোদটা বড্ড কড়া হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, চলো।

লারা বলল, কয়েক ব্লক হেঁটে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারেই যাওয়া যাক। তোমাদের ব্যানিয়ান ট্রির ছায়ায় ওপেন-এয়ার কাফেতে বসে গল্প করা যাবে। তুমি কোনও স্যুভেনির কিনতে চাও বাড়ির লোকের জন্যে তা হলে তাও কিনতে পারো। অনেকরকম দোকান আছে।

আমি বললাম, স্যুভেনির কিনে দেব কাকে? আর কতবছর পরে দেশে ফিরব তারই ঠিক নেই। এখন কিছুই কেনার মানে হয় না।

তা যা বলেছ। লারা বলল।

আমরা দশ মিনিট হেঁটে গিয়ে বটগাছের ঠাণ্ডা ছায়াতে ঝিরঝিরে হাওয়ায় এসে বসলাম।

আমাদের দেশে কত গাছ গাছালি কিন্তু আমাদের মধ্যে কত কম লোকই গাছপালা ভালবাসি। কলকাতা শহরের বুকে ব্রিটিশরা যে সব গাছপালা পুঁতে গেছিলেন সেই সব গাছ বিনা দ্বিধায় আমরা কেটে ফেলেছি। নতুন গাছ লাগানোর কথা ভাবিনি। গাছ গাছালি রেখেও যে একটা শহরকে বাড়ানো যায় কী করে তা আমরা সত্যিই জানি না। ভাবলেও খারাপ লাগে।

লারা বলল, বিয়ার খাওয়াচ্ছি আমি তোমাকে।

তুমি?

আমিও খাব। লারা বলল। যেন ও খেলেই ওর দাম দেওয়ার অধিকার বর্তে যাবে।

বেশ লাগছে এই পরিপূর্ণ অবকাশ। পড়াশোনা নেই, কাজ নেই, টেলিফোন নেই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই—নিরবচ্ছিন্ন ছুটি..... শুধু ছুটি।

পশ্চিমের জগতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে না পড়লে বোধহয় জানতেও পেতাম না যে, ছুটিটা কত উপভোগের। আমরা কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলাতে বিশ্বাস করি না। এদেশের লোকে যখন কাজ করে, শুধুই কাজ করে। কাজের মধ্যে আড্ডা বা খেলা বা রাজনীতি কিছুই করে না। যারা সত্যি সত্যিই প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে তারাই ছুটির মজা পুরোপুরি পায়। কাজের নিয়মানুবর্তিতা ও নেশা যাকে পায়নি, সে ছুটির আনন্দের গভীরতাও জানে না।

লারা ওর বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে বলল, পার্ল হারবারের উপরে একটা ফিল্ম দেখেছিলাম ছোটবেলায়! ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা, মার্লন ব্রান্ডো আর কে যেন...।

আমি বলে উঠলাম, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার। আমিও দেখেছি। কী যেন নামটা? মনে পড়েছে "ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি"। তাই না?

ঠিক ঠিক। লারা বলল।

লারা বলল, সকাল সাতটা পঞ্চান্ন। ডিসেম্বরের সাত তারিখ। ১৯৪১ সন। জাপানি বোম্বাররা টর্পেডো, টোরা মেসেজ নিয়ে মেঘে ঢাকা পাহাড়ের ফাঁক থেকে হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এল

www.BanglaBook.org

পার্ল হারবারে। তার আগে অত নিচু দিয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট ফর্মেশানে উড়ে রাডারের চোখ এড়ানোর অমন দুঃসাহসিক চেষ্টা আর কোনও জাতের এয়ার ফোর্সই করেনি। চার হাজার লোক মারা গেছিল সেই আক্রমণে। আর ইউ-এস-এর প্যাসেফিক ফ্লিটের যে ক্ষতি হয়েছিল তার পরিমাপ ছিল না। যখন পার্ল হারবারে যাবে তখন দেখতে পাবে অ্যারিজোনা মেমোরিয়াল। ইউ-এস-এস অ্যারিজোনা ছিল ইউ-এস-এর গর্ব। অ্যারিজোনা এবং অন্যান্য অনেক নৌ-জাহাজ একেবারে শেষ করে দিয়েছিল জাপানিরা। পার্ল হারবার বন্ধ করেই জাপান ইউ-এস-এ-কে যুদ্ধে টেনে নামাল তাদের বিপক্ষে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পার্ল হারবার আক্রমণই জাপানের সর্বনাশের সূত্রপাত।

আমি লারাকে বললাম, তুমি যেরকম সন তারিখ মুখস্থ রাখো দেখছি তাতে মনে হয় তুমি ইতিহাসের ছাত্রী, সাহিত্যের নও।

লারা হাসল। বলল, ইতিহাসকে উপেক্ষা করা আর নিজেদের অতীতকে অবজ্ঞা করা একই কথা। ছাত্রী যে বিষয়েরই হই না কেন— ইতিহাস আমাকে ভীষণ টানে। হিসটরি রিপিটস ইটসেল্ফ। সমস্ত জাতের ভবিষ্যৎ তার ইতিহাসের মধ্যেই সুপ্ত থাকে, এতে কোনও ভুল নেই।

বিয়ার খেয়ে আমরা একটু দোকানগুলো ঘুরে-টুরে দেখলাম। লারাকে আমি একটা পাগো-পাগো কিনে দিলাম। সবুজ আর হলুদ হাইবিসকাস ফুলের ছাপ দেওয়া প্রিন্টের কাপড়ের। লারা একটা হাওয়াইন সার্ট কিনে দিল আমাকে। বেগুনি আর জংলা-ফুলের কাজের। একটা দোকানে বাঁশের নানা জিনিস ছিল। টিপিক্যাল হাওয়াইন ডিজাইনের। আমার স্কুলে পড়া ছোট ভাইকে পাঠাবার জন্যে একটা মানি-ব্যাঙ্ক কিনলাম। কাঠের তৈরি, হালকা বাদামি রঙা, অপদেবতার মুখ খোদাই করা তাতে।

কেনাকাটা সেরে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে ফিরে চললাম।

হোটেলে পৌঁছে লারা বলল, দাঁড়াও। তোমাকে একটা বই প্রেজেন্ট করব। হাওয়াই সম্বন্ধে লেখা।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের দোকানে ঢুকে লারা বইটা চাইল।

বইটা আমার হাতে দিয়ে লারা বলল, আশ্চর্য কথা কী জানো ? হাওয়াইন ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট যে বাছা বাছা বই-এর বিবলিওগ্রাফি তৈরি করে ওদের মুখপত্র ছাপিয়েছেন তাতে এই বইটিরই নাম নেই। অথচ বইটি কী ভাল !

লিফটের দিকে এগোতে এগোতে লারা আমার হাত ধরে বলল, কাল তোমার সঙ্গে আমি সত্যিই খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আজ রাতে তোমাকে আমি কাহালা হিলটনে খাওয়াতে নিয়ে যাব।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, আমার জন্যে তোমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, কেনেথের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হল, আর তুমিই আমাকে খাওয়াবে ?

লারা দুষ্টুমি করে হাসল। বলল, সর্বনাশ হল না লাভ হল কে বলতে পারে ? আমি মুহূর্তে বাঁচার পক্ষপাতী। মুহূর্তের সমষ্টিই তো জীবন। এই মুহূর্তে সুখী হলেই সব মুহূর্তে সুখী। ভবিষ্যৎ-এর জন্যে বর্তমানকে মাটি করতে আমি কখনওই রাজি নই।

তারপর হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, বিশ্বাস করো, আমার মতো সুখী এই মুহূর্তে কেউ নেই।

আমি বললাম,তোমার সুখ যেন স্থায়ী হয়।

লারা বলল, হবে। আমি জানি যে, হবে।

দেবত্বের পরীক্ষা

লারাই বলেছিল যে আবার সন্ধের সময় আমার সঙ্গে দেখা হবে। মধ্যবর্তী সময়ে উই উইল বি অন আওয়ার ওওন।

আমি শুধিয়েছিলাম, কেন এমন স্বেচ্ছারোপিত বিচ্ছেদ ?

লারা হেসে বলেছিল, কারণ বিচ্ছেদ মাত্রই মিলনকে মধুর করে।

www.BanglaBook.org

তারপর বলেছিল, সমস্ত সময় একসঙ্গে থাকলে তুমি বোরড হয়ে যাবে। আমিও হয়তো বা। টু মাচ ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস কনটেমপ্ট। তোমার সম্বন্ধে আমি একই রকম মনোভাব নিয়ে যেতে চাই এখান থেকে। আশা করি তুমি আমার কথা বুঝবে।

আমি বলেছিলাম, বুঝব।

ঘরেই এক প্লেট ফিশ-ফ্রাই আনিয়ে নিয়েছিলাম। লাঞ্চের পর ঘরে শুয়ে শুয়ে লারার দেওয়া বইটা পড়ছিলাম। সত্যি। আমরা বড় আনইনফর্মড। কোনও দেশ দেখতে আসার আগে সেই দেশ সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা করে তবেই আসতে হয়। রথের মেলা দেখতে আসার মতো নতুন দেশে এসে পাঁপড় ভাজা খেয়ে আর ঘাড়-নাড়া বুড়ি কিনে বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না। অ্যামেরিকায় আসার পর থেকে এ-দেশীয় মানুষদের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়া করে থাকেন তাঁদের এই একজাকটিং অ্যাটিচুডটা আমাকে বড় মুগ্ধ করে। ফাঁকিবাজি বা অগভীর ব্যাপার-স্যাপারকে এরা বেশ ঘৃণার চোখে দেখে।

বইটা পড়তে পড়তে সত্যিই তন্ময় হয়ে গেছিলাম।

লারা যে উমি রাজার গল্প করছিল, সেই উমির রাজত্বকালের তিনশো বছর পর মানে সতেরোশো খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রায় সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। উমির রাজত্বকালের পর হাওয়াইতে আর বিশেষ উন্নতি হয়নি কোনও।

ক্যাপ্টেন তাঁর দুটি পালতোলা জাহাজ রেজলুশান ও ডিসকভারি নিয়ে তাহিতি ছেড়ে উত্তরমুখো রওয়ানা হয়েছিলেন। দুটো জাহাজই হুইটবী কলিয়ার্স—। তাদের গতিবেগ ছিল খুবই কম কিন্তু বড় শক্ত পোক্ত জাহাজ। সতেরোশো আটাত্তরের এক জানুয়ারির সকালে রেজলুশানের লুক-আউট রিপোর্ট করল যে, স্থলচর পাখি দেখতে পেয়েছে সে। নাবিকরা উৎসুক হয়ে দূরবিণ চোখে লাগিয়ে সামনে চেয়ে রইল। তারপর কচ্ছপের ভিড় দেখা গেল জলে। জাহাজের দুপাশে তারা সরে সরে যেতে লাগল। এরও পরে যখন সমুদ্রের স্রোতে অনেক বেশি টান লক্ষ করল তখন যেসব পুরনো নাবিক ছিল জাহাজে তারা নিঃসন্দেহ হল যে ডাঙা আর বেশি দূরে নেই।

আঠারোই জানুয়ারির সকালবেলা দূরে ডাঙা দেখা গেল। কুয়াশার ঘোমটার আড়াল থেকে ফিকে নীল আর করমচা-লাল পাহাড় আর নরম সবুজে বনানী ঘেরা ওআহু দ্বীপ নাবিকদের অবাক করে দিল। তারা সব জাহাজের রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চেয়ে রইল সেদিকে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর মাটির গন্ধে বুঁদ হয়ে।

কিন্তু বিপরীত হাওয়া, পালতোলা জাহাজগুলোকে ওআহু দ্বীপের হাতছানি সত্ত্বেও উত্তরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। উত্তরে কানাই দ্বীপ। অন্ধকারে ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ দুটো ওই কানাই দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে লাগল।

সেই রাতে কয়েকজন হাওয়াইন তাদের ক্যানোতে থেবড়ে বসেছিল। মাছের জাল ফেলেছিল তারা। ওদের মধ্যে একজন, তার নাম মোআপু, মুখ তুলে হঠাৎ দেখল আলো ঝলমল, দুটি স্বর্গের পাখির মতো সাদা ডানার কী প্রাণী জলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে জাল-টাল ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ক্যানো চালিয়ে তীরে ভিড়ল। তারপর পড়ি কি-মরি দৌড়ে গিয়ে তাদের সর্দারদের এই অলৌকিক জলযানের খবর জানাল।

সকাল হতে না হতেই ছোট ছোট ক্যানোতে দাঁড় বেয়ে দলে দলে হাওয়াইনরা সমুদ্রে ভেসে পড়ল। রেজুলেশান আর ডিসকভারির কাছাকাছি আসার সাহস ছিল না তাদের। তারা দূর থেকে তাদের ক্যানোতে বসে অবাক চোখে জাহাজ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া দড়িতে শুয়োর, মাছ, মিষ্টি আলু, এইসব বেঁধে নবাগন্তুকদের ভেট পাঠাল। বদলে, তাদের ইংরেজরা ধাতুর টুকরো দিল।

হাওয়াইনদের মধ্যে যারা ক্যানো নিয়ে আসেনি তারা তটে মহা ভিড় ভারাক্কার লাগিয়ে দাঁড়িয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। পালগুলোকে দেখে কেউ বলল, সূর্যের রশ্মি আটকে গেছে ওখানে। মাস্তুল দেখে অনেকে বলল যে, ওগুলো গাছ; সমুদ্রেও হেঁটে বেড়াচ্ছে।

শেষমেষ ওখানকার যে সর্দার—মানে ছোট রাজা—সে জনাকয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দড়ি ধরে জাহাজে উঠে এল। আর উঠে এসেই তো চক্ষুস্থির। ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ তেকোণা টুপি

www.BanglaBook.org

পরে ছিল। হাওয়াইনরা ভাবল যে, মানুষগুলোর মাথাই তিনকোণা। ইংরেজদের পোশাক দেখে ভাবল ওগুলো গায়েরই চামড়া—ঢিলে ঢালা হয়ে গেছে এবং মাঝে মাঝে জিনিসপত্র রাখার থলে আছে সেই চামড়ায়। একজন নাবিক পাইপ খাচ্ছিল। তাকে দেখে হাওয়াইনরা ভাবল যে, সে দেবতা লোনো আগ্নেয়গিরির আগুন মুখে নিয়ে এসেছেন। একটা মরা ষাঁড়ের চামড়া দেখে ভাবল যে, এই হাওলরা মানে বিদেশিরা কু-লঙ্গ কুকুরটাকেই বুঝি বা মেরে তার চামড়া নিয়ে এসেছে। কু-লঙ্গ কুকুর ওদের প্রবাদে আছে, যে কুকুর মানুষখেকো। সাদা চামড়ার ক্যাপ্টেন জেমস কুককে দেখে ওরা ভাবল যে ইনি নিশ্চয়ই হাওয়াইনদের পূর্বপুরুষদের কল্পিত, রোমান্টিক পলিনেশিয়ান পিতৃভূমি থেকে এসেছেন।

এমন অভ্যর্থনা কুক জীবনে কখনও পাননি।

কুক এই ধনধান্যে পুষ্পে-ভরা দ্বীপের নাম রাখলেন স্যান্ডউইচ আইল্যান্ডস। ইংল্যান্ডের তৎকালীন চীফ এ্যাডমিরালিটি আর্ল অব স্যান্ডউইচের উৎসাহেই ক্যাপ্টেন কুক সেবারকার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। তাই তাঁরই নামে নাম রাখলেন।

এদিকে দ্বীপবাসীরা নবাগন্তুকদের পোশাক-আশাক সাজ-সরঞ্জাম দেখে উৎসাহে একেবারে চেগে উঠেছিল! আগন্তুকরা যে কী বড়লোক, তাদের কত কী যে আছে! তাদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে যা পাওয়া যায় তাই ই নিতে তারা উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু সবচেয়ে যে বড় পুরুত দ্বীপের তিনি মানা করলেন। এই নবাগন্তুকরা মানুষ না ভগবান এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পুরুতমশাই দ্বীপবাসীদের নিরস্ত থাকতে বললেন।

পুরুতমশাই বললেন যে, আগে এদের পরীক্ষা করতে হবে। এমনই এক পরীক্ষা করবেন তিনি, তাতে ওরা মানুষ যদি হয় তো হাতে-নাতে ধরা পড়বে মানুষ বলে। ভগবান হলে তাও বোঝা যাবে।

পরীক্ষাটা কী?

না, মেয়েছেলে।

পুরুতমশাই বললেন, নবাগন্তুকদের মেয়েছেলে সেধে দিয়ে দেখা যাক ওরা তাদের নিয়ে কী করে। যদি মেয়েদের নিয়ে আমরা যা করি তাই-ই করে তবে যে ব্যাটারা মানুষ এ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকবে না।

পরীক্ষা নেওয়া হল।

প্রায় নগ্ন ঝাঁক ঝাঁক পবিত্র নির্ভীক ও উৎসুক নরম ফুলের মতো যুবতী মেয়েরা সাঁতরে এসে জাহাজের দড়ি ধরে জাহাজে উঠে আসতে লাগল। এবং বলা বাহুল্য আগন্তুক ইংরেজরা সেই ভগবান হওয়ার পরীক্ষায় মর্মান্তিকভাবে ফেল করল।

কিন্তু জাহাজে এত মেয়ে দেখে ক্যাপ্টেন কুক চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে তাঁর নাবিকদের মধ্যে অনেকেই সিফিলিস ও গনোরিয়ার রোগী। যাদের অসুখের কথা তিনি বিলক্ষণ জানতেন তাদের অত্যন্ত আপত্তি সত্ত্বেও আলাদা করে রাখলেন। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হল না। অভিসার শেষে মেয়েরা যখন আবার সাঁতরে তীরে ফিরে গেল সেই সুন্দরী হাসি-খুশি পবিত্র মুখগুলির আড়ালে ভবিষ্যতের এক কদর্য ব্যাধির বীজ বয়ে নিয়ে গেল তারা তাদের শরীরে। হাইবিসকাস ফুলের রঙ বেরঙা হাসির আড়ালে চোখের জলের বিন্দু টলটল করে উঠল।

শুধু রেজোলুশান জাহাজেই একশো বারো জন নাবিকের মধ্যে ছেষট্টি জনের যে ওই ব্যাধি ছিল তা তাদের লগ-বুক থেকে জানা যায়। ক্যাপ্টেন কুকের আসার এক বছরের মধ্যে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত দ্বীপে গনোরিয়া ও সিফিলিস রোগ ছড়িয়ে যায়। এই রোগের কারণে পরবর্তী সময়ে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জে জন্মহারও প্রচণ্ডভাবে কমে আসে।

ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজের পালগুলি কূল ছেড়ে সমুদ্রে অদৃশ্য হতে না হতেই চতুর্দিকের দ্বীপে এই দ্বীপবাসীরা অদ্ভুত দর্শন আগন্তুকদের আগমনের খবর পাঠিয়ে দিল দূতের মাধ্যমে। সেই পাখির ডাকের মতো ভাষায় কথা বলা পা ঢাকা সাদা লোকগুলোর কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়া হল। বলা হল যে, ওরা আগুন খায় এবং মুখ দিয়ে আগ্নেয়গিরির মতো ধুঁয়ো উদ্গীরণ করে।

www.BanglaBook.org

তার সঙ্গী-সাথীরা দেবত্বের পরীক্ষায় ফেল করলেও হাওয়াইনরা কিন্তু বিশ্বাস করেছিল যে ক্যাপ্টেন টমাস কুক নিজে মানুষ নন ; ভগবানই ! ভেবেছিল যে উনিই তাঁদের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান দেবতা "লোনো" ।

এই অবধি পড়ে বইটাকে পেন্সিল-মার্ক দিয়ে রেখে দিলাম । রীতিমতো নেশা লেগে গেছে । মনেই হয় না ইতিহাস পড়ছি বলে ।

কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি । তাই পুরোপুরি বঙ্গসন্তানের মতো এক ঘুম ঘুমিয়ে নেব ঠিক করলাম ভর দুপুরে । রাতে হোটেলে ফিরে আবার পড়ব বইটা ।

ঘুমিয়ে যখন উঠলাম তখন প্রায় চারটে বাজে ।

কাল থেকে লারার সঙ্গে সঙ্গে থাকায় হাঁটা-চলা বিশেষ হয়নি । শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে । সওনা-বাথ, সাঁতার অথবা স্কোয়াশে গেলে হত । আজকেই খবর নিতে হবে কাছাকাছি কোথায় র‍্যাকেট ক্লাব আছে । আপাতত বড় বড় পা ফেলে ঘণ্টাখানেক হেঁটে আসা মনস্থ করে চোখমুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম । হলিডে ইন-এর মেইন এনট্রান্স-এর সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা ডানদিকে চলে গেছে সেই রাস্তাতেই পা বাড়ালাম ।

অচেনা অজানা জায়গায় একা একা হাঁটতে আমার ভারী ভাল লাগে । বিশেষ করে ছুটিতে । কত কী যে চোখ ভরে দেখা যায়, কত মানুষজন দোকান-পাট ।

এই হাঁটায় কোনও গন্তব্যে পৌঁছবার হীনতা নেই । খবরদারি নেই ঘড়ির ওপর । মূল্যবান সময়কে পথের মেজাজের উপর ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনতাকে পাথেয় করে এই রকম হাঁটার সুযোগ আজকের জীবনে খুব কম মানুষেরই আসে ।

হাঁটতে ভীষণ ভীষণ ভীষণ ভাল লাগে এই কারণে যে, হাঁটাই মানুষের আদিমতম ও প্রাকৃততম ব্যায়াম । পায়ে হেঁটেই গুহামানব পাহাড় ছেড়ে নীচে নেমে এসেছে । পায়ে হেঁটেই চাষ করেছে—ফসল ফলিয়েছে । অস্ত্র বানিয়েছে তারা পাথর থেকে, লোহা থেকে, তারপর এই সেদিন পর্যন্তও প্রধানত পায়ে হেঁটেই লড়াই করেছে । পায়ে হেঁটেই মানুষ আর মানুষী অভিসারে গেছে—আবার মিলনের পর আলো ছায়ার বুটিকাটা গালচের বনপথ ধরে যে যার পর্ণকুটিরে ফিরে এসেছে । তাই হাঁটতে থাকলেই আমি, এই সামান্য একজন মানুষ, মানুষের সার্বিক ইতিহাসের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি । দারুণ আনন্দিত হই এ-কথাটা ভেবেই ।

আমাদের দেশের বাঙ্গালোর শহরের রাস্তাঘাট যেমন, হনলুলুর ভিতরের রাস্তাঘাটও অনেকটা তেমন । পাহাড় ও উপত্যকা সব নিয়েই শহর ! এদিকে ওদিকে চলে গেছে পথ উঁচু নিচু । জুইক জুইক করে গাড়ি যাচ্ছে । সারা শহরে সর্বক্ষণ একটা মেলা মেলা ভাব । চিউয়িংগাম চিবোনো আর চকোলেট মুখে অ্যামেরিকানরা । বেঁটে-খাটো ব্যস্ত-সমস্ত দাড়ি গোঁফহীন ফ্যাকাসে জাপানিরা । হরেকৃষ্ণ কাল্টের গেরুয়া বসনাবৃত শ্বেতাঙ্গিনী সন্ন্যাসিনী পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে হরে কৃষ্ণ হরে রাম ধ্বনি তুলে চাঁদা ওঠাচ্ছে । ভাড়া-করা কলগার্লের হাত ধরে সময়ের উপর জবরদখল নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে পয়সা উসুল ও জীবন সার্থক করে চলেছে লাল-নাক, গাব্দা-গোব্দা সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো এক ধরনের মানুষ ।

মনে, যে যার ধান্দায় এই হনলুলুতে নু-লু করে হনুমানের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে । কারও আনন্দে কেউ বাধ দেওয়ার নেই । হুলা-হুলা নাচছে কেউ কেউ হুলা-নাচিয়েদের সঙ্গে বা নাচ দেখছে খড়ের ঘাঘরা পরা কদলিকাণ্ডবৎ ঊরুসম্পন্না হাওয়াইন মেয়েদের । কেউ বা মাহিলাহি খাচ্ছে কোনও সরাইখানায় বসে । হাওয়াই-এর স্পেশ্যাল মাছের প্রিপারেশান । কেউ বা খাচ্ছে মাই-টাই । হাওয়াই-এর জাতীয় পানীয় । অথবা কেউ বা সন্ধ্যে-হব-হব সমুদ্রে গ্লাস-বটম বোটে করে রঙিন কোরাল রীফ দেখে চর্মচক্ষু সার্থক করছে । অন্য কেউ সঙ্গিনীর সঙ্গে সানসেট ডিনারে বসেছে পালতোলা ছোট্ট নৌকোয় আদিগন্ত সমুদ্রের উপর, পশ্চিমের আকাশের ক্রিমসন-লাল পটভূমি পিছনে রেখে । ওয়াটার স্কিয়িং করছে কোনও শ্বেতাঙ্গিনী । রোদে পুড়ে যাওয়া তার এক জোড়া বর্তুল সুডৌল উত্তেজিত স্পন্দিত বুক উথাল-পাথাল হচ্ছে, তীব্র বেগে চলেছে সে সমুদ্রে নীল দুটি [illegible] পা ছুঁইয়ে দ্রুতধাবমান স্পিডবোটের দড়ি ধরে । আবু ধাবি বা দুবাইয়ের কোনও বুড়ো

www.BanglaBook.org

খয়েরি শেখ তার প্রাইভেট এয়ার কন্ডিশানড মোটর বোটে বিশ্বের যাবৎ দেশের তাবৎ কচি কচি সুন্দরীদের তেল-বেচা টাকা দিয়ে কিনে এনে বোটের খোলে রঙিন মাছের মতো ঢেলে দিয়েছে। মেয়েগুলো এক গামলা রঙিন কই মাছের মতো খলখল খলখল করছে।

খয়েরি খচ্চরের মতো শেখ নিজে তার কাঁচঢাকা কেবিনে ভেলভেটের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে চুকুর চুকুর করে দেড় হাজার টাকা দামি বোতলের রয়্যাল স্যালুট হুইস্কি খাচ্ছে। হাওয়াইন সূর্যাস্তের লালিমা দেখে, তাল খেজুর, উট আর তার অফিসিয়াল পয়লা নম্বরী বিবির মুখ এবং মাকাল ফলের মতো লাল মরুভূমির সূর্যাস্তের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে শেখ সাহেবের। তেল-সাম্রাজ্যে এখন সূর্য ডোবে না একদিনও। কিন্তু শেখসাহেব জানেন যে একদিন ডুববে। সব সূর্যই ডোবে একদিন না একদিন। তাই বেলা থাকতে থাকতে শেখ সাহেব ভোগের চরম করে নিচ্ছেন যাতে বেলা পড়লে হজ যাত্রায় যেতে পারেন পরম নিশ্চিন্তে।

এক রাস্তা দিয়ে ঢুকে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে এসে ওয়াইকিকিতে পড়লাম। তারপর হনহনিয়ে হেঁটে হোটেলে ফিরে এলাম। বেশ ভাল হাঁটা হল। জামাকাপড় ঘামে ভিজে উঠল। মাথার চুলও। শরীরটা হালকা ও সুস্থ লাগতে লাগল। মন প্রসন্ন।

শাওয়ারের নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে চান করলাম। তারপর জামাকাপড় পরে লবিতে নেমে এলাম।

পৃথিবীর যে-কোনও জায়গার আন্তর্জাতিক হোটেলের লবিতে বসে আমি সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। কত রকম, কত জাতের কত চরিত্রের নারী পুরুষ যে দেখা যায় তা বলার নয়। বসে বসে তাদের লক্ষ করতে এবং তাদের ফেসরিডিং করতে খুব ভাল লাগে আমার।

একটু পর লারা নামল সেজেগুজে। ওকে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

লারা হাসল আমাকে দেখে তারপর এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে।

আমি বললাম, তুমি পাগো-পাগোটা পরলে না কেন?

লারা বলল, কাহালা হিলটনে পাগো-পাগো পরে গিয়ে লাভ কী?

আমি বললাম, তাহলে আমরা যেদিন অন্য কোথাও যাব সেদিন পরো।

লারা একটু অবাক হল। তারপর বলল, ঠিক।

লারাও আমার পাশে বসল, সোফায়। তারপর বলল, আমাদের গাড়ি আসবে সাড়ে-ছটায়।

কীসের গাড়ি?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

বাঃ রে, হোটেলে যাব না? তোমাকে কি অনাদর করতে পারি? তাই ক্যাডিলাক লিমুজিনের কথা বলে দিয়েছি।

আমি আঁতকে উঠলাম। বললাম, তুমি ভেবেছ কী? তুমি কি কোটিপতি ঠাউরেছ নিজেকে?

মোটেই না। তা হলে আর ফুল বিক্রি করে পড়াশুনা করি? কোটিপতি হলে কি আর ভাড়া করা ক্যাডিলাকে তোমাকে চড়াতাম আমি?

আমি বললাম, উঁ আর গ্রেট।

লারা হাসল। টোল পড়ল ওর গালে। বাহারে আঙুলগুলো নেড়ে এক সুন্দর ভঙ্গি করে বলল, নট অ্যাট অল।

লারা রিসেপশানে বলে রেখেছিল। একটি প্রায় সাড়ে ছ'ফিট লম্বা গুণ্ডার মতো নিগ্রো লোক লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি উঠে কাঁচের দরজা ফুঁড়ে এসে রিসেপশানে দাঁড়ালেন।

রিসেপশানের মেয়েটি মিস ডস বলে আস্তে ডাকল।

থ্যাঙ্ক উ! বলে লারা উঠল। আমিও উঠলাম।

কাঁচের দরজা এখানের সব জায়গাতেই অটোম্যাটিক। দরজার সামনে দাঁড়ালেই 'সুইশ' শব্দ করে দরজা আপনা আপনিই খুলে যায়। ভদ্রলোক বিরাট কালো ক্যাডিলাকের দরজা খুলে আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লারা আগে উঠল, তারপর আমি উঠলে দরজা বন্ধ করে দিল শোফার।

www.BanglaBook.org

ভাঙা-ভাঙা হাসকি গলায় শুধোল লারাকে, হোয়্যার টু ? মিস ভস ? টু ক্যাসিনো ?

মনে হল, লারা একটু বিব্রত হল।

বলল, নো। টু কাহালা হিলটন প্লিজ।

ওকে ম্যাম। বলল শোফার।

হু-হু করে চলতে লাগল গাড়িটা।

ন্যু ইয়র্কের শো-রুমে এ গাড়ি দেখেছি বহুবার। লস এঞ্জেলসেও দেখেছি। গাড়িগুলো এয়ার কন্ডিশানড এবং হিটেড। যখন যেমন দরকার। একটা গাড়ির দাম বাট হাজার ডলার। মানে আমাদের প্রায় পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার মতো। যেমন ভারী গাড়িটা, তেমন নিঃশব্দ গতি, তেমন পিক-আপ। মনেই হয় না যে গাড়িতে বসে আছি আর গাড়িটা অত জোরে চলছে। গাড়িটা এত লম্বা যে মনে হয় ড্রাইভার যেন আমাদের উপর রাগ করে দূরে গিয়ে বসেছে।

প্রায় মিনিট বারো থেকে পনেরো বেশ জোরে গাড়ি চলার পর আমরা কাহালা হিলটনে গিয়ে নাবলাম। শোফার এসে লারাকে দরজা খুলে নামালেন। আমি নিজেই নামলাম অন্য দিকের দরজা খুলে।

হিলটন সমস্ত পৃথিবীতে একটি পরিচিত নাম। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় শহরে হিলটনের একটি করে বা একাধিক হোটেল আছে। প্রথমে শহরের নাম বা জায়গার নাম পরে হিলটন। কাহালা হিলটন হিলটন-এর হোটেলগুলির মধ্যে ছোটখাটই কিন্তু তবুও এই হোটেল সম্বন্ধে বলবার অনেক কিছুই আছে।

একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপরে দাঁড়িয়ে আছে এই বহুতল হোটেলটি। নিজস্ব তটভূমি আছে এর, যাতে হোটেলের বাসিন্দারা স্বচ্ছন্দে ও আরামে চান করতে, সার্ফ রাইডিং করতে, ওয়াটার স্কিয়িং করতে পারেন। সমুদ্র থেকে জল পাম্প করে এনে হোটেলের নিজের জলের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও হোটেলের মধ্যে ঝরনা, পণ্ড ইত্যাদি সব করা হয়েছে। দিনে তিরিশ লক্ষ গ্যালন জল পাম্প করে তোলা হয়। এদের নিজেদের যে হাইড্রোইলেকট্রিসিটি প্ল্যান্ট আছে তা থেকেই এই হোটেলের বিজলির প্রয়োজন মেটে। সবচেয়ে কম যে-ঘরের ভাড়া, বেসমেন্টে—যেখান থেকে আকাশ কি সমুদ্র কিছুই দেখা যায় না—তাই-ই বেয়াল্লিশ ডলার দিনে। আমেরিকান প্ল্যানে। প্রায় চারশো টাকার মতো। বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট।

সবচেয়ে দামি ঘর প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট—দিনে ছশো ডলার অর্থাৎ পাঁচ হাজার চারশো টাকা।

এসব শুনে-টুনে আমি ভাবলাম যে, এ হোটেল বুঝি ফাঁকাই থাকে। কিন্তু শুনলাম এখানে থাকতে হলে আগে থেকে রিজার্ভেশন না করে এলে ঘর পাওয়াই যায় না। সবচেয়ে ভাল লাগল হাইড-অ্যাওয়ে কটেজগুলো। প্রেমিক-প্রেমিকা, নব-বিবাহিত দম্পতির এবং পরকীয়া প্রেমের নির্বিঘ্ন আশ্রয়।

ঝরনা পেরিয়ে, পুকুরের উপর ব্রিজ পেরিয়ে এসে আমরা একতলার বিরাট ডাইনিং হল-এ পৌঁছলাম। ডাইনিং হল-এর একদিকটাতে পুরো কাঁচের দরজা। দরজার পরই সমুদ্রের তটভূমি। তারপরই জল।

আমরা বসার পর মিনিট পনেরোর মধ্যেই ডাইনিং হল-এর সব কটি চেয়ারই প্রায় ভরে গেল। আমাদের টেবলে শ্যাম্পেন দিয়ে গেল ওয়েটার।

আমি লারাকে বললাম, ব্যাপারটা কী ? এত বড়লোকি ?

লারা বলল, আমি যে বড়লোক। বড়লোক কি মানুষ টাকায় হয়, বড়লোক হয় মনে।

এমন সময় হঠাৎ ডাইনিং হল-এর সব আলোগুলো নিভে গেল। কাঁচের মাটিসমান দরজাগুলো ইলেকট্রিকালি খুলে গেল। কোনও অদৃশ্য জায়গা থেকে বহুবর্ণ সার্চলাইটের আলো পড়ল সমুদ্রে এবং সমুদ্রতটে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজনার তালে তালে সুর মিলিয়ে নানা রঙা হাইবিসকাস ফুলের মালা গলায় পরে রঙিন ফুল ফুল ছাপা কাপড়ের স্তনবন্ধনী এবং ঘাসের ঘাঘরা পরে জলকন্যারা যেন সমুদ্র থেকে নাচতে নাচতে উঠে এল বাদামি তটভূমিতে। তারপর হুলা হুলা নাচতে নাচতে সোজা সেই খুলে-দেওয়া কাঁচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ডাইনিং হল-এর মধ্যে চলে এল। তারপর নাচতে

www.BanglaBook.org

নাচতেই সোজা স্টেজে এসে উঠল। তারপর শুরু হল তাদের নাচ ও গান। নানারকমের।

ড্যানি কাহিল্যানি বলে একজন রোদ-পোড়া চেহারার সপ্রতিভ জলদকণ্ঠের গায়ক হাওয়াইন গিটার বাজিয়ে আমাদের গান শোনালেন। গলায় দারুণ গভীরতা ছিল ভদ্রলোকের। হাওয়াইতে গিটারের চল খুব। গিটারের উৎসস্থলও বোধহয় হাওয়াইই। ঠিক জানি না। তবে অনেকানেক গায়ক নৃত্যরতা মেয়েদের সঙ্গে গিটার বাজিয়ে গান গাইলেন। মেয়েরা যখন নাচছিল তখন তাদের ঘাসের ঘাঘরা ফুলে ফুলে উঠছিল— গলার রঙিন হাইবিসকাসের মালা দোল খাচ্ছিল।

শ্যাম্পেন দিয়ে ডিনার শেষ করতে করতে গান বাজনার মধ্যে কখন যে রাত দশটা বাজতে চলল, হুঁশই ছিল না।

ফেরার সময় ক্যাডিলাক লিমুজিনের পেছনের সিটে বসে লারা আমার হাতটা ওর কোলে তুলে নিয়ে বলল, সময়টা ভালই কাটল আমাদের! কী বলো?

আমি বললাম, ধন্যবাদ তো তোমারই প্রাপ্য।

তারপরই বললাম, কাল কিন্তু আমার তোমাকে খাওয়ানোর দিন।

লারা হাসল, বলল, বেশ! কোথায় খাওয়াবে?

হাওয়াইন হাটে। আমি বললাম।

হোটেলের রিসেপশানের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে আমি হাওয়াইন হাট অর্থাৎ হাওয়াইন কুঁড়েঘরের ঠিকানা জোগাড় করেছিলাম।

লারা বলল, ভাল। খুব মজা হবে। কিন্তু কাল সারাদিন কী করবে?

আমি বললাম, চলো একটা ট্যুওর নিয়ে ঘুরে আসি। যাবে? এইচ্চি ট্যুওরে?

যাব। খুশি খুশি গলায় লারা বলল।

তারপর বলল, যেখানে নিয়ে যাবে তুমি সেখানেই যাব। আমি এখন তোমারই ইচ্ছাধীন।

ক্যাডিলাকের নিগ্রো শোফার যখন হোটেলের সামনে এসে দরজা খুলে লারাকে নামাচ্ছিল তখন হঠাৎ লক্ষ করলাম তার কাঁধের উপরের ফ্ল্যাপে ডি-আই-আই এই তিনটি অক্ষর লেখা।

লারা নামতেই শোফার তাকে বলল, ম্যাম এনি মেসেজ ফর বস?

লারা অপ্রতিভ মুখে তাড়াতাড়ি বলল, নো থ্যাঙ্ক ড্যু!

শোফার গুডনাইট জানিয়ে চলে গেল।

আমি সিঁড়ি দিয়ে লবিতে উঠতে উঠতে বললাম, ডি-আই-আই মানে কী? এরা কি ট্রাভেল এজেন্ট? না ট্যুওর কোম্পানি?

লারা কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, কে জানে? হবে ওইরকমই কিছু। ভাড়াগাড়ি সম্বন্ধে আমার কোনও ঔৎসুক্য নেই।

হঠাৎ আমার মনে হল, যখন ঝকঝকে পালিশ করা কালো হিরের মতো কালো ক্যাডিলাক গাড়িটা চলে যায় তখন যেন তার নাম্বার প্লেটে প্রাইভেট গাড়ির নম্বর দেখেছিলাম। ট্যাক্সির নয়।

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে লারা লিফটের দিকে এগোতে এগোতে বলল, কী ভাবছ?

কিছু না। আমি বললাম।

মাঝে মাঝে তুমি এত গম্ভীর হয়ে যাও যে, ভাল লাগে না। লারা বলল।

আমি বললাম, সরি।

লারা বলল, আমার ঘরে চলো। কফি খেয়ে যাবে অথবা একটা কনিয়াক। নাইটক্যাপ।

আমি ওর সঙ্গেই ওর ঘরে গেলাম।

রুম সার্ভিসে ফোন করে দুটো কনিয়াকের অর্ডার দিয়ে যখন রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও, তখন আমি বললাম, শোফার তোমাকে কী বলছিল নামবার সময়?

লারা চমকে উঠল। তারপর বলল, কী জানি? ওর বস-এর কথা বোধহয়। বুঝলাম না কী বলল।

কনিয়াকটা শেষ করে আমি উঠলাম। বললাম, গুড নাইট। ও উঠে এসে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বলল, ওন্ট ড্যু কিস্ মি গুড নাইট?

www.BanglaBook.org

বলেই, দুটি হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল। আমি ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম। ও কীরকমভাবে যেন চুমু খেল আমাকে। ওর জিভটা আমার মুখের মধ্যে ঠেলে দিল। গা-শিরশির করে উঠল আমার ভাল লাগায়।

আমার ঘরে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম কোনও বাঙালি মেয়ে কি লারার মতো চুমু খেতে জানে? বোধহয় না। নিশ্চয় করে বলতে পারছি না। কারণ দেশ ছেড়ে আসার আগে কারওরই চুমু পাবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

গোল্ডেন প্লোভার

কোন অজানা কাল হতে প্রতি শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে একরকম পাখি উত্তর ছেড়ে দক্ষিণে উড়ে আসত প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে। তারা আজও আসে। আবার গরমের সময় দক্ষিণ ছেড়ে উড়ে যায় তারা আলাস্কায়, সাইবেরিয়ার দক্ষিণ দিগন্তে। পাখিগুলোর গায়ের রঙ নরম খয়েরিতে মেশা সোনালি। তাদের নাম গোল্ডেন প্লোভার।

প্রতি শীতে তারা দু হাজার মাইল পেরিয়ে হাওয়াইতে আসত। কোনও কোনও ঝাঁক তারও দক্ষিণে চলে যেত আরও হাজার-দুই মাইল পেরিয়ে গিয়ে পলিনেশিয়ার নানা দ্বীপে। কেউ জানে না কত শতাব্দী ধরে এই গোল্ডেন প্লোভার পাখিরা তাদের বাৎসরিক যাত্রায় বেরোচ্ছে।

এই পাখিগুলোর বাৎসরিক যাত্রা নিশ্চয়ই পলিনেশিয়ানদের চোখ এড়ায়নি। তারা ভাবত যে পাখিগুলো যখন প্রতিবছর উত্তর থেকে উড়ে আসে এবং আবার গরমের শুরুতে উত্তরে ফিরে যায় তখন নিশ্চয়ই উত্তরে স্থলভূমি আছে।

হাওয়াই-এর আবিষ্কারে গোল্ডেন প্লোভার পাখিদের ভূমিকা বড় কম নয়।

হাওয়াইনদের পূর্বসূরি কারা তা নিয়েও কম জল্পনা-কল্পনা হয়নি। নানা মুনির নানা মত।

উনবিংশ শতাব্দীর মিশনারি-ওরিয়েন্টেড ঐতিহাসিকরা বলেন যে ইজরায়েলের দশটি হারিয়ে যাওয়া উপজাতি থেকে হাওয়াইনদের উৎপত্তি। ডঃ পিটার ব্ল্যাক, বিখ্যাত পলিনেশিয়ান অ্যানথ্রপোলজিস্টের ধারণা যে পলিনেশিয়ান ভাষার শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি হয়েছে মিশর মেসোপটেমিয়া এবং বালুচিস্থান থেকে। এবং খুবই উল্লেখযোগ্য এই যে তাঁর মতে প্রাচীন ভারতের ভিরহিয়া নামক জায়গা থেকে বিতাড়িত হতে হতে কয়েকদল লোক বর্মা হয়ে, থাইল্যান্ড হয়ে, মালয় উপকূলে এসে পৌঁছয়। এবং সেখান থেকে আবার শত্রুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এসে এই বসবাসযোগ্য আশ্চর্য ভূখণ্ডের হদিস পায়। তারা যখন হাজার হাজার বছর ধরে এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশের মধ্যে দিয়ে পালাতে থাকে তখন বিভিন্ন দেশীয় লোকেদের সঙ্গে তাদের বিবাহ বন্ধন হয়। এই প্রক্রিয়াতে তাদের শারীরিক চেহারা মানসিকতা এবং চারিত্রিক বিশেষত্ব সবই পাল্টে যায়।

আরেকদল ঐতিহাসিকের ধারণা যে, পলিনেশিয়ানরা এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কূল ছেড়ে ইন্দোনেশিয়ার দিকে চলে আসে।

আসলে যেখান থেকেই হাওয়াইনরা এসে থাকুক না কেন, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই যে ইন্দোনেশিয়াকেই তারা জাম্পিং বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিল। যে-কোনও কারণেই হোক, ইন্দোনেশিয়ায় তারা না থেকে পুবে পলিনেশিয়াতে এসে হাজির হয়।

সতেরোশো আটাত্তরের নভেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন কুক আবার হাওয়াইন আইল্যান্ডস-এ ফিরে আসেন। তাঁরা ফেরার পথে প্রথম যে দ্বীপ চোখে পড়ে তাঁর, তা হচ্ছে মাউই। কিন্তু মাউই-এর উপকূল প্রস্তরসঙ্কুল ও এবড়ো খেবড়ো বলে সেখানে নোঙর করা হয় না। তাই দক্ষিণ-পুবে এগিয়ে গিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মূল ভূখণ্ড হাওয়াইতে এসে পৌঁছন কুক। কূল দিয়ে যখন কুক ভেসে চলেছেন তখন সমস্ত কূল জুড়ে কৌতূহলী উৎসুক দ্বীপবাসীরা দাঁড়িয়ে। জাহাজ দুটো হামাকুয়া কূলের সবুজ পাহাড়ি ঢাল ও খাড়া নিচু উপত্যকার পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। দূরে মাথা উঁচু করা বরফ-ঢাকা মউনা-কিয়া পাহাড়ের চুড়োটা দেখা যায়। আরও এগিয়ে চওড়া ইংরিজি 'ভি' আকারের

www.BanglaBook.org

হিলো উপসাগরের পাশ দিয়ে চলে যান কুক।

ওইখান থেকে দূরের আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত কালো লাভায় ঢাকা পুনা আর কাউভেলার ভূমি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে দক্ষিণপ্রান্তে ঘুরে ছিমছাম নিস্তরঙ্গ কোনও কূলে এসে পৌঁছন। তবুও নোঙর করতে ভীষণ বেগ পেতে হয়। অতি ধীরে ধীরে জাহাজ দুটো নোঙর করার জন্যে কূলের কাছে এগোতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে জাহাজে নাবিকদের একাকিত্ব ঘুচে যায়। দলে দলে মেয়েরা সাঁতরে এসে দড়ি ধরে উপরে উঠে আসে। এবং উপরে উঠে নাবিকদের সবরকম খুশি করে।

মাউই দ্বীপেও এরকমভাবে মেয়েরা দড়ি ধরে উপরে উঠে আসছিল কিন্তু ক্যাপ্টেন কুক তাদের অনুমতি দেন না। ডঃ স্যামওয়েল, জাহাজের ডাক্তার লিখে গেছেন যে তাতে মেয়েগুলো প্রচণ্ড খেপে গিয়ে তাদের সাধুসঙ্গ থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি করে।

আগেই বলেছি, হাওয়াইতে ক্যাপ্টেন কুককে ভগবান লোনো বলে মেনে নিয়েছিল দ্বীপবাসীরা। তাঁর জাহাজের উঁচু মাস্তুল ও সাদা পালগুলোকে দ্বীপবাসীরা ভগবান লোনোর উঁচু দণ্ড ও কাপা কাপড় বলে জানত। তাছাড়া কুক দু-দুবারই মাকাহিকি উৎসবের সময়ে হাওয়াইতে উপস্থিত হওয়ায় কুকের লোনোত্বে দ্বীপবাসীদের কোনওই সন্দেহ ছিল না।

সেবারও ক্যাপ্টেন কুক-এর জন্যে আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনার অভাব হয়নি কোনও। খাবারদাবার, ফলমূল, শুয়োর এবং নাবিকদের জন্যে অগণিত মহিলাকুল কিছুরই কমতি ছিল না। কিন্তু সমস্ত অভ্যর্থনার মূলে ছিল কুকের তৎকালীন লোনোত্ব।

তাঁদের থাকাকালীনই অবশ্য দেবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগরুক হয়েছিল দ্বীপবাসীদের, বিশেষ করে পুরুতদের মনে। কোয়ালাকুয়া উপসাগরে নোঙর করার দু সপ্তাহের মধ্যে ক্যাপ্টেন কুকের একজন সহকর্মী উইলিয়াম ওয়াটম্যান মারা গেলেন। ওয়াটম্যানকে খ্রিশ্চিয়ান মতানুসারে কবর দেওয়া হল। নৌসেনারা গার্ড অব অনার দিল ওয়াটম্যানকে। বন্দুক উল্টো করে ধরে তারা ইউনিয়ন জ্যাক মোড়া ওয়াটম্যানের কফিনের সামনে সামনে শোভাযাত্রা করে গেল। কিন্তু ওয়াটম্যানের মৃত্যু দ্বীপবাসীদের কাছে একটা কথা প্রাঞ্জল করে দিয়েছিল যে সাদা চামড়ার এই বিদেশিরা অমর নয়। অন্যান্য মরণশীল মানুষের মতো তারাও মরণশীল।

ওয়াটম্যানের কবরে দ্বীপবাসীরা একটা শুয়োর দিতে চেয়েছিল আহুতি হিসেবে তাদের প্রথানুযায়ী। কুক বারণ করেছিলেন। কিন্তু তারা ভরা রাতের প্রাঞ্জল অন্ধকারে কয়েকজন বয়স্ক হাওয়াইন ওয়াটম্যানের কবরের উপরে উঠে বসে। তারপর কবরের উপর তারা একটা শুয়োর মারে। ছোট্ট আগুন করে শুয়োরটার নাড়িভুঁড়ি সেই আগুনে ফেলে শুয়োরটার মড়িটা কবরের উপরে ফেলে রেখে যায়।

বিদেশিদের সম্বন্ধে দ্বীপবাসীদের মনোভাবের পরিবর্তনের আরও একটা বড় কারণ হয় তাদের কাপুর পর কাপু ভাঙা। হাওয়াইতে কাপু ভাঙা যে ভীষণ গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য হত তাই-ই নয় যে, কাপু ভাঙে তাকে গলা টিপে অথবা মাথায় বাড়ি মেরে নিধন করা হত।

একদিন লাঠি, আড়াআড়ি করে রেখে যে কাপু সৃষ্টি করেছিল পুরুতরা, ইংরেজরা সেই লাঠিগুলো তুলে নিয়ে গেল জাহাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। তাছাড়া জাহাজ দুটো অনেকদিন নোঙর করে থাকাতে দ্বীপবাসীদের স্বল্প ক্ষমতার উপর প্রচণ্ড চাপেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের খাবারদাবার সবকিছুতে বিদেশিরা ভাগ বসাতে তাদের ভাঁড়ার বাড়ন্ত হয়ে এল। নিজেদের দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা হল।

একদিন দ্বীপের লোকেরা ইংরেজদের ভুঁড়িওয়ালা পেটে আলতো করে টোকা মেরে বিনয়ের সঙ্গে তাদের এবার তীর ছেড়ে চলে যেতে বলল। শ্বেতাঙ্গদের ওরা বলল, যখন ওদের কাছে আবার যথেষ্ট খাবারদাবার জমা হবে তখন যেন বিদেশিরা আবার আসে।

অনেক মেয়েদের মতোই একজন হাওয়াইন মেয়ে যে জাহাজে নাবিকদের সঙ্গে নিয়ত সহবাসে লিপ্ত ছিল একদিন এসে এক গল্প করল সবাইকে। যখন একজন তার উপরে শুয়ে চরম আদর করছিল তাকে, তখন সে তার নখ ঢুকিয়ে দিয়েছিল নাবিকটির পিঠে। কী আশ্চর্য! নাবিকটা অন্য

www.BanglaBook.org

দশজন মানুষের মতোই ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল। নখ ঢোকালে যদি ব্যথা লাগে তাদের তা হলে তারা নিশ্চয়ই ভগবান নয়।

হাওয়াইন দ্বীপের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে ভগবানদের মরণশীল মেয়েছেলের সঙ্গে সহবাস করার কথা নয়। ভগবানদের শরীরে ব্যথা বা যন্ত্রণাও থাকে না।

ততদিনে দ্বীপসুদ্ধ লোকই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল যে কুক ভগবান হলেও যদি বা হতে পারেন, কিন্তু তাঁর নাবিকরা মোটেই ভগবান নয়।

সতেরোশো উনআশি সনের ফেব্রুয়ারির চার তারিখে কুক কোয়ালাকুয়া থেকে জাহাজ দুটির নোঙর তুললেন। তার ঠিক চার সপ্তাহ আগে নোঙর ফেলেছিলেন কুক।

কিন্তু বাহির সমুদ্রে বেরোতে না বেরোতেই প্রচণ্ড হাওয়ার মধ্যে পড়ে জাহাজ দুটোর ভীষণ ক্ষতি হল। এমন ক্ষতি হল যে, পাল মাস্তুল দড়াদড়ি সব মেরামত না করে ফিরে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই কুক বাধ্য হয়ে আবার কোয়ালাকুয়া উপসাগরে ফিরে এলেন।

যখন ফিরে এলেন তখন সমুদ্রতটে একজন লোকও ছিল না তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। একটি নৌকোয় কয়েকজন নাবিককে পাঠালেন কুক সেই স্তব্ধ, জনশূন্যতটে খবরাখবর নিয়ে আসার জন্যে। সেই নৌকোর নাবিকরা এসে খবর দিল যে, রাজা কালানিওপু যিনি গতবার ইংরেজদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিলেন তিনিই সমস্ত সমুদ্রতটে কাপু জারি করেছেন। সেখানে পা ফেলা নিষেধ, যাওয়া নিষেধ।

কুকের মন উদ্বেগে ভরে গেল কিন্তু নোঙর করে জাহাজ মেরামত না করে ফিরে যাওয়ারও কোনও উপায় ছিল না।

পরদিন রাজা কালানিওপু নিজে সমুদ্রতটে এসে ইংরেজদের বন্ধুভাব আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু একটা ছোট ঘটনার পর দ্বীপবাসীদের মেজাজ বিগড়ে গেল আরও। ওই শ্বেতাঙ্গ বিদেশিদের প্রতি তাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক উষ্ণতা আগেই মরে গেছিল।

কয়েকজন নাবিক দ্বীপের ভিতরে গেছিল জল আনতে। রাজা তাদের কোনওরকম সাহায্য দিতে মানা করে দিলেন। তখন যে ছ'জন নৌ-সেনা ওই নাবিকদের রক্ষক হয়ে তীরে গেছিল তাদের রাইফেল গ্রেপশট্-এর বদলে বুলেট পুরতে আদেশ দিলেন কুক।

তখনকার মতো ক্যাপ্টেন কুক আর তাঁর বিশ্বস্ত অফিসার জেমস কিং সেই উত্তেজনাময় থমথমে আবহাওয়া শান্ত করলেন। কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত হতে না হতেই কুকের বাহিনীর অন্য জাহাজ ডিসকভারি থেকে বন্দুকের ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা আওয়াজ শোনা গেল। কুক তাকিয়ে দেখলেন একটা ক্যানো তীরবেগে ওই দিক থেকে ডাঙার দিকে চলে আসছে। নিশ্চয়ই হাওয়াইনরা ওই জাহাজ থেকে কিছু চুরি করে পালাচ্ছিল, ওদের আটকাতে না পেরে ওই জাহাজ থেকে গুলি চালায়।

ইতিমধ্যে নানারকম গণ্ডগোল শুরু হল। কুক নিজে আবার জমিতে নেমে রাজা কালানিওপুর সঙ্গে দেখা করলেন। কুকের মতলব ছিল রাজাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে বন্দি করে ফেলতে পারলে প্রজারা আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু রাজাকে নিয়ে তিনি তীরের দিকে যখন এগিয়ে আসছেন তখন একজন নৌ-সেনার গুলিতে একজন হাওয়াইন সর্দার মারা গেল। কোনও সর্দারকে মারা আর দ্বীপবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা সমগোত্রীয় বলে মনে করত তারা। এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ও ছোট ছেলেমেয়েরা সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল। বর্শা, ছোরা, লাঠি, পাথর নিয়ে মাদুরের বর্ম পরে দলে দলে দ্বীপবাসীরা সমুদ্রতটে দৌড়ে আসতে লাগল।

একজন যোদ্ধা ক্যাপ্টেন কুককে তরোয়াল তুলে মারার ভয় দেখাতেই কুক তার পিস্তল বের করে তাকে গুলি করলেন। কিন্তু পিস্তলে ছররা পোরা ছিল। ছররাগুলো মাদুরের বর্মে আটকে গেল। লোকটার কিছুই হল না। তখন লোকটা সোল্লাস সবাইকে বলল যে, দ্যাখ দেবতা লোনা আমাকে মারতে চাইল কিন্তু আমার কিছুই হল না। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভীরু দ্বীপবাসীরা সাহসী হয়ে উঠল। সেই দিন সকালে কোয়ালাকুয়ার তটে প্রায় বাইশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার সশস্ত্র দ্বীপবাসী জমায়েত হয়েছিল।

কুক জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশেই ছিলেন মোলসওয়ার্থ ফিলিপস। আরেকজন

www.BanglaBook.org

যোদ্ধা কুককে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করল, কুক তাকে গুলি করলেন কিন্তু ফসকে গেল গুলি। আক্রমণকারীর পাশের লোক মারা গেল গুলিতে। ফিলিপসও গুলি করে পর পর দুজন আক্রমণকারীকে মারলেন। নৌকায় যে নাবিকরা ছিল তারাও গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। অন্য যারা তীরে ছিল তারা জলের দিকে পিছন ফিরে লাইন করে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

কুক প্রায় হাঁটু জলে চলে এসেছিলেন, এসে হাত তুলে গুলি চালানো বন্ধ করতে অর্ডার দিলেন।

ঠিক তখনই তাঁকে পিছন থেকে একটা মুগুরের বাড়ি মারল একজন মাথায়। কুক জলে পড়ে গেলেন।

যেই কুক জলে পড়লেন, অন্য আরেকজন দ্বীপবাসী তার ছোরা ক্যাপ্টেন কুকের পিঠে আমূল বসিয়ে দিল। জাহাজ থেকে ডাঙায় নামার ঠিক এক ঘণ্টা পর কুক মারা গেলেন।

কুককে পড়ে যেতে দেখে দ্বীপবাসীরা উল্লাসে পাহাড় ফাটানো চিৎকার করে উঠল। কুককে ওরা টেনে ডাঙার অনেক ভিতরে নিয়ে গেল এবং একে অন্যের সঙ্গে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে কুকের লাশে ছোরা বা বর্শা বসাতে পারে।

কুকের মৃত্যুতে ইংরেজরা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। চার্লস ক্লার্ক তখন অধিনায়ক হলেন কুকের জায়গায়।

সেদিন গভীর অন্ধকার রাতে রেজলুশান জাহাজের উপর দুজন নার্ভাস প্রহরী অন্ধকারতর জল-কেটে একটা ক্যানো আসবার আওয়াজ শুনতে পেল। ওরা কাঁপা হাতে অন্ধকারে গুলি ছুঁড়ল আন্দাজে। গুলি একটুর জন্যে লাগল না। যে দুজন দ্বীপবাসী ক্যানোটা চালিয়ে আসছিল তারা জাহাজের কাছাকাছি এসে উপরে আসার অনুমতি চাইল। অনুমতি দেওয়া হল। লোক দুটো এক টুকরো কাপা কাপড়ে মুড়ে একটা ছোট পুঁটলি নিয়ে ঝোলানো দড়ি ধরে জাহাজে উঠে এল। লণ্ঠনের মিটমিটে আলোতে সেই পুঁটলিটা খুলে দিল তারা। হতবাক ইংরেজরা বিস্ফারিত চোখে দেখল যে তার মধ্যে ক্যাপ্টেন কুকের শরীরের একতাল রক্তমাখা লাল-টকটকে মাংস।

ইংরেজরা কুকের মৃতদেহ নিয়ে দ্বীপবাসীদের এমন নরখাদকের মতো ব্যবহারে দুঃখিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। দ্বীপবাসীরা কিন্তু কুকের মৃতদেহকে তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী যথেষ্ট সম্মানই দেখিয়েছিল।

হাওয়াইতে যদি কোনও শ্রদ্ধার জন বা ভাললাগার জন মারা যান, তাহলে ওখানকার প্রথানুযায়ী তাঁর হাড়-মাংস মুণ্ডু-চামড়া সকলে ভাগাভাগি করে নিয়ে যায় ঘরে।

কুকের মাথা গেছিল রাজার বাড়িতে। মাথার খুলি গেছিল এক বড় সর্দারের বাড়ি। শরীরের অন্যান্য অংশ সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন সর্দারেরা। ওদেশীয় প্রথানুযায়ী হাড় থেকে মাংস চেঁচে নিয়ে সেই মাংসও ভাগ করে নিয়েছিল ওরা। তারপর হাড়গুলো সব একসঙ্গে করে পুঁতে দিয়েছিল মাটিতে।

প্রতি শীতে নরম সোনালি-বাদামি গোল্ডেন প্লোভার পাখির ঝাঁকের গন্তব্য আদিগন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের কোরকের ফিকে-নীল আর করমচা-লাল জলজ হাওয়াই-এর আবিষ্কারক প্রথম হাওল ক্যাপ্টেন টমাস কুক-এর মর্মান্তিক পরিণতি এই-ই।

ডেরিল্ ড্যানার

সেদিন আর কন্ডাকটেড ট্যুরে যাওয়া হল না। লারার শরীরটা খারাপ হয়েছিল। খুব ভোরে উঠে অনেকক্ষণ চান করাতে ঠাণ্ডা লেগে গেছিল। ও ঠাণ্ডা দেশের লোক। হাওয়াই-এর উষ্ণ আবহাওয়ায় গরম ঠাণ্ডার খেলায় কাবু হয়ে পড়েছিল।

ব্রেকফাস্টের পর যেন করে ওর ঘরে গেছিলাম। ও মেরুন আর কালো খোপকাটা সুতির একটা হাউস-কোট পরে বসেছিল সোফাতে। আমাকে দেখে বলল, এসো, এসো।

কিছুক্ষণ গল্প করার পরই দরজার ঘণ্টা বাজল।

www.BanglaBook.org

লারা বলল, কাম অন ইন।

আমি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি একজন বেঁটে খাটো লোক বয়স্ক, শক্ত-সমর্থ চেহারা, দরজায় দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা গোরখা টুপি। চেহারা দেখে মনে হল হাফ-হাওয়াইন।

আমাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, গুড মর্নিং টু উ্যা, ইউ মাস্ট বি লারাজ ফ্রেন্ড।

ইতিমধ্যে লারাও উঠে এসেছিল সোফা ছেড়ে।

লারাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, হাই! সুইটি!

লারা এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক লারার গালে চুমু খেলেন। বললেন, তোমাকে বহুদিন পরে দেখে খুবই ভাল লাগল।

লারাও হাসল। কিন্তু লারার মুখ দেখে লারা যে ভদ্রলোককে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে তা মনে হল না। বরং তাঁকে দেখে উচ্ছল লারা কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

ভদ্রলোকের চোখ দুটো অদ্ভুত। আশ্চর্য জ্বলজ্বলে, বড় বড় চোখ। চোখের নীচে কালি। মাথার গোরখা টুপিটার দিকে আমি অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম এই হনলুলুতে নেপালি টুপি উনি কী করে পেলেন? অড়াআড়ি করে দুটি রূপোলি ভোজালি টুপির সঙ্গে গাঁথা আছে দেখলাম। যেমন থাকে ওই কাপড়ের টুপিগুলোতে।

লারা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলল, মীট মিস্টার জিত বোস। ফ্রম ন্যুইয়র্ক। আর এই যে মিস্টার ডেরিল ডানোর।

আমি মাথা নাড়লাম। অবাক হয়ে টুপিটার দিকে চেয়ে ছিলাম আমি।

তারপর উঠে বললাম, আমি এবার চলি।

লারার চোখ দেখে মনে হল ও চাইছিল না যে, আমি চলে যাই কিন্তু ড্যানার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভেরি নাইস টু হ্যাভ মেট উ্য মিস্টার বোস।

আমি, সী ইউ...বলে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর সোজা লিফট নিয়ে নীচে।

হলিডে-ইন থেকে যখন বেরোচ্ছি দেখি পার্কিং লট-এ কালকের সেই কালো ক্যাডিলাক লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই লম্বা-চওড়া নিগ্রো ড্রাইভারটি নিজের সিটে বসে মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজ পড়ছে।

কেন জানি না, ড্যানার ভদ্রলোককে আমার ভাল লাগল না একটুও। ওঁর চোখ দুটো এমন যে মনে হয় উনি একজন অসাধারণ লোক। অসাধারণ খারাপ লোকও হতে পারেন।

কলকাতা থেকে আসার আগে আমার পিসিমা বলে দিয়েছিলেন, খবরদার জিত্, মেমসায়েব বিয়ে করিসনি।

সে অনেকদিনের কথা। আজকের যুগে বিয়ে ব্যাপারটা অত চট করে হয় না। পশ্চিমি দেশে তো নয়ই, এখন আমাদের দেশেও হয় না। তবে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে, ঘনিষ্ঠতা হতে তো কোনও বাধা নেই। দুজন মানুষের যদি একে অন্যকে ভাল লাগে, তারা মনে এমনকী শরীরেও যদি কাছাকাছি আসতে চায় একে অন্যের তা হলে তাতে কোনও দোষ দেখি না আমি। বিয়ে অনেক গভীর ব্যাপার। সারা জীবনের ব্যাপার। রক্তের শরিক সৃষ্টির চিরায়ত নীড়ের ব্যাপার। যাযাবর পাখিদের মতো হয়ে গেছে এখন পৃথিবীর মানুষ মানুষী। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেড়ায় তারা গোল্ডেন প্লোভার পাখিদের মতো, একটু উষ্ণতার খোঁজে। খড়কুটো মুখে করে তারা চিরদিনের নীড়ের চেষ্টায় প্রায়ই সচেষ্ট হয় না। এই পারমাণবিক যুগে এক একটা দিনই এক একটি নিটোল জীবন, মুক্তোর মতো। চিরস্থায়ী ভাবনা, চিরায়ত কামনা, মানুষের আর নেই। তারা সকলেই অস্থির, ক্ষণস্থায়ী, ছটফটে অপরিণত সম্পর্কের পরিণতির দিকে নিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে। কালকের কথা ভাবারই সময় নেই এখন মানুষের, সারা জীবনের কথা কে ভাবে? যখন জীবন, ভবিষ্যৎ সবকিছুই মানুষের নিজ-নির্ধারিত ছিল, তখন ওইসব ভাবনা ভেবে দিন কাটানো যেত। আজকে যখন দেশ, কাল, সমাজ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমন কী পৃথিবীর ভবিষ্যৎই অনির্দিষ্ট তখন ওসব ভাবনা ভাবা বোকামি ছাড়া আর কী?

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হনলুলু ভাল করে দেখবার জন্য। ট্যাক্সি ড্রাইভার একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যামেরিকান : বিরাট গাড়িটার স্টিয়ারিং ধরে বড় খোলের পাইপ মুখে বসে আছে সে।

তার সঙ্গে গল্প করতে করতে চললাম। নাম স্ন্যাট।

শুধোলাম, বিয়ে করেছ ?

ও বলল, হোয়াট ফর ?

আমি চমকে উঠলাম, কপালের দুপাশের চুলে তার পাক ধরেছে এখনও বিয়ে করেনি কী রকম !

আমাদের দেশে তো এরকম ভাবাই যায় না। জন্ম-মৃত্যুর মতো বিয়েও তো অবশ্যম্ভাবী, সেখানে কেউ খেতে পাক আর নাই-ই পাক, নিজে রোজগার করুক আর নাই-ই করুক, বউকে খাওয়াতে পারুক আর নাই-ই পারুক, একটা বিয়ে না করে ফেলতে পারলে এবং ছেলে মেয়ে না হলে তো মানবজন্মই বৃথা ! তাই সেদেশের মানুষ হয়ে কেন বিয়ে করব ; এই কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলাম।

আমি বললাম, কেন, তুমি যথেষ্ট রোজগার করো না ?

ও বলল, করব না কেন ?

আমি বললাম, তুমি একা বোধ করো না ? শারীরিক একাকিত্ব, মানসিক একাকিত্ব ?

ও বলল, একেবারেই নয়। আমি আমার গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে থাকি। উই লিভ টুগেদার।

আমি বললাম, সে না হয় কয়েকদিন, কয়েকমাস, তারপর ?

ও বলল, তারপর কী ? পাঁচ বছর তো হয়ে গেল।

ছেলেমেয়ের বাবা হতে ইচ্ছে করে না। তোমার গার্ল ফ্রেন্ড মা হতে চান না ?

ড্রাইভার বলল, আমাদের ওসব ফালতু বিলাস ও বড়লোকি নেই। আমরা দুজন নিজেদের বড়ই ভালবাসি। আমার বান্ধবীও রোজগার করে, আমিও করি। নিজের নিজের সব খরচা নিজের নিজের : হ্যাঁ ! কখনও কেউ কাউকে কোনও প্রেজেন্ট দিলাম, বা খাওয়ালাম দাওয়ালাম সে অন্য কথা। দুজনেই আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কেউ কারও উপরে নির্ভরশীল নই ; যতদিন ভাল লাগে থাকব—যখন লাগবে না সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

আমি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লাম ওর জন্যে। বললাম, ধরো দশ বছর পর যদি তোমার সঙ্গিনী তোমাকে ছেড়ে চলে যায় ?

ও হো-হো হেসে উঠল। তারপর বলল, ওঃ বয় ! যেতে ও পারেই। আমিও যেতে পারি। কিন্তু গেলে আমারও সঙ্গিনীর অভাব হবে না, ওরও হবে না সঙ্গীর। এতে অসুবিধার কী ?

হু-হু করে হাওয়া আসছিল ওয়াইকিকি বীচ থেকে—দোকান-বাজার-হোটেল সারি সারি—মালটিস্টোরিড। জানালায় হাত রেখে আমি ভাবছিলাম যে, এদের সবচেয়ে বড় বন্ধন বোধহয় এদের মুক্তিই। স্বার্থপর, অন্যের দায়মুক্ত, সবরকম স্বাধীনতাময় জীবনে আনন্দ নিশ্চয়ই আছে। এ আনন্দটা একরকম। বড় স্বার্থপর আনন্দ এ। আমাদের দেশে এখনও কত ছেলেমেয়ে আছে যারা নিজের ভাইবোনেদের মানুষ করে তোলার জন্যে, নিজের বেকার ও অযোগ্য আত্মীয়স্বজনদের শুভার্থে চিরদিন নিজেদের সবদিক দিয়ে বঞ্চনা করে এসেছে ও করছে। কী জানি সেই আত্মবঞ্চনার মধ্যে যে এক বিশেষ সুখ আছে তা বোধহয় এই স্বার্থপরতার সঙ্গে ছিনিয়ে নেওয়া সুখের চেয়ে অনেক গভীর।

অথবা তাই-ই কি ? আমাদের দেশেও কি একদল মানুষ ভার বইতে বইতে, অন্যের দায় নিজের কাঁধে চাপাতে চাপাতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পর যখন যাদের জন্যে নিজেকে নিঃস্ব করল, সেই সব অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্ন লোকেদের দ্বারা অবহেলিত এমন কী অপমানিতও হয় তখন কি তারাও বড় দেরি করে হারানো-অতীতের দিকে চেয়ে হতাশার মধ্যে পা-ছড়িয়ে বসে ভাবে না যে, স্বার্থপর হওয়াই ভাল ছিল ?

দেখতে দেখতে ডোল্‌মাণ্ডির আনারসের ফার্মে চলে এলাম। এত বড় যে আনারসের বাগান হয়, হতে পারে ; তা না দেখলে ভাবা যায় না। যেদিকেই তাকাই না কেন অদিগন্ত আনারস। নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে ছন্দোবদ্ধভাবে লাগানো। মাইলের পর মাইল। তীরবেগে ট্যাক্সি ছুটিয়েও দেখা যায় দিগন্ত রেখাই শুধু প্রসারিত হচ্ছে ; বাগান শেষ হচ্ছে না।

www.BanglaBook.org

আনারস তোলা হয় হাতে, কিন্তু মেকানিকালি কনভেয়র বেল্টে করে সেগুলো ট্রাকে গিয়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে ক্যানিং ফ্যাক্টরিতে।

হাওয়াই-এর প্রথম গভর্নর ছিলেন মিস্টার স্যানফোর্ড বি. ডোল। উনিশশো সন থেকে উনিশশো তিন সন পর্যন্ত। তখনই মিস্টার ডোলের এক কাজিন এখানে এসে আনারসের চাষের পত্তন করেন। আজকে ওআহু ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ডোল্ কোম্পানির বাগান আছে। হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের একটা পুরো দ্বীপ লানাইর মালিকই এই কোম্পানি। আনারসের দ্বীপ করে ফেলেছেন সেখানে। পুরো ইউ-এস-এ-তে যত আনারস এবং আনারসের রস বিক্রি হয় তার যথাক্রমে পঁয়ষট্টি ভাগ এবং পঁচাশি ভাগই যায় হাওয়াই থেকে।

একসময় ব্রিটিশরা, রাশানরা, এবং ফ্রেঞ্চরা তিমি মাছের ব্যবসার জন্যে এখানে আসত। তখন এই নীল-সবুজ করমচা-লাল শান্ত মেঘাচ্ছন্ন ঘুমন্ত দ্বীপগুলোতে কে ভেবেছিল এত বড় বড় কল বসবে, চাষাবাদ হবে এমন করে? ওসানোগ্রাফিক ইনস্টিটিউট হবে? এখন হাওয়াই-এর সবচেয়ে বড় রোজগারের সূত্র হচ্ছে—ইউ-এস-এর সামরিক ব্যয়। তারপরই ট্যুরিজম্।

হাওয়াই এখন বিশ্রাম ও ছুটি কাটানোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ট্যাক্সিটা একটা মোড় ঘুরল। দেখি, মোড়ের মাথায় রাজা কামেহামেহার বিরাট এক বারো-ফুট মূর্তি। লীই ফুলের মালায় ঢাকা। কাঁধের পিছনে বর্শা শোয়ানো, সামনে হাত প্রসারিত করা রাজা এখন কামেহামেহা।

এই কামেহামেহা নামটি হাওয়াইন ইতিহাসে কখনও বিস্মৃত হবে না। আগে প্রত্যেকটি দ্বীপ একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এক একটা দ্বীপ উত্তরাধিকার সূত্রে এক একজন ছোট রাজা বা চিফদের দ্বারা শাসিত হত। কামেহামেহা, ওইরকম একজন সর্দার বা ছোট রাজা ছিলেন। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে সমস্ত হাওয়াইতে একাধিপত্য করেন।

বেলা বেশ বেড়ে গেছিল। গরমও বেশ। সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছে হু-হু করে। ট্যাক্সির মিটারে ডলারের অঙ্কও হু-হু করে বেড়ে চলেছিল।

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, এবার কোথায়?

আমি বললাম, সোজা হোটেলে, সবচেয়ে শর্টকাট দিয়ে।

হোটেলে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে নামবার সময় লক্ষ করলাম যে, সেই কালো ক্যাডিল্যাক লিমুজিনটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে তবে সকালে যেখানে ছিল সেখানে নয়।

আমি ইচ্ছে করে গাড়িটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম। শোফার কোলের উপর খবরের কাগজটা ফেলে রেখেছিল কিন্তু তার চোখ ছিল গাড়ির ভিতরের আয়নায়। আয়না দিয়ে সে আমাকে লক্ষ করছিল।

আমি যেন ওকে দেখিইনি এমনভাবে ওর পাশ দিয়ে গিয়ে হোটেলের সিঁড়িতে উঠলাম। ওর পাশ দিয়ে আসার সময় ওর কাঁধের ডি-আই-আই লেখাটাতে আবার চোখ পড়ল।

আমার মন বলছিল যে লারা কোনও কথা আমার কাছে লুকিয়ে যাচ্ছে। এই ড্যানার নামের গোরখা-টুপি পরা লোকটা, এই কালো ক্যাডিলাক লিমুজিন, লারা এবং ড্যানারের মধ্যের সম্পর্ক—ওই সমস্তই আমার কাছে হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছিল।

ঘরে গিয়ে আমি টেলিফোন ডিরেকটরি থেকে ড্যানার নামটা বের করে দেখলাম। 'ড্যানার' 'ড্যানার', 'ড্যানার' পেয়েছি। ড্যানার ইনটিগ্রেটেড-ইনটারন্যাশনাল্। ডি-আই-আই।

কিন্তু এই ড্যানার যে সেই ড্যানার বুঝব কী করে?

নাম্বারটা ডায়াল করলাম। সেক্রেটারি লাইন ধরল। বলল, গুড মর্নিং। ড্যানার ইনটিগ্রেটেড্।

মে আই স্পিক টু মিস্টার ড্যানার? আমি বললাম।

বলেই বললাম, আমি কথা বলতে চাই না, আপনি শুধু মিস্টার ড্যানারকে জিজ্ঞেস করুন যে তাঁর গোরখা-টুপিটা ফেলে এসেছেন কি না?

সেক্রেটারি মেয়েটি একটু অবাক হল। পরমুহূর্তেই বলল, না তো। ওঁকে তো টুপি মাথায় দিয়েই ঢুকতে দেখলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি থ্যাঙ্ক উ্য বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

ততক্ষণে ড্যানারকে সেক্রেটারি নিশ্চয়ই ওই ফোন কলের কথা বলেছে। এবং ড্যানার কী ভাবছেন কে জানে!

টেলিফোনের বই থেকে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, টেলেক্স এবং মিস্টার ড্যানারের বাড়ির নম্বর টুকে নিয়ে আমি ডাইরিতে লিখলাম।

কেন জানি না, বার বারই আমার মনে হচ্ছিল যে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং সম্পূর্ণ না জেনে আমি একটা বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ছি। বিপদটা কীসের, কার কাছ থেকে এবং কী ধরনের সে সম্বন্ধে আমার কোনওই ধারণা ছিল না।

নিজের ঘরে ফিরে লারাকে ফোন করে পেলাম না ওর ঘরে। রিসেপশান থেকে বলল যে, ও বেরিয়ে গেছে, ফিরতে পাঁচটা-ছ'টা হবে।

হাওয়াইন হাট

লাঞ্চের পর আমি নীচের লাউঞ্জে নেমে এসে দেখি সেখানে কুরুক্ষেত্র বেধেছে। বাচ্চাকাচ্চা বুড়ো ধাড়ি সব নানারঙা জামা গায়ে দিয়ে একটা ট্যাবলো সাজাতে লেগে গেছে বিরাট লাউঞ্জের মধ্যেখানে। ফুলে ফুলে ছয়লাপ। কত রঙের যে কতরকম ট্রপিকাল ফুল তার ইয়ত্তা নেই।

রিসেপশানে জিজ্ঞেস করতে জানলাম যে কাল আলোহা প্যারেড হবে। ওয়াইকিকি বীচের রাস্তা বেয়ে প্রতিবছর একবার করে যে প্যারেড হয়, সেই আলোহা প্যারেড। ট্রাডিশান অনুসারে প্রত্যেক হোটেলের রেসিডেন্টরা একটা করে ট্যাবলো সাজাবেন।

বেশ মজা লাগল আমার। মনে কত স্ফূর্তি থাকলে বড়রাও এমন ছেলেমানুষের মতো ট্যাবলো সাজাতে লেগে যেতে পারে তা ভেবে অবাক হলাম। বাবা-মা-ছেলেমেয়ে সকলে মিলে হাত লাগিয়েছে। শুনলাম হোটেলের বাসিন্দাদের নিয়ে একটা কমিটি হয়েছে। সকলে নাকি চাঁদাটাদাও দিয়েছে। রেসিডেন্টদের চাঁদা ও হোটেলের টাকা নিয়ে এই কুরুক্ষেত্র হচ্ছে।

আমি ওর কাছাকাছি একটা সোফায় বসে ফুল সাজানো দেখতে লাগলাম। আর্যকন্যাদের মতো ফুটফুটে সব মেয়েরা, জ্বলজ্বলে কাস্তের ছেলেরা ফুলের পাহাড় ঘিরে প্রজাপতির মতো নাচানাচি করছে। দেশের সরস্বতী পুজোর আগের দিন বাড়ির পুজোয় রাত জেগে ঠাকুর ও মণ্ডপ সাজানোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার।

একটি হাওয়াইন ছেলে ফুলের পাহাড়ের জিম্মায় ছিল। সেই-ই ফুল এগিয়ে দিচ্ছিল। এয়ার-কন্ডিশান্ড হোটেলের এয়ার-কন্ডিশান্ড লাউঞ্জ। তাই আজ ফুল সাজালেও কাল নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই কোনও।

ছেলেটির সঙ্গে ফুল নিয়ে কথা শুরু করলাম। ওর ফুলের দোকান আছে এয়ারপোর্টে, হাসপাতালে, বাজারে। সে যে এদেশীয় ফুলের উপরে অথরিটি তা জানা গেল একটুক্ষণের মধ্যেই। পটাপট ফুলের নাম বলতে লাগল। বলল, হাওয়াই-এর প্রত্যেকটা দ্বীপেরই এক একটা করে ন্যাশনাল ফ্লাওয়ার আছে।

হাই-বিসকাস, কটেজ রোজ, এয়ার প্লান্ট আরও কতরকম ভারাইটির ফুল। ছেলেটি গড়গড় করে বলে যেতে লাগল---।

হাওয়াই-এর, মানে মূল হাওয়াই দ্বীপের জাতীয় ফুল হচ্ছে লাল লেহুয়া (ওহিয়া)—লাল রঙা। মাউই-এর জাতীয় ফুল হচ্ছে লোকেলানি-গোলাপি। মোলাকাই বেছে নিয়েছে হোয়াইট কুকুই ব্লসমস্, যে কুকুই বাদাম দিয়ে ওদের পূর্ব-পুরুষেরা মোমবাতির কাজ চালাত। কুকুই গাছকে এখানে মোম-বাদামও বলে—ক্যান্ডেলনাট্। এ গাছ থেকে পুরনো দিনে তেল, আলো আর ওষুধ তৈরি হত।

কাহুলায়ে দ্বীপের জাতীয় ফুল হচ্ছে হিনাহিনা (বীচ হেলিয়োট্রোপ) ধূসর রঙা। লানাই দ্বীপের

www.BanglaBook.org

পছন্দ কাউমাওআ, হলুদ, হলুদ আর সোনালি এয়ার প্লান্ট। আর হনলুলু যে দ্বীপে, সেই ওআহুর জাতীয় ফুল হচ্ছে ইলিমা। হলুদ ফুল। এই রকমই মোহিকোনা দেখতে পার্পল—কাউআই দ্বীপের জাতীয় ফুল। আর নিহাউ দ্বীপের জাতীয় ফুল হচ্ছে হোয়াইট পাপ্ শেল—সাদা। সমস্ত দ্বীপ থেকে ফুল উড়ে আসে প্লেনে হনলুলুতে আলোহা সপ্তাহের জন্যে।

যেমন এক একটা ফুলের নাম মন-পসন্দ তেমনই তাদের রঙ আঁখ-পসন্দ। রামধনুর কোনও রঙই বিভিন্ন মিশ্র হাইবিস্‌কাসে অপ্রাপ্য নয়। এতরকম রঙের যে হয় হাইবিস্‌কাস! দেখলে চোখ ও মন জুড়িয়ে যায়।

দেখতে দেখতে ছেলেটার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল, ও বলল, ওদের কাজ শেষ হতে হতে রাত আটটা বাজবে। তারপর এই ট্যাব্‌লো টেনে নিয়ে যাবে গাড়ি সেখানে, যেখান থেকে প্যারেড শুরু হবে কাল। প্যারেড দেখবে তো?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই।

ও বলল, তোমাকে বটগাছ দেখাব।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, বটগাছেরই দেশের লোক আমি।

ও বলল, কোথাকার?

ইন্ডিয়ার, আমি বললাম।

ও বলল, সাটাজিৎ রে'র দেশের লোক?

রবীন্দ্রনাথকে বিদেশি তরুণরা জানে না। তারা সত্যজিৎকে জানে। পরে জানলাম, অবসর সময়ে ও একটা টি ভি কোম্পানির ফটোগ্রাফারও।

ওর সঙ্গে গল্পে মেতে রয়েছি, এমন সময় সেই দীর্ঘকায় গুণ্ডাদর্শন ক্যাডিলাক লিমুজিনের শোফার এসে আমাকে বলল, গুড আফ্‌টারনুন স্যার। আপনি কি মিস্ ডস্‌কে দেখেছেন?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছিল যে, লারা হোটেলে নেই। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললাম যে, না। আমি দেখিনি।

উনি কি ঘরে আছেন?

আমি বললাম, জানি না।

শোফার আমার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সোজা রিসেপ্‌শানের দিকে হেঁটে গেল।

রিসেপ্‌শানের অনেকগুলি মেয়ের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞেস করল ও দেখলাম। কী উত্তর পেল অতদূর থেকে শোনা সম্ভব ছিল না। সেই মেয়েটি একটি সবুজ গাউন পরে ছিল। শোফার আমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম, কী বলল?

ও বলল, ঘরে নেই।

একটু পর বাইরে গিয়ে দেখি যেখানে লিমুজিনটা ছিল, সেখানে সেটা নেই।

লারা নিশ্চয়ই ওয়াইকিকি বীচের উপরে যে গেটটা হোটেলের সেই গেট দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কেন? ও কেন ওরই জন্যে অপেক্ষমাণ ক্যাডিলাক লিমুজিন-এর আরাম অগ্রাহ্য করে অন্য দরজা দিয়ে শোফারের নজর এড়িয়ে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে? এ দেখছি এক রীতিমতো রহস্যময় নাটকের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। জীবনে কখনও অভিনয় করিনি। অথচ…

লারাকে আজ গ্রাওয়াইন হাটে ডিনার খাওয়াব বলেছিলাম। ওয়াইকিকি বীচের দিকে রাস্তায় হোটেলেরই লাগোয়া একটা কফি ও স্ন্যাকস্ বার ছিল। সেখান থেকে এক কাপ কফি খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে এলাম। টি-ভি খুলে দিয়ে লারার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পর ফোনটা বাজল।

মিঃ বোস?

ইয়েস। আমি বললাম পুরুষকণ্ঠের উত্তরে।

গুড আফ্‌টারনুন। ইডস্ ড্যানার হিয়ার। ডেরিল ড্যানার।

ইয়েস মিস্টার ড্যানার। হোয়াট ইজ ইট? আমি উৎকর্ণ হয়ে বললাম।

মিস্টার ড্যানার বললেন, লারার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, লারা তো এখানে নেই।

ওঃ নেই বুঝি ?

তারপর বললেন, আমি কি আমার গোরখা টুপিটা আপনার ওখানে ফেলে গেছি ?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলাম আমি। বললাম, গোরখা টুপি, আপনার ? না তো ! আপনি আমার ঘরে আসেনই নি ! লারার ঘরে ফেলে গেছিলেন কি ?

মিঃ ড্যানার বললেন, ও ! আই অ্যাম সরি ! তাহলে অন্য কোথাও ফেলে এসেছি।

আমি আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, আপনার কাছে ওই টুপির গল্প শোনা হল না। আবার কবে দেখা হবে ?

মিঃ ড্যানার কাটা-কাটা গলায় বললেন, নিশ্চয়ই দেখা হবে মিঃ বোস। দেখা নিশ্চয়ই হবে।

"নিশ্চয়ই হবে" কথাটার উপর বেশ জোর দিলেন মিস্টার ড্যানার। রিসিভারটা নামাতে না-নামাতে দরজার বেল বাজল, উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। রীতিমত হ্যান্ডসাম। ছিপছিপে। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। আমারই মতো বয়স হবে। পরনে একটা গ্রে-রঙা বিজনেস্ স্যুট। হাতে ব্রিফকেস্, চোখে সান গ্লাস—ফোটো সান—যে-চশমার রঙ আলোর সঙ্গে সঙ্গে বদলায়।

ভদ্রলোক বললেন, সরি টু বদার উ। ইজ মিস্ ডস ইন ?

আমি অতোধিক অবাক হয়ে বললাম, লারা তো নেই।

ভদ্রলোক, সরি, আই আম রিয়্যালি সরি ; বলে চলে গেলেন।

দু মিনিট পরে আবার দরজার ঘণ্টা বাজল। দরজা খুলতেই দেখি রিসেপ্শানের সেই সবুজ গাউন পরা মেয়েটি দাঁড়িয়ে। যার সঙ্গে নিগ্রো শোফার কথা বলছিল কিছুক্ষণ আগে।

মেয়েটি বলল, একসকিউজ মি স্যার, মিস ডস্ কি আছেন ?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আছেন কি নেই তা আপনি রিসেপ্শান থেকে আমার ঘরে ফোন করেই তো জানতে পারতেন। কী পারতেন না ?

মেয়েটি প্রথমে অপ্রস্তুত হল। তারপর বলল, আপনার ঘরের টেলিফোন বাজছে না—বোধহয় কোনও গোলমাল হয়েছে—

বলতে বলতেই, দরজায় মেয়েটি যখন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তখনই ফোনটা আবার বাজল।

মেয়েটি অপ্রতিভ অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে হাসির ভাব মুখে এনে বলল, ওঃ ফোনটা তাহলে ঠিক হয়ে গেছে। পরক্ষণেই বলল, সরি অ্যাম সরি টু ডিসটারব ইউ।

আমি দরজাটা লক করে দিয়ে রিসিভারটা তুললাম।

লারা ওপাশ থেকে বলল, হুই জিত তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে অবেলায়, না স্বপ্ন দেখছিলে কারও ? ফোন ধরতে এতক্ষণ লাগল ?

আমি বললাম, না, ঘুমোইনি। কী বলছ বলো ?

লারা বলল, কখন বেরোবে ?

তুমি যখন আসবে ? কখন আসবে ?

এই ছ'টার মধ্যে। তারপর বলল, রাতে কোথায় যাবে ?

আমি ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বললাম, পলিনেশিয়ান কর্নারে।

ও বলল, কেন ? হাওয়াইন হাটে যাবে না ?

আমি বললাম, নাঃ।

ও বলল, যাই-ই হোক, আমি আসছি।

বিকেল থেকে নানারকম রহস্যময় ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে দেখে ফোনে আমি বলতে চাইনি ওকে যে, হাওয়াইন হাটেই যাব, কিন্তু লারাই নামটা বলে দিল। জানি না সবুজ গাউনের মেয়েটা তখনও বন্ধ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল কি না ?

টি-ভির দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম আমি। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে নানা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যেই লারা হোটেলে পৌঁছে নিজের ঘর থেকে ফোন করল আমায়। বলল, দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি।

লারা যখন এল তখন একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। বিভিন্ন পোশাকে ওর সৌন্দর্য যে কত বিভিন্নতায় আমার চোখে ধরা পড়ছিল এ ক'দিনের দিনে ও রাতে তা কী বলব! আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে ও বলল, হোয়াট? আর ইউ মুন-স্ট্রাক?

আমি বললাম, নো। লারা-স্ট্রাক!

ও দৌড়ে এসে আমাকে চুমু খেল। বলল, ইউ নটি ফ্লাশার!

আমি বললাম, আই মেন্ট ইট। রিয়্যালি, আই ডিড!

তারপর ওকে সোফায় বসিয়ে পর পর যা ঘটেছে তাই-ই বলে গেলাম।

শুনতে শুনতে লারার মুখটা চিন্তায়, ভয়ে কুঁকড়ে উঠল।

ও, যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তার চেহারার বর্ণনা আরেকবার চাইল আমার কাছে। আমি আবার বলতেই ওর মুখ ফুটে বেরিয়ে এল, কেনেথ্। নোওও, ইট কান্ট বি।

কেনেথ্ মানে? তোমার টোরোন্টোর বয় ফ্রেন্ড?

হ্যাঁ? কিন্তু আবারও বলো ওর চেহারার কথা। কেনেথ্ হতেই পারে না।

আমি আবার ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা দিলাম।

লারা রিসেপ্শানে ফোন করল। রিসেপ্শান থেকে বলল, যে ওই নামে হলিডে ইন-এ কেউই চেক-ইন্ করেনি।

মেয়েটি বলল, বেনামেও উঠে থাকতে পারে।

পরক্ষণেই লারা আমার কাছে এসে বলল, জিত তুমি আমার কতখানি বন্ধু কেন জানি না, আমার বড় ভয় করছে।

মানে? আমি অবাক হয়ে শুধোলাম। বললাম, কীসের ভয়?

ও বলল, তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা অল্প দিনের, কিন্তু তোমাকে না বলেও আমার উপায় নেই। সত্যিই তোমার জানা দরকার। আমার বড় বিপদ জিত।

আমি বললাম, ব্যাপারটা বলো আমাকে।

ও বলল, চলো, যেতে যেতে ট্যাক্সিতে বলব। দেওয়ালেরও কান আছে।

আমি বললাম, যাবে?

ও আমার হাত ধরে বলল, চলো।

আমরা লাউঞ্জে এসে নামতেই দেখি সেই নিগ্রো শোফার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

সে বাউ করে বিনয়ের সঙ্গে বলল, গুড ইভনিং ম্যাম্। আমি আপনার জন্যে সকাল থেকে অপেক্ষা করে আছি।

লারা বলল, থ্যাঙ্ক উ। আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়েই যাব।

লোকটি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আমার চাকরি যাবে। বস্ বলে দিয়েছেন যে, আপনি ট্যাক্সিতে যাতায়াত করলে আমার চাকরিই থাকবে না। আর আমার চাকরি না থাকলে···।

লারা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি ওর মুখের দিকে।

তারপর আমরা ক্যাডিলাক লিমুজিনের দিকেই এগিয়ে চললাম।

খুব সৌজন্যের সঙ্গে শোফার দরজা খুলে দিল লারাকে। তারপর আমিও বসলে বলল, হোয়ার টু?

লারাই বলল, হাওয়াইন হাট। আমি কিছু বললাম না।

হাওয়াইন হাট একটা রেস্তোরাঁ। একেবারে ঘাসে ও শনে ছাওয়া একটা প্রকাণ্ড কুঁড়ে ঘরের মতো দেখতে তার ভিতরেটাও, বাইরেটাও। ক্যাডিলাক লিমুজিনটা যখন নিঃশব্দে অথচ বেগে ছুটে চলছিল হাওয়াইন হাট-এর দিকে তখন লারা আমার হাতটা তুলে নিয়ে ওর কোলে রাখল।

দেখলাম, ওর হাতের পাতা দুটো ঠাণ্ডা, ঘামে ভেজা।

আমি আমার হাতের পাতা ঘষে ঘষে ওর হাতের পাতা গরম করে দিলাম। তারপর আমার

www.BanglaBook.org

হাতের মধ্যে ওর হাতের পাতা নিয়ে চাপ দিলাম তাতে।

হাওয়াইন হাটে যখন পৌঁছলাম আমরা তখনও শোফার খুব যত্ন করে দরজা খুলে লারাকে নামাল, তারপর বলল, আমি অপেক্ষা করছি।

আমরা ভিতরে ঢুকে একটা দুজনের মতো ছোট্ট টেবলে বসলাম। রেস্তোরাঁটি প্রায়ান্ধকার। তবে অন্ধকারের চেহারাটা কালো নয়, রঙিন। নানারঙা আলোর তরল রঙে। কুকুই বাদামের হুড়া দিয়ে বাতি জ্বালা উচিত ছিল ওদের। অবশ্য আগুন লাগার ভয় তাতে।

ড্রিঙ্কস-এর অর্ডার নিতে এল ওয়েটার। আমি মাই-টাই-এর অর্ডার দিলাম। এখানের জাতীয় পানীয়। ওয়েটারের কাছেই শুনলাম যে, মাই-টাই তৈরি হয় ফলের রসের সঙ্গে হোয়াইট রাম মিশিয়ে। বোতলেও মাই-টাই পাওয়া যায়।

একটু পরেই স্টেজে হুলা ড্যানস আরম্ভ হল। পেছন দুলিয়ে ঘাসের ঘাঘরা উড়িয়ে উদ্দাম অথচ ছন্দোবদ্ধ নাচ। নাচের সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও বাজছিল।

আমি ওই গোলমালের মধ্যে লারাকে বললাম, এবার বলো। এই গোলমালে কেউ কিছু শুনতে পাবে না।

লারা এদিক ওদিক তাকাল, যেন এই হাওয়াইন হাটেও কোনও লোক ওকে নজরে রেখেছে।

কিন্তু ওর কথা শোনা হল না। আমাদের একেবারে পাশের টেবলেই এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসে বসলেন। এত কাছে যে ফিসফিস করে বললেও সেকথা শোনা যায়।

লারা মাই-টাই শেষ করে আমাকে বলল, গিভ মি এনাদার ড্রিঙ্ক। আই ফীল লাইক গেটিং ড্রাঙ্ক টু-নাইট।

আমি ওয়েটারকে ডেকে আরও মাই-টাই-এর অর্ডার দিলাম। স্টেজে ততক্ষণে হুলা নাচ শেষ হয়ে গেছে। এখন সামোয়ান ফায়ার ডান্স হচ্ছে। সামোয়া আইল্যান্ডের লোকেদের এই আগুনের নাচ একটি দেখার মতো জিনিস।

আমি মাই-টাই-এ চুমুক দিয়ে বললাম যে, কেনেথই কি তোমার জীবনে প্রথম পুরুষ?

লারা হেসে ফেলল। বলল, নাঃ।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে, এমন প্রশ্ন অভদ্র, ইতর লোকেরা করে কোনও মেয়েকে। আমি এও বুঝতে পারছিলাম না যে, লারার ব্যাপারে আমার এত ইন্টারেস্ট কীসের, কেন? আমি কি লারাকে? লারাকে আমি কি...?

লারা আমার চোখের দিকে চেয়েছিল। একটা আশ্চর্য অভিব্যক্তিময় হাসিতে ওর সমস্ত মুখ দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। বলল, আমরা তোমাদের দেশের মেয়েদের মতো ভাল ও বোকা নই। অন্য শরীরের কাছে আসাটার কোনও দামই নেই আমার কাছে। আমাদের কাছে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, অনেকে এসেছে। কেউ এসেছে কোনও মুহূর্তের ভাললাগায়, পরিবেশের অভিনবত্ব বা মাদকতায়, দয়ায়, সমবেদনায় অথবা কৃতজ্ঞতায়, কেউ কেউ বা ঘৃণাতেও। আমার প্রতি ঘৃণা, তার নিজের প্রতি ঘৃণা। ওটা কিছুই নয়। আসলে ভালবাসা তো মনের। মনের ভালবাসা কেনেথকেই প্রথম বেসেছিলাম, হয়তো ভুল করে।

আমি লারার টেবলের উপরে রাখা হাতে আমার হাত রাখলাম।

লারা বলল, আমি আসছি একটু, একসকিউজ মি।

বলেই, লেডিজ রুমের দিকে চলে গেল।

লারা চলে যেতেই, একজন ওয়েটারের পোশাক পরা লোক অচিরে আমার কাছে এসে হাজির হল। তারপর বাউ করে বলল, একসকিউজ মি স্যার! হাউ ওয়েল ডু উ্য নো দিস লেডি? অ্যান্ড ফর হাউ লঙ?

লারাকে আমি কতখানি চিনি এবং কতদিন হল চিনি একথা ও জিজ্ঞেস করবার কে?

প্রথমে খুব রাগ হল আমার। ভাবলাম বলি যে, দ্যাটস মাই অফ ইওর বিজনেস।

কিন্তু কিছু বলার আগেই লোকটি বলল, ওয়াচ আউট। টেক কেয়ার অফ ইওরসেলফ। শী ইজ ডেনজারাস!

www.BanglaBook.org

বলেই লোকটা যে ট্রে-টা ধরে দাঁড়িয়েছিল, সেই ট্রে-টা নিয়ে চলে গেল।

লারা ফিরে এল। লারাকে আমি কিছু বললাম না, কারণ ও এমনিতেই যথেষ্ট চিন্তিত ছিল। কিন্তু এবার আমার চিন্তা শুরু হল।

এবার খাবার নিয়ে এল, যা অর্ডার করেছিলাম। হাওয়াইন স্পেশালিটি। মাহি-লাহি। ফ্রেঞ্চ পাইজ, স্যালাড উইথ ড্রেসিংস, সঙ্গে মাছ ভাজা। এই-ই মাহি-লাহি।

লারাকে বেশ চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, চীয়ার আপ! হোয়াটেভার উইল বি : উইল বি। আমি তোমার পাশে আছি। ফর বেটার অর ফর ওয়ার্স—তোমার সঙ্গেই আছি।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা উঠলাম। আবার ক্যাডিলাক লিমুজিন। হু হু করে গাড়ি চলল।

শোফার বলল, হ্যাভ অ নাইস টাইম ম্যাম?

ইয়েস! থ্যাঙ্ক উ! লারা বলল নৈর্ব্যক্তিকভাবে।

হলিডে ইন-এর কাছাকাছি এসেছি এমন সময় পাঁ-পাঁ, পাঁ-পাঁ, পাঁ-পাঁ করে সাইরেন বাজাতে বাজাতে দুটো পুলিশের গাড়ি মাথার উপরের ঘুরন্ত লাল আলো জ্বালিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। লারা চমকে উঠে গাড়ি দুটোর দিকে তাকাল। শোফারও। গাড়ি দুটো হলিডে ইন-এর সামনে গিয়েই থেমে গেল। গাড়ি থেকে দু কোমরে দুটি পিস্তল ঝোলানো পুলিশ নেমে বীচের দিকে দৌড়ে গেল।

ওসব দেশে, আমাদের দেশের মতো অসংখ্য কৌতূহলী, বেকার ও পরের ব্যাপারে নাক-গলানো লোক নেই। বীচে বিশেষ ভিড় ছিল না। দু-তিনজন লোক এবং একজন মহিলা হোটেলের দিকে ফিরে আসছিলেন বীচের দিক থেকে।

আমাদেরও নামিয়ে দিল শোফার গাড়ি থেকে। পুলিশ দুজন তখনও জোরে বীচের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। ফ্লাড লাইটের আলোয় বীচে কী যেন একটা জিনিস পড়ে আছে দেখলাম।

আমি আর লারা হোটেলে ঢুকে গেলাম।

লারা অটোমেটিক লিফটে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আজকে আমার সঙ্গে থেকো। আমার ভয় করছে। আমার খুব কাছে থেকো।

আমি কিছুই না ভেবে বললাম, বেশ।

লারাকে বললাম, তুমি ঘরে যাও। আমি চেঞ্জ করে আসি। আমার ঘর থেকে।

লারা আমার হাত জড়িয়ে বলল, না। তুমি আমাকে এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকবে না। আমার ভয় করে!

আমি হাসলাম, বললাম, পাগলি নাকি? জামাকাপড় ছাড়ব না? স্লিপিং স্যুটটা পরে আসি।

লারা বলল, না। আমাকে এক মুহূর্তও ছেড়ে যেও না।

তারপর বলল, রাতে তো শুয়েই থাকবে বাবা! স্লিপিং স্যুটের দরকার কী? বলে দুষ্টুমি করে হাসল।

আমি বললাম, নটি গার্ল।

লারা ঘরে ঢুকেই রুম সার্ভিসে ফোন করে দুটো বড় কনিয়াকের অর্ডার দিল।

জুতোটা খুলে ফেলে, কার্পেটে পা রেখে আরাম করে বসল। তার পরেই উঠে পড়ে আমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আমার জুতো খুলতে লাগল দুহাতে।

আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম। বললাম, করো কী? করো কী?

লারা বাচ্চা মেয়ের মতো বলল, কেন? শুনেছি ইন্ডিয়ায় স্ত্রীরা স্বামীদের জুতো খুলে দেয়।

আমি হাসলাম। বললাম, সে স্বর্ণযুগ চলে গেছে, এখন স্বামীদের জুতো পেটা করে।

লারা জুতোটা টেনে খুলতে খুলতে বলল, আই ডোন্ট বিলিভ। তোমাদের দেশের বাবা-মা ছেলেমেয়ে ও স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আমাদের কাছে একটা বিস্ময়। পরের জন্মে যদি কখনও কেউ আমাকে বিয়ে করে তাহলে আমি ভারতীয়কে বিয়ে করব।

আমি বললাম, পরজন্ম কেন? এ-জন্মে কী দোষ করল? তাছাড়া তোমরা আবার পরজন্ম মানো নাকি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লারা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মনতে পারলে খুশি হতাম।

পিসিমার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আমি বললাম, ধরো আমিই যদি বিয়ে করি ?

লারা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, না, না। তা হয় না। আমার কী আছে যে তোমাকে দিতে পারি ? আমি খারাপ ; খুব খারাপ ! আমাকে তুমি কয়েক রাতের সঙ্গিনী করতে পারো, বিয়ে করার কথাই ওঠে না ! বিয়ে মানে সন্তানের জননী ! রক্তের উত্তরাধিকারী। বিয়ে কি যাকে তাকে করা উচিত ? ওসব কথা মনেও এনো না।

এমন সময় ফোনটা বাজল।

লারা ফোন ধরল। বলল, ইয়েস।

তারপর অন্য প্রান্তে যে ছিল তাকে বলল, শুনেছি নাকি কেনেথ এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। মিস্টার বোস, আমার বন্ধুর কাছে ও নাকি আমার খোঁজে এসেছিল। এ হোটেলে ও নেই ! আমি চেক করেছি। যদি বেনামে উঠে থাকে তো অন্য কথা।

আমি ঘড়ি দেখলাম, প্রায় দশটা বাজে। আমরা হাওয়াইন হাট থেকে ফিরেছি সাড়ে নটা নাগাদ।

তারপরই লারা উত্তেজিত হয়ে উঠল দেখলাম। রাগত স্বরে ড্যানারকে বলল, না। আমি তোমার কাছে এখন যেতে পারব না।

ওপাশ থেকে কে কী বলল, শোনা গেল না কিন্তু লারা বলল, তোমার জন্যে যা করার সবই করেছি। তোমার কোনও বিপদ আমি ঘটাইনি, ঘটাব না। বাট ডোন্ট ইন্টারফেয়ার ইন মাই প্রাইভেট লাইফ। মিস্টার বোস আমার বন্ধু—তার সঙ্গে আমি কতখানি ঘনিষ্ঠ হব না হব তা আমার ব্যাপার।

তারপর রিসিভারে কান লাগিয়ে কিছুক্ষণ শুনল লারা।

তারপর বলল, লুক ড্যানার। আই হ্যাড হ্যাড এনাফ অফ উ্য ! লেট মি লিভ মাই ওওন লাইফ। ভয় দেখিয়ো না আমাকে। সবচেয়ে বড় ভয় তো মৃত্যুভয় ? তুমি না হয় মেরেই ফেলবে আমাকে ! মেরে ফেললে ফেলো, ভয় দেখিয়ো না প্লিজ। গত দশ বছর ভয়ের মধ্যেই কেটেছে প্রতিটি মুহূর্ত। ভয়ের ভয় আর করি না। তোমার যা খুশি করতে পারো।

একটু থেমে, আবার কী যেন শুনল। তারপর আবার বলল, বললামই তো ! যা খুশি করতে পারো। আমাকে ঘাঁটিও না ! আমি নানা কারণে এখন ডেসপারেট হয়ে গেছি। তোমার ভালর জন্যেই আমার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলিয়ো না। লিভ মি এলোন !

বলেই ঘটাং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল লারা।

আমি বললাম, কী ? এবার আমাকে নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে ? তার চেয়ে আমি চলে যাই না কেন, কালই ফিরে যাই ! নইলে তোমার বিপদ হবে।

লারা হাসল। বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে। যদি ভয় পাও তো চলেই যাও ! আমি চাই না আমার জন্যে তোমার কোনও ক্ষতি হোক ! তুমি ড্যানারের কোনও ক্ষতি না করলে ড্যানার তোমার ক্ষতি করবে না। তাই তোমার ভয়ের কারণ দেখি না ! ভয় যা তা আমার ! তবুও ভয় যদি পাও তাহলে তুমি চলে যাও ! অন্য হোটেলেও চলে যেতে পারো। সেটাই ভাল।

আমি বললাম, ড্যানার লোকটা কীসের ব্যবসা করে ?

লারা বলল, করে না এমন ব্যবসা নেই। তারপর বলল, আমাকে তুমি যত পবিত্র ভাবছ তা নই আমি—নইলে ড্যানারের ভয় পাই আমি ! ড্যানারও আমাকে ভয় পায় ! কারণ তার অনেক গোপন কথা জানি আমি !

তারপর বলল, কেনেথকে ড্যানার চিনত কিন্তু ওদের মধ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল নই।

এমন সময় ওয়েটার কনিয়াক নিয়ে এল।

লারা আরও দুটো কনিয়াকের অর্ডার দিল।

আমি বললাম, করছ কী ? একেই তো অতগুলো মাই-টাই খেয়ে নেশা হয়ে গেছে, দুটো

www.BanglaBook.org

কনিয়াকে তো পুরো মাতাল হয়ে যাবে।

লারা হাসছিল। বলল, কিছু কিছু রাত থাকে, মুহূর্ত থাকে, মাতাল হওয়ার। বিশেষ রাতে, বিশেষ মুহূর্তে 'না' করতে নেই। কোনও কিছুতেই 'না' করতে নেই।

ওয়েটার আর একটা কনিয়াক দিয়ে যাবার পর সেটা টেবলে রেখে আমি বাথরুমে শাওয়ার নিতে গেলাম। শাওয়ার নিয়ে, ঘরে ফিরে এসে দেখলাম লারা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

লারা কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল। আমার দিকে পিছন ফিরে।

লারাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরের ওয়াইকিকির রাতের বহুবর্ণ আলোকমালার রামধনুর রং ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। লারা একটা হালকা বেগুনি নাইটি পরে ফেলেছে। আমি যখন চান করতে গেছিলাম তখন। ও আমার কনিয়াকটা হাতে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার হাতে দিল। তারপর শক্ত করে আমার হাত ধরল।

ফ্রেঞ্চ ওডিকোলনের গন্ধে আমার নাক ভরে গেল।

কনিয়াকটা নিতে নিতে আমি বললাম হাসতে হাসতে, আচ্ছা পাগলির পাল্লায় পড়লাম যা হোক। স্লিপিং স্যুটটাও পরে আসতে দিলে না?

লারা খাটে এসে আমার কোমরের পাশে বসল। ওর কাঁধ সমান নেমে আসা সুন্দর ঢেউ খেলানো চুল, তীক্ষ্ণ নাক, ভরন্ত ঠোঁট, গোল্ডেন প্লোভারের মতো নরম সোনালি-বাদামি বুকের আভাসে মনে হচ্ছিল ঠাকুরমার ঝুলির মতো আমি কোনও মন্ত্রপূত রাজপুত্র হয়ে জলের তলায় কোনও পরম রূপসী রাজকন্যার শোওয়ার ঘরে চলে এসেছি।

জীবনে যে স্বপ্ন সত্যি হয় রূপকথার নরম পাখিও বাস্তবে এসে জানা ঝাপটায় তা আমার জানা ছিল না।

আমার কনিয়াকটা শেষ হতেই লারা নিজেরটাও শেষ করে দৌড়ে এসে আমার চাদরের তলায় ঢুকে গেল। তারপর কী করে যে আদরে সোহাগে খেলায় অভিমানে, ক্লান্তিতে, আধোঘুমে আবারও খেলায় সারা রাত কেটে গেল তা আমি জানি না।

ঘোরের মধ্যে, ভাললাগার আশ্লেষে বার বার আমি লারাকে নেনে বলে ডাকছিলাম। ওর নরম সাদা দুধল ফুলের মতো শরীরের সঙ্গে একমাত্র নেনেরই তুলনা চলে। কী করে কোনও পুরুষকে খুশি করতে হয় তার শরীরের সর্বস্বতায় তা লারা জানে। আমার জীবনে, প্রথম গোঁফ ওঠার মতো, সাইকেল চড়া শেখার মতো, সাঁতার কাটতে শেখার মতো প্রচণ্ড এক আনন্দময় উত্তেজনার মধ্যে আমি এক দারুণ ভরন্ত অথচ নিছক ওওয়ার খেলা জীবনে সেই প্রথম শিখলাম।

সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, গাড়ি চালানো শেখার মতোই সেই আদিম, প্রাকৃত এবং প্রথম মানুষী খেলা একবার শিখে ফেলার পর পরবর্তী জীবনে কেউ কখনওই আর ভোলে না।

সে রাতে আমি প্রথম পুরুষ শরীরে প্রাপ্তবয়স্ক হলাম। শরীরের মধ্যে যে এত সুপ্ত আনন্দ এমন হেলাফেলায় লুকোনো ছিল সেই জানাকে হৃদয়ের সর্বস্বতায় সেই রাতে প্রথম আবিষ্কার করলাম। সে খেলায় লারাই আমার প্রথম পার্টনার হল। আমার শিক্ষয়িত্রী।

আলোহা প্যারেড এবং তারপর

প্যারেড চলেছে তো চলেছেই। শেষ নেই।

ঝকঝক করছে রোদ্দুর। ওয়াইকিকির পথের দুপাশের হোটেল থেকে মানুষজন সব ভেঙে পড়েছে রাস্তায়। খবরের কাগজ পেতে পেতে বসে পড়েছে সকলে ফুটপাথে। অল্পবয়সীরা দাঁড়িয়ে আছে। কী চমৎকার যে সাজসজ্জা। মেয়েরা ও ছেলেরা ঝকমকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে চকচকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছে। ট্যাবলোর পর ট্যাবলো। গাড়ির পর গাড়ি। ব্যান্ডের পর ব্যান্ড। মিলিটারির বিভিন্ন শাখার ব্যান্ড। পুলিশের ব্যান্ড। স্কুল কলেজের আলাদা ব্যান্ড।

প্যাসিফিক ফ্লিটের কম্যান্ডার সস্ত্রীক চলে গেলেন ধীর-গতিতে যাওয়া কনভার্টিবল গাড়িতে।

www.BanglaBook.org

হাওয়াইয়ের গভর্নর এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরও গেলেন সস্ত্রীক। বিভিন্ন হোটেল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দ্বীপের আলাদা আলাদা ট্যাবলো। চোখে ধেঁধে যায়!

আমরা ঘুম থেকে উঠেছিলাম দেরি করে। ততক্ষণে প্যারেড আধ ঘণ্টাটাক হল চলা শুরু করেছে। তবুও আমরাও প্রায় ঘণ্টা তিনেক ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে হট-ডগ আর কাগজের কাপে কফি খেতে খেতে আলোহা প্যারেড দেখলাম।

প্যারেড যখন শেষ হল তখন সারা পথে খবরের কাগজ, আইসক্রিমের কাগজের কাপ, ক্যান্ডি-নাটের ঠোঙা, পপ-কর্ণ ও পটেটো চিপসের প্লাস্টিকের আবরণী সব পড়েছিল। অত লোক বলে রাস্তার বিন-এ জায়গা হয়নি তাদের! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পথ ঝাঁট দেওয়ার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লাগানো বিরাট বিরাট সিভিক ভ্যান এসে সমস্ত কাগজপত্র, নোংরা ধুলো সাফ করে শুষে নিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল।

রোদটা কড়া হয়েছিল বেশ! লারা বলল, চলো আমরা সানসেট বীচ-এ যাই।

আমি বললাম, আমি ঘুমোব! রাতে ঘুম হয়নি একটুও। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। লারা হাসল। বলল, দোষটা যেন আমারই একার।

আমিও হাসলাম। বললাম, আমি তো তা বলিনি।

হোটেলে ফিরে আমি শুয়ে পড়লাম। লারার ঘরেই। লারাও বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল।

আমি বললাম, চলো, আজ আমরা ক্যাটামেরনে ডিনার খাব।

লারা বলল, বেশ।

তারপর দুজনেই ঘুম লাগালাম। ছুটি, কী আনন্দ; কী আশ্চর্য আরাম। জীবনে এমন ছুটিও যে কখনও কাটাব তা কোনওদিনও ভাবিনি! কাজ থেকে ছুটি, কর্তব্য থেকে ছুটি, ভয় থেকে, মজ্জাগত স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারাচ্ছন্ন নৈতিক বোধ থেকে, ভারতীয় কর্পূ থেকে ছুটি! বড় পিসিমার শাসন থেকে ছুটি।

বিকেলে আমার ঘরে গিয়ে আমি তৈরি হয়ে এলাম। লারাও তৈরি। আমি বললাম, আর দেরি নয়, চলো।

নীচে নেমে দেখলাম, কোনও অনিবার্য কারণে সেই সাড়ে ছ'ফুটের শোফার এবং কালো লিমুজিনটি অনুপস্থিত। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম! একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছলাম গিয়ে সমুদ্রের সেই জায়গায় যেখানে ক্যাটামেরন ভাড়া পাওয়া যায়, বিরাট প্রমোদ তরণী; হাউসবোট। গ্লাস-বটম বোট—নীচটা কাঁচের। রঙিন কোরাল্ বীচ্ দেখে, তাতে চড়ে লোকেরা।

ওখানে গিয়ে লারা বলল, চলো, হাউস বোটেই যাই। পরে চেঞ্জ করে চলে যাব ক্যাটামেরনে।

সূর্য ডোবার দেরি ছিল, তবুও বোট ছেড়ে দিল। পশ্চিমের রামধনু আকাশের দিকে মুখ করে। কী আশ্চর্য যে দেখতে লাগে এখানে সমুদ্রের উপরের অস্তগামী সূর্যের আলো তা কী বলব!

লারা বলল, বহুদিন চাইনিজ খাই না; চাইনিজ খাবো। সাওয়া স্যুপ সোয়াবিন সস দিয়ে, আর প্রণ গোল্ড-কয়েন! সঙ্গে অ্যামেরিকান চপ্‌সুই। তার সঙ্গে বুলস-ব্লাড রেড-ওয়াইন।

লারা আমার টেবিলে-রাখা হাতের উপর ওর হাতটা রেখেছিল। কথা বলছিল না কোনও। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। লাল মুছে গিয়ে আকাশে কালোর ছোপ লেগেছিল ততক্ষণে—শেষ সূর্যের লাল পাড় লুটিয়ে ছিল দিগন্তরেখার বুকে। সাদা সিগালের ঝাঁক কোথায় না-জানি দেরি করে ফেলেছিল। দ্রুত পাখায় উড়তে উড়তে তাদের অদ্ভুত বিষণ্ণ অস্ফুট ডাকে আসন্ন রাতের রহস্যময়তাকে গভীর করে ওরা চলে যাচ্ছিল তীরের দিকে।

এমন সময় ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা বেজে উঠল। দপ করে জ্বলে উঠল জাহাজের সব কটা আলো একসঙ্গে। নানারঙা রঙিন আলো জ্বলবার পরই শুধু বুঝতে পেলাম কী সুন্দর করে সাজিয়েছে জাহাজটাকে। কালো গভীর আদিম মহাসাগরের বুকে আলোকমালায় সাজা সুবেশ সুবেশী, সুন্দর ও সুন্দরী, পুরুষ ও নারীর সুগন্ধি ভিড়ে আনন্দ যেন ট্যাঙ্গো নাচের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যের হৃদয়ে বিকীরিত হচ্ছিল। পৃথিবীর কত জায়গার নারী ও পুরুষ যে এই স্বর্গীয় সুন্দর সন্ধ্যায় আনন্দের

www.BanglaBook.org

মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছে।

ভাবছিলাম, ওরা কত যে আনন্দ করতে জানে, জীবনকে কী দারুণ ভালোবাসে ওরা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে। প্রতি মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এ-কথাটা সর্বক্ষণ জানে বলেই আঁজলা গলে এক বিন্দু জীবনকেও বুঝি ওরা গড়িয়ে গিয়ে নষ্ট হতে দেয় না। পান করে জীবনের অনুপরমাণুকেও। ওদের কাজ করা যেমন শেখার আছে আমাদের, ওদের আনন্দ করার ও আনন্দ পাবার ক্ষমতাও শেখার নিশ্চয়ই।

লারা বলল, নাচবে? ট্যাঙ্গো আমার প্রিয় নাচ।

আমি বললাম, কখনও যে নাচিনি এমন নয়— : দার্জিলিং-এ ঠাণ্ডা জলে চান করলে, অথবা মুখে গরম আলু পড়লে অনেকবার নেচেছি।

লারা হাসল। বলল, দার্জিলিং কোথায়?

আমি বললাম, যখন আমাদের দেশে যাবে তখন দেখাব, হিমালয়ের বুকের শহর। কোথায় লাগে ইয়োরোপের আল্পস তার কাছে।

লারার চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল। বলল, সত্যি নিয়ে যাবে?

বললাম, তুমি তো যাচ্ছই।

লারা হাঁসীর মতো হিস্-স্-স্-স্ করে উঠল।

বলল, বিশ্বাস হয় না।

রাত নটা নাগাদ হাউসবোট এসে পাড়ে ভিড়ল। আমরা নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলের দিকে এলাম। তারপর হোটেল থেকে মাইল খানেক আগে নেমে পড়লাম, হাঁটবার জন্যে।

এখন দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে বেশির ভাগ। সমুদ্র থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছে। এদিকে ঢেউ ভাঙার শব্দ পাওয়া যায় না একেবারেই সমুদ্রকে বালিতে ভরে দিয়েছে বলে।

আমরা দুজনে হাতে হাত ধরে হেঁটে আসছিলাম হোটেলের দিকে। আমি যে কী খুশি ছিলাম কী বলব। মানুষ শারীরিকভাবে সুখী হলে যে মানসিকভাবেও কতখানি সুখী হয় তা আমি আগে জানতাম না। মানুষের শরীর মন বোধহয় অবিচ্ছেদ্য। একটার সুখ অসুখের সঙ্গে অন্যটার সুখ অসুখ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

হোটেলে ঢুকতেই মনে হল একটা ছমছমে ভাব। লাউঞ্জে বিশেষ লোকজন নেই। রিসেপশান ডেস্কের কাছে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন রঙিন হাওয়াইন শার্ট আর ট্রাউজার পরে।

আমাদের ঢুকতে দেখেই ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন—রিসেপশানিস্টের কাছ থেকে আমাদের পরিচয় পেয়ে। তারপর আমাদের কাছে এসে আইডিন্টিটি কার্ড বের করে দেখালেন। ইউ-এস-এর এফ-বি-আই-এর লোক ওঁরা।

ওঁরা বললেন যে, আপনাদের একটু যেতে হবে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।

আমি বললাম, আপনারা যে ভুয়া আইডিন্টিটি কার্ড নিয়ে আসেননি তার প্রমাণ?

ভদ্রলোক দুটি বললেন, কী প্রমাণ চান?

আমি বললাম, আমি ফোন করে জানব, তারপর যাব।

ওঁদের মধ্যে যে ভদ্রলোকের বয়স বেশি, তিনি কাঁধ শ্রাগ করে বললেন, ফেয়ার এনাফ্।

ওঁরা নম্বর বললেন একটা। কিন্তু তবুও আমি রিসেপশানে গিয়ে টেলিফোন ডিরেক্টরি চেয়ে নিয়ে ফোন নাম্বার বের করে টেলিফোন করলাম। যিনি লোকাল এফ-বি-আই-র বস তাঁর বাড়িতে। তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাঁকে মিস্টার ম্যাক্স গিলিগান বলেই উল্লেখ করছি।

মিস্টার গিলিগানকে আমি ওঁদের আইডেন্টিটি কার্ড দুটো দেখে নাম ও নম্বর বললাম। চেহারার বর্ণনা দিলাম।

উনি বললেন, ইয়া! বোথ অফ দেম আর ভেরি মাচ উইথ আস।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য।

www.BanglaBook.org

ম্যাক্সের বাড়ির নাম্বারটা মনে মনে মুখস্থ করে নিলাম।

আমাদের দুজনকে গাড়িতে বসিয়ে ওঁরা লোকাল পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেলেন। একটা ছোট ঘরে আমাদের বসতে বলে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন।

আমি লারাকে বললাম, ওঁরা কি তোমার সম্বন্ধে জানতে পেরেছে?

লারা মুখে আঙুল দিয়ে ইসারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বলল।

বুঝতে পারলাম, হয়ত এ ঘরে টেপ রেকর্ডার আছে অথবা টি-ভির ক্যামেরা আছে।

যে টেবলের সামনে আমরা বসেছিলাম, সেই টেবলের উপর সেদিনকার খবরের কাগজটা পড়েছিল। লোকাল কাগজ। সময় কাটাবার জন্য আমি কাগজটা তুলে নিলাম। কাগজটা তুলে নিতেই আমার চোখের মণি স্থির হয়ে গেল। প্রথম পাতার মাঝামাঝি জায়গায় বাঁদিকে বড় বড় হেডলাইনের খবর : 'মার্ডার অন দ্য বীচ'। তার নীচেই কেনেথের ছবি। যে-টাইটা পরে ও আমার কাছে এসেছিল সেই টাইটাই তখনও গলায় ছিল। সেই জামা, সেই স্যুট। নিশ্চয়ই কেনেথ।

সন্দেহের অবকাশও ছিল না। খবরে লেখা ছিল যে, কেনেথ হচনার নামের এক ভদ্রলোক, তাঁর বাড়ি ম্যাসাচুসেটস-এ, কর্মস্থল টোরোন্টো, কাল সকালের ফ্লাইটেই লস এঞ্জেলস্ থেকে এসেছিলেন হনলুলুতে। বোধহয় আলোহা প্যারেড দেখতে। কোনও দুর্বোধ্য কারণে তিনি ওয়াইকিকির একটা হোটেলে বেনামে উঠেছিলেন। সন্ধেবেলায় তিনি বীচ-এ হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় কে বা কারা তাঁকে সাইলেন্সার বসানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে। একটিই গুলি : হার্টে। করোনার বলেছেন, পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়। আততায়ী ধরা পড়েনি।

লারা আমার দিকে তাকিয়েছিল।

ও আমাকে বলল, হঠাৎ এত মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়তে শুরু করলে? তারপরই বলল, আজ তো কাগজ আমার দেখাই হয়নি।

বলল বটে, তবে ও ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কোথায় যেন চলে গেছিল লারা।

আমি কথা না বলে কাগজটা লারার দিকে এগিয়ে দিলাম।

কাগজটা দেখেই লারা, ওঃ মাই গড! বলে মুখ ঢেকে ফেলল দুহাতে। তারপর মুখ ঢেকেই রইল।

এমন সময় দরজা খুলে একজন সৌম্যদর্শন, হ্যান্ডসাম ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি কোনও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

উনি বললেন, কেনেথ হচনারকে আপনারা কি চিনতেন?

লারা তাড়াতাড়ি বলল, আমাকে দেখিয়ে যে, ও কিছু জানে না, চিনতও না কেনেথকে। আমিই চিনতাম। ভালভাবেই চিনতাম।

ভদ্রলোক লারাকে তারপর খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম লারাকে। একটুও উত্তেজিত না হয়ে, না ঘাবড়ে গিয়ে ও কীভাবে নিজের বিষয়ে বলছিল ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক আমাকে বাইরে যেতে বলে লারাকে আরও অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আমাকে ডেকে কেনেথকে আমি যে এক ঝলক দেখেছিলাম সেই দেখা সম্বন্ধে যা জানার তা জানলেন। তারপর কেনেথের যে ছবিটা কাগজে ছাপা হয়েছে তার ওরিজিনাল দেখিয়ে আমাকে বললেন, এই লোকই তাহলে আপনার ঘরে লারার খোঁজে গেছিলেন? কেনেথ হচনারকে আপনি সনাক্ত করছেন তাহলে!

আমি বললাম, কেনেথকে আমি চিনি না। তবে ছবিটি এ লোকেরই।

একটু পর আমাদের ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউই যদি শহর ছেড়ে যান তা হলে আমাদের জানিয়ে যাবেন। আপাতত কিছুই করার নেই।

লারা বলল, কেনেথের বেরিয়াল কোথায় হবে? আমি কি ওকে দেখতে পাব না একটুও?

ভদ্রলোক বললেন, ওঁর বাবার রিকোয়েস্টে ওঁর বডি ম্যাসাচুসেটস-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিকেলের প্লেনে চলে গেছে বডি।

লারা এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

www.BanglaBook.org

একটু হেঁটে গিয়েই আমরা একটা ক্যাব পেলাম। ট্যাক্সিতে উঠেই লারা নিঃশব্দে কাঁদতে আরম্ভ করল। ওর চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছিল—দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়েছিল ও। ট্যাক্সিতে আমার সঙ্গে ও কোনও কথাই বলল না, বোধহয় ড্রাইভারের সামনে বলবে না বলেই।

হেটেলের কাছাকাছি আসার আগেই ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে নিজেকে সংযত করল ও। মুখে পাউডার মাখল। যখন হলিডে ইন-এ নামলাম আমরা ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। লাউঞ্জে ঢুকতেই একজন লোক আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে বাইরে গেল। লারা পিছন ফিরে লোকটাকে দেখল অনেকক্ষণ।

লিফট-এ করে লারার ঘরে এসে পৌঁছতেই লারা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু একবারই। তারপরই সামলে নিল নিজেকে। আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম না। পশ্চিমি দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের অনেক ছেলেদের চেয়েও শক্ত হয় যে, তা নিজের চোখেই দেখলাম। একটু পর ও নিজেই সামলে নিল নিজেকে।

লারা আমার হাত ধরে বলল, ভিক্ত! কোনওক্রমে আমাকে উদ্ধার করো ড্যানাবের হাত থেকে। গতকাল কেনেথকে মারল, আগামীকাল আমাকেও যে মারবে না তার কী গ্যারান্টি আছে? এসব লোক বিপদে পড়লে কোনও কিছু করতেই দেরি করে না।

আমি বললাম, তুমি জানলে কী করে যে কেনেথকে মেরেছে ড্যানারই। তোমার সব জানাশোনা লোকেরাই আমার কাছে হেঁয়ালি। ড্যানার কেনেথকে মারবে কেন? কীসের ইন্টারেস্টে?

ও ছাড়া কে মারবে? ও নিজে হাতে মারে না। ওর লোক আছে। লারার চোখ দুটি ভয়ে ও হতাশায় মাখামাখি হয়ে কোনও গৃহপালিত পরনির্ভর ভাষাহীন প্রাণীর মতো হয়ে গেছিল।

লারার জন্যে, লারাকে আমার বুকে নিয়ে, আমার বড়ই কষ্ট হল।

ম্যাক্স গিলিগান

কাল লারার ঘরে আমি শুইনি। লারাই বারণ করেছিল। অথচ ওর ওইরকম মানসিক অবস্থাতে ওর সঙ্গে থাকা আমার উচিত ছিল।

সারা রাত ঘুম হয়নি। ড্যানার, ড্যামার ইনটিগ্রেটেড ইন্টারন্যাশনাল। ডি-আই-আই! এই নামগুলো মাথায় ঘুরছে কেবল। লোকটার চেহারাই খুনি খুনি। কিন্তু এরকম খুনি চেহারার রহস্যময় চরিত্রের লোকের সঙ্গে ফুলের মতো ফুলওয়ালি মেয়ের আলাপ কী করে হল এবং ওদের সম্পর্কটাই বা কী তা আমার মাথায় এল না। অথচ, লারা প্রায় প্রাঞ্জলভাবেই বলছে ড্যানারই মেরেছে কেনেথকে। যদি তা জানেই লারা তবে ও পুলিশে খবর দিচ্ছে না কেন?

চান-টান করে তৈরি হয়ে নিলাম আমি। ঠিক করলাম আজ একা-একাই বেড়াব। পরশু আমার চলে যাওয়ার দিন। মধ্যে মাত্র একটা দিন কাল। ভাল করে ঘুরে ফিরে নিই। এ-জীবনে আবার কখনও হনলুলুতে ফেরা হবে কি না জানি না।

জামা-কাপড় পরে ফেলেছি, বেরোব, এমন সময় লারা এসে উপস্থিত।

দরজা খুলতেই বলল, কোথায় চললে তুমি?

আমি বললাম, পুলিশে খবর দেব অথবা এফ বি-আইকে।

লারার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল।

ও বলল, কী খবর?

আমি বললাম, ড্যানারের খবর। কেনেথের হত্যাকারী বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-কথা বলব ওদের।

লারা আমাকে ধমকে বলল, ডোন্ট বি সিলী! তুমি এসবের মধ্যে জড়িও না নিজেকে।

আমি বললাম, তোমার সঙ্গে ড্যানারের সম্পর্ক কী?

লারা আমার দিকে অবাক চোখে চেয়েছিল। এমন চোখে আগে কখনও তাকায়নি ও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও বলল, তোমার তা জেনে লাভ কী ?

আমি বললাম, এত কিছু ঘটার পর আমার জানা দরকার। কারণ আমি তো জড়িয়েই পড়ছি তোমার ব্যাপারে।

লারা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বলল, সম্পর্কটা কী তা বললে তুমি আমাকে ঘেন্না করবে। আর আমাকে ভালবাসতে পারবে না।

আমি বললাম, জীবনের কোনও লজ্জা বা গ্লানির কথা লুকিয়ে রেখে যে-ভালবাসা পাওয়া যায় তা কি থাকে ?

লারা বলল, একথা ঠিক। থাকে না। তবু, ক্ষণিকের ভালবাসারও কি কোনও দাম নেই ?

আমি বললাম, কথা ঘুরিয়ো না, বলো।

ও একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, আমি ড্যানারের রক্ষিতা ছিলাম। অনেকদিন। ও আমার সৎ বাবার বন্ধু। আমাকে দশ বছর বয়স থেকে জানত। জীবনে ওই প্রথম পুরুষ আমার। টাকার বিনিময়ে এখনও সেই সম্পর্কই রাখতে চায়। আমি যে ফুল বিক্রি করে, কষ্ট করে নিজের পড়াশুনা চালাই, ভবিষ্যৎ স্থির করি তা ওর ইচ্ছে নয়। আমাকে ওর রক্ষিতা করেই রাখতে চায় চিরদিন। এখানে আসার আগে ওকে না জানালেই ভাল হত যে আসছি। আমি ভেবেছিলাম, বড়লোক ড্যানার আমার ও কেনেথের অনেক উপকারে আসবে। আমার সৎ বাবার বন্ধু হিসেবে কেনেথের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিতাম ওর। গাড়ি, নৌকো, বেড়ানো-টেড়ানো সবই চলতে পারত ওর ঘাড়ে। আফটার অল, একসময়ের শয্যাসঙ্গিনী—কিছু দুর্বলতা তো থাকতই আমার প্রতি।

আমি বললাম, কেনেথ যদি তোমাদের সম্পর্ক জেনে ফেলত ?

লারা হাসল। বলল, কেনেথ জানত। ওকে সবই বলেছিলাম। জানলেই বা কী ? ও-ও তো আর ধোওয়া বাইবেল ছিল না। নাথিং লাইক গুড মিডিং অ্যান্ড গুড লাইফ। বুড়ো ড্যানারের ঘাড়ে আমাদের ছুটিটা পরম উপভোগ্য হত। অনেক মেয়েরই মানি ইজ দ্যা ফাস্ট হাজব্যান্ড। টাকার চেয়ে বড় আধুনিক মানুষের জীবনে আর কী আছে ? কিন্তু দ্যাখো, লোকটা কী সাংঘাতিক। আমার বয়-ফ্রেন্ডকেও সহ্য করতে পারল না। কেনেথ আসতে না আসতেই কেনেথকে মেরে ফেলল।

আমি বললাম, এখন তোমার বয়-ফ্রেন্ড তো আমি। এবার আমার পালা বলো।

লারা বলল, তোমাকে এ-জন্যেই তো চলে যেতে বলছি।

আমি সেই কথার পিঠে বললাম, তুমি যদি ড্যানারের ব্যাপারে নিশ্চিতই, তবে পুলিশ বা এফ-বি-আইকে বলছ না কেন ?

লারা বলল, বলে লাভ ? সব জায়গায় ড্যানারের লোক আছে। টাকা ছড়িয়ে রেখেছে সে সব পকেটে। মাঝখান থেকে আমার আরও বিপদ হবে—কারণ ও জানতে পারবেই।

তারপরই লারা বলল, এবার আমি যাই। তুমি এসব ব্যাপারে মাথা গলিয়ো না। তোমারই বিপদ হবে।

আমি বললাম, চললে কোথায় ?

ও বলল, কেনেথের এক কাজিন থাকে এখানে। নেভিতে কাজ করে। ওর কাছে যাব। পার্ল হারবারে। কেনেথের সম্বন্ধে সব জানতে।

ওঃ ! আমি বললাম।

লারা চলে গেল আমার ঘর ছেড়ে। আমি ব্রেকফাস্ট করার জন্যে বেরোবার আগে সারাটা দিন কীভাবে কাটানো যায়, তাই-ই মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিলাম। এমন সময় লারা আবার আমার ঘরে ঢুকল। দরজা লক করা ছিল না। এসেই বলল, তোমাকে একটু বিরক্ত করছি। এই প্যাকেটটা তোমার কাছে রাখো। এতে কতগুলো দলিল আছে। মোলোকাইতে আমি একটা জমি কিনছি—তার দলিলপত্র। আমার সলিসিটরকে দেখাতে হবে। ওখানেই থাকব ভাবছি এরপর। কানাডার ঠাণ্ডা আমার সহ্য হবে না। এই জমি কেনার ব্যাপারেও ড্যানারের কাছে আমার হাত পাতার ছিল। কিন্তু সে যে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ তা কি আগে জানতাম ? আমি হোটেলে না থাকলে

www.BanglaBook.org

আমার ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দেওয়াও ড্যানারের লোকেদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কাল থেকে আমার ভীষণ ভয় করছে। এই প্যাকেটটা তোমার কাছেই থাক। তুমি যখন পরশু চলে যাবে, নিয়ে যেয়ো। আমার সলিসিটরস লোক পাঠিয়ে তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন ন্যু-ইয়র্কে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমার সলিসিটরসদের কোনও লোক নেই হাওয়াইতে ?

লারা বেশ বিরক্ত গলায় বলল, থাকলে আর তোমাকে কষ্ট দেব কেন ?

তারপর বলল, এটা তুমি এখুনি তোমার স্যুটকেসে চাবি-বন্ধ করে রাখো। হারিয়ো না।

আমি হাসলাম। বললাম, তথাস্তু।

লারা বলল, তুমি ন্যু-ইয়র্কে তোমার ফ্ল্যাটে পৌঁছবার আধঘণ্টার মধ্যেই সলিসিটরের লোক ওটা নিয়ে যাবে। তোমার কোনও চিন্তা নেই।

—আমার কোনওই চিন্তা নেই। আমি বললাম।

লারা চলে গেলে আমি উঠে প্যাকেটটাকে স্যুটকেসে ভরে রাখলাম। প্যাকেটটা বেশি ভারী নয়। চারকোনা একটা বাক্সর মতো। দলিল দস্তাবেজ লম্বাই হয়। নয়ত মোড়কের মতো মোড়া থাকে। এ-দেশের ব্যাপার আলাদা। হয়তো ফোটোস্টাট করা আছে।

লিফট নিয়ে লাউঞ্জে এলাম। এ কদিন প্রায় সর্বক্ষণ লারার সঙ্গে থেকে হঠাৎ একলা পড়ে যাওয়ায় খারাপ লাগতে লাগল। লাউঞ্জেই বসে রইলাম আমি। বসে বসে বইটা পড়তে লাগলাম। এমন সময় রিসেপশানের একটি মেয়ে, পেজ-বয়কে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল। রিসেপশানে গিয়ে পৌঁছতেই মেয়েটি বলল, কল ফর উ্য স্যার।

ফোনটা তুলে নিতেই ওপাশ থেকে লারা বলল, হাই ! হিউ। আই ফীল ব্যাড ফর উ্য ! তুমি একা আছ ! কী করব বলো ? না এসে উপায় ছিল না। আজ সন্ধেবেলায় আমরা খুব মজা করব। উই উইল বীট ইট আপ। আমার দুঃখ মাই-টাইতে ডুবিয়ে দেব।

আমি বললাম, তুমি কখন ফিরবে ? লাঞ্চ খাবে আমরা একসঙ্গে ?

ও বলল, আমার জন্যে বসে থেকো না। তুমি খেয়ে নিয়ো।

আচ্ছা। আমি বললাম।

ফোনটা ছাড়ার আগে ও বলল, দলিলের প্যাকেটটা স্যুটকেসে রেখেছ তো ?

আমি অবাক হলাম। বললাম, হ্যাঁ।

ও বলল, বাই।

বলেই, ফোনটা ছেড়ে দিল।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পিছন ফিরেছি এমন সময় মেয়েটি আবার ডাকল আমাকে। বলল, ইয়েট অ্যানাদার কল।

আমি আবার গিয়ে রিসিভার নিলাম।

ওপাশ থেকে একটি চেনা চেনা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল। মর্নিং মিস্টার বোস।

বললাম, গুড মর্নিং টু উ্য। আপনি কে ?

ওপাশ থেকে ভদ্রলোক বললেন, ম্যাক্স। ম্যাক্স গিলিগান।

ম্যাক্স ! আমি এক মুহূর্ত ভাবতেই মনে পড়ল। সেদিন রাতে এফ-বি-আইয়ের বড় সাহেবকে ফোন করেছিলাম এখান থেকে। তার আসল নাম বলা যাচ্ছে না। ম্যাক্সই বলছি।

আমি বললাম, কী ব্যাপার ?

ম্যাক্স বলল, হাউ বাউট হ্যাভিং লাঞ্চ উইথ মি ! আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাও আজকে খুশি হব। তুমিও খুশি হবে।

অন্য সময় হলে আমি রাজি হতাম না। কিন্তু এই রহস্যের পর রহস্য আমাকে ড্যানার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। লারার জন্যে চিন্তান্বিত।

আমি বললাম, আমাকে হঠাৎ লাঞ্চে ডাকছেন কেন ? আমাকে তো আপনি প্রায় চেনেনই না।

ওপাশ থেকে বলল ম্যাক্স, চিনি, চিনব না কেন ? তবে আমার স্বার্থ আছে বলেই ডাকছি। হয়তো

www.BanglaBook.org

তোমার স্বার্থেও ভাবছি।

তারপরই বলল, চলে এসো। ক্যাব নিয়ে চলে এসো, বলেই ঠিকানা বলল। তারপর বলল, এসো, আমরা পাম গাছের নীচে বসে বিয়ার খাব, গল্প করব। তোমার ভালই হবে এলে। চলে এসো।

ভাল করছি না মন্দ বুঝতে না পেরে আমি বেরিয়ে পড়লাম। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে গেলাম।

বাড়িটা বাংলো ধরনের, মনে হল এটা একটা অফিসও। ছোট্ট—কিন্তু ভিতরে ঢুকেই দেখলাম সুন্দর সবুজ লন, বড় বড় পাম গাছ—সামনেই সমুদ্র। লনে সাদা ফার্নিচার পাতা—লাল নীল ছাতার নীচে। দুটো কালো কুচকুচে অ্যালসাসিয়ান কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে লনে। আমাকে দেখে যে ভদ্রলোক লনের অন্যপ্রান্ত থেকে এগিয়ে এলেন তাঁকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সেই অধ্যাপকের মতো দেখতে ভদ্রলোক—যিনি সেদিন রাতে আমাকে আর লারাকে জেরা করেছিলেন পুলিশ স্টেশনে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। উনি বললেন, হ্যাঁ। আমিই সেই লোক। আমাকেই তুমি ফোন করেছিলে। পুলিশ স্টেশনেও দেখেছিলে।

আমি বসতেই বাটলার কান বিয়ার দিয়ে গেল, সঙ্গে সসেজ ও পটাটো চিপস।

জিগ্যেস করলাম, আপনি খাবেন না?

ম্যাক্স বলল, আমিও খাব।

বসেই আমি বললাম, আমাকে ডেকেছেন কেন?

ম্যাক্স বলল, বলব, বলব। রিল্যাক্স, মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান। রিল্যাক্স করো এবং আমাকে তোমার বন্ধু ভাবো।

তারপর বিয়ারে এক চুমুক দিয়ে বলল, লারাকে তুমি কতখানি চেনো? ও কি তোমার ফিয়াসে?

বলেই বলল, অত্যন্ত পার্সোন্যাল প্রশ্ন—কিন্তু তুমি সত্যিকথা বললে আমার পক্ষেও তোমাকে সত্যিকথা বলা সহজ হবে।

আমি বললাম, ফিয়াসে নয়, তবে আমরা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছি। এখানে এসেই। তার আগেই আলাপ হয়েছিল মনট্রিয়ালের একটি রাস্তায় রাতে ও ফুল বিক্রি করতে এসেছিল সেখানে। তার পরেও দেখা হয়েছে দু একবার।

ম্যাক্স বলল, তার আগে তুমি চিনতে না লারাকে?

না! আমি বললাম।

তারপর বললাম, আমি ন্যু-ইয়র্কে থাকি—পড়ি···।

ম্যাক্স বলল, তোমার সব খবর আমি রাখি। বলেই আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা, ইউনিভার্সিটির হদিস, এমনকী আমার দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নামও বলল ম্যাক্স।

তারপর বলল, আমাদের কাজই হচ্ছে খবর রাখা। উই হ্যাভ ডাবল-চেকড অন উ। অ্যান্ড উ আর ক্লীন। উই নো দ্যাট।

আমি উদ্বেগের সঙ্গে বললাম, তবে লারা সম্বন্ধে কি তোমরা অন্যরকম ভাবছ? আসলে ও কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। ড্যানার বলে একটা লোকই কিন্তু কেনেথের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ড্যানার ইন্টিগ্রেটেড ইন্টারন্যাশনালের ডানার। লারা আগে ওর রক্ষিতা ছিল।

ম্যাক্সকে উৎসাহিত দেখাল। ও সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। বলল, ড্যানারকে তুমি মীট করেছ?

হ্যাঁ। আমি বললাম, লারার ঘরে। লোকটার চেহারাই খুনি খুনি। তোমরা খোঁজ করে দেখো, কেনেথ হচনারের মৃত্যুর পিছনে ওই ড্যানারই আছে।

ম্যাক্স বলল, তুমি এত জোরের সঙ্গে কী করে বলছ কথাটা?

লারার কাছ থেকে শুনে। আমি বললাম।

ম্যাক্স বলল, তোমার কাছে ড্যানারের ঠিকানা আছে?

www.BanglaBook.org

এই যে, বলে, সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঠিকানা ফোন নম্বর সব দিলাম।

ম্যাক্সের পকেটেই লম্বা তার লাগানো ফোন ছিল। একটা সাদা একটা লাল।

লাল ফোনটা তুলে ম্যাক্স কাকে যেন বলল, মারিয়ান, চেক অন দিস জেন্টেলম্যান এন্ড সেট মি নো ইমিডিয়েটলি।

ম্যাক্সকে চিন্তান্বিত দেখাল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ফোনটা বাজল। ড্যানারের ইউ-এস-এ এবং ইয়োরোপে কোথায় কোথায় ব্যবসা আছে তা সব জানিয়ে দিল ম্যাক্সকে কে যেন।

ম্যাক্স বলল, ড্যানারের নানারকম ব্যবসা আছে, প্রথেল-কীপারও সে। নানা আন্ডার-ডেভালাপড দেশ থেকে মেয়ে আনে ও। ভারত, থাইল্যান্ড, নেপাল, আফ্রিকার নানা দেশ। স্মাগলিংও করে নানা জিনিসের।

তারপরই বলল, লারা কি কল গার্ল?

আমি বললাম, ছিঃ ছিঃ, না-না। তবে ওর প্রথম যৌবনে ও ড্যানারের রক্ষিতা ছিল। ড্যানারই ওর জীবনের প্রথম পুরুষ।

তারপর বললাম, এত সব গর্হিত কাজ করে তাহলেও ড্যানারকে ধরছ না কেন?

ম্যাক্স বলল, লাইসেন্সওয়ালা মেয়েরা ওর প্রথেলে থাকে। এদেশে এটা বে-আইনি নয়। স্মাগলিং-এর প্রমাণ হাতে-নাতে পেলে ধরব।

তারপর একটু থেমে ম্যাক্স বলল, মিস্টার বোস, আপাতত আমরা কেনেথ হচনারের মৃত্যু নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। হত্যাকারীকে ধরবার জন্যেই প্রথমে চেষ্টা করতে হবে।

আমি বললাম, আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে?

ম্যাক্স বলল, কিছু না, কিছু না। যা যা বললে এখনই যথেষ্ট সাহায্য হবে। ড্যানারের পিছনে লোক লাগাচ্ছি আমরা। তোমার এবং লারার কথাও সত্যি হতে পারে। ড্যানার মারতেও পারে কেনেথকে। কিন্তু আমাদের তো প্রমাণ চাই। সন্দেহের বশে তো আর কোনও কেস টিকবে না। সন্দেহটাকে প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে।

বলেই বলল, লারা আর কেনেথের সম্পর্ক সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জানো?

আমি যা জানি, বললাম। তারপর এও বললাম যে, কেনেথ একদিন ফোন করেছিল লারাকে আমার ঘরে—ওর আসবার কথা ছিল এখানে।

ম্যাক্স সোজা হয়ে বসল। বলল, ফোন করেছিল? তুমি কেনেথের গলা শুনেছিলে?

হ্যাঁ। আমি অবাক হয়ে বললাম।

তারপর বললাম, ফোনে কথা বললাম আর গলা শুনব না?

ম্যাক্স বলল, জাস্ট এ সেকেন্ড প্লিজ। বলেই সাদা ফোনটা তুলে নিয়ে কাকে যেন কী বলল।

দু মিনিটের মধ্যে একজন ছাই-রঙা স্যুট পরা লোক একটা ক্যাসেট টেপ-রেকর্ডার নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল। রেখেই চলে গেল।

ম্যাক্স চাবি টিপে টেপ-রেকর্ডারটাকে বাজাল। একজন লোক কথা বলছিল একটি মেয়ের সঙ্গে। কোনও বার বা রেস্টুরেন্টে টেপ করা হয়েছে কণ্ঠস্বর।

ম্যাক্স বলল, ভাল করে শোনো তো! এই ভদ্রলোকের গলার সঙ্গে কেনেথ হচনারের গলার কোনও মিল আছে?

একটুক্ষণই গলা শুনেছিলাম আমি কেনেথের—ভাল বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে হল এ অন্য লোকের গলা।

ম্যাক্স আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে।

চটপট বন্ধ করে বলল, কী? কী মনে হল?

আমি বললাম, ভাল মনে নেই আমার কিন্তু এ যে অন্য লোকের গলা বলে মনে হচ্ছে।

ম্যাক্স তখনও আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। বলল, আবারও শোনো।

বলেই, আবার টেপটা চালিয়ে দিল।

www.BanglaBook.org

মেয়েটা আর ছেলেটা আবার কথা শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে শুনলাম এবারে। কিন্তু মনে হল না যে, এই গলাটার সঙ্গে কেনেথের যে গলা শুনেছিলাম তার খুব মিল আছে বলে।

ম্যাক্সকে সেকথা বললাম।

ম্যাক্স বলল, এক লোকের গলাও তো অন্যরকম শোনায় বিভিন্ন সময়ে। তা ছাড়া তুমি একটু শুনেছ। তোমার পক্ষে বোঝা মুশকিলও।

আরও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর আমরা পলিনেশিয়ানে খাবার খেলাম।

ম্যাক্স বলল, আমার স্ত্রী থাকলে তোমাকে বিরিয়ানি পোলাউ খাওয়াতাম। আমরা দু বছর যে দিল্লিতে ছিলাম।

তাই বুঝি ? অবাক হলাম আমি।

ম্যাক্স বলল, আই হ্যাভ গ্রেট রেসপেক্ট ফর ইন্ডিয়ানস। তোমরা বড় সাদা—সরল অতিথিপরায়ণ লোক—ইন্ডিয়াতে ক্রাইমও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক উ।

তারপর ম্যাক্স আমাকে অনেকবার ধন্যবাদ দিল। এবং নিজের শোফার ড্রিভন সাদা স্পোর্টস মডেল জাগুয়ার গাড়ির দরজা খুলে আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিল।

গাড়িতে হলিডে ইন-এ ফিরে আসতে আসতে আমি ভাবছিলাম যে, ম্যাক্স আমাকে একবারও বারণ করল না লারাকে জানাতে যে, আমি এখানে এসেছিলাম। লারার প্রতি কোনও সন্দেহ থাকলে তা নিশ্চয়ই করত। লারাকে সন্দেহ করবেই বা কেন ? ভাবলাম আমি। আহা এমন সুন্দরী নরম নেনে পাখির মতো মেয়ে, সে কি কোনও অন্যায় করতে পারে ? কেনেথের মৃত্যুতে বেচারি ভেঙে পড়েছে একেবারে।

রৌদ্রালোকিত পথে গাড়িতে যেতে যেতে রাতের স্বপ্নালোকিত আলোয় বিছানার উপর লারার নগ্ন নিভৃত স্বপ্নময় শরীরটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই বলেছিল বিয়ের পর পর কয়েকমাস ও-ও এমনি করে দিনদুপুরে ওর নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে দেখতে পেত। ভাই ডাক্তার ছিল। ও বলত, ওই সময় যে কত ভুল চিকিৎসাই না করেছি কত লোকের কী বলব।

বিয়ারটা একটু বেশিই খেয়েছিলাম। জামাকাপড় ছেড়ে লম্বা ঘুম লাগালাম। ঘুম ভাঙল দরজার বেল বাজায়।

দরজা খুলতেই দেখি লারা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই দুহাত বাড়িয়ে এসে আমাকে চুমু খেল ও।

আমি বললাম, চা আনাই।

ও বলল, চা না কফি। বিয়াল স্ট্রং ব্লাক কফি।

রুম সার্ভিসে কফির অর্ডার করে আমি ওকে বললাম ম্যাক্সের কথা। ওখানে যাওয়ার কথা। লারার চোখ দুটি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আমার জন্যে।

বলল, তুমি করেছ কী ? তুমি জানো যে যেই-ই কেনেথকে মেরে থাকুক, তার লোক আমাদের নজর রাখছে, জানারের লোক তো রাখছেই। তারা তোমাকে কিছু বোঝার আগেই শেষ করে দেবে। তুমি জানো না তুমি কী ভুল করেছ। এখন আমার চেয়ে তোমার বিপদ বেশি।

আমি বললাম, আমার কীসের বিপদ ?

লারা বলল, তুমি এইসব আন্ডার ওয়ার্ল্ড-এর লোকদের জানো না। এরা সাংঘাতিক।

লারাকে খুবই চিন্তান্বিত দেখাল।

আমি ভাবলাম যে আমি ফিরে যাই ন্যু-ইয়র্কে। মিছিমিছি কী সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছি। কিন্তু লারা। লারার সুন্দর শরীর। শরীরের মধ্যের কত সব লুকোনো জাদু, ছলাকলা। আমার নেশা লেগে গেছে। মৃত্যুর নেশাও বুঝি এরকম। নিশির ডাকের মতো লারার শরীর সবসময় আমাকে হাতছানি দেয়।

নারী-শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমি শরীরী জগতে প্রবেশ করলাম এমনই একজন নমনীয়

www.BanglaBook.org

পেলব রঙ্গিনী নারীর হাতে ধরে যে, মনে হচ্ছে সারা জীবনের মতো এই জগতেই বুঝি বন্দি হয়ে থাকব। এই গোলকধাঁধা থেকে আমার বুঝি মুক্তি নেই। পরন্তু যেতে তো হবেই। কিন্তু আজ ও কাল এই দুটি দিন ও রাতের বিনিময়ে যে কোনও দামই দিতে রাজি আমি।

লারা আমাকে বলল, তুমি আজই চলে যাও। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো। সানফ্রানসিস্কো বা লস-এঞ্জেলেস হয়ে অনেক ফ্লাইট আছে ন্যু ইয়র্কের। দেরি কোরো না তুমি। দেরি করলে মরবে।

আমি ওকে দু হাতে জড়িয়ে বললাম, আমাকে এই দু দিন দু রাত তোমার কাছে থাকতে দাও। তাতে যদি মরতে হয় তাহলে মরব। এই আনন্দের জন্যে মরতে হলেও মরব।

লারা হঠাৎ বিড় বিড় করে বলল, উঃ সিলী সেন্টিমেন্টাল ফুল। তুমি জানো না যে, এখন আমার সঙ্গে শোওয়া মানে মৃত্যুর সঙ্গে শোওয়া।

আমি হেসে উঠলাম। কাব্য করে বললাম, তাই-ই! মৃত্যুকেই রমণ করব।

তারপর মনে মনে বললাম, লারার শরীরের নিবিড় আশ্লেষে প্রতিবারের উষ্ণ নিশ্বাসে মৃত্যুর জঘনে ওঠা নামা করব আমি।

লারা অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। ওর মুখটা ভাবলেশহীন।

ও বলল, মৃত্যুর মধ্যে কোনও উষ্ণতা নেই! মৃত্যু ব্যাঙের গায়ের মতো ঠাণ্ডা। মৃত্যুকে জানোনি তুমি। তাই ই এমন পাগলের মতো কথা বলছ।

আমি বললাম, কথা বাড়িয়ো না।

লারা বলল, তুমি যদি চলে নাই ই যাও তবে এখানে আমাদের একসঙ্গে থাকা অসম্ভব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তবে কোথায় যাবে?

পালাব। নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল লারা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি পালাবে কেন? তুমি কী করেছ? ড্যানারের ভার নিয়ে নিয়েছে ম্যাক্স। ড্যানার আর তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চিন্ত থেকো।

লারা বলল, তুমি কিছু চেনো না ড্যানারকে। তুমি চুপ করো। চলো আজ রাতেই চলে যাই আমরা।

আমি বললাম, বাঃ। থানায় না জানিয়ে যাবে কী করে? আমাদের না বলেছে শহর ছেড়ে গেলে জানিয়ে যেতে।

তুমি জানাও। আমি জানাব না। লারা বলল।

আমি লারাকে বললাম, জানো, ওরা আমাকে কেনেথের গলার টেপ বাজিয়ে শোনাল।

টেপ? কীসের টেপ? কেন?

গলাটা কেনেথের কি না জানার জন্যে।

লারা বলল, তুমি কী বললে?

বললাম, কেনেথের মতো মনে হচ্ছে না---মানে আমি যে কেনেথের গলা শুনেছিলাম।

লারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বলল, তার মানেই আমাকে এবং তোমাকে ওরা ড্যানারের সাগরেদ ভাবছে। তুমি জানো না তুমি কী ইডিয়টের মতো কাজ করেছ।

আমি ওর ভাষায় স্তম্ভিত ও দুঃখিত হলাম। মুখে কিছু বললাম না।

লারা বলল, চলো আমরা এই হোটেল থেকে পালাই।

কোথায় যাবে? আমি শুধোলাম। তারপর বললাম, তোমার সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্যই তো দেখায়নি ম্যাক্স। তুমি নিজেকে এত ইমপর্টান্ট ভাবছ কেন?

কাহালা হিলটনে যাব। হাইওয়ে আওয়ে কটেজে থাকব চুপচাপ। বেনামে। ওদিকটা একেবারে নির্জন। সমুদ্রের ধারে।

আমি বললাম, আমি বেনামে থাকতে যাব কেন? বেনামে কোথাও থাকাটাও তো বেআইনি।

লারা বলল, তাহলে আমি একাই যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকো—যখন খুশি চলে এসো আমার কাছে। কিন্তু কেউ যেন বুঝতে না পায়। যেন ওই হোটেলেই খেতে গেছ—এমনি ভাবে যাবে—ট্যাক্সি ঘুরিয়ে অন্য পথ দিয়ে—যাতে কেউই বুঝতে না পারে যে তুমি আমার কাছে আসছ।

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, যা ভাল মনে করো। আমি তো পরশু ভোরেই চলে যাচ্ছি। তোমার কী যে এমন অসুবিধা হত জানি না দুদিন এখানে থাকলে।

লারা বলল, আমি এই হোটেলের ঘরটাও রেখে দেব। যাতে আমি চলে গেছি এখান থেকে এমন সন্দেহ কেউ না করতে পারে। শুধু সুইটটা নিয়ে যাব কাগজে মুড়ে। তুমি আমার ঘরের বিছানাতে শুয়ে থেকো মাঝে মাঝে, যাতে হোটেলের হাউসকীপিং স্টাফেরা জানে যে, আমি এখানেই আছি।

আমি কোনও জবাব দিলাম না।

লারা বলল, আমি চললাম। আমার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে বোলো, জানো না। আমাকে ফোনও কোরো না। যদি আসতে চাও, তাহলে সোজা চলে এসো কাহালা হিলটনে রাতে। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।

বলেই, হঠাৎ উঠে পড়ে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে চুমু খেল আমাকে। পরক্ষণেই বলল, বাই!

দরজা অবধি ফিরে গিয়েই বলল, আমার প্যাকেটটা—প্যাকেটটা হারিয়ো না যেন। আমার সলিসিটরের নাম ফিনিগান ব্রাদার্স, ফিফথ অ্যাভিন্যুতে ওদের অফিস। ওদের লোকই আসবে।

লারা আদর বলল, আমার নতুন নাম জিনা ওয়াকার, সানফ্রানসিসকোর।

আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একটা সুন্দর উষ্ণ ছুটি ধীরে ধীরে কেমন ঠাণ্ডা, টেন্স, ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠছে।

লারা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসে থেকে পথে বেরোলাম। হলিডে ইন-এর দুটো দরজা। একটা ওয়াইকিকি বীচের দিকে—হোটেলের স্টেশনারি দোকানটার পাশ দিয়ে আর অন্যটা পাশের রাস্তায় পড়েছে। সেটাও গিয়ে মিশেছে ওয়াইকিকিতেই।

একবার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারে গেলাম। কিছুই ভাল লাগছিল না। রাত বাড়তেই লারার চুলের সুগন্ধ ওর শরীরের সাবানের গন্ধের সঙ্গে মিশে উত্তাল হাওয়ায় হাতছানি দিতে লাগল আমাকে। আমি এই প্রথম জানলাম, নারী, পুরুষের পক্ষে কত বড় বিপদের। নারীর নেশায় কীভাবে পুরুষ সর্বস্বান্ত হয়। আমার মন বলছিল লারার কাছে যাওয়ায় আমার বিপদ আছে। এমনিতেও হয়তো আছে। জানার এবং চেনা লোকজন চারপাশে। তবুও, সব জেনেও আমি নিজেকে বাগ মানাতে পারলাম না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারের সামনে থেকেই একটা ক্যাব নিয়ে বললাম, কাহালা হিলটন।

ট্যাক্সিটা মুহূর্তের মধ্যে ছুটে চলল কাহালার পথ ধরে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথ ঘাট ভিজে। ভেজা পথে পথের রঙিন আলোর প্রতিফলন পড়েছে। কাহালা হিলটনের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ একটা কালো ক্যাডিলাক লিমুজিন খুব জোরে আমার ট্যাক্সিকে ওভারটেক করে চলে গেল। যেন নাম্বার প্লেটটা চেনা মনে হল। কিন্তু ভাল করে দেখার আগেই গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাড়া মিটিয়ে বিশেপসানে গিয়ে জিনা ওয়াকারের খোঁজ করলাম। হাইড-আওয়ে কটেজগুলো কোথায় তা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে কটেজের নাম্বার বলে দিল।

হু হু করে হাওয়া আসছে সমুদ্র থেকে, পামগাছের পাতাগুলো হাত নাড়ছে পাগলের মতো। আরও নানারকম গাছ। এদিকটা কেমন ছায়া ছায়া, অন্ধকার-অন্ধকার। হনিমুনিং কাপলসরা, প্রেমিক-প্রেমিকারা এবং পরকীয়া প্রেমের অংশীদাররা বড় পছন্দ করে এই লুকিয়ে-থাকা কটেজগুলো। ওরা যেমন পরিবেশ চায়, তেমনই পরিবেশ।

লারার কটেজের কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখি লারা জল থেকে উঠে আসছে বিকিনি পরে। তারপর ওইখানেই দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। আমি কাছে যেতেই বলল, এসো, পাম গাছের অন্ধকারে বসি। কেউই আমাদের দেখতে পাবে না। বলেই, লারা টান টান হয়ে বালির মধ্যে শুয়ে পড়ল।

আজ ত্রয়োদশী কি চতুর্দশী। চাঁদের আলো পাতার ফাঁক-ফোক দিয়ে এসে নীচে পড়েছে। তবুও জায়গাটা অন্ধকার। সাদার ভেতর ঠোঁটে আমি জামাকাপড় পরেই নিচু হয়ে চুমু খেলাম।

লারা বলল, সুইটি পাই। তারপর বলল, খেয়ে এসেছ?

আমি বললাম, না। খাব না। আজ শুধু তোমাকে খাব।

www.BanglaBook.org

লারা চাপা হাসি হাসল। বলল, ক্যানিবাল্।

তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, এসো আমরা বালির বাড়ি-ঘর বানাই বালি খুঁড়ে।

আমাকেও খেলায় পেল। লারা যেন ছোট্ট মেয়ে হয়ে গেল। আমরা দুজনে মিলে বালি খুঁড়তে লাগলাম ঘনসন্নিবিষ্ট পাম গাছেদের মাঝের ছায়াচ্ছন্ন জায়গাতে। অনেকক্ষণ খোঁড়ার পর আমি বললাম, অনেক হয়েছে, আর কী হবে?

লারা বলল, প্রাসাদ বানাব। ছোট্ট বাড়িতে কি আমাদের দুজনকে কুলোবে? বলেই দ্বিগুণ জোরে বালি তুলতে লাগল।

আমি বললাম, করছ কী? আঙুল ব্যথা হয়ে গেল আমার।

ও বলল, হোক না কেন? আমি রাতে ব্যথা সারিয়ে দেব।

দেখতে দেখতে প্রায় দু ফিট মতো গর্ত হয়ে গেল একটা। অনেক বালি উঠল। আমরা দুজনে ঘর বাড়ি বানাতে লাগলাম। আমি একটা ও একটা।

লারা বলল, আমাদের আলাদা আলাদা বাড়ি—মধ্যে জল থাকবে আর তাতে ব্রিজ। পূর্ণিমা রাতে তুমি আমার বাড়ি আসবে, কেমন?

আমি হাসলাম। বললাম, বাবাঃ, এ যে শেষের কবিতা হয়ে গেল।

লারা বলল, সেটা কী?

আমি বললাম, আমাদের রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা। টেগোরের নাম শুনেছ?

না।

আমি বললাম, তোমাকে দেব বইটা। কৃষ্ণ কৃপালনীর ইংরিজি ট্রান্সলেশান আছে, "এ্যাডিউ মাই ফ্রেন্ড"। বলেই, আমি বাংলায় আবৃত্তি করলাম, "মোর তরে যদি কেউ প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে।" তারপর ইংরিজিতে তর্জমা করে শোনালাম লারাকে।

লারা বলল, গ্রেট।

এমন সময় স্যুট-পরা একজন লোককে দূরে হোটেলের মেইন ব্লকের দিক থেকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

লারা কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখেই সিঁটিয়ে গেল ভয়ে।

ও আমাকে বলল, তুমি এগিয়ে গিয়ে দেখো তো লোকটা কে? কী চায়?

আমিও যেন বীচে হেঁটে বেড়াচ্ছি এমনিভাবে ওইদিকে হেঁটে গেলাম। লোকটা সোজা ওই পামগাছের ছায়া ঘেরা জায়গাটার দিকেই আসছিল। আমার মুখোমুখি হতেই হঠাৎ লোকটাকে চিনতে পারলাম আমি।

আবছা চাঁদের আলোয়, সমুদ্রের গর্জনে, পামের পাতা কাঁপানো হাওয়ায় আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম।

লোকটা বলল, হাই! মিস্টার বোস।

আমি বললাম, হাই!

বলেই, বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সেই ছাইরঙা বিজনেস-স্যুট—কেনেথ হচনার।

লোকটা বলল, ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে কী করছিলে তুমি? লারা কোথায়?

আমি বললাম, আমার এক গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে বালির ঘর বানাচ্ছিলাম। লারার কথা জানি না। ও বোধহয় হলিডে ইন-এই থাকবে।

কেনেথ বলল, দ্যাটস ফাইন। আমি বরং হলিডে ইন-এই যাই।

তুমি এখানে কী করছিলে?

কনভাকটেড ট্যুরে এসেছিলাম নাচ দেখতে, ডিনার খেতে। বলেই, হাত তুলে বলল, সী উ্য এগেইন।

ও পিছন ফিরতে আমি বললাম, আমিই কি বললাম? বললাম, তুমি তো মরে গেছ!

কেনেথ হচনার মুখটা ঘোরাল। বলল, ইয়েস, অলমোস্ট। তারপর বলল, আ ক্যাট হ্যাজ নাইন

www.BanglaBook.org

নইভস।

বলেই আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

আমি লারার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে দেখলাম, লারা কী একটা জিনিস বালির গর্তের মধ্যে ফেলে বালি চাপা দিচ্ছে।

আমি পৌঁছতেই বলল, হাত লাগাও। এসো গর্ত বুজিয়ে দিয়ে ঘরে যাই আমরা।

আমি বললাম, তুমি গর্তের মধ্যে কী কিছু ফেললে ?

লারা অবাক হয়ে বলল, আমি ! কী ফেলব ? না তো ?

আমি তাকিয়ে দেখলাম লারার হ্যান্ডব্যাগটা পাশেই রাখা।

আমি বললাম, এই ব্যাগটা তো তোমার সঙ্গে ছিল না।

না। আমি ওইখানে ছায়ায় রেখে গেছিলাম লুকিয়ে। তুমি বোধহয় ব্যাগটাকেই নিতে দেখেছ আমায়।

আমি বললাম, হবে।

লারা বলল, লোকটা কে ?

আমি বললাম, কেনেথ। কেনেথ হচনার।

হোয়াট ! বলে লারা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আমাকে ধমকে উঠল।

তারপর বলল, আমাকে সত্যি কথা বলো। নইলে তোমাকেও সন্দেহ করব আমি।

আমি বললাম, সত্যিই বলছি। আমাকে আমার নাম ধরে ডাকল। তোমার কথা জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, তুমি হলিডে ইন-এই আছ। ও বলল, ও খেতে ও নাচ দেখতে এসেছিল। বীচে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে এদিকে চলে আসে।

লারা রাগে কাঁপছিল। বলল, ইউ ইন্ডিয়ানস। ইউ বিলিভ ইন রোপট্রিকস, স্নেক-চার্মিং অ্যান্ড ইন ঘোস্টস। ইউ আর ফানি, রিয়্যালি ফানি।

আমি বললাম, হবে। আমি কথা বললাম লোকটার সঙ্গে। চলো, আমরা তো ওই পথ দিয়েই কটেজে ফিরব। তোমাকে ওর জুতোর ছাপও দেখাব বালিতে।

লারা আমার সাহায্য ছাড়াই গর্তটা বালি দিয়ে বুজিয়ে দিল।

আমি বললাম, বাড়িগুলো গড়তে না গড়তেই ভাঙলে কেন ? গর্ত ভরাট করার তাড়া কী ছিল ?

লারা বলল, তা কেন ? কোনও লোক অন্ধকারে এর মধ্যে পড়ে পা মচকাক আর কী ?

আমরা ফিরে আসছিলাম। লারা আমার হাত ধরে আসছিল। কিন্তু ওর নিজের পায়ে যেন জোর ছিল না। আমার শরীরে ভর দিয়ে হাঁটছিল।

কেনেথের সঙ্গে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছিলাম, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি লারাকে জুতোর ছাপ দেখাতে নিচু হতেই দেখলাম কী যেন একটা পড়ে আছে সেখানে।

আমি সেটা তুলে নিতেই লারা আতঙ্কে অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, রুমালটায় কোনও পারফ্যুম আছে ?

আমি শুঁকে বললাম, আছে।

কী পারফ্যুম ? বলতে পারো ?

লারা জলজলে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল উত্তরের প্রতীক্ষায়।

আমি বললাম, পারি। ব্রুট।

লারা আবারও যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বলল, ব্রুট ! ব্রুট পারফ্যুমের গন্ধ ! এ তো কেনেথেরই রুমাল, কেনেথেরই পারফ্যুম।

পরক্ষণেই বলল, ঘরে চলো, তাড়াতাড়ি ঘরে চলো। ইট জাস্ট কান্ট বি। কেনেথ ইজ ডেড। ও মরে গেছে। মরে যাওয়া মানুষ কেমন করে, কেমন করে··· ?

আমরা কটেজে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এয়ার কন্ডিশানড কটেজ। ফ্রিজ খুলে আমি ওয়াইনের বোতল বের করলাম একটা। ফ্রেঞ্চ হোয়াইট ওয়াইন।

লারা সোফাতে বসে পড়ল বিকিনি পরেই। তারপর চোখ বন্ধ করে বালিশ টেনে নিল।

www.BanglaBook.org

আমি ওয়াইন ঢালতে ঢালতে বললাম, কী ব্যাপার বলো তো ? কেনেথ কি তা হলে সেদিন মারা যায়নি বাঁচে ? কেনেথের মতো দেখতে অন্য কোনও লোক কি মারা গেছিল তা হলে ?

লারা বলল, ইটস ফুলিশ। হতেই পারে না। আমি জানি যে কেনেথ মারা গেছে। আমি নিশ্চয়ই জানি। এবং জানি বলেই আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এর মাথামুণ্ডু।

আমি বললাম, লোকটাকে ডেকে আনব তোমার কাছে ? কথা বলবে তুমি ? কথা বলো তা হলে ? যে-লোক ভূতো পায়ে হাঁটে, রুমাল ফেলে দিয়ে যায় সে তো ভূত নয়।

ভূত নয়, তাই-ই বা বলি কী করে ? লারা স্বগতোক্তির মতো বলল।

তারপর বিছানার উপর সোজা হয়ে বসে বলল, হতে পারে না জিত, হতেই পারে না এ। আমি নিশ্চয়ই জানি যে কেনেথ মারা গেছে।

হাত বাড়িয়ে লারা ওয়াইনের গ্লাসটা নিল এবং এক চুমুকে শেষ করে ফেলল তা। আমাকে আবারও ঢেলে দিতে বলল। দেখতে দেখতে ও একাই বলতে গেলে পুরো বোতল শেষ করে ফেলল। ফ্রিজ থেকে আরও একটা বোতল বের করলাম।

লারার ততক্ষণে পুরো নেশা হয়ে গেছিল। আমাকে লাইটটা নিভিয়ে দিতে বলল।

লাইটটা নিভিয়ে দিতেই চাঁদের আলোয় ঘরে ভরে গেল। লারা শোওয়া অবস্থাতেই নিজেকে অনাবৃত করে ফেলল। তারপর জড়ানো গলায় আমাকে চেঁচিয়ে ডাকল। বলল, কাম, মেক লাভ টু মি। উই উইল ড্রাইভ অ্যাওয়ে কেনেথস ঘোস্ট টু নাইট। হোল্ড মি টাইট। প্লিজ হোল্ড মি টাইট !

কেনেথ হচনার

সারা রাত জিনা ওয়াকার ও লারা ডস-এর সঙ্গে কেনেথ হচনারের ভূত তাড়ালাম আমি। রাতভর আনন্দময় ক্লান্তির পর আমি যখন প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কাহালা হিলটনের হাইড-অ্যাওয়ে কটেজ থেকে বেরিয়ে হোটেলের পার্কিং লট-এ এসে একটা ট্যাক্সি নিলাম তখন ঘুম পাচ্ছিল।

গাড়ির পিছনের সীটে মাথা হাওয়া লাগছিল খুব। চোখের পাতা বুঝি বুঁজেই ফেলেছিলাম। এমন সময় ট্যাক্সিটা একটা মোড় ঘুরেই থেমে গেল।

রাস্তার ফুটপাথের এক কোণে একটা লোক সকালের খবরের কাগজে মুখ আড়াল করে আছে। ট্যাক্সি থামতেই, কেন থামল একথা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করার আগেই দেখি, কেনেথ হচনার খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সোজা হেঁটে এসে বাঁদিকের দরজা খুলে আমার পাশে বসে পড়ল।

বসেই বলল, গুড মর্নিং টু ইউ মিস্টার বোস।

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞেস না করে হচনারকেই জিজ্ঞেস করল, হোয়ার টু ?

হচনার বলল, বস-এর বাড়ি।

আমার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না যে হচনার ড্যানারের লোক। সেই কালো ক্যাডিলাক লিমুজিনের ড্রাইভারও ঠিক এমনিভাবে লারার কাছে ড্যানারকে বস বলে উল্লেখ করত।

আমি দরজার একদিকে সরে যেতেই হচনার তার কোটের নীচে বাঁ কাঁধের সঙ্গে ঝোলানো হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আমাকে দেখিয়ে বলল, ঝামেলা করবেন না। আপনাকে গরম গরম ব্রেকফাস্ট রোলস, চিকেন, ওমলেট উইথ ব্যাকন এবং মধু দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়াব বস-এর বাড়ি। পিস্তলের গুলির চেয়ে তো খেতে নিশ্চয়ই অনেক ভাল।

কেনেথ পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল। ব্রুট পারফ্যুমের গন্ধ পেলাম আমি।

ট্যাক্সিটা কিন্তু যে-বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সেটা ম্যাক্স-এর বাড়ি।

দরজায় হচনার আমাকে নিয়ে এসে দাঁড়াল। কলিং বেল টিপতেই ড্রেসিং গাউন পরে ম্যাক্স নিজে এসে দরজা খুলল। আমাকে দেখে যেন খুশিই হয়েছে বলে মনে হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচনার স্যালুট করে বলল, গুড মর্নিং স্যার। আমি ভদ্রলোককে গরম রোলস, চিকেন ওমলেট, ব্যাকন এবং মধু খাওয়ার বলে নিয়ে এসেছি ব্রেকফাস্টে। আমিও খাব। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ম্যাক্স আমাদের বসবার ঘরে বসতে বলে জামাকাপড় ছেড়ে আসতে গেল।

বসবার ঘরে আরেকজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, খুব লম্বা কালো স্যুট পরে। আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক শুধু বললেন, হাই।

হচনার বলল, আপনি বসুন, আমি আসছি।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ম্যাক্স ও হচনার দুজনেই এল একসঙ্গে। ম্যাক্স লম্বা মতো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলল, মরিসন ওহারা অফ ক্যানাডিয়ান পোলিস। এখন ইস্টারপোলে আছেন।

ডাইনিং রুমের টেবলে বাটলার কাটাচামচ সাজিয়ে ব্রেকফাস্ট রেডি করছিল। ফুটন্ত জলে টাটকা কফি ভেজানোর গন্ধ আসছিল হাওয়ায়।

আমি বললাম, সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। আমাকে কেন এখানে আনা হল জানালে ভাল হয়। কখন ছাড়া পাব আমি?

ম্যাক্স আমার হাঁটুতে হাত রেখে বলল, আজ ছাড়া পেতে দেরি আছে। কাল সকালে তোমাকে আমিই এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে আসব। তুমি আজকের মতো আমার অতিথি।

আমি বললাম, আমার জামাকাপড়। সব তো হোটেলে।

ম্যাক্স হাসল। বলল, সব আছে। তারপর হচনারকে বলল, তুমি মি. বোসকে ওঁর ঘরে নিয়ে যাও। চেঞ্জ করে আসুন উনি।

উপরে গিয়ে যে-ঘরের দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে দিল হচনার সে ঘরে ঢুকে দেখি আমার সব সম্পত্তি সেখানে। এমনকী টুথ ব্রাশ, দাড়ি কামানোর জিনিসপত্র সমস্ত বাথরুমে জায়গামতো সাজানো আছে।

হঠাৎ আমার স্যুটকেসটার কথা মনে হল। তালাটা বন্ধই ছিল। তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে খুলে দেখি সবই ঠিক আছে, শুধু লারার দেওয়া প্যাকেটটাই নেই।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে নেমে আমি প্যাকেটটার কথা বললাম ম্যাক্সকে। বললাম, প্রথমত আমাকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে তা বলা হোক, দ্বিতীয়ত একটা প্যাকেট ছিল স্যুটকেসে। প্যাকেটটা স্যুটকেসে নেই কেন? কে চুরি করেছে?

ম্যাক্স বলল, ওটা নিশ্চয়ই তোমার প্যাকেট নয়। ওটার মালিকানা দাবি করলে ভীষণ বিপদে পড়বে তুমি। আমরা তোমার বন্ধু, শত্রু নই; আপাতত সে কথাটুকু জানলেই যথেষ্ট; এখন রিল্যাক্স করো। উত্তেজনা এখন আমাদের; তোমার নয়। তুমি পুরোপুরি নিরাপদ।

আর লারা? লারা যে ওখানে একা রইল?

ম্যাক্স কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বলল, ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও। সব কথাই বলা হবে তোমাকে। আমরা তোমার সাহায্য চাই। লারার জন্যে তোমার চিন্তা করার কারণ নেই। নিজের ভার সে নিজেই বইতে পারে।

ব্রেকফাস্ট টেবলে খেতে বসে ম্যাক্স হচনারকে বলল, বিল, কাহালা হিলটনে পামগাছের নীচে লোক পাঠিয়েছ--- ওটা বালি থেকে তোলার জন্যে?

বুঝলাম যে, কেনেথ হচনারবেশী মানুষটার আসল নাম বিল।

বিল বলল, আমি তো এই-ই এলাম স্যার।

ম্যাক্স বলল, রাতারাতিই ওটা করা উচিত ছিল। এখন দিনের আলোতে তুলতে পারবে না। সব বন্দোবস্ত করে রেখো যাতে সন্ধে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তুলে আনতে পারো।

পুরো ব্যাপারটা, এদের কথাবার্তা আমার কাছে এমন হেঁয়ালি হেঁয়ালি মনে হচ্ছিল যে অমন রোলস মধু আর ব্যাকন এবং চিকেন ওমলেটটা ভাল করে খেতে পারলাম না।

বিল টেবল ছেড়ে পাশের ঘরে গিয়ে ফোনে কাকে কী যেন বলে এল।

বিল চলে যেতে ম্যাক্স বলল, এর নাম বিল সেমুর। মেক-আপ ও মাইনর প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওকে কেনেথ হচনার সাজানো হয়েছিল।

ক্যানাডিয়ান পোলিস-এর মরিস ওহারা বললেন, আমি তা হলে কাল সকালের প্লেনেই প্রিজনারকে নিয়ে মনট্রিয়ালে চলে যেতে পারি।

কফির কাপে দুধ চিনি নাড়তে নাড়তে ম্যাক্স বলল, আশা করছি। বলেই বাঁ-হাতের দু তর্জনী আর মধ্যমা জোড়া করে বলল, কীপ ইওর ফিঙ্গারস ক্রসড।

ওহারা বলল, তোমাকে চোখের সামনে কাজ করতে দেখলাম এই সাতদিন। অনেক কিছু শিখলাম ম্যাক্স তোমার কাছ থেকে।

ম্যাক্স মনে মনে খুশি হলেও, হেসে বলল, ওহ্ স্টপ ইট। আমি যখন কানাডা যাব তখন তোমাকে দেখেও আমার অবাক লাগবে।

বিল-এর ও আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে ম্যাক্স বলল, বিল টেক আওয়ার ফ্রেন্ড টু ইওর বেডরুম অ্যান্ড ব্রিফ হিম। আমি পরে আসছি।

বিল আমাকে নিয়ে ওর বেডরুমে এল। একটা নরম গদিওয়ালা বড় চেয়ারে আমাকে বসাল। তারপর ড্রয়ার খুলে ডানহিল-এর আফটার ব্রেকফাস্ট টোব্যাকো বের করে দিল আমাকে।

বলল, আরাম করে পাইপটা ধরাও।

আমি পাইপ ধরাতে ধরাতে ভাবছিলাম, এইবার ইন্টারোগেশান শুরু হবে। ভাল কথায় কাজ না হলে অত্যাচার করবে এরা। অত্যাচারের রকম এবং প্রক্রিয়া যে কত রকম হয় তা বইয়ে ও সিনেমাতে পড়া ও দেখা ছিল। কিন্তু মৃত কেনেথ হচনার সাজল কেন বিল আর হচনারের হত্যাকারীই বা কে এবং ওই হত্যার উদ্দেশ্যই বা কী এ সব কথা জানার আগ্রহ কম ছিল না। ওই চেয়ারে বসে ভাল ব্রেকফাস্টের পর পাইপ খেতে খেতে তখন কে যে একটা ভয় করছিল এমন বলব না!

কেনেথ একটা হাভানা সিগার ধরিয়ে বসল।

আমি, দাঁতের ডাক্তারকে যেভাবে দাঁত তোলা শুরু করতে বলে লোকে, সেইভাবে বললাম, প্রশ্ন করতে শুরু করুন।

বিল হেসে ফেলল। বলল, আপনিই আমাকে করুন। বড়সাহেব আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে বলেছেন আমাকে।

আমাকে প্রশ্ন করতে বলেছেন? আমি অবাক হয়ে বললাম।

বিল বলল, হ্যাঁ। তাই।

আমি বললাম, সেদিন হলিডে ইন-এর সামনে যে লোকটিকে গুলি করে মারা হয়েছিল সে লোকটি কে?

বিল হাসল। বলল, লোকটি আমিই। তবে আমাকে মারা হয়নি। একটা মার্ডার স্টেজ করা হয়েছিল শুধু। আমারই কলিগরা গুলি করেছিল। ব্ল্যাঙ্ক শট। সিনথেটিক রক্তের ব্যাগে। বুক পকেটে সে ব্যাগ লুকোনো ছিল।

আমি বললাম, তা হলে কাগজের রিপোর্ট, পোস্ট-মর্টেম, করোনারের রিপোর্ট?

ওগুলো সব অ্যারেঞ্জড।

কেনেথের ডেডবডিটা ম্যাসাচুসেটস-এ পাঠানো?

কফিনটা সত্যিই গেছিল। ম্যাসাচুসেটস-এই। কিন্তু কফিনে আনারস ছিল এখানকার। ওখানকার এয়ারপোর্টে আমাদেরই একজন কেনেথের বাবা সেজে কফিনের ডেলিভারি নিয়েছিল।

বিল একটু থেমে বলল, আনারসগুলো অক্ষত অবস্থাতেই পৌঁছেচে। স্বাদও খুবই ভাল ছিল। বড় সাহেব খবর পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যে।

আমি বললাম, তা হলে লারার বন্ধু কেনেথ হচনার মারা যায়নি?

হ্যাঁ। মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, এ কী হেঁয়ালি করছেন।

বিল বলল, কেনেথ হচনার মারা গেছিল আটদিন আগে আজ থেকে। এবং মারা গেছিল

www.BanglaBook.org

টরেন্টোতে তার অ্যাপার্টমেন্টে। তাকে পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ কোলট্ পিস্তল দিয়েই মারা হয়েছিল।

আমি বিল-এর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বললাম, তাহলে কেনেথ যে আমার সঙ্গে কথা বলল, হলিডে ইন-এ টেলিফোনে। কেনেথ যে এল একদিন, আমার ঘরে, কথা বলে গেল আমার সঙ্গে।

বিল বলল, প্রথম কেনেথ যে কানাডায় টোরোন্টো থেকে তোমার সঙ্গে ও লারার সঙ্গে কথা বলেছিল ফোনে সে আসল কেনেথ নয়। আসল কেনেথ তার অনেক আগেই মারা যায়। আর যে কেনেথ হোটেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলে সে আমি, এই বিল সেমুর।

শুধোলাম, তা হলে টেলিফোনের কেনেথ কে ?

বিল বলল, দ্যাটস ইমম্যাটেরিয়্যাল। আমাদের তাকে দরকার নেই, যদিও পরে সে ধরা পড়বে হয়তো। সে খুনির কোলাবরেটর। আমাদের এবং তোমাকে কনফিউজ করবার জন্যে লারা তাকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল। আসল কথাটা হচ্ছে, কেনেথের প্রকৃত হত্যাকারী টেলিফোন কলের বন্দোবস্ত করে পুরো ব্যাপারটা গোলমেলে করে দিয়ে আমাদের ধোঁকা দিতে চেয়েছিল।

আমি বললাম, ড্যানাবকে কি ধরা হয়েছে ?

বিল অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, বড় সাহেব বলতে পারবেন, কিন্তু ওকে শ্যাডো করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে ধরা যাবে।

বিল তারপর বলল, লারা সম্বন্ধে তোমার মতামত কী ?

চমৎকার মেয়ে। আমি বললাম।

বিল হাসল। অসভ্যের মতো বলল, নো ডাউট শী মাস্ট বি ভেরি গুড ইন বেড। আমিই আসল কেনেথ হচনার, মানে ওর বয় ফ্রেন্ড হলে ভাল হত। যাই-ই হোক, আই হোপ উ্য উইল এগ্রি উইথ হোয়াট আই সে।

আমি বিজ্ঞের মতো বললাম, ও বিষয়ে কোনও দ্বিতীয় মতের প্রশ্নই ওঠে না। এমনভাবে বললাম যেন আমি এ সব ব্যাপারে একজন অথরিটি।

এবার আমি বললাম, লারা সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা, মানে তোমাদের ?

বিল একটু চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, চমৎকার মেয়ে। তবে, আরও ভাল হতে পারত। ওর সঙ্গী-সাথী ভাল ছিল না।

কেনেথ তো ভাল ছিল।

না। বিল বলল। ওর চাকরিটা একটা ছুতো ছিল। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলারের দলের লোক ছিল ও। সাংঘাতিক সব মানুষজনের সঙ্গে ওর ওঠা-বসা ছিল।

আমি বললাম, তাই-ই বল, এতক্ষণে ওর মৃত্যু কাদের হাতে হয়েছে বুঝতে পারছি।

তারপর বললাম, ড্যানার তা হলে মারেনি ওকে ? কারণ লারা তো তোমাদের সাজানো-খুনের কেনেথকে ড্যানার মেরেছে বলে ভাবছিল। যদি এখানে কোনও সত্যিকারের খুনই না হয়ে থাকে তাহলে ড্যানারকে সন্দেহর প্রশ্নই আসে না।

বিল বলল, ড্যানার সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা ?

সাংঘাতিক লোক। ওর চোখই বলে সে-কথা।

আমি কিন্তু ড্যানারের ভক্ত। ড্যানার নাম করা মাউন্টেনীয়ার ছিল যৌবনে। বহুবার তোমাদের দেশে গেছে তারপর নেপাল থেকে হিমালয়ের বিভিন্ন চূড়োয় উঠেছে। চমৎকার স্পোর্টসম্যান ড্যানার।

আমি বললাম, কিন্তু ও তো প্রথেল-কীপার।

তাতে কী ? বিল বলল। ব্যবসা, ব্যবসাই। মদের ব্যবসায়ীদের যেমন প্রায়ই মদ খেতে দেখা যায় না, মেয়ে-খাটিয়ে যারা খায় তাদের নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়ে সম্বন্ধে অস্বাভাবিকভাবে কম আসক্তি দেখা যায়।

www.BanglaBook.org

তারপর বিল একটু থেমে বলল, টাকার আসক্তিই মানুষের সব চেয়ে বড় ক্রাইম। এই আসক্তির কোনও শেষ নেই। ওর জন্যে করতে পারে না মানুষে এমন কোনও কাজ নেই।

বিল সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল।

আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

হঠাৎ আমার মনে হল এতক্ষণে আসল প্রশ্নটাই করা হয়নি বিলকে। এত সব ব্যাপার খুন-খারাপির মধ্যে আমার ভূমিকা কোথায়? আমাকে কেন ধরে আনা হল, জড়ানো হল কেন আমায়?

বিলকে কথাটা বলতেই, বিল বলল, তুমি বেনেথের হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার কেসে যদি আমাদের সাক্ষী হও, মানে উইটনেস ফর দ্যা প্রসিকিউশান, তা হলে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তুমি সাক্ষী না দিলে আমরা জোর করতে পারি না, যদিও সমন করে কোর্ট তোমাকে ডাকতে পারে। কিন্তু তুমি প্রথম থেকে আমাদের সাহায্য করলে খুব উপকার হয় আমাদের। হত্যাকারী যাতে সাজা পায়, তা দেখা সৎ নাগরিকের কর্তব্য।

আমি বললাম, কিছুই বুঝছি না তোমার কথা। হত্যাকারীটি কে?

বিল বলল, তা আমরা জানি না এখনও। তবে জানার চেষ্টা হচ্ছে।

ঠিক এই সময় ম্যাক্স ঘরে এসে ঢুকল।

বিল উঠে দাঁড়াল।

ম্যাক্স বিলকে বলল, বিল লকার খুলে প্যাকেটটা নিয়ে এসো। ফিঙ্গার প্রিন্ট ডিভিসনের রিপোর্ট এসেছে। টোরোন্টোর রিপোর্টের সঙ্গে মেলানো হয়ে গেছে। আইডেনটিকাল। সেই মেয়েটিকে নিয়ে একটু পরে ড্যানার আসছে। মেয়েটি বলেছে, হত্যাকারীকে দেখলে সে চিনতে পারবে। ফোটো দেখেও আইডেনটিফাই করেছে। এখন তুমি প্যাকেটটা নিয়ে এসো।

বিল চলে যেতেই, ম্যাক্স বলল, তুমি তো শুনলে সব, এবার তোমার কী মনে হয় বলো তো?

আমি বললাম, আমার কী মনে হবে? মার্ডার যখন এখানেই হয়নি, হয়েছে টোরোন্টোতে তাও আটদিন আগে, এখানকার কাকে সন্দেহ করব? ডাক্তারের উপর সন্দেহ হয়েছিল, লায়ারও তাই-ই সন্দেহ। এখন তো দেখছি এখানের মার্ডারটাই সাজানো।

ম্যাক্স বলল, হ্যাঁ সাজানো। এটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে সত্যিকারের মার্ডারারকে পাজল করে দেওয়ার জন্যে। অনেক সময় এই রকম ঘটনা ঘটানোর পর খুনির ব্যবহারের তারতম্য দেখে তাকে সনাক্ত করা সোজা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সন্দেহের বশে তো আর কাউকে গ্রেফতার করা যায় না—হাতে প্রমাণ আজকেই সব এসে যাবে। আজ রাতেই অ্যারেস্ট করব মার্ডারারকে। কিন্তু অ্যারেস্ট করার পর তোমার সাহায্য দরকার হবে আমাদের। তুমি আমাদের অত্যন্ত ইমপর্টান্ট সাক্ষী।

আমি বললাম, আজকে সন্ধেয় অ্যারেস্ট করবেন মানে? মার্ডারার তো টোরোন্টোতে মার্ডার করেছে—তাকে এখানে পাবেন কী করে?

ম্যাক্স বলল, সে এখানে এসেছে। তা নইলে কানাডিয়ান পোলিসের ওহারা কি এখানে এসে বসে থাকে। অ্যারেস্ট করার পর ওহারার হাতে তাকে দিয়ে আসার ছুটি। নু-ইয়র্ক থেকে টোরোন্টো আর কতটুকু পথ। তোমাকে যাওয়া-আসার খরচ, ভাল হোটেলে থাকার খরচ, সিকিউরিটি সবই দেওয়া হবে। ভীরু লোকেরা রাজসাক্ষী হতে পারে না—কারণ সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে মনের জোর লাগে। তোমার কোনও বিপদ না হয় তার সব দায়িত্ব আমাদের। সাক্ষ্য দেওয়ার পরও অনেক দিন পর্যন্ত তোমাকে আমরা পাহারা দেব সব সময়। যদি দরকার হয়।

আমি আবারও শুধোলাম, খুনি কে তা জানেন?

ম্যাক্স বলল, জানি।

আমি বললাম, বলুন।

ম্যাক্স বলল, তুমি নিজেই জানতে পারে। নিজের মাথা খাটাও। খুনিদের কোনও পৃথক জাত নেই—অত্যন্ত স্বল্প ক্ষেত্র ছাড়া -আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভাল মন্দ আছে। কখনও আমরা মহৎ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কখনও নীচ ! আমাদের মধ্যেই খারাপত্বটা যখন মাথাচাড়া দেয় তখন আমরা অনেকেই এমন এমন কাজ করে ফেলি যে পরে সুস্থ অবস্থায় তা ভেবে দেখলে আশ্চর্য লাগে। কোনও মানুষ যখন একটা বড় রকমের অন্যায় করে ফেলে, তখন সেটা ঢাকতে তাকে অন্যায়ের পর অন্যায় করে যেতে হয়—মিথ্যাচারের পর মিথ্যাচার। তখন কারও কারও মাথায় নানা রকম শয়তানি বুদ্ধি খেলে—এমন এমন বুদ্ধি যা বড় বড় মনীষীদের মাথা দিয়েও বেরোত না। এই রকম বুদ্ধি ভাল কাজে লাগালে, যারা খারাপ কাজ করে ফেলে সমাজের হাতে শাস্তি পায় তারা কত না বড় হতে পারত।

একটু থেমে ম্যাক্স বলল, সত্যি কথা বলতে কী, আমার যা কাজ তা করতে করতে কত রকম মানুষই দেখি, মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটা, পাপের দিকটা। তবু মানুষের উপর বিশ্বাস হারাতে এখনও যেন পারি না। যে সব চেয়ে খারাপ মানুষ তার মধ্যেও যে কত কী ভাল দিক থাকে তা আমার মতো করে খারাপ মানুষদের নিয়ে না থাকলে বোধ হয় জানতেই পেতাম না।

বিল, লারা আমাকে যে প্যাকেটটা দিয়েছিল রাখতে সেই প্যাকেটটা নিয়ে এল হাতে করে। সঙ্গে ওহারাও এল। ওরা তিনজনে প্যাকেটটা খুলল। প্যাকেটটার মধ্যে থেকে বাচ্চাদের খেলার গুলির মতো বড় দশটা হিরে বেরোল।

বিল ফোন করল নীচে। ভ্যালুয়ার এখনও আসেনি। রাতের আগে নাকি আসতে পারবে না।

হিরেগুলো ম্যাক্স ও ওহারা নেড়েচেড়ে বলল, এদের দাম সব মিলিয়ে প্রায় বারো তেরো মিলিয়ন পাউন্ড হবে।

তারপর বলল, আমরা তো জহুরি নই। জহুরি এলে হয়তো জানা যাবে যে, দাম আরও বেশি।

দেখা হয়ে গেলে, বিল সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটা নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড লকারে তুলে রাখল।

আমার গলায় থুথু আটকে গেছিল।

ম্যাক্স বলল, ইয়েস, দিস ইজ লাইফ।

তারপর বলল, তুমি কাল যখন এই হিরেগুলো নিয়ে ধরা পড়তে তখন তোমার কত বছর জেল হত জানো তো? ধরা পড়লে একেবারে যাবজ্জীবনেই পড়তে। তোমার লাগেজ চেক করার ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে এয়ারপোর্টে, এবং সমস্ত কাস্টমস অফিসেও গত সাতদিন হল যেদিন থেকে তুমি লারার সঙ্গে মাখামাখি আরম্ভ করেছিলে।

আমার গলায় থুথু তখন দলা পাকিয়ে গেছিল।

আমি বললাম, লারা তাহলে জেনেশুনেই আমাকে জেলে পাঠাচ্ছিল?

ম্যাক্স বলল, জেনেশুনে নয়। তাহলে ও তোমাকে দিয়ে পাচার করার চেষ্টা করত না।

আমি বললাম, কেন? ও যে ওর সলিসিটরের কথা বলল, বলল, আমি ন্যু-ইয়র্কে ফেরার আধঘণ্টার মধ্যে ওর সলিসিটরের লোক এসে প্যাকেটটা নিয়ে যাবে।

ম্যাক্স বলল, সলিসিটর? মাই ফুট।

আমি নাম ও ফিফথ অ্যাভিন্যুর কথা বললাম।

ম্যাক্স ফোন তুলে টেলেক্স অপারেটারকে বলল, এক্ষুনি ন্যু-ইয়র্ক থেকে জেনে নিতে ওই নামে কোনও সলিসিটর ফার্ম আছে কি নেই। থাকলে ন্যু-ইয়র্ক এফ-বি-আইকে বলে দিতে বলল তাদের ইমিডিয়েটলি শ্যাডো করতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিল নিজেই টেলেক্স মেসেজের স্ট্রিপটা নিয়ে ম্যাক্সকে দিল।

ম্যাক্স স্ট্রিপটা দেখে নিয়ে আমাকে এগিয়ে দিল। "নো সাচ ফার্ম একজিসটস।" ওই নামে কোনও ফার্ম নেই ন্যু-ইয়র্কে।

ম্যাক্স বলল, কী বুঝলে? খুব সম্ভব যে ওই হিরের প্যাকেট নিতে আসত সে তোমাকে খুন করেও যেত কারণ, পরে কখনও তোমার মাধ্যমে ওই প্যাকেটের কথা ফাঁস হলে লারা এবং তার দলের ভারী বিপদ ছিল।

ততক্ষণে যা বোঝার বুঝেছিলাম আমি। সমস্ত পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী মেয়েদের সম্বন্ধে, নারীশরীরের মাদকতা, সুগন্ধ, স্বাদ সম্বন্ধে আমি বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলাম। লারার মুখটা মনেও

www.BanglaBook.org

আনতে পারছিলাম না। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, কেনেথকে মারল কেন লারা? ও তো ওকে ভালবাসত।

ম্যাক্স হাসল।

আমি ভাবছিলাম, মৃতদেহের উপরে বসে, ফাঁসিতে লটকানো আসামীর জিভ বের করা চেহারা দেখতে দেখতেও এদের হাসতে আটকায় না একটুও।

ম্যাক্স বলল, কেনেথকে ভাল নিশ্চয়ই বাসত। কিন্তু বারো মিলিয়ন ডলারের ভালবাসার কাছে কেনেথের ভালবাসার দাম কতটুকু ছিল? টাকা থাকলে সব সুখ থাকে। কেনেথকে ভালবাসা সত্ত্বেও ওই হিরেগুলোর লোভে ও কেনেথের আদর খেতে খেতেই ওর হ্যান্ড ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে ওকে গুলি করে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় কেনেথ। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ও জামাকাপড় পরে কেনেথের আলমারি থেকে প্যাকেটটা নিয়ে টোরোন্টোর সিম্পসনস-এর দোকানের একটা পলিথিনের ব্যাগে প্যাকেটটা ভরে নিয়ে লিফট দিয়ে নেমে যায়। ফেরার সময়, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, জুইশ মার্কেটের একটা দোকানে বসে ডিনার খায় লারা, বিয়ার খায় দুটো। কেনেথকে কোল্ড ব্লাডে খুন করার পনেরো মিনিট পর। তখনও নিশ্চয়ই কেনেথের আদরে তার শরীরের কেন্দ্রবিন্দু ভেজা ছিল। বোঝো কী সাংঘাতিক মেয়ে!

একটু থেমে ম্যাক্স বলল, টাকার জন্যে মেয়েরা সব করতে পারে। মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের থেকে সাধারণত বেশি লোভী হয়।

আমি বললাম, তুমি এত সব জানলে কী করে?

ম্যাক্স বলল, পিস বাই পিস এভিডেন্স জোগাড় হয়েছে। ওহায়ো দুদিনের মধ্যে টোরোন্টো থেকে এখানে চলে আসে সমস্ত প্রাইমারি ড্যাটা নিয়ে। লারা অত্যন্ত সুন্দরী। সকলেরই চোখে পড়ে। ডানাবের ব্রথেলের একটি মেয়েকে কেনেথ সে রাতে ডেকেছিল তার অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটাবার জন্যে। সে মেয়েটিও সুন্দরী। লারার সেদিন কেনেথের কাছে যাওয়ার কথাই ছিল না। লারা জানত যে কেনেথ স্মাগলিং করে। সেই দুপুরেই লারা হনলুলুতে ছুটি কাটাতে আসবে বলে লাঞ্চের পর অফিস ছুটি করে কেনেথের অ্যাপার্টমেন্টে যায় এবং দুজনে দুজনকে আদর করে। সেই সময় কেনেথ দুর্বল মুহূর্তে লারাকে ওই হিরের কথা বলে। বলে যে এটা জায়গামতো পাচার করতে পারলে পঞ্চাশ হাজার ডলার রোজগার হবে কেনেথের। তখন ওরা দুজনে লম্বা ছুটিতে যাবে—সারা পৃথিবী ঘুরবে রাজা-মহারাজার মতো। লারার সামনেই আলমারি খুলে হিরেগুলো বের করে দেখায়। হিরেগুলো তখন একটা ভেলভেটের বাক্সে ছিল।

সারা বিকেল হিরেগুলো লারার মাথায় ঝড় তোলে। ও ওর নিজের ফ্ল্যাটে যাবে বলে টিউব স্টেশনে গিয়েও ফিরে আসে। কেনেথ তখন ঘুমোচ্ছিল। কেনেথকে ও বলে যে আমি চলে যাব কাল, কতদিন তোমাকে দেখতে পাব না—আরেকবার তোমার আদর খেতে এলাম। কেনেথ আলমারি থেকে কনিয়াকের বোতল বের করে, দুজনে মিলে খায়। কেনেথই বেশি খায়—প্রায় ড্রাঙ্ক হয়ে যায়। তখন লারা বলে, বালিশের তলায় তোমার পিস্তলটা যে সবসময় গুলিভরা অবস্থায় রেখে দাও, আমার শুতে ভয় করে বড়। তখন কেনেথ পিস্তলটা বের করে সাইড টেবলে রাখে।

লারা মিষ্টি করে জিগ্যেস করে, চেম্বারে গুলি ভরে রাখো? না, গুলি শুধু ম্যাগাজিনেই আছে?

কেনেথ হাসে। বলে, চেম্বারে না-রাখলে হঠাৎ প্রয়োজনে কাজেই তো লাগবে না।

লারা বলে, আমি তোমার উপরে শুচ্ছি, তোমাকে ভীষণ আদর করব আমি।

তার কিছুক্ষণ পরই যা করার করে। কেনেথ সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

আমার বাকরোধ হয়ে গেছিল। কোন কালনাগিনীর সঙ্গে কোন সর্বনাশের খেলায় মেতেছিলাম আমি!

একটু পরে আমি শুধোলাম, তুমি যে মেয়েটির কথা বলছিলে, ডানাবের ব্রথেলের মেয়ে—সে কী করল?

সে যখন লিফটে এসে কেনেথের পঁয়তাল্লিশ তলার ফ্ল্যাটে যাবে বলে পঁয়তাল্লিশ তলায় পৌঁছে করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তখন দেখে কেনেথের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে লারা হাতে সিম্পসনস-এর

www.BanglaBook.org

শপিং ব্যাগ আর হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

লারাকে মেয়েটি দেখেছিল এক রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে গিয়ে দূর থেকে কেনেথের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে। পরে কেনেথকে জিজ্ঞেস করে লারার পরিচয় জেনেছিল। তারপর মেয়েটি দরজা খুলেই ড্রইং রুম পেরিয়ে বেডরুমের দরজা খুলেই ওই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে আসে। খারাপ মেয়েদের উপরে সন্দেহ সহজে হয় তাই নিজেকে বাঁচবার জন্যেই ও এসে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দরজায় লারার হাতের প্রিন্টের সঙ্গে ওর হাতের প্রিন্টও পায় এবং বোঝে যে ও সত্যি কথা বলছে। ওই মেয়েটি লারার নাম জানত না, কোথায় থাকে লারা তাও জানত না। শুধু চেহারাটা চিনত। লারাও কেনেথের দরজা খুলে বেরিয়েই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখেছিল। লারাও নিশ্চয়ই দেখতে চেয়েছিল মেয়েটি কোথায় যায় কিন্তু তখন সময় নষ্ট করতে পারেনি। লারা কেনেথের পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ও যদি মেয়েটির পিছন পিছন গিয়ে কেনেথের ড্রইং রুমে ওকে গুলি করে মেরে ফেলত তা হলে একজনও সাক্ষী থাকত না। কিন্তু মাথা অত সঠিকভাবে কাজ করলে কোনও খুনিই কখনও ধরা পড়ত না।

আমি বললাম, ম্যাক্স, আমি একটু ঘুমুতে পারি ? আমার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

ম্যাক্স বলল, এমনি ঘুম হবে না তোমার। বলেই, ফোন তুলল। দু মিনিটের মধ্যেই একজন ডাক্তার এসে আমাকে সবরকম পরীক্ষা করে সিডেটিভ ইনজেক্ট করে দিলেন।

ম্যাক্স বলল, ডাক্তার, ছটার মধ্যেই কিন্তু ওঁকে আমার সঙ্গে বেরোতে হবে। ওভারডোজ যেন না হয়।

ডাক্তার বললেন, ঠিক আছে। তিনটে সাড়ে তিনটে অবধি ঘুমিয়ে উঠে দেরি করে লাঞ্চ খান—একদম ফিট হয়ে যাবে শরীর।

জিনা ওয়াকার

তিনটে নাগাদ আমার ঘুম ভাঙতেই বাইরে বেরিয়ে দেখি অনেক লোক সেখানে। ম্যাক্স গিলিগান খুব উত্তেজিত। বিল একটু আগে ফিরে এসে একটা খারাপ খবর দিয়েছে।

ম্যাক্স আমাকে জিজ্ঞেস করল, কাল রাতে তুমি আর লারা যখন বীচে পাম গাছতলায় বসেছিলে তখন বালির গর্ত খোঁড়ার পর সেই গর্তে লারাকে কিছু লুকিয়ে রাখতে দেখেছিলে ?

আমি অবাক হলাম। আমার মনে যে কথাটা এসেছিল মুহূর্তের জন্যে তা ম্যাক্স কী করে জানল ভেবে পেলাম না।

আমি বললাম, বিলের সঙ্গে কথা বলার পর আমি পিছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল আমার, লারা কী যেন একটা গর্তের মধ্যে ফেলল। লারাকে সেকথা বলেও ছিলাম, ও অস্বীকার করল, বলল আমি দূর থেকে ভুল দেখেছি।

ম্যাক্স বলল, কেনেথের পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ কোল্ট পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছিল ও—যা দিয়ে কেনেথকে মেরেছিল লারা। বালি খুঁড়ে দেখা গেছে সে পিস্তল নেই। কাল রাতের পর আজ সকালে নতুন করে বালি খুঁড়ে সেটাকে বের করে নিয়ে গেছে কেউ।

কে নিতে পারে ? আমি উদ্বেগের সঙ্গে বললাম।

লারাও নিতে পারে। কিন্তু লারা নিলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু কেনেথের দলের লোকেরা যদি লারার খবর পেয়ে থাকে তা হলে বিপদ। কারণ লারা ধরা পড়লে কেনেথের খুনের কিনারা যে শুধু হবে তাই-ই নয়, কেনেথের কাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাও জানা যাবে ওকে জেরা করে। তাই ওদের পক্ষে ওই পিস্তলটি লুকিয়ে ফেলা খুব জরুরি। ওরা ইতিমধ্যেই কানাডা থেকে খবর পেয়েছে যে, কেনেথের দলের দুজন কন ম্যান হনলুলুতে এসে পৌঁছেছে। লারা যে হিরেগুলো তোমাকে দিয়ে দিয়েছে একথা তারা জানে না। তারা মোটেই লারার বন্ধু নয়। তারা জানে যে হিরেগুলো লারার কাছেই আছে। লারা হঠাৎ লোভের বশে কেনেথকে হয়তো মেরে বসেছিল কিন্তু

www.BanglaBook.org

ও এই স্মাগলারদের আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তারা করতে পারে না এমন কাজ নেই। ওদের কাছে লারা একেবারেই দুধের শিশু।

ম্যাক্সের কথা শেষ হতে না হতে কাহালা হিলটনের পাশে দাঁড়ানো এফ-বি-আইএর লোক ওয়ারেলেসে মেসেজ পাঠাল যে লারার পাশের হাইড-অ্যাওয়ে কটেজ থেকে একজন সন্দেহজনক লোক এবং একজন সুন্দরী মেয়েকে চেক-ইন করে ঢুকতে দেখা গেছে। লোকটির চেহারার সঙ্গে কানাডিয়ান পুলিশের কন-ম্যানদের চেহারা সম্বন্ধে যা ইনফরমেশান ছিল, তার সঙ্গে মিলে গেছে।

ম্যাক্স অর্ডার দিল তাদের উপর কড়া নজর রাখো। ইতিমধ্যে লারা ঘর থেকে বেরোলেই নজর রেখো তার উপরও।

জবাব এল, লারার হাইড-অ্যাওয়ে কটেজের ঘরের দরজা দেখা যাচ্ছে না ওদের হাইড-আউট থেকে।

ম্যাক্স অর্ডার দিল, ঘরের সামনেই তা হলে প্লেইন-ড্রেসে আর্মড লোক রাখো। লারার ঘরে যেন কেউ ঢুকতে না পারে। লারাও যেন বেরোতে না পারে। আমরা ঠিক সাতটায় যাব।

তারপর ম্যাক্স একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, ড্যানার এখনও আসছে না কেন মেয়েটিকে নিয়ে কে জানে?

আমি বললাম, সন্দেহ বা কল্পনায় ভর করে তো আর তোমরা লারাকে ধরতে পারবে না। ধরতে পারলেও কেস টেকাতে পারবে না। তোমাদের হাতে কী প্রমাণ আছে?

তারপর একটু থেকে বললাম, তোমরা ভুল করছ না তো ম্যাক্স?

বিরক্ত গলায় ম্যাক্স বলল, আছে আছে। অনেক প্রমাণ আছে। ওসব কখনও তোমাকে বলব। তা ছাড়া তোমার কাছ থেকে যে হিরেগুলো বেরোল সেগুলোও কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

তখনও সূর্য ডোবেনি, বেলা ছিল। ম্যাক্সকে খুব উত্তেজিত ও বিচলিত দেখাচ্ছিল।

ম্যাক্স বলল, কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক?

আমি হ্যাঁ না কিছুই বললাম না।

ম্যাক্স ড্রইং রুমে এসে সেলারের সামনে দাঁড়িয়ে হুইস্কির বোতল খুলে রক-হুইস্কি ঢালল দুটো। তারপর বাটলারকে বলল, আমাকে কিছু খাবার দিতে।

বাটলার বলল, কী দেব?

আমি লাঞ্চ খাইনি আজ। খাওয়ার ইচ্ছেও ছিল না। বললাম, যা খুশি। সসেজ বা হ্যাম স্যান্ডউইচ বা হট-ডগ যা হয়।

ম্যাক্স ড্রিঙ্কটা হাতে করে আমাকে পাশের ঘরে ওর স্টাডিতে নিয়ে গেল। গিয়ে একটা বই টেনে নিয়ে আমার হাতে দিল। ম্যাক্স বইটার একটা চ্যাপ্টার খুলে আমাকে দেখাল। দেখলাম চ্যাপ্টারটার নাম আইডেনটিফিকেশান অব ইন্ডিভিজুয়ালস। ড্যাকটিলো-স্কোপীর প্রথম রুল হচ্ছে—কোনও মানুষের আঙুলের ছাপই অন্য মানুষের আঙুলের ছাপের মতো নয়। আমাদের আঙুলের ছাপ নানারকম হয়। প্লেইন আর্চ, টেন্টেড আর্চ, একসেপশানাল আর্চ, প্লেইন লুপ, হোর্ল সেন্ট্রাল পকেট লুপ, টুইন লুপ, লাটারাল পকেট লুপ এবং অ্যাকসিডেন্টাল। তাই আঙুলের ছাপ দেখে সহজেই বোঝা যায়।

তারপর বইটা জায়গায় তুলে রেখে, হুইস্কির গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে বলল, কেনেথের টরেন্টোর ঘরের দরজায় যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে লারার, সাইড বোর্ডের উপরে, এখানে হোটেলের কাউন্টারের উপরে, বাথরুমের দরজায়, বাইরের দরজায়, সব হুবহু মিলে গেছে। আঙুলের ছাপের ডেলটা এবং লুপস দেখে অনেক কিছুই বোঝা যায়। বোঝা যায় রিজ ট্রেসিং করেও। তা ছাড়া ড্যানারের মেয়েটি আইডেনটিফাই করবে লারাকে। এফ বি আই-এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভিশানে যে কত লোক কাজ করে তা দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

তারপরই বলল, আচ্ছা, কেনেথ কাল ওখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার পর লারার মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখলে?

আমি বললাম, শুধু কাল কেন? ও যখন হোটেলে এসেছিল, লারা কেবলি বলেছিল, ইট কান্ট

www.BanglaBook.org

ধি। ইটস ইমপসিবল : কালকে কেনেথের রুমালটা আমি যখন তুলে নিলাম, যখন জুতোর ছাপ দেখলাম, সত্যি মানুষের, তখনও ও চমকে উঠল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও আমাকে শুধোল, রুমালে কোনও পারফ্যুমের গন্ধ আছে ?

আমি বললাম, ব্রুট !

ও চমকে উঠল। বলল, ব্রুট ?

তারপরই একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে, ভীষণ ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি তখন ভেবেছিলাম ও ভূতের ভয় পেয়েছে বুঝি।

ম্যাক্স হাসল : বলল, ভূতের ভয়ই বটে ! পেট্রীরা ভূতকে ভয় পায় না। তারপর বলল, কেনেথ সবসময় ব্রুটের টয়লেটরীজ ব্যবহার করত, তাই বিলকে বলেছিলাম ব্রুটের পারফ্যুম লাগিয়ে যেতে।

তারপর বলল, এখন বুঝতে পারছ কেনেথকে দেখে এবং কেনেথ দ্বিতীয়বার মার্ডার হবার খবরে ও কেন হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিল। ওর মতো করে আর কেউই জানত না যে ও নিজে হাতে কেনেথকে গুলি করে মেরেছে। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ দিয়ে গুলি করলে সিংহও মরে যায়, তায় মানুষ ! এবং যে মুহূর্তে ও বুঝতে পারছে এই দ্বিতীয় কেনেথ মিথ্যা সেই মুহূর্তেই ও অনবধানে বলে ফেলেছে তোমার কাছে নিশ্চয়ই যে, এ হতেই পারে না, ইট কান্ট বি ; অসম্ভব। এই কথাই ওর দোষ প্রমাণ করবে। তোমার কাছ থেকে এইটুকু সাহায্য আমার দরকার।

আমি বললাম, আমি সবই বুঝছি, কিন্তু ও যদিও আমার কেউই ছিল না কিন্তু এই কদিনে আমাকে যে ও অনেক কিছু দিয়েছে— এত কিছু যা জীবনে আর কারও কাছেই পাইনি। কী করে আমি ওকে জেনে শুনে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাই। আমার যে কী খারাপ লাগছে ম্যাক্স, কী বলব ! আমি এখনও ভাবতে পারছি না !

ম্যাক্স বলল, এইটুকু সাহায্য না করলে তো আমার তোমাকেই জেলে পাঠাতে হয়। এত টাকার স্মাগলড হিরে কিন্তু আমরা পেয়েছি তোমারই কাছ থেকে। লারাকে বাঁচাতে হলে তোমাকে মারতে হয়। লারা যে তোমার কত বড় বন্ধু তা তোমার জন্যে হিরে পাচার করার চেষ্টাতেই বুঝতে পারছ !

আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। তখনও অবাক হয়েই ছিলাম। কেবলই বলছিলাম, অমন ফুলের মতো ফুলওয়ালি কী করে এমন কাজ করল। নাঃ ম্যাক্স ! কোথাও কোনও ভুল করছ তোমরা। লারার খুব বিপদ। তোমরা লারাকে যেনওক্রমে বাঁচাও।

ম্যাক্স হাসছিল।

বলল, বাঁচাবার মালিক ভগবান। আমি তুমি মারবারই বা কে ? বাঁচাবারই বা কে ?

বাটলার হ্যামবার্গার এনে দিল সঙ্গে মাস্টার্ড আর সেলারী পাতা দিয়ে। খেয়ে নিলাম। তারপর স্টিফ ড্রিঙ্কটা এক চোকে গিলে ফেললাম। ম্যাক্স আগেই গিলে ফেলেছিল।

ম্যাক্স ঘড়ি দেখল। তারপর আমাকে বলল, তুমি তৈরি হয়ে নাও। দ্য হাউস ইজ ইয়োর্স। হেলপ ইওরসেলফ উইথ অ্যানাদার ড্রিঙ্ক।

বলেই নীচে নেমে গেল।

সাড়ে ছটা নাগাদ ম্যাক্স আমাকে নিয়ে ওর সাদা জাগুয়ারে উঠল। আগে পিছনে দেখলাম, দুটি কালো গাড়ি। বুঝলাম প্লেইন ড্রেসে এফ বি আই-এর আর্মড লোক আছে।

ম্যাক্স-এর কাঁধে একটা ব্যাগ। তার মধ্যে ওয়াকি-টকি আছে। শর্ট ডিসটান্স ওয়্যারলেস। সামনের পিছনের গাড়ির সঙ্গে কথা বলল ম্যাক্স।

দেখতে দেখতে আমরা কাহালা হিলটনের বিরাট পার্কিং লটে এসে পৌঁছলাম। চতুর্দিকে বড় বড় ট্রপিকাল গাছ। ওয়াইকিকি বীচ থেকে হুশ হুশ করে হাওয়া আসছে। চমৎকার সন্ধেটা। আমার লারার জন্যে এবং আমার জন্যেও বড় খারাপ লাগতে লাগল। চাঁদ উঠেছে আকাশ ভরে। চাঁদের আলো চকচক করছে প্রশান্ত মহাসাগরের জলের উপরে। গত দু তিনটি দিন লারার সঙ্গে যেমন আমার এই জীবনের এক মধুরতম স্বপ্নের মতো মনে হয়েছে আমার কাছে, চারধারের ঘটনাবলী তেমনই দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়েছে, হচ্ছে। এমন এক আনন্দ ও দুঃখের স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র

www.BanglaBook.org

অনুভূতি জীবনে কখনও হয়নি আগে। আমি যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

রিসেপশান লবিতে ঢুকতেই একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে একজন লোক উঠে দাঁড়াল ম্যাক্সকে দেখে। লোকটি দেখতে কদাকার। তার মুখ শিয়ালে চিবিয়ে-খাওয়া কইমাছের মাথার মতো কুদৃশ্য। সে ম্যাক্সকে ফিসফিস করে বলল, ড্যানার আসতে পারেনি, আমি এসেছি তার বদলে।

ম্যাক্স যখন তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, তক্ষুনি লোকটি বলল, নিহাউ!

ম্যাক্স আশ্বস্ত গলায় বলল, নিহাউ।

বুঝলাম, কোড ওয়ার্ড একটা।

ম্যাক্স শুধোল, ড্যানার কোথায়?

জানি না। বোধ হয় বাড়িতেই আছে। শরীর ভাল না। অপারেশন ওয়াকার ওভার হয়ে গেলে আপনাকে কথা বলতে বলেছে ওর সঙ্গে।

ম্যাক্স বলল, ও কে।

আমি আর ম্যাক্স রিশেপশান ডেস্কে গিয়ে পৌঁছলাম। ম্যাক্স যেমন গাড়িতে আসতে আসতে আমাকে শিখিয়ে রেখেছিল, আমি তেমনই রিশেপসানের একটি মেয়েকে বললাম, আমি মিস জিনা ওয়াকার-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

মেয়েটি শুধোল, রুম-নাম্বার জানেন?

আমি বললাম, হাইড-অ্যাওয়ে কটেজ।

মেয়েটি হেসে বলল, হাইড-অ্যাওয়ে কটেজ তো লুকিয়ে থাকার জন্যে। ওখানে কি গিয়ে আপনি বিরক্ত করবেন মিস ওয়াকারকে? এই কারণেই অনেক কটেজে টেলিফোনের কানেকশানই রাখিনি আমরা। কিন্তু ওঁর ঘরে আছে। তারপর ডায়াল করে কথা বলতে দিল আমায়।

ফোনটা অনেকক্ষণ বাজবার পর লারা ধরল।

লারা বলল, ইয়েস, হু ইজ ইট?

আমি বললাম, আমি জিত্।

লারা ওপাশ থেকে ভয় পাওয়া গলায় বলল, আমি জিনা, জিনা ওয়াকার।

আমি বললাম, বুঝেছি।

লারা বলল, কোথায় ছিলে তুমি সারাদিন? আমি তো ভাবলাম তুমি চলেই গেলে ন্যু-ইয়র্কে।

আমি বললাম, পাগল।

তারপর বললাম, আমি আসছি তোমার কাছে।

লারা বলল, তোমার আসতে ফোন করার দরকার কী ছিল। তবে যখন করেইছ তখন এক্ষুনি এসো না। আমি চান করতে যাচ্ছি। জামাকাপড় ছেড়ে ফেলেছি। দরজা বন্ধ, তুমি দশ মিনিট পরে এসো। হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক অর আ কোক অ্যান্ড উ্য প্লিজ।

আমি বললাম, আমি গেলেই চান কোরো। তারপর বললাম, তোমার চান দেখব আমি।

লারা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, দেখো, আজ নয়; অন্য কোনওদিন, অন্য কোনওখানে।

ওর এই হঠাৎ পরিবর্তনে অবাক হলাম। ভাবলাম, ও কি জানতে পেরেছে যে আমি, এমনকী জিমও ওর শত্রু হয়েছি?

আমি বললাম, ঠিক আছে, দশ মিনিট পরেই যাচ্ছি।

ম্যাক্সের ইঙ্গিতে আমি রিশেপসানের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, লারা বেরিয়েছিল কি না?

মেয়েটি বলল, বিকেলে একবার বেরিয়েছিল, শপিং-এর জন্যে। এই তো ঘণ্টাখানেক হল ফিরে চাবি নিয়ে গেলেন ডেস্ক থেকে।

আমার খুব দুর্বল লাগছিল নিজেকে, ভীষণ অপরাধী; পা কাঁপছিল আমার। লারাকে কী করে মুখ দেখাব জানি না। এত কিছু ওর সম্বন্ধে জানা সত্ত্বেও ওকে তবুও খারাপ বলে, খুনি বলে ভাবতে পারছিলাম না।

ম্যাক্স ঠিকই বলেছিল, যখন বলেছিল, কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা সকলেই ভালত্বে মন্দত্বে মেশানো মানুষ। কখনও ভালত্বটা প্রবল হলে আমরা মহৎ হয়ে উঠি, মন্দত্বটা প্রকট হলে নীচ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সংসারে অবিমিশ্র খারাপ মানুষ বা ভাল মানুষ বলে বোধ হয় কেউই নেই।

ভালর মধ্যেও খারাপ থাকে, খারাপের মধ্যেও ভাল।

এমন সময় ম্যাক্সের একজন অনুচর বাইরে থেকে এসে ম্যাক্সকে ফিসফিস করে বলল যে, সময় নষ্ট করা উচিত নয় আমাদের। ওঁহারা তাড়া লাগিয়েছেন, ব্যাপারটা মিটে গেলে উনি আজই রাতের প্লেনে চলে যেতে চান কানাডাতে।

ম্যাক্স বলল, ঠিক আছে। ওঁহারাকে বলে দাও দশ মিনিটে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। ব্যাপারটা যে জরুরি তা আমরাও বুঝি। আমরা এখানে স্ট্রিপটিজ দেখতে আসিনি।

তারপর ফিসফিস করে আমাকে ম্যাক্স বলল, পিস্তলটা যে লারার কাছে নেই এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই। যদি লারাই আবার ওটাকে খুঁড়ে তুলে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে। একমাত্র তোমাকেই ও সন্দেহ করবে না। তুমি ঘরে যাবার পরই ওর হ্যান্ড ব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের করে নেবে। এর জন্যে তোমাকে আমি দু মিনিট সময় দেব। প্রয়োজন হলে তুমি গায়ের জোরে কেড়ে নেবে। তা না হলে ও যে ডেসপ্যারেট কন্ডিশানে আছে এখন ওর পক্ষে আমাদের দেখেই এলোপাথাড়ি গুলি চালানো অসম্ভব নয়। এত বড় নামজাদা হোটেলের মধ্যে আমি সীন ক্রিয়েট করতে চাই না। পুরো অপারেশনটা কোয়েইটলি সারতে চাই। উইদাউট এনি ব্লাড শেড।

আমি বললাম, পিস্তলটা যদি লারার কাছে থাকে এবং ও যদি ইতিমধ্যে বুঝে থাকে যে ওর বাঁচবার আর পথ নেই, তা হলে ও যদি আত্মহত্যা করে?

ম্যাক্সের চোখ দুটো মুহূর্তের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল।

এক সেকেন্ড ও চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, এই কথাটা আমার মনে আসেনি, যদিও আসা উচিত ছিল। তবে লোকচরিত্র আমি যতটুকু বুঝি তাতে লারা এমন করবে বলে আমার মনে হয় না। যে-মেয়ে টাকার জন্যে মানুষ খুন করতে পারে, সে অত সহজে নিজেকে মারবে না।

আমি বললাম, কী জানি? আমার তো মনে হয়েছে লারা খুব এমোশনাল মেয়ে, বেসিকালি ভাল মেয়ে। ওকে কাল সন্ধেতেই যেমন আপসেট দেখেছি তাতে ওর পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। যদি ও আত্মহত্যা করে মারা যায়?

ম্যাক্স আমার কাঁধে থাপ্পড় মেরে বলল, ডোন্ট ওরী। শী উইল বি অ্যাজ গুড ইন হার ডেথ অ্যাজ উ্য ফাউন্ড হার অন বেড।

আমি ম্যাক্সের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা ও স্থূলতা দেখে অবাক হলাম।

ঘড়িতে আট মিনিট হয়ে গেছিল। ম্যাক্স ও আমি হাইড-অ্যাওয়ে কটেজের দিকে যাচ্ছিলাম। আমাদের পাশ কাটিয়ে জিনস-পরা একটি কদর্য প্রসাধন করা কুৎসিত সুদর্শন বুড়ি গটগট করে ছ ইঞ্চি হিলের জুতো পরে চলে গেল। হাতে জিনের হ্যান্ড ব্যাগ।

ম্যাক্স হেসে ফেলল। আমাকে বলল, এই ছুঁড়ি-সাজা বুড়ির লুকোবার মতো কোন এ্যাফেয়ার আছে যে হাইড-অ্যাওয়ে কটেজে উঠেছে? এর বয়ফ্রেন্ডই বা কে?

আমি বললাম, বয়ফ্রেন্ড কে থাকবেই, তার কী মানে আছে! লেসবিয়ানও হতে পারে

ম্যাক্স আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল, এই তো বুদ্ধি খুলছে আস্তে আস্তে।

আমরা যখন লারার কটেজের সামনে পৌঁছেছি, তখন ম্যাক্স অবাক হল সেখানে প্লেইন ড্রেসে আর্মড গার্ড নেই দেখে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকি-টকিতে কথা বলল ম্যাক্স। হোটেলের বাইরে গাড়িতে বসা ওর সহচরেরা বলল, নিশ্চয়ই আছে, সে বোধ হয় এদিকে ওদিকে আছে, হয়তো সামনেই হয়তো নেই। ওরা আরও বলল যে, পাঁচ মিনিট আগেও কথা বলেছে ও তাদের সঙ্গে। হয়তো বাথরুমে গেছে।

ম্যাক্স নিজের ওয়াকি-টকিতে লেকটার নাম ধরে ডাকল। তার নাম জন।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

ম্যাক্স বাইরের গাড়িকে বলল, ওকে লোকেট করতে পারলেই যেন ম্যাক্সের সঙ্গে দেখা করতে

www.BanglaBook.org

বলে।

আমরা যখন লারার দরজার সামনে পৌঁছলাম তখন ম্যাক্স আড়ালে চলে গেল। বেল টিপতেই ভিতর থেকে একেবারে দরজার পাশ থেকেই লারা বলল, ডার্লিং, দশ মিনিট পরে এসো। আমার এক বান্ধবী এসেছিল, এইমাত্র গেল। এখনই চান করতে যাচ্ছি—জামাকাপড় পরে নেই, দরজা খুলতে পারছি না, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

আমি বললাম, ও-কে। লারা।

ম্যাক্স ও আমি সরে গিয়ে যাতে কটেজ থেকে দেখতে না পাওয়া যায় এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ওয়াকি-টকিতে ম্যাক্স ওই বুড়ির চেহারার বিবরণ দিয়ে বাইরের গাড়ির লোকদের বলল, তারা তাকে দেখেছে কি না?

ওরা বলল, দেখেছে। বুড়ি তো একটু আগে নিজের গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। লবিতেও ঢুকেছিল। লেডিজরুমে গেছিল লবির। তারপর বেরিয়ে এসে চলে গেল।

ম্যাক্স শুধোল, সন্দেহজনক দেখলে কিছু চলাফেরার?

ওরা বলল, নাথিং। একটুও নার্ভাস বা টেন্স নয়—ধীরেসুস্থে লবি থেকে বেরিয়ে গাড়ির লক খুলল, তারপর গাড়ি স্টার্ট করে আস্তে আস্তে চালিয়ে চলে গেল, বুড়িরা যেমন সাবধানীভাবে গাড়ি চালায়। শী ওয়জ জাস্ট অ্যান ওল্ড হ্যাগ।

ম্যাক্স বলল, গাড়ির নাম্বার প্লেট নোট করেছ?

ওরা বলল, করেছি।

ম্যাক্স বলল, ফলো নাও কার গাড়ি।

তারপর বলল, কিন্তু জন কোথায়? জনের কী হল? জন তো সাড়া দিচ্ছে না। দ্যাখো তোমরা কোথায় গেল জন?

ম্যাক্স আমাকে বলল, তোমার সঙ্গিনী তো একটি চীজ—দ্যাখো, জনকেও সে ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর খাচ্ছে কি না। তোমাকেও যখন দরজা খুলল না—আরও দশ মিনিট পর আসতে বলল। তখন ব্যাপারটা রহস্যময়।

আমি বললাম, দরজা ভাঙবে না কি?

ম্যাক্স বলল, না। নিজেই যখন সাড়া দিল তখন দশ মিনিট অপেক্ষাই করা যাক। তা ছাড়া তাড়াহুড়ো করলে ওর কাছে পিস্তল-টিস্তল যদি থাকে তবে তাতে দু-একজন লোক মারা পড়বে। লারাও মারা যেতে পারে।

লারার গুলিতে মারা যাওয়ার কথাতে আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

তারপর ম্যাক্স ইয়ার্কি করে বলল, দশ মিনিট সময় কি জনের আদর খাবার পক্ষে যথেষ্ট?

আমি অনেকক্ষণ পরে হাসলাম। বললাম, আমরা কোনারক-খাজুরাহোর দেশের পুরুষ। দশ ঘণ্টাও যথেষ্ট নয় আমাদের কাছে—তোমার জনের কথা জানি না।

ম্যাক্স খিলখিল করে হাসল। বলল, বুলশিট। বাড়িয়ে বলার একটা সীমা আছে।

দশ মিনিট কেটে যেতে চলল কিন্তু তবুও জনের পাত্তা নেই।

আমি আবার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বেল টিপলাম। তখনও লারা আবারও ওই একই কথা বলল।

আমি ম্যাক্সকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। ম্যাক্স দৌড়ে এল। আমরা দুজনেই কান পেতে শুনলাম। লারার আগের কথাগুলো বার বার শোনা গেল—ঘুরে ঘুরে। বার বার একই কথা বলছে লারা।

ম্যাক্সকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাল—ফ্যাকাশে মুখে আমাকে বলল, এ তো টেপ-রেকর্ডার বাজছে। টেপড মেসেজ।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বলো কী?

ম্যাক্স সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকি-টকিতে বাইরের গাড়িগুলোকে কনট্যাক্ট করল। ওরা বলল, জনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

www.BanglaBook.org

লারার কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এবার আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। রক্ত গড়িয়ে আসছিল ভিতর থেকে বাইরে, দরজার তলা দিয়ে।

ম্যাক্সকে দেখালাম।

ম্যাক্স সঙ্গে সঙ্গে বাইরের লোকদের যা যা ইনস্ট্রাকশন দেবার দিল।

আমি ও ম্যাক্স দৌড়ে রিসেপসানে ফিরে গেলাম। সেখানে দেখি ভ্যানারের সেই লোকটি ছটফট করছে। পায়চারি করছে উদ্বেগে।

ম্যাক্স বলল, মেয়েটি কোথায়?

লোকটি বলল, লেডিজরুমে ঢুকেছে তো ঢুকেছেই।

এতক্ষণ? ম্যাক্স অবাক হয়ে গেল।

তারপর বলল, তুমি গিয়ে দেখোনি কেন এতক্ষণ?

লোকটি অবাক হয়ে বলল, মেয়েদের ল্যাভেটরিতে আমি কী করে ঢুকব?

আমার হাসি পেয়ে গেল, কিন্তু হাসি বেরোল না।

ম্যাক্স রিসেপসানে নিজের পরিচয় দিয়ে একটি মেয়েকে যেতে বলল লেডিজরুমে। গিয়ে দেখতে বলল, কী ব্যাপার?

মেয়েটি লোকটির কথা শুনে, হাসতে হাসতে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই প্রচণ্ড চিৎকার করে আতঙ্কে দৌড়ে এল বাইরে। প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর বলল, রক্ত; খুন।

ম্যাক্সের অনেক অনুচর তখন এসে গেছে। হোটেল তখন উনিফর্ম পরা পুলিশেও ভর্তি।

মেয়েটি যখন বলল, লেডিজরুমে আর কেউ নেই, তখন ম্যাক্স ও তার অনুচরেরা লেডিজরুমে ঢুকল। ঢুকে ফিরে এল।

আমাকে বলল, ভ্যানারের সেই মেয়েটিকে গুলি করে মেরেছে কেউ। যাকে গুলি করেছে পিছন থেকে।

লেডিজরুমে আর কে ঢুকেছিল ওই মেয়েটি ঢোকার আগে ও পরে? ম্যাক্স জিজ্ঞেস করল ভ্যানারের লোক ও রিসেপসানের মেয়েদের।

ওরা সকলেই বলল, একজন জিনস পরা বুড়ি ছাড়া কেউই ঢোকেনি।

যদিও ম্যাক্স বলল, শী ইজ অ্যাজ ডেড অ্যাজ হ্যাম। তবুও পুলিশের লোক মেয়েটিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল।

ম্যাক্স জিজ্ঞেস করল রিসেপশানে, এ বুড়ি কি হোটেলের রেসিডেন্ট?

মেয়েরা বলল, বোধ হয় না। আমরা তো আগে দেখিনি। কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বোধ হয়।

তারপর হোটেলের অনুমতি নিয়ে লারার ঘরের দরজা ভাঙা হল। দরজা ভাঙতেই আমি ও ম্যাক্স সামনে ছিলাম—আঁতকে উঠলাম।

ম্যাক্স বলে উঠল, জন, ওই জন!

জন নামক ম্যাক্সের অনুচর মেঝের কার্পেটে পড়ে আছে। তার বুকের বাঁদিকে একটা রক্তাক্ত গর্ত।

বাথরুমে ঢুকে দেখা গেল জনের ওয়াকি-টকিটা বাথটবের জলের মধ্যে ডুবানো। লারার ছাড়া জামাকাপড়—চান করেছে তার সাবানের ফেনা। থিয়েটারের মেক-আপের নানা রকম জিনিসের খাপ ও খোল ছড়িয়ে পড়ে আছে।

দরজার সামনে মাটিতে শুইয়ে রাখা একটা ক্যাসেট টেপ-রেকর্ডার তখনও বেজে চলেছে—"ডার্লিং দশ মিনিট পরে এসো। আমার এক বান্ধবী এসেছিল, এই গেল...প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।"

ম্যাক্স আমার দিকে একবার সন্দেহের চোখে তাকাল।

একটা ভয় আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শির শির করে নামতে লাগল।

ম্যাক্স বলল, আজ লারার হাতে তোমারই মৃত্যু ছিল, কিন্তু মরল জন।

www.BanglaBook.org

তারপর দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে ডন-এর মৃতদেহ দেখিয়ে বলল, লুক অ্যাট দিস লাউজি ইডিয়ট। একজন অ্যাভারেজ অ্যামেরিকান। এদের জন্যেই সারা পৃথিবীতে আমরা বেইজ্জত। এদের জন্যেই পৃথিবীর সর্বত্র ক্ষমতার যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি আমরা। সিলী সোয়াইন্।

তারপর বড় দুঃখের গলায় বলল, জানো, দ্যা স্ট্রেনথ্ অফ আ নেশান ইজ লাইক দ্যাট অফ অ্যান আয়রন চেইন—দ্যা উইকেস্ট হিউম্যান এলিমেন্ট—দ্যা উইকেস্ট লিঙ্ক। দ্যাট্স দ্যা স্ট্রেনথ।

বেচারি ম্যাক্স গিলিগান। ও সম্পূর্ণ ফ্রাস্টেটেড হয়ে পড়েছিল। শেষ মুহূর্তে ওই একটি লোক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করায় এতগুলো যোগ্য লোকের পরিশ্রম বৃথা গেল।

নেনে

ম্যাক্স আমাকে কিছুতেই হোটেলে ফিরতে দিল না। বলল, এর পরও আজ রাতে তোমাকে একা থাকতে দেওয়া যায় না। তারপর বলল, কাল সকালে তোমার প্লেন ক'টায়?

আমি বললাম, দশটায়।

তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে দিয়ে আসবে আমার লোক। নাবার কোনও ক্ষতি তুমি করোনি। ন্যু ইয়র্কে তোমার কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। তবুও আমার ন্যু-ইয়র্কের লোককে বলে রাখব আমি।

আমি কথা আর কী বলব। বললাম, যা ভাল মনে করো তুমি।

আমরা ম্যাক্সের বাড়ি-কাম অফিসে ফিরে যাবার পর হনলুলুর সব চেয়ে নামী জুয়েলার ফার্মের ভান্ডারীকে ডাকল ওরা। হিরেগুলোর মূল্যায়ন করতে।

বুড়ো, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা, রঙিন হাওয়াইন শার্ট পরা পৃথিবীবিখ্যাত জহুরি চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একে একে হিরেগুলোকে দেখলেন।

পরীক্ষা শেষ করার পর ম্যাক্সকে বললেন, ম্যাক্স, উড ডা প্লিজ গিভ মি আ স্টিফ্ ড্রিঙ্ক।

ম্যাক্স গিয়ে ড্রিঙ্ক ঢালতে ঢালতে বলল, স্বাভাবিক।

তারপর বুড়োর দিকে ফিরে বলল, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তোমার জীবনে এত দামি এবং এতগুলো হিরে একসঙ্গে দেখোনি। কী বলো?

বুড়ো আস্তে আস্তে বলল, এই সবগুলো কাচের দাম একটা বেলজিয়ান কাট্ গ্লাসের অ্যাশট্রের চেয়েও কম হবে।

হো—হো—ট—! বলেই ম্যাক্স ড্রিঙ্ক হাতে থমকে দাঁড়াল।

পরক্ষণেই এক গলে হুইস্কির গ্লাসটা নিজের মুখেই ঢেলে দিল।

তারপর আরও দুটো গ্লাস বের করে নিজে আরেকটা নিয়ে আমাকে ও জহুরি বুড়োকে দিল।

বুড়ো বলল, সব কাচ। একটাও হিরে নয়।

ম্যাক্স বলল, মাই গুডনেস্। দ্যাট গার্ল মাস্ট বী দ্যা ডেভিল হিমসেল্ফ।

বলেই ম্যাক্স পা ছড়িয়ে সোফায় বসে পড়ল।

আমার মাথাও ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছিল।

কখন যে বুড়ো আরেকটা ড্রিঙ্ক নেবার পর চলে গেল, কখন রাত গভীর হল, কখন আমরা খেতে বসলাম, কতগুলো হুইস্কি খাবার পর, আমার মনে নেই।

আমি একাই ছিলাম তারপর আমার ঘরে। ম্যাক্স, বুড়ো চলে যাবার পরই নীচে ওর অফিসে চলে গেল।

টেলেক্স মেশিনের আওয়াজ, ইন্টারকমের বুঁ বুঁ, টেলিফোন, ওয়ারলেস, মেসেজ—সারা পৃথিবীময় একটি নেনে পাখিকে খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা চলতে লাগল যে কী বলব!

এমন সময় খবর এল, যে গাড়িটা করে বুড়িটা কাহালা হিল্টন থেকে বেরিয়ে গেছিল, সেটি একটা ভাড়া করা গাড়ি। হোটেল থেকে আধমাইল দূরে একটা পার্কিং লটে গাড়িটা পাওয়া গেছে।

www.BanglaBook.org

একজন সুন্দরী মেয়ে, জীনা জনসন—গাড়িটা বিকেলে কার-রেন্টাল কোম্পানি থেকে ভাড়া নিয়েছিল।

পরদিন সকালে প্লেনের সময় হলে ম্যাক্স আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে, ওর লোকদের দিয়ে পাঠিয়ে দিল এয়ারপোর্টে। প্যান-অ্যাম-এর ফ্লাইট আমার। সানফ্রান্সিসকো হয়ে ন্যু-ইয়র্ক। লম্বা ফ্লাইট।

এয়ারপোর্টে এসে প্যান-অ্যাম-এর টিকিট দেখিয়ে চেক ইন্ করতে যেতেই ডেস্কের মেয়েটি আমাকে একটি চিঠি দিল। খামে বন্ধ চিঠি।

আমি বললাম, কে দিয়েছে ?

মেয়েটি বলল, কিছুক্ষণ আগে একটি স্কুলের উনিফর্ম-পরা মেয়ে দিয়ে গেছে—আপনাকে দেওয়ার জন্যে। এই তো ছিল মেয়েটি—বলে ডেস্কের মেয়েটি এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল।

ম্যাক্স-এর লোকরা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। চিঠিটা ওরা দেখতে পায়নি, কথাও শুনতে পায়নি।

আমি অ্যান্টি-হাই-জ্যাকিং-এর ব্যাগেজ চেকিং-এর কাউন্টারে ঢুকে পড়ে ওদের হাত নেড়ে চলে যেতে বললাম।

প্যান-অ্যাম-এর ডি-সি টেন প্লেনটা অতিকায় রাজহাঁসের মতো টারম্যাক্ ছেড়ে উঠে এল—নীচে দিগন্তবিস্তৃত ওয়াইকিকি বীচটা দেখা যেতে লাগল। প্লেনটা একটা চক্কর মেরে প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলরাশি নীচে ফেলে মেঘ ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে গেল।

সীট বেল্টটা খুলে ফেলে আমি খামটাও খুলে ফেললাম।

চিঠিটা টয়লেট পেপারের উপর বল-পয়েন্ট পেন দিয়ে তাড়াতাড়ি লেখা।

মাই ডিয়ার জিত্,

আমি তোমাকে সত্যিই ভালবেসেছিলাম।

কিন্তু টাকার মতো ভাল জীবনে আর কিছুকেই বাসিনি।

এই পৃথিবীতে টাকাই হচ্ছে সব থেকে সুখ এবং ক্ষমতার মূল। যার টাকা নেই, তার কিছুই নেই।

আমার জন্যে তোমাকে কিছু ঝামেলা পোহাতে হল। আমাকে ক্ষমা কোরো। এয়ারপোর্টে সঙ্গে গিলিগানের লোক নিয়ে এসেছিলে কেন ?

তুমি জানো না, জীবনটা কী দারুণ ইন্টারেস্টিং। যে-জীবনে ঝুঁকি নেই, বুদ্ধি এবং টাকার খেলা নেই, নিজের ইচ্ছামতো মুঠিভরে হেলায় পৃথিবীকে ধরার ক্ষমতা নেই ; সে জীবন জীবনই নয়।

গিলিগানকে প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছি মর্মান্তিকভাবে। আবারও খেলা হবে। এই খেলার মধ্যেই, খেলার আনন্দেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। আমি এখন তোমার দেশের আগেকার কোনও মহারানির মতো বড়লোক। কুকুরের মতো অনেক পুরুষকে পুষব আমি। সব পুরুষই বোকা। মেয়েরা তাদের শরীর ও বুদ্ধিকে ঠিকভাবে চালিত করতে পারলে উইমেনস লিব-এর জন্যে শোভাযাত্রা করতে হত না মেয়েদের। পুরুষদের ঠুলি পরানো চোখ দিয়ে মেয়েরা চিরদিন জীবনকে দেখে এসেছে। আমি তেমন মেয়ে নই।

তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। ভালবাসা বলতে তুমি যা বোঝো, অন্য অনেক মেয়ে যা বোঝে ; আমি তা বুঝি না। আমার ভালবাসা শরীর-নির্ভর। আমার মন আমি কাউকেই দিতে পারব না। আমার মন আমারই একার।

এদেশে তোমার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না। হলে তোমারই বিপদ।

কোনওদিন তোমাদের দেশে যদি যাই তো তোমার কাছে যাব। কলকাতার ঠিকানা রেখেছি। তোমার সঙ্গে দার্জিলিং-এ যাব ও শেলের কবিতা পড়ব। তখন আবার তোমাদের দেশের গিলিগানদের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো না যেন !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরও টাকা, অনেক টাকার পর ক্ষমতা, আরও ক্ষমতার জন্যে, প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সব দেশের টাকাওয়ালা লোকেরা, রাজনীতিকরা মানুষ খুন করেছে ; সততা, চরিত্র, সরলতা যা-কিছু পবিত্র সব কিছুই খুন করছে—। সে খুনে রক্ত ঝরে না। সে বড় ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী খুন।

আমি একসময় খুবই গরিব ছিলাম বলে সেই খুনিদের প্রকৃত চেহারা আমি জানি। ধনী এবং ক্ষমতাসীন থাকার জন্যে ওরা পারে না এবং করে না এমন কিছুই নেই। ওরা সার্বিক খুনি, জন্ম খুনি ; বংশ পরম্পরায় খুনি।

ওদের তুলনায় আমি কিছুই নই।

আমার মধ্যে যে লারাকে তুমি জেনেছ সেও বাস করে ; করবে চিরদিন ; অন্য একটা রাগী নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষের সঙ্গে।

তুমি সেই প্রথম লারাকে মনে রেখো।

যে লারা তোমাকে ভালবেসেছিল।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—তোমার আদরের নেনে।

জানালা দিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালাম।

এখন আর ওয়াইকিকি, ওআহু দেখা যাচ্ছে না। নীচে কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু মেঘ, আর সুনীল শূন্যতা।

BanglaBook.org